শিবনাথ শাস্ত্রী

আত্মচরিত

সিগনেট প্রেস ।। কলকাতা ২০

প্রকাশকের নিবেদন

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'আত্মচরিত'এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদনা করেন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়। গ্রন্থকারের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও প্রথম সংস্করণের প্রেসকপি তুলনা করে দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি সামান্য কিছু পরিবর্তন করেছিলেন এবং 'সম্পাদকের নিবেদন'এ লিখেছিলেন : 'আমি কেবল পুনরুক্তি পরিহার, বর্ণনার অসামঞ্জস্য পরিহার এবং শৃঙ্খলা বিধানের চেষ্টা করিব।' মূল পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশ দ্বিতীয় সংস্করণেই প্রথম মুদ্রিত হয়। পরিশিষ্টে প্রসন্নময়ী দেবী প্রসঙ্গ শাস্ত্রীমহাশয় এই গ্রন্থের জন্য রচনা করেন নি, কিন্তু প্রবন্ধটি পরিশিষ্টের অন্যান্য প্রবন্ধের অনুরূপ বিবেচনা করে শাস্ত্রীমহাশয়ের পুত্র প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংযোজিত হয়। গ্রন্থের পরিচ্ছেদগুলির যে ভাবে তিনি বিন্যাস করেছিলেন বর্তমান সংস্করণেও সেই বিন্যাস রক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু প্রতি পরিচ্ছেদের প্রথমে বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আমরা বর্জন করেছি। তাছাড়া অনুচ্ছেদের প্রথমে বিষয়ের নামও বর্তমান সংস্করণে স্থানে-স্থানে পরিবর্তন করা হয়েছে।

'আত্মচরিত'এ অনেক বিদেশীয় গুণীব্যক্তির উল্লেখ আছে। গ্রন্থশেষে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যোগ করা হল।

প্রথম সিগনেট সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৫৯
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
১০।২ এলগিন রোড
কলকাতা ২০
প্রচ্ছদপট ও ছবি
সত্যজিৎ রায়
মুদ্রক
প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫ চিন্তামণি দাস লেন
ছবি ও প্রচ্ছদপট মুদ্রক
গসেন এণ্ড কোম্পানি
৭।১ গ্র্যাণ্ট লেন
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রিট

দাম চারটাকা

আত্মচরিত

সূচীপত্র

শিবনাথ শাস্ত্রী ॥ জন্ম ১২৫৩ সাল ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ। মৃত্যু ১৩২৫ সাল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ ॥

আত্মচরিত

পূর্বপুরুষগণ

গ্রাম মজিলপুর। কলিকাতা শহরের প্রায় ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সুন্দরবনের উত্তর প্রান্তে মজিলপুর নামে একটি গ্রাম আছে। ইহা প্রসিদ্ধ জয়নগর গ্রামের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত। ইহাতে ব্রাহ্মণ কায়স্থেরই অধিক বাস। ভদ্রলোকদিগের বাসস্থান হইতে দূরে গ্রামের পার্শ্বে কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, হাড়ি, মুচি প্রভৃতির বাস আছে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বড় অধিক নয়, গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ-কায়স্থদিগের কার্য নির্বাহের উপযুক্ত। গ্রামখানির ইতিবৃত্ত জানি না, অনুমান করি, এক কালে গঙ্গা এই পথে বহমানা ছিল* এবং গ্রামখানি গঙ্গার চড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পোর্তুগিজেরা যখন এদেশে আসে তখন এই পথে আসিয়াছিল কি না ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু প্রাচীন বাংলা কাব্যে ও পোর্তুগিজদের যাত্রাবিবরণে 'ময়দা' নামক একটি গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়, এই মজিলপুরের কয়েক ক্রোশ উত্তর-পূর্বে 'ময়দা' নামে এক গ্রাম এখনো বিদ্যমান আছে। ইহাতে অনুমান করা যায়, পোর্তুগিজেরা এই পথেই আসিয়া থাকিবে। গ্রামের পার্শ্বে মাঠে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে ভগ্ন জাহাজ ও বোটের নিদর্শন স্বরূপ অনেক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। তাহাতেও অনুমান হয়, এক সময় এই পথে জাহাজাদি চলিত। এইরূপে গ্রামখানি যে বহুকালের নয় তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

পূর্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা। এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, জাহাঙ্গীর বাদশার সময় যখন রাজা মানসিং যশোর নগর আক্রমণ করেন, তখন চন্দ্রকেতু দত্ত নামক এক জন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ভদ্রলোক সপরিবারে যশোর বিভাগ হইতে পলায়ন করিয়া ঐ চড়ার উপরিস্থিত গ্রামে সুন্দরবনের ভিতরে আসিয়া সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন।† তাঁহার সহিত তাঁহার যজ্ঞপুরোহিত ও কুলগুরু শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহারই প্রদত্ত এক সামান্য ভূমিখণ্ডে আপনার বাসস্থান নির্দেশ করেন। তিনিই আমাদের পূর্বপুরুষ। এই শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা কে, এবং কোথা

* এখনো মজিলপুর ও জয়নগর এই উভয় গ্রামের মধ্যস্থিত ভূমিখণ্ডকে 'গঙ্গার বাদা' বলে এবং এখনো আমাদের গ্রামের সমুদয় পুষ্করিণীর জল পবিত্র গঙ্গাজল বলিয়া গণ্য হয়।—গ্রন্থকারের হস্তলিখিত কুলপঞ্জিকা।

† চন্দ্রকেতু দত্তের পরিবারগণ এখনো আছেন। তাঁহারা মজিলপুরের দত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।—গ্রন্থকারের হস্তলিখিত কুলপঞ্জিকা।

হইতে আসিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ জানি না। যশোর হইতে আসিয়াছিলেন বলিলে মনে হইতে পারে তিনি পূর্বদেশের লোক, কিন্তু তাহা নহে। আমরা দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেদ হইতে বৈদিক নামের উৎপত্তি। তদ্ভিন্ন উদ্গাতা উপাধিটিও বৈদিক সম্পর্ক সূচনা করিতেছে। বৈদিক ঋত্বিকগণের মধ্যে হোতা পোতা অধ্বর্যু ও উদ্গাতার উল্লেখ দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে তৈলঙ্গ ও দ্রাবিড় দেশে এখনও বৈদিক শব্দ এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের প্রতি প্রযুক্ত দেখা যায়। যাঁহারা ধর্মের যজন-যাজন লইয়া থাকেন তাঁহারা 'বৈদিক', আর যাঁহারা বিষয়-ব্যাপারে লিপ্ত হন তাঁহারা 'লৌকিক'। তদ্ব্যতীত এখনো সে সকল প্রদেশে অনেক স্থানে বৈদিক প্রণালীতে হোমাদি ক্রিয়াকাণ্ডের রীতি প্রচলিত দেখা যায়। তদ্ভিন্ন এইরূপ বহু বহু ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা বেদগান, বেদমন্ত্রপাঠ ও হোমাদিরূপ বৈদিক কার্যের অনুষ্ঠানাদিকে জীবনের প্রধান কার্য করিয়া রহিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ উপলক্ষে গোদাবরী-তীরে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—

> "বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার—
> এই সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্ম সম,
> শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন।"

অতএব মনে হয় যে, হয় শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা, না হয় তাঁহার পূর্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া থাকিবেন। আমাদের বংশে এরূপ প্রবাদ আছে যে ইঁহার পূর্বপুরুষগণ উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর হইতে আসিয়াছিলেন। উড়িষ্যাতে এখনও 'ওতা' নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যায়। এই 'ওতা' শব্দ হোতা কি উদ্গাতার অপভ্রংশ কি না বলিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা হইতে আমি নবম পুরুষ পরে।

পিতা বংশের প্রথম রাজকর্মচারী। এই বংশের ব্রাহ্মণগণ মজিলপুর গ্রামের মধ্যভাগ ছাইয়া ফেলিয়াছেন। এই বাৎস-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ আবহমান কাল কেবল যজন-যাজন অধ্যয়ন-অধ্যাপন কার্যে রত থাকিয়া গৌরবান্বিত দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিয়া আসিয়াছেন। যত দূর স্মরণ হয়, এই বংশে আমার পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বাগ্রে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অধীনে পণ্ডিতী কর্ম লইয়া সকলের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তৎপূর্বে আমার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কেহ রাজসেবা করেন নাই।

প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার। বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে ও তৎপূর্ব শতাব্দীর শেষ ভাগে আমার স্ববংশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক সময়ে একই গ্রামে ১০।১২ খানি টোল চতুষ্পাঠী ছিল। তন্মধ্যে আমার প্রপিতামহ স্বর্গীয় রামজয় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের একখানি। ইনি একশত তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইঁহাকে আমি ১০।১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত দেখিয়াছি। আমার [illegible] বর্ণনাপ্রসঙ্গে ইঁহার কথা অনেক বলিতে হইবে।

পিতামহী লক্ষ্মীদেবী। আমার পিতামহ মহাশয় স্বগ্রামেই কাণ্বায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের গৃহে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই কাণ্বায়ন বংশীয়গণ বড় অহঙ্কৃত ও

তেজী মানুষ ছিলেন। আমার পিতামহীঠাকুরাণী লক্ষ্মীদেবী সেই বংশের কন্যা। তিনিও অতিশয় তেজস্বিনী নারী ছিলেন। আমাদের গৃহে এরূপ প্রবাদ আছে যে, তাঁহার ঘরে একবার চোর ঢুকিয়া নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার কণ্ঠদেশ হইতে কণ্ঠাভরণ হরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তিনি হঠাৎ জাগ্রত হইয়া এরূপ বলের সহিত চোরের হাত ধরিলেন যে তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া তার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। অনেক টানাটানির পর চোর কোনো মতে নিষ্কৃতি পাইল।

আর একটি গল্প ইহা অপেক্ষাও অধিক সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচায়ক। সেটি এই। সেকালে আমাদের গ্রামে শীতকালে মধ্যে মধ্যে বাঘ দেখা দিত। গ্রামটি সুন্দরবনের মধ্যেই বলিলে হয়। কয়েক ক্রোশের মধ্যে আকাট জঙ্গল ছিল। গ্রামের চতুষ্পার্শ্বেও বন-জঙ্গল যথেষ্ট ছিল। সুতরাং বাঘের আসা কিছুই বিচিত্র ছিল না। এই কারণে এই নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল যে, এক শাখাভুক্ত চারি-পাঁচ পরিবার একত্র বাস করিয়া সমগ্র পাড়াটি এক বড় প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া রাখিত; সম্মুখের দ্বার এক, খিড়কির দ্বার ভিন্ন ভিন্ন। এই বন্দোবস্তে কাজকর্ম চলিত। আমাদের কয়েক ঘর জ্ঞাতির সহিত আমাদের বাড়িটি এইরূপ এক প্রাচীরে আবদ্ধ ছিল। এক দিন শীতকালে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমার পিতামহ সায়ংসন্ধ্যা করিয়া খড়ম পায়ে উঠানে বেড়াইতেছেন, প্রপিতামহদেব সায়ংসন্ধ্যাতে নিমগ্ন আছেন, পিতামহীঠাকুরাণী রন্ধন-শালাতে পাককার্যে রত আছেন, এমন সময়ে পার্শ্বের প্রতিবেশীদের বাড়ি হইতে 'বাঘ, বাঘ' চীৎকার উঠিল। পিতামহ মহাশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দেখিবার জন্য সেদিকে উঁকি মারিলেন, অমনি বাঘের সঙ্গে চোখাচোখি। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বাবা, সত্যি তো বাঘ, আমাকে নিলে যে!" প্রপিতামহ বলিলেন, "দাঁড়িয়ে থাক, পিছন ফিরিস না।" অমনি যিনি যেখানে যে কাজে ছিলেন, সকলেই আমার পিতামহের রক্ষার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। পিতামহীঠাকুরাণী উনান হইতে এক জ্বলন্ত কাঠ লইয়া বাঘের দিকে ধাবিত হইলেন। শুনিতে পাই, সেই প্রজ্বলিত অগ্নি দর্শনে বাঘ ভীত হইয়া যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দ্বার দিয়া মহাবেগে বহির্গত হইয়া গেল। তখন জানিতে পারা গেল, কোনো প্রতিবেশীর একটি নবাগতা বধূ একটি খিড়কির দ্বার খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন, বাঘ তাহা দিয়াই প্রবেশ করিয়াছিল।

আমার পিতামহীর সমগ্র চরিত্র এই সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অনুরূপ ছিল। গ্রামেই বাপের বাড়ি, তাহাতে বাপেরা পদস্থ ও গর্বিত লোক, এজন্য তাঁহার দোর্দণ্ড প্রতাপে পাড়ার লোক সশঙ্ক চিত্তে বাস করিত। আমার পিতা শ্রীযুক্ত হরানন্দ বিদ্যাসাগর তাঁহারই গর্ভজাত পুত্র। তিনি স্বীয় জননীর ব্যক্তিত্ব ও প্রখর তেজস্বিতা প্রচুর পরিমাণে পাইয়াছিলেন।

পিতামহ রামকুমার ভট্টাচার্য। স্বর্গীয় রামকুমার ভট্টাচার্য আকৃতি ও প্রকৃতিতে পিতামহী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিলেন। পিতামহী গৌরাঙ্গী, তিনি শ্যামবর্ণ; পিতামহী অসহিষ্ণু, তিনি সহিষ্ণু; পিতামহী অন্যায়ের গন্ধ পাইলেই অগ্নিমূর্তি ধারণ করিতেন, পিতামহ ঠাকুর অনেক অন্যায় শান্ত ভাবে বহন করিতেন; এমন লোক ছিল না যে পিতামহীঠাকুরাণীকে অপমানের কথা শুনাইয়া দশ কথা না শুনিয়া যায়, পিতামহ মহাশয় অনেক অন্যায় কথা ও ব্যবহার নির্বাক থাকিয়া সহ্য করিতেন, অপমানের সম্ভাবনা হইতে দূরে থাকিতেন; পিতামহীঠাকুরাণী নিজ

গৃহের সুখ সমৃদ্ধি সর্বাগ্রে বুঝিতেন, সেইদিকে প্রধান দৃষ্টি রাখিতেন, বাহিরের লোকের সুখ দুঃখের দিকে ততটা মন দিতেন না; পিতামহের হৃদয়ের দ্বার বাহিরের লোকের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত ছিল। তিনি অতিশয় দয়ালু মানুষ ছিলেন।

বড়পিসীর মুখে নিম্নলিখিত গল্পটি শুনিয়াছি। একদিন বড়পিসী দোলাতে বসিয়া আছেন, এমন সময় পিতামহ ঠাকুর স্নান করিয়া আসিলেন। আসিয়াই সত্বর শয়ন ঘরে প্রবিষ্ট হইলেন। পিসী দেখিলেন, তিনি গামছাখানি পরিয়া আসিয়াছেন, পরিধেয় বস্ত্র নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! তোমার কাপড় কোথায় ফেলে এলে?" পিতামহ তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া চুপে চুপে বলিলেন, "চেঁচিয়ো না মা! তোমার মা যেন টের পায় না, কাপড়খানা একজন গরীবকে দিয়ে এসেছি।" ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, পিতামহ মহাশয়কে অনেক সময় . পিতামহীঠাকুরাণীর ভয়ে লুকাইয়া দান করিতে হইত। আমার পিতাঠাকুর স্বীয় মাতার এই তেজস্বিতা ও নিজ পিতার এই সহৃদয়তা, উভয়ই পাইয়াছিলেন।

বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী প্রদেশে ভীষণ সাইক্লোন হয়। এই ঝড়ে সমুদ্রতরঙ্গ উঠিয়া আমাদের গ্রামের দক্ষিণবর্তী সমুদয় প্রদেশকে প্লাবিত করে। সেই সময়ে হাজার হাজার লোক মারা যায়। তদনন্তর ওলাউঠা রোগ বঙ্গদেশে প্রথম দেখা দিয়া আরও সহস্র সহস্র লোককে নিধন প্রাপ্ত করে। সেই ওলাউঠা রোগে দশদিনের মধ্যে আমার পিতামহ, প্রপিতামহী ও পিতামহী মারা পড়েন।

আমার পিতামহ ঠাকুর যখন গত হইলেন, তখন দুই পুত্র, দুই কন্যা পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন। তন্মধ্যে বড়পিসী তখন বয়ঃপ্রাপ্তা অর্থাৎ ১৬।১৭ বৎসরের মেয়ে, এবং তৎপূর্বেই সন্তানের মুখ দেখিয়াছেন। কাজেই তিনি তখন গৃহের কর্ত্রী হইয়া বসিলেন। পিসামহাশয় এই সময় হইতে ঘরজামাই হইয়া, বড়পিসীর শাসনাধীনে থাকিয়া, আমাদের বাড়িতেই বাস ও সমুদয় বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমার পিতার বয়ঃক্রম তখন ৬।৭ বৎসর। এইরূপে বৃদ্ধ প্রপিতামহ, পিসামহাশয় ও বড়পিসী, ছোটপিসী, কাকা, ও বড়পিসীর দুই সন্তান লইয়া সংসার চলিতে লাগিল।*

আমার প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার আয়েই সংসার চলিত। তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বৃত্তিরূপে অনেক উপার্জন করিতেন। তিনি অনেক সময় কলিকাতাতে বাস করিতেন। সেখানে তিনি পটলডাঙ্গার প্রসিদ্ধ রাধানাথ মল্লিক মহাশয়দের পরিবারের কুলপুরোহিত ছিলেন। দেশের কাজকর্ম দেখার ভার পিসামহাশয় ও বড়পিসীর উপর ছিল।

'কুলসম্বন্ধ' কুলীন বিবাহের প্রথা। ক্রমে আমার পিতার দশম কি একাদশ বৎসর

* পিতামহ-পিতামহীর মৃত্যু হইলে, বৃদ্ধ প্রপিতামহ, আমার জ্যেষ্ঠা পিতৃষ্বসা আনন্দময়ী বা বিন্দী, কনিষ্ঠা পিতৃষ্বসা গণেশজননী, আমার পিতা, ও আমার পিতৃব্য রামতারণ, এই কয়জন সংসারে থাকেন। বড়পিসীর স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত বিবাহ হয়।... পিসামহাশয় দত্তবাড়ীতে পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। কয়েক বৎসর মধ্যেই আমার পিতৃব্য রামতারণ ভট্টাচার্যের মৃত্যু হয়।—গ্রন্থকারের হস্তলিখিত কুলপঞ্জিকা।

বয়ঃক্রম ও সেই সঙ্গে বিবাহের কাল উপস্থিত হইল। দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলীনদিগের মধ্যে তখন কুলসম্বন্ধের প্রথা ছিল, এখন দিন দিন অন্তর্হিত হইতেছে। কুলসম্বন্ধের অর্থ এই যে, কুলীন বৈদিকের ঘরে কন্যা জন্মিলেই দুই-এক মাসের মধ্যে সমশ্রেণীর কোনো শিশু বালকের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখা হইত। তৎপরে কন্যা আট-নয় বৎসরের হইলেই বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করা হইত। যদি বিবাহের পূর্বে বাগ্‌দত্ত বরের মৃত্যু হইত, তাহা হইলে কন্যা 'অন্যপূর্বা' নাম পাইত। তৎপরে আর তাহার কুলীন বরের সহিত বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না, মৌলিক বরের সহিত বিবাহ হইত। আমার দুই পিসী, এইরূপে 'অন্যপূর্বা' হইয়া মৌলিক বরের সহিত বিবাহিত হইয়াছিলেন। এই প্রথানুসারে আমার পিতার ছয় কি সাত মাস বয়সের সময়, কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ববর্তী চাঙ্গড়িপোতা গ্রামের হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের একমাস-বয়স্কা প্রথমা কন্যার সহিত কুলসম্বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তদনুসারে দশম কি একাদশ বৎসর বয়সে আমার পিতার বিবাহ হইল।

মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। আমার মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় এক জন সুবিজ্ঞ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও অধ্যাপক ছিলেন। কলিকাতা কাঁসারিপাড়াতে তাঁহার টোল চতুষ্পাঠী ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবিখ্যাত সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্য-জগতে চিরদিনের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আমার মাতামহ কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিষ্ঠিত 'প্রভাকর' নামক পত্রিকা সম্পাদনে তাঁহার সাহায্য করিতেন। তিনি উত্তর কালে মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত বাংলা পাঠশালাতে পণ্ডিতী কর্ম লইয়াছিলেন, এবং আমার বড়মামা সংস্কৃত কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই কলেজেই কর্ম পাইলে, মাতামহ মহাশয় মিতব্যয়িতার গুণে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া পৈতৃক ভিটা হইতে উঠিয়া স্বগ্রামেই একটি দোতালা পাকা বাড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষে ইহা এক নূতন ব্যাপার বলিয়া ঐ দোতালা বাড়ি প্রতিবেশীবর্গের অনেকের চক্ষের শূল-স্বরূপ হইয়া বহুদিন ধরিয়া আমার মাতুল পরিবারের ঘোর অশান্তির কারণ হইয়াছিল। তাহা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিব।

মাতামহ মহাশয়কে আমার বেশ স্মরণ হয়। আমার ৯।১০ বৎসরের সময় তিনি দারুণ উরুস্তম্ভ রোগে গতাসু হন। তিনি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, প্রসন্নমূর্তি, দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন। আমাকে 'শিবরাম' বলিয়া ডাকিতেন। গৃহস্থালী বিষয়ে পরিপক্কতা তাঁহার প্রধান গুণ ছিল। আমার মাতুলালয়ে সম্বৎসরের চাল-ডাল প্রভৃতি গৃহস্থের প্রয়োজনীয় তাবৎ দ্রব্য এরূপ সঞ্চিত থাকিত যে, হঠাৎ কোনো দিন দশ-পনরোজন অতিথি উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে দুই ঘণ্টার মধ্যে পরিতোষ পূর্বক আহার করানো মাতামহীঠাকুরাণীর পক্ষে কিছুই ক্লেশকর হইত না। মাতামহের মিতব্যয়িতা ও পাকা গৃহস্থালীর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমার বড়মামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রথম পুত্র উপেন্দ্রনাথের শৈশব কালে হুঁকা কলিকা হাতে লইয়া বেড়াইবার বাতিক ছিল। একটা হুঁকা ও কলিকা না পাইলে কাঁদিয়া ঘর ফাটাইত, রাত্রে তাহার শয্যার পার্শ্বে হুঁকা কলিকা রাখিতে হইত, রাত্রি দুই প্রহরের সময় জাগিলে হুঁকা হুঁকা করিয়া কাঁদিত। সুতরাং তাহার জন্য হুঁকা ও কলিকা সর্বদাই রাখিতে হইত। হুঁকা তো বড় একটা ভাঙিতে পারিত না, কলিকা-গুলি দিনে ২।৩ বার ভাঙিত। মাতামহ মহাশয় প্রতি শনিবার কলিকাতা হইতে

গৃহে আসিতেন, আসিয়া রবিবার গৃহস্থালীর জিনিস গুছাইতেন। একবার আসিয়া রবিবার কয়েক ঘণ্টা বসিয়া মাটি দিয়া এক ঝোড়া কলিকা গড়িয়া খড়ের আগুনে পোড়াইয়া রাখিয়া গেলেন; অভিপ্রায় এই, উপেন যত পারে কলিকা ভাঙুক। তখন এক পয়সাতে বোধ হয় আটটা কলিকা পাওয়া যাইত, সে ব্যয়টুকুও বাঁচাইবার দিকে তাঁহার এত দৃষ্টি পড়িল।

দোলদার ছক্কড়-গাড়ি। পূর্বেই বলিয়াছি চাঙ্গড়িপোতা গ্রাম কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রতিষ্ঠিত। সেকালে এক প্রকার দোলদার ছক্কড়-গাড়ি ছিল, তাহা চাঙ্গড়িপোতার সন্নিহিত রাজপুর গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিত। কুঠীওয়ালা বাবুরা ও অপেক্ষাকৃত পদস্থ ব্যক্তিরা প্রতি সোমবার সেই দোলদার ছক্কড়-গাড়ি চড়িয়া কলিকাতায় আসিতেন ও শনিবার কলিকাতার ধর্মতলা হইতে ঐ গাড়ি চড়িয়া বাড়ি যাইতেন। আমার মাতামহের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না, কিন্তু তাঁহাকে কেহ কখনো গাড়িতে দেখিতে পাইত না। তিনি সর্বদাই শনিবার পদব্রজে কলিকাতা হইতে বাড়িতে যাইতেন, এবং সোমবার পদব্রজেই কলিকাতায় ফিরিতেন; বড়মামাও সেইরূপ করিতেন। আমি ৮ বৎসরের সময় কলিকাতায় আসিলে, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে পদব্রজে যাতায়াত করিতাম।

এই সকল কারণে লোকে কৃপণ বলিয়া আমার মাতামহের অখ্যাতি করিত; কিন্তু আমি কলিকাতায় তাঁহার বাসাতে আসিয়া দেখিয়াছি, তিন জামাতা ছাড়া স্বসম্পর্কীয় প্রায় ৮।৯ জন যুবক তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে। যাহা হউক, তিনি যে অতিশয় হিসাবী ও মিতব্যয়ী লোক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার মাতা-ঠাকুরাণী গোলোকমণি দেবী স্বীয় পিতার গৃহস্থালীর সুব্যবস্থা ও মিতব্যয়িতা পাইয়াছিলেন।

মাতামহী। আমার মাতামহীঠাকুরাণী আকৃতি ও প্রকৃতিতে মাতামহ হইতে বিভিন্ন ছিলেন। মাতামহ সম্বৎসরের চাল-ডাল গোলাতে সঞ্চয় করিতেন, মাতামহী দরিদ্রা স্ত্রীলোকদিগকে গোপনে ডাকিয়া সেই চাল-ডাল অঞ্চল ভরিয়া দান করিতেন; টাকা-কড়ি সর্বদা দুই হাতে দান করিতেন। এজন্য তাঁহার পতি বা পুত্র তাঁহার হস্তে সংসারের টাকা রাখিতেন না, আপনাদের নিকট রাখিতেন। কিন্তু মাতামহীর নিজ ব্যয় বলিয়া তাঁহার হস্তে যাহা দেওয়া হইত, তাহা হইতেই দান-ধ্যান চলিত।

এই স্থানে মাতামহীঠাকুরাণীর সদাশয়তার কয়েকটি নিদর্শন দেখাই। আমার পিতা আমাকে কলিকাতায় রাখিয়া গেলে সময় সময় আমার ভয়ানক অর্থাভাব হইত, তখন অনন্যোপায় হইয়া আমি মাতুলালয়ে যাইতাম। মামীদিগকে আমার অভাব জানাইতে সাহস করিতাম না। মাতামহীঠাকুরাণী আমাকে এত ভালোবাসিতেন যে আমি মাতুলালয়ে গেলে, রাত্রে আমাকে স্বীয় শয্যাতে লইয়া গলা জড়াইয়া শুইতে ভালোবাসিতেন। এই নিয়মে তিনি আমাকে অনেক বৎসর পর্যন্ত কাছে রাখিয়া-ছিলেন। তিনি কিরূপ স্নেহে আমাকে নিজ বাহু পাশে বাঁধিতেন তাহা স্মরণ করিলে এখনো চক্ষে জল আসে। যাহা হউক, যে জন্য এ বিষয়টা উল্লেখ করিতেছি তাহা এই—মাতামহী আমাকে নিজের কাছে লইয়া শয়ন করিলে আমি রাত্রে তাঁহার কানে কানে আমার দারিদ্র্যের কথা বলিতাম। তিনি গোপনে আমার কাপড়ের খুঁটে তাঁহার নিজ ব্যয়ের টাকা হইতে হয়তো দুইটি বা চারিটি টাকা বাঁধিয়া দিতেন,

বলিতেন, "এ কথা কারুকে বল না, টাকার কষ্ট হলেই আমার কাছে এস।" এখন স্মরণ করিয়া লজ্জা হয়, কি স্বার্থপরতার কাজই করিতাম!

আমার মাতামহী-ঠাকুরাণী বড় ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন। উপহাসচ্ছলেও যদি কাহাকেও কিছু দিব বলিয়া মুখ দিয়া কথা বাহির করিতেন, তাহা হইলে তাহা না দিয়া প্রসন্নমনে থাকিতে পারিতেন না, তাহা দিতেই হইত। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার রন্ধনশালার জন্য একটি বড় ঘটি কেনা হইল। ঘটিটি এত বড় যে জলশুদ্ধ নাড়াচাড়া করিতে মেয়েদের কষ্ট হয়। মাতামহী একবার জলসমেত ঘটিটি তুলিতে গিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাবা রে! এ ঘটির এক ঘটি জল যদি কেউ এক বারে খেতে পারে, তবে তাকে এক টাকা দিই।" অমনি জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে এক পরিবারের একটি ছেলে ছুটিয়া গিয়া ঘটিটি লইয়া জলপান করিতে বসিয়া গেল। মাতামহী ভয় পাইয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে, তুই অত জল খাসনি, আমি টাকা দিব বলিছি, দিবই," এই বলিয়া একটি টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিলেন। আর একবার একদিন গ্রীষ্মকালে ভয়ানক রৌদ্রে উঠান তাতিয়া অগ্নি-সমান হইয়াছে। এমন সময় মাতামহীঠাকুরাণীর একবার গোলাতে যাওয়ার আবশ্যক হইল। উঠানে পা দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "বাবা রে! যেন আগুন, এ উঠানে যদি কেউ দুদণ্ড বসতে পারে, তবে তাকে দুটাকা দিই।" অমনি একজন যুবক প্রস্তুত! সে লম্ফ দিয়া সেই তপ্ত উঠানের মধ্যে গিয়া বসিল। মাতামহী একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন, "ওরে তুই উঠে আয়, আমি দুটাকা দিচ্ছি," বলিয়া তাহাকে দুই টাকা দিলেন।

বাস্তবিক তাঁহার মতো কোমলহৃদয়া, দয়াশীলা, স্বজনবৎসলা, উদারপ্রকৃতি, সত্যপরায়ণা নারী অল্পই দেখিয়াছি। আমার বড়মামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ধর্মভীরুতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। সে ধর্মভীরুতা তিনি জননী হইতে পাইয়াছিলেন।

মাতামহীর বৃদ্ধাবস্থায় আমার দুই মামী যখন ঘরকন্নার ভার লইলেন ও তাঁহাকে সংসারের খুঁটিনাটি হইতে নিষ্কৃতি দিলেন, তখন ধর্মচিন্তা, দরিদ্রের সেবা ও গৃহস্থ শিশুগণের পালন তাঁহার প্রধান কাজ দাঁড়াইল। তিনি প্রতিদিন প্রাতে প্রায় অর্ধ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন, এবং স্নানান্তে ফিরিবার সময় পথের দুই পার্শ্বে পরিচিত দরিদ্র পরিবারদিগকে দেখিয়া আসিতেন। এটি তাঁহার নিত্য ব্রতের মধ্যে হইয়াছিল। এজন্য তিনি নিজ ব্যয়ের টাকা হইতে কয়েক আনা পয়সা সঙ্গে লইতেন, এবং গৃহে ফিরিবার সময় বাড়িতে বাড়িতে প্রবেশ করিয়া আবশ্যক-মতো কিছু কিছু সাহায্য করিতেন, এবং নিজের সাধ্যে না কুলাইলে, পুত্রদিগকে অনুরোধ করিয়া সাহায্য করাইয়া দিতেন।

তাঁহার সহৃদয়তার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কথা স্মরণ হইতেছে। একবার আমি পদব্রজে স্বীয় বাসগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলাম। পথিমধ্যে মাতুলালয়ে একবেলা থাকিয়া আসিব এইরূপ সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু অগ্রে তথায় সংবাদ দিই নাই। গ্রাম হইতে অতি প্রত্যুষে বাহির হইয়াছিলাম, মাতুলালয়ে পৌঁছিতে প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া যাইবে। পথিমধ্যে একজন হীনজাতীয় লোক আমার সঙ্গ লইল। সে ব্যক্তি সর্বপ্রথম কলিকাতায় আসিতেছে। সে যখন শুনিল যে আমি শহরে আসিতেছি তখন ব্যগ্রতা সহকারে তাহাকে সঙ্গে লইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি জানিতাম, বিনা সংবাদে অসময়ে মাতুলালয়ে পৌঁছিব, হয়তো মামীদিগকে আবার পাক করাইতে হইবে, সেই ভয়ে প্রথমে ইতস্তত করিলাম, কিন্তু তাহার ব্যগ্রতাতিশয়

দেখিয়া চক্ষুলজ্জাবশত 'না' বলিতে পারিলাম না। দুইজনে দ্বিপ্রহরের সময় মাতুলালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মামীরা তখন আহারে বসিয়াছেন, মাতামহী-ঠাকুরাণী বসিতে যাইতেছেন, তখনও ভাতে হাত দেন নাই। আমার গলার স্বর শুনিয়া বাহিরে আসিলেন। আমি তাঁহাকে চুপে চুপে বলিলাম, একটি অন্যজাতীয় লোক পথ হইতে আমার সঙ্গ লইয়াছে। সে কলিকাতায় কখনো যায় নাই, আমার সঙ্গে যাইবে। তিনি বলিলেন, "বেশ তো, তুই শিগ্‌গির নেয়ে এসে মামীদের পাতে বসে যা। আমার ভাত ঐ লোকটি খাক, আমি আমার ভাত চড়িয়ে দিচ্ছি, পরে খাব।" এ প্রকার বন্দোবস্তটা আমার ভালো লাগিল না। একবার বলিলাম, "তোমার ভাত ওকে কেন দেবে, যে ভাত চড়াবে, তাই ওকে দিয়ো, তোমার ভাত তুমি খাও।" তিনি বলিলেন, "আহা! বেচারা পথ চলে ক্লান্ত হয়ে এসেছে, ও বসে থাকবে আর আমরা খাব, তা কি হয়? যা যা তুই নেয়ে আয়।" তাঁহার ত্বরাতে আমাকে আর ভাবিতে-চিন্তিতে সময় দিল না, তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিয়া মামীদের পাতে বসিয়া গেলাম। মাতামহী সেই লোকটির হাতে তেল দিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমিও নেয়ে এসো, আসবার সময় আমাদের বাগান থেকে একখানা কলাপাতা কেটে এনো।"

তাহার পরে মাতামহীঠাকুরাণী যখন উঠানের পাশে ঢেঁকিশালার দাবা ঝাঁট দিয়া নিজের ভাতগুলি তুলিয়া তাহাকে দিতে গেলেন, তখন মামীদের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল। তাঁহারা রাগারাগি করিতে লাগিলেন। দিদিমা আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদিগকে বলিয়া নিজের ভাতগুলি ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া দিলেন। আমি আহারান্তে আচমন করিয়া আসিয়া দেখি সে ব্যক্তি আহারে বসিয়াছে, দিদিমা অদূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, এবং "বাবা, এটা খাও, ওটা খাও," বলিতেছেন; যেন তাহার প্রত্যেক গ্রাসে তাঁহার সন্তোষ হইতেছে। সে ব্যক্তি আহারান্তে আসিয়া গলবস্ত্র হইয়া আমার মাতামহীর চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিল, "মা, অনেক বামনের মেয়ে দেখেছি, তোমার মতো বামনের মেয়ে দেখিনি।"

ঠিক কথা! আমার মাতামহীর ন্যায় ব্রাহ্মণকন্যা বিরল। বলিতে কি, তাঁহাকে আমি যখন স্মরণ করি, আমার হৃদয় পবিত্র ও উন্নত হয়, এবং এ কথা আমি মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমাতে যে কিছু ভালো আছে, তাহার অনেক অংশ তাঁহাকে দেখিয়া পাইয়াছি।

জন্ম ও শৈশব

মাঘ-প্রতিপদে জন্ম। এই মাতামহীর ক্রোড়ে, মাতুলালয়ে, বাংলা ১২৫৩ সাল ১৯শে মাঘ, ইংরাজী ১৮৪৭ সাল ৩১শে জানুয়ারী, রবিবার, আমার জন্ম হইল। আমার জন্মকালের বিষয় যাহা শুনিয়াছি, লিখিতেছি। সায়ংকালে যখন আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম, তখন সবে পূর্ণিমা গিয়া প্রতিপদের সঞ্চার হইতেছে। সেদিন আমার মাতামহ বাড়িতে আছেন। কন্যার পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শ্রবণমাত্র তিনি তাঁহার এক দৈবজ্ঞ জ্ঞাতিবন্ধুর ভবনে ধাবিত হইলেন। গৃহস্থ রমণীগণের শঙ্খধ্বনিতে পাড়া কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। ওদিকে গ্রামে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল যে, ন্যায়রত্নের দৌহিত্র জন্মিয়াছে। মাতুলগৃহে সেই প্রথম শিশুবালকের আবির্ভাব। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতামহী ও তাঁহার জননী, দুই মামী, দুই মাসী (আর এক মাসী তখনো শিশু) ও গৃহস্থ অপর দুই-একজন বিধবা, ইঁহাদের আদর ও অভ্যর্থনার ধন হইলাম। পরদিন রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই দলে দলে বাজনাদার আসিয়া বাড়ি আক্রমণ করিতে লাগিল। পরদিন প্রাতে মাতামহ মহাশয় কলিকাতায় গেলেন। শনিবার তাঁহার ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সাতদিন দলে দলে বাজনাদার আসিয়া বাড়ি মাথায় করিয়া তুলিল।

শনিবার মাতামহ ঠাকুর ও বড়মামা কলিকাতা হইতে আসিলেন। বাবা তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, তিনি বোধ হয় লজ্জাতে তাঁহাদের সঙ্গে আসেন নাই। কিছু দিন পরে আসিয়াছিলেন। বড়মামা রবিবার প্রাতে সূতিকাগৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া মোহর দিয়া ভাগিনার মুখ দেখিলেন। জননীর মুখে শুনিয়াছি, আমার মামা আমার মাথা ও কপাল দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার এই ভাগিনা বড়লোক হবে।"

ক্রমে সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইয়া আমি মাতামহী মামী ও মাসীদের কোলে বাড়িতে লাগিলাম। বিশেষত আমার মেজমাসী এক দণ্ড আমাকে কোল হইতে নামাইতেন না।

কিন্তু আমি পৃথিবীতে পদার্পণ করিবামাত্র মাতুলগৃহে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, আমার মাতামহ মহাশয় স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিয়া পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগ পূর্বক, তাহার নাতিদূরে একটি দ্বিতল পাকা বাড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঐ দ্বিতল বাড়িটি পাড়ার লোকের চক্ষুঃশূল হইল। একখণ্ড পতিত জমি ক্রয় করিয়া সেই জমির উপরে ঐ বাড়িটি নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ভূমিখণ্ড বহুদিন পতিত অবস্থাতে থাকাতে তাহার উপর দিয়া লোকের যাতায়াতের পথ হইয়া গিয়াছিল। বহু বহু বৎসর ধরিয়া লোকে সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিত। কিন্তু মাতামহ যখন তাহা ক্রয় করিয়া, প্রাচীরের দ্বারা আবদ্ধ

করিয়া, তদুপরি গৃহনির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাহা লইয়া বিবাদ ও বিষম দলাদলি ও তাহার ফলস্বরূপ মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। তখন প্রতিবেশীগণ আমার মাতুল-পরিবারের প্রতি এরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিল যে, তাঁহারা বাধ্য হইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হইলেন। সেই সূত্রে আমার ছয় মাস বয়সে জননী আমাকে লইয়া আমাদের বাসগ্রাম মজিলপুরের বাটীতে গেলেন।

আমার প্রপিতামহ তখন সকল কর্ম হইতে অবসৃত হইয়া গৃহে আসিয়া বসিয়াছেন; চক্ষে দেখেন না, কানে শোনেন না। তিনি আমাকে পাইয়া "আমার বংশধর আসিয়াছে" বলিয়া মহা আনন্দিত হইলেন, এবং আমাকে 'বাবা বাবা' করিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

শৈশবে অশান্তি। আমার এতটা অভ্যর্থনা আমার বড়পিসীর সহ্য হইল না। কয়েক বৎসর পূর্বে আমার কাকার মৃত্যু হওয়ার পর, ও ছোটপিসী শ্বশুরালয়ে যাওয়ার পর, তিনি নিজ পুত্রকন্যাগণকে লইয়া গৃহের কর্ত্রী হইয়া বসিয়াছিলেন। সে ভিটা যে তাঁহাকে কোনো দিন পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা বোধ হয় স্বপ্নেও জানিতেন না। গৃহকর্ত্তা স্বীয় পিতামহের হাতে নূতন বংশধরের এই আদর দেখিয়া তাঁহার আর এক চিন্তার উদয় হইল। তিনি বুঝিলেন, তিনি এতদিন ভিতরে থাকিয়াও বাহিরে রহিয়াছেন।

ইহার পর হইতে আমার মাতার প্রতি তাঁহার দারুণ বিরুদ্ধ ভাব জন্মিল এবং ননদে ও ভাজে মন-কষাকষি আরম্ভ হইল। তাহার ফলস্বরূপ আমার মা আমাকে দেখিতেন না। মনের রাগে প্রভাত হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অনাহারে রান্নাঘরে সংসারের কাজে নিমগ্ন থাকিতেন, আমি চেঁচাইয়া মরিয়া যাইতাম, একবার ফিরিয়া চাহিতেন না। বড় কাঁদিলে আমার পিসতুতো বোনেরা কোলে করিয়া রান্নাঘরে লইয়া গিয়া উনানের নিকট হইতে স্তন্যপান করাইয়া আনিত। কিন্তু রাগের দুধ খাইয়া খাইয়া আমার ঘোর উদরাময় জন্মিল; যেমন দুধ পান করিতাম, তেমনি দুধ বাহির হইয়া যাইত। অল্পদিনের মধ্যে রাগে ও অনাহারে মায়ের বুকের দুধ শুকাইয়া গেল। তখন আমার জীবন সংকট উপস্থিত। রক্তভেদ ও রক্তবমন আরম্ভ হইল। তখন মা'র চক্ষু স্থির হইল। তিনি সমস্ত দিন সংসারের কাজে থাকিতেন, সমস্ত রাত্রি আমাকে কোলে করিয়া বসিয়া কাঁদিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে আমার মুখে জল দিতেন। এই অবস্থাতে একদিন আমার পিসীর অনুপস্থিতি কালে আমার মা আমার প্রপিতামহের ক্রোড়ে আমাকে শোয়াইয়া তাঁহার কানে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার দুধ শুকিয়ে গিয়েছে, তোমার বাবা না খেতে পেয়ে মরে।" এই কথা শুনিয়া তিনি নিজের গালে মুখে চড়াইতে লাগিলেন, এবং এই সংবাদ তাঁহাকে কেহ দেয় নাই বলিয়া আমার পিসামহাশয় ও পিসীমাকে গালাগালি দিতে লাগিলেন; এবং পিসামহাশয় আসিলে হুকুম দিলেন, "আমার বাবার জন্য যত দুধ লাগে রোজ করে দাও।" আমার জন্য দুধের রোজ হইল। তদবধি প্রপিতামহ কিছু সতর্ক হইয়া কান পাতিয়া থাকিতেন। ছোট ছেলের কান্না একটু কানে গেলেই "বাবা কেন কাঁদে" বলিয়া চীৎকার করিতেন, আর বড়পিসী রাগিয়া যাইতেন।

আমার জন্য দুধের রোজ হইল বটে, কিন্তু তখন উদর ভাঙ্গিয়াছে, ছেলে আর বাঁচানো যায় না। আমার শরীর অস্থিচর্মসার হইল। তখনকার অবস্থা এই বলিলেই

যথেষ্ট হইবে যে, আমার পাছা ছিল না যে পাছা পাতিয়া বসি; যখন বসিতে শিখিলাম, তখন পিঠের দাঁড়ার উপর বসিতাম। সেই যে আমার হাত পা ছিনা পাড়িয়া গেল, সেই ছিনা-পড়া এখনো রহিয়াছে।

দারুণ উদরভঙ্গের উপরে রসতড়কা রোগ দেখা দিল। মধ্যে মধ্যে সমুদয় গা গরম হইয়া হাত পা খেঁচিতাম ও অজ্ঞান হইয়া যাইতাম। মা আমাকে বুকে ধরিয়া 'ছেলে গেল' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেন। মায়ের মুখে শুনিয়াছি, এই রোগ প্রায় ৭।৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছিল, ডুব দিয়া নাইতে শিখিলে সারিয়া যায়। আমার আকার ও মূর্তি তখন এ প্রকার হইয়াছিল যে, আমাকে রাখা ও আমার সেবা করা একমাত্র জননী ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য ছিল না।

যাহা হউক, আমার পিসীমা আমার প্রপিতামহের তিরস্কার খাইয়া খাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে আমাদের ভিটাতে আর তাঁহার থাকা হইতেছে না। পিসামহাশয় আমাদের বাড়ির সম্মুখেই কিছু জমি লইয়া একটি বসতবাটী নির্মাণ করিলেন। পিসীমা সপরিবারে সেখানে উঠিয়া গেলেন। আমার বয়স তখন দুই কি আড়াই বৎসর হইবে।

বড়পিসী উঠিয়া গেলে গৃহে শান্তি হইল বটে, কিন্তু আমার মা'র আর এক প্রকার সংগ্রাম উপস্থিত হইল। একমাত্র দাসী সহায় করিয়া সেই বৃদ্ধ দাদাশ্বশুর ও শিশুপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইতে হইল। একলা ঘরে একলা স্ত্রীলোক পাইয়া চোরে বড় উপদ্রব আরম্ভ করিল। কয়েকবার সিঁদ হইল। এক রাত্রে এক ঘরে পাঁচ জায়গায় সিঁদ ফুটাইয়াছিল।

আমার মা। একদিকে চোরের উপদ্রব, অপর দিকে দুষ্ট লোকের উপদ্রব। বাবা তখন কলিকাতায় আমার মাতামহের বাসায় থাকিয়া সংস্কৃত কলেজে পড়িতেছেন। সুতরাং আমার মাকে বৎসরের অধিকাংশ কাল সশঙ্ক চিত্তে একাকিনী থাকিতে হইত, এবং আত্মরক্ষার জন্য অনেক সময় উগ্রমূর্তি ধারণ করিতে হইত। সেই অবধি মায়ের এমন একটা আত্মমর্যাদাজ্ঞান জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার মর্যাদার অণুমাত্র লঙ্ঘন হইলে, তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না; লঙ্ঘনকারীকে জানিতে দিতেন যে, ঐ স্ত্রীলোকটির ভিতরে স্নেহের বারিধারার ন্যায় আগ্নেয়গিরির অগ্নিও আছে।

আমার মাতার আত্মমর্যাদাজ্ঞানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একটি আমার শৈশবে ঘটিয়াছিল, অপরটি বহু বৎসর পরে। প্রথম ঘটনাটি এই : পাঁচ বৎসর বয়স হইলেই মা আমাকে গ্রামের একটি পাঠশালে দিলেন। বসুপাড়ায় বসুদের বাড়িতে এক বর্ধমেনে গুরুর পাঠশালা ছিল, তাহাতে আমাকে ভর্তি করা হইল। আমি তালপাতে লিখিতে আরম্ভ করিয়াই দিন দিন সমপাঠী বালকদিগের অপেক্ষা উন্নতি দেখাইতে লাগিলাম। ইহার কারণ এই, আমার মা সে সময়কার তুলনাতে অনেক লেখাপড়া জানিতেন। আমার বাবা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মদন মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রিয় মানুষ ছিলেন। তাঁহার মত-সত একটু উদার ছিল, তিনি আমার মাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। মা প্রায় প্রতিদিন দুপুরবেলা রামায়ণ পড়িতেন। দুপুরবেলা তিনি নিজে পড়িতেন ও আমাকে পড়িতে ও লিখিতে শিখাইতেন। সেই জন্য আমি পাঠশালে অপরাপর বালকের অপেক্ষা অধিক উন্নতি দেখাইতে লাগিলাম। ইহাতে গুরুমহাশয়ের কিছু আশ্চর্য বোধ হওয়াতে তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, "তোরে কে পড়া বলে দেয় রে?" আমি বলিলাম, "আমার মা।" গুরুমহাশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর মা লেখাপড়া জানে?" উত্তর, "হাঁ, আমার মা বেশ পড়তে পারে।" তাহার পর গুরুমহাশয় সন্ধান লইলেন যে আমার মা একাকিনী বাড়িতে থাকেন, বাবা বিদেশে। একদিন গুরুমহাশয় আমার লিখিবার তালপাতে কি লিখিয়া আমাকে দিলেন, বলিলেন, "তোর মাকে দিস্, আর কেউ যেন দেখে না।" আমি ভাবিলাম, সকল বালকের মধ্যে আমি ভাগ্যবান, গুরুমহাশয় আমার মাকে পত্র লিখিয়াছেন। আমি বাড়িতে আসিয়া এক গাল হাসিয়া মাকে বলিলাম, "ওরে মা, গুরুমহাশয় তোকে কি লিখেছে দেখ্।" মা তালপাতাটি আমার হাত হইতে লইয়া একটু পড়িয়াই গম্ভীর মূর্তি ধারণ করিলেন, পাতাটি ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়া দিলেন। আমি তাহা আনিয়াছিলাম বলিয়া আমাকে মারিলেন, এবং তৎপর দিন হইতে আমার পাঠশালে যাওয়া বন্ধ করিলেন। সেই আমার পাঠশালে যাওয়া শেষ। তৎপরে তিনি আমাকে গ্রামের নবপ্রতিষ্ঠিত হার্ডিঞ্জ মডেল স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন।

আর একটি ঘটনা অন্যরূপ। সে ঘটনাটি সে সময়ে আমার মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হওয়াতেই স্মরণ আছে। একবার আমার মাতুলালয়ে কয়েকজন নবাগত অতিথি আহারে বসিয়াছেন। আমার মায়ের জ্ঞাতি সম্বন্ধে খুড়তুতো ভাই অভয়াচরণ চক্রবর্তী সেই সঙ্গে বসিয়াছেন। এই অভয়মামা কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে কি বিশপস্ কলেজে সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গ্রামে একজন পদস্থ ব্যক্তি। কিন্তু আমার মা ও পাড়ার অপরাপর প্রাচীনা আত্মীয়া মহিলারা অভয়মামাকে বালক-কাল হইতে 'ঘেনো' 'ঘেনো' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার 'অভয়' নাম দিদিদের বা খুড়ী-জেঠীদের মুখে কখনই শোনা যাইত না। সকলেই 'ঘেনো' 'ঘেনো' বলিয়া ডাকিতেন। উক্ত দিবস আহারের সময় আমার মা পরিবেশন করিতেছিলেন। তিনি মাছ পরিবেশন করিবার সময় অভয়মামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘেনো, তোকে একটা মাছের মুড়ো দেব?" কারণ অভয়মামা আহারের বিষয়ে খুঁতখুঁতে লোক ছিলেন, মা তাহা জানিতেন। এত লোকের সমক্ষে 'ঘেনো' বলিয়া ডাকাতে অভয়মামা রোষ-কষায়িতলোচনে একবার আমার মায়ের মুখের দিকে চাহিলেন, এবং অবজ্ঞাসূচক দুই-একটি বাক্য প্রয়োগ করিলেন। আমার মা তখন কিছু বলিলেন না। তৎপরে আচমনান্তে অভয়মামা যেই ঘরের মধ্যে পান খাইতে আসিয়াছেন, অমনি মা কুপিতা সিংহীর ন্যায়, পদাহতা ফণিনীর ন্যায়, গর্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "লেখাপড়া শিখে তোর এই বিদ্যে হয়েছে? আমি তোকে 'ঘেনো' বলেছি, তাই ভালো দেখায়, না 'অভয়বাবু' বললে ভালো দেখায়? তোর বন্ধুরা কি জানে না আমি তোর দিদি? তুই বাইরে অভয়বাবু হতে পারিস, আমাদের কাছে তো সেই ঘেনোই আছিস। জিজ্ঞাসা করে দেখিস, তোর বন্ধুরা ঐ ঘেনো ডাকেই খুশি হয়েছে কি না। আর যদি আমার ঘেনো বলাটা চুকই হয়ে থাকে, তুই তো অতগুলো ভদ্রলোকের সমক্ষে তোর দিদিকে অপমান করলি। এই তোর লেখাপড়ার ফল? তোর লেখাপড়াকে ধিক, তোর প্রফেসারিতে ধিক, তোর নাম সম্ভ্রমকে ধিক! অমুক কাকার কি কপাল, তোর জন্য এতগুলো টাকা বৃথা খরচ করেছেন!" যখন আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় এইরূপ বাক্যবাণ বর্ষণ চলিতে লাগিল, তখন অভয়মামা আর সহিতে না পারিয়া মায়ের পায়ে পড়িয়া বলিলেন, "দিদি! মাপ কর, অপরাধ হয়েছে।" অভয়মামাকে আমি বিদ্বান লোক ও গুণী লোক বলিয়া মনে মনে উচ্চ স্থান দিয়া রাখিয়াছিলাম।

তিনি যখন আমার মায়ের পায়ে পড়িয়া গেলেন, তখন আমি চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না। তিনি চলিয়া গেলে মাকে বকিতে লাগিলাম, "তুমি আমাকে যেমন করে বকো, তেমনি করে অত বড় লোকটাকে বকলে?" মা বলিলেন, "রেখে দে তোর বড় লোক, বড় লোকের মুখে ছাই!" সেদিনকার সে দৃশ্য আমি জন্মে ভুলিব না।

আমার তেজস্বিনী মা একাকিনী পড়িয়াও এইরূপে তাঁহার আত্মমর্যাদাজ্ঞানের গুণে আপনাকে রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। বাবা গ্রীষ্মের ছুটি ও পূজার ছুটির সময় বাড়িতে আসিতেন। আমি তাঁহাকে যমের মতো ডরাইতাম, কারণ তিনি সামান্য সামান্য কারণে আমাকে ভয়ানক মারিতেন।

আমার মা আমাতে কিছু অন্যায় দেখিলে রাগ করিতেন এবং সাজা দিতেন বটে, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার কি প্রকার স্নেহ ছিল, তাহার বর্ণনা হয় না। একবারকার একটা ঘটনা মনে আছে। তখন আমার বয়স চারি-পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না। সেই সময়ে একবার আমার গুরুতর পীড়া হইয়াছিল। সেই পীড়ার অবস্থাতে মা ইষ্টদেবতার চরণে প্রণত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহার কৃপায় ছেলে যদি সারিয়া যায়, তাহা হইলে তিনি হাতে মাথাতে ধুনা পোড়াইবেন, এবং নিজের বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া দেবতার স্তব লিখিয়া দিবেন। কয়েক দিনের পর আমি সারিয়া উঠিলাম। যেদিন ব্রত উদ্‌যাপনের দিন আসিল, সেদিন পাড়ার একটি মেয়ে আমাকে কোলে করিয়া মায়ের ব্রত উদ্‌যাপন দেখিবার জন্য ঠাকুর ঘরে লইয়া গেলেন। গিয়া দেখি, মা স্নান করিয়া আসিয়া দুই হাঁটুর উপর দুই হাত দিয়া যোগাসনে বসিয়াছেন। পূজারি ব্রাহ্মণ তাঁহার দুই হাতে ও মাথার উপরে কাদার তাল দিয়া তদুপরি জ্বলন্ত আগুনের সরা বসাইয়াছেন এবং মন্ত্র পড়িতে পড়িতে সেই আগুনে ধুনার গুড়া নিক্ষেপ করিতেছেন, আগুন দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। মনে হইল আমার মাকে পোড়াইতে যাইতেছে। যাঁহার কোলে ছিলাম, ভয়ে তাঁহার কাঁধে মুখ লুকাইলাম। তাহার পর যখন একখানা ছুরির বা নরুনের অগ্রভাগ দিয়া মা'র বুক চিরিলেন এবং একটা ঝিনুকে রক্ত ধরিয়া এক ভুর্জপত্রে দুর্গার স্তব লিখিতে লাগিলেন, তখন আর আমাকে সে ঘরে রাখিতে পারিল না। আমি মেয়েটির কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম, আমাকে বাহিরে লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে মা আসিয়া আমাকে কোলে লইলেন ও নানা মিষ্ট সম্বোধনে কান্না থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমার বয়স তখন চারি পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না। আমার মায়ের উনিশ বৎসর বয়সের সময় আমি হইয়াছি, সুতরাং মায়ের বয়স তখন ২৩ কি ২৪ বৎসরের অধিক নয়। ২৪ বৎসরের বালিকার ঐ মানতের কথা যখন স্মরণ করি, তখন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে ভাবি, এই ধর্মনিষ্ঠা আমার চরিত্রে কৈ?

শৈশবে ঠাকুরের নিবেদিত অন্নে অরুচি। এ সময়কার একটা অদ্ভুত কথা আছে। অনুমান চারি-পাঁচ বৎসর বয়সের সময় আমি কোনো মতেই ঠাকুরদের নিবেদিত অন্ন আহার করিতে চাহিতাম না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাটীতে এটা একটা ভয়ানক কথা। কে যে আমার মাথাতে এ সঙ্কল্প ঢুকাইয়া দিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বেশ মনে আছে যে প্রায় প্রতিদিন আমার ভাত খাওয়া লইয়া একটা মহাবিভ্রাট উপস্থিত হইত। আমাদের বাড়িতে শালগ্রাম শিব পঞ্চানন প্রভৃতি অনেক পৈতৃক ঠাকুর ছিলেন। প্রপিতামহ মহাশয়ের কথা বলিবার সময় তাঁহাদের বিশেষ বিবরণ

দেওয়া যাইবে। প্রতিদিন অন্নব্যঞ্জন তাঁহাদের অগ্রে নিবেদন না করিয়া কাহারও আহার করিবার অধিকার ছিল না। আমারও ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল, ঠাকুরদের নিবেদিত অন্ন আহার করিব না। এজন্য বাবার ও মা'র হাতে গুরুতর প্রহার সহ্য করিতাম, তবুও নিজের জেদ ছাড়িতাম না। অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া এই নিয়ম করা হইয়াছিল যে, আমার অন্নগুলি স্বতন্ত্র রাখিয়া, অপর অন্ন ঠাকুরদের নিবেদন করা হইত। কিন্তু আমার পিতামাতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর থাকিত না। অধিকাংশ সময় ঠাকুরদের নিবেদনের পূর্বে আসিয়া আমি বাহিরের দাবাতে আহার করিতে বসিতাম। কোনো কোনো দিন বাবা কৌতুক দেখিবার জন্য রান্নাঘরের ভিতর হইতে অন্ন নিবেদন করিয়া ঠাকুর লইয়া যাইবার সময় দাবার এক প্রান্তে যে আমি আহারে বসিয়াছি, আমার পাতে ঠাকুরদের কুশীর জল ছড়াইয়া দিতেন। অমনি, 'ভাত আমি খাব না,' বলিয়া আমি হাত তুলিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিতাম; মা আসিয়া অনেক বুঝাইতেন, কিছুতেই খাওয়াইতে পারিতেন না। শেষে বড়পিসীদের বাড়ি হইতে আমাকে খাওয়াইয়া আনিতে হইত, কারণ তাঁহাদের বাড়িতে ঠাকুর-টাকুর ছিল না।

মায়ের স্বপ্ন। এই ব্যাপার লইয়া আমার মাকে পাড়ার মেয়েদের নিকট বড় লজ্জা পাইতে হইত। তাঁহারা বলিতেন, "তোমার পেটে এ কি কালাপাহাড় এসেছে?" তখন মা তাঁহাদিগকে নিজের একটি স্বপ্নের কথা বলিয়া বলিতেন, "আমি জানি, ও ছেলে জাতহরণীতে হরে নিয়েছে।" সে স্বপ্নটি এই। আমাদের এতৎ প্রদেশের স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে সংস্কার আছে যে, সূতিকাগৃহে ছয়দিনের রাত্রে শিশুকে মাটিতে শোয়াইতে নাই, প্রসূতিকে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। মাটিতে শোয়াইলে জাতহরণীতে হরিয়া লইয়া যায়। তদনুসারে আমি যখন ছয়দিনের ছেলে, সেদিন রাত্রে মা ধাইয়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেন যে অর্ধেক রাত সে আমাকে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিবে, আর অর্ধেক রাত মা নিজে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিবেন। তদনুসারে ধাই অর্ধেক রাত্রি রহিল, পরে মা'র পালা আসিল। মা কিয়ৎকাল বসিয়া নিদ্রাতে অভিভূত হইলেন। মনে করিলেন, শুইয়া ছেলে বুকের উপর শোয়াইয়া ঘুমাইবেন, মাটিতে না শোয়াইলেই হইল। এই ভাবিয়া আমাকে বুকের উপর শোয়াইয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, একটি রূপলাবণ্যসম্পন্না নারী সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে ছেলেটি নিজ কোলে তুলিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি কে? আমার খোকাকে কোথায় নিয়ে যাও?" স্ত্রীলোক হাসিয়া বলিল, "বাঃ এ যে আমার খোকা।" মা বলিলেন, "না, আমার খোকা।" মেয়েটি বলিল, "না, আমার খোকা।" এই বিবাদে মা'র ঘুম ভাঙিয়া গেল। জাগিয়া দেখেন, আমি বুক হইতে সরিয়া পড়িয়াছি। এই স্বপ্নের কথা চিরদিন মা'র মনে জাগিয়া রহিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, আমাকে জাতহরণীতে হরিয়াছে বলিয়া কুলধর্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছি। মা'র মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিলাম।

আমার ছয় বৎসর বয়সের সময় আমার এক ভগিনী জন্মিল। সে দেখিতে অতি সুশ্রী হইয়াছিল বলিয়া বাবা কবিত্ব করিয়া তাহার নাম 'উন্মাদিনী' রাখিলেন। সে যখন পাঁচ-ছয়মাসের মেয়ে, তখন মা একদিন তাহাকে প্রপিতামহদেবের সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহার হাতখানি লইয়া উন্মাদিনীর উপরে রাখিলেন এবং চীৎকার করিয়া

বলিলেন, "এই মেয়ে হয়েছে দেখ, পদধূলি দেও, আশীর্বাদ কর।" প্রপিতামহদেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মা রে দয়াময়ি! ভুলতে না পেরে আবার এসেছিস্?" প্রপিতামহের দয়াময়ী ও করুণাময়ী নাম্নী দুইটি কন্যা শৈশবেই গত হইয়াছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন, সেই দয়াময়ী পুনরায় আসিয়াছে। তদবধি উন্মাদিনীকে তিনি দয়াময়ী বলিয়া ডাকিতেন।

উন্মাদিনী বসিতে সমর্থ হইলেই আমার খেলিবার সঙ্গিনী হইল। দুই ভাই-বোনে বসিয়া খেলিতাম। মা পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আমার মেশা পছন্দ করিতেন না। তখন পাড়ার ছেলেরা যে কি খারাপ কথা বলিত ও খারাপ কাজ করিত, তাহা স্মরণ করিলে লজ্জা হয়। গালাগালি বৈ তাহাদের মুখে ভালো কথা ছিল না। অধিকাংশ ছেলে রাগিলেই তাহাদের মাকে 'পাঁটী' বলিত। আমাদের প্রতিবেশী এক জ্ঞাতি জেঠার ছেলে মেয়েরা মাকে এত পাঁটী পাঁটী বলিত যে, তাদের একটি বোনের মা-মা বলার পরিবর্তে পাঁটী পাঁটী বলিয়াই কথা ফুটিল। সে মাকে না দেখিতে পাইলে 'পাঁটী, ও পাঁটী' করিয়া কাঁদিত। সেই কুসঙ্গের মধ্যে আমার মা যে আমাদিগকে কিরূপে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা এখন ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। একবার পাড়ার এক ছেলের মুখে তার মা'র প্রতি বাপান্ত গালি শুনিয়া আসিয়া আমি নিজের মাকে সেই গালি দিলাম। আর কোথায় যায়! মা আমাকে ধরিয়া দুইখানা খোলার কুচি একত্র করিয়া আমার গালের মাংস ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, রক্তে মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তৎপরে কয়েক দিন আহার বন্ধ হইল, মা আমার গলায় গলান ভাত ও দুধ ঢালিয়া দিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। সেই দিন অবধি জননীর প্রতি গালাগালি আমার মুখে কেহ কখনও শোনে নাই।

ভাই-বোন। উন্মাদিনীকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম, সর্বদাই কাঁধে করিয়া বেড়াইতাম, কোথাও কিছু ভালো ফল বা ফুল পাইলে তাহার জন্য আনিতাম, সে সঙ্গিনী না হইলে খাইতে বসিতাম না, এবং তাহাকে ফেলিয়া একা শয্যাতে যাইতে পারিতাম না। মা সন্ধ্যার পূর্বে আমাদের দুই ভাইবোনকে খাওয়াইয়া দিতেন, আমরা দুজনে গিয়া শয়ন করিতাম। আমার কল্পনাশক্তি শৈশব হইতেই প্রবল, কত যে গল্প বানাইয়া উন্মাদিনীকে শুনাইতাম, এখন মনে হইলে হাসি পায়। গল্প শুনিতে শুনিতে আমার গায়ে হাত দিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িত, আমিও ঘুমাইয়া পড়িতাম।

চিন্তাদাসী। ১৮৩৩ সালের সাইক্লোনে সমুদ্রতরঙ্গ উঠিয়া সুন্দরবনের অভ্যন্তরবর্তী প্রদেশ সকলকে প্লাবিত করে। সেই প্লাবনে যখন গরীব লোকের কুঁড়েঘর ভাসিয়া যায়, তখন হাজার হাজার পুরুষ ও রমণী জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। কেহ কেহ নিজ নিজ ঘরের চালের উপরে আশ্রয় লইয়া প্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর বিভাগে ভাসিয়া আসে। এইরূপে অনেক পুরুষ ও নারী ভাসিয়া আসিয়া আমাদের গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিল। তৎপরেই তাহারা বিষম কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করে। এই কলেরার মহামারীতে আমার প্রপিতামহী পিতামহ ও পিতামহীর মৃত্যু হয়, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। যে সকল লোক ভাসিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে চিন্তা নামে এক নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক আসিয়া আমাদের বাড়িতে শরণাপন্ন হয়। আমার পিতামহ দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে বাড়িতে স্থান দেন, তৎপরেই তাঁহারা বিষম কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। চিন্তা আমাদের বাড়িতে থাকিয়া যায়, এবং আমার বড়পিসীর

পরিচারিকা হয়। আমার বড়পিসীর ছেলেমেয়েরা মাতার গর্ভ হইতে চিন্তাদাসীর ক্রোড়েই পড়িয়াছেন ও তাহার ক্রোড়েই প্রতিপালিত হইয়াছেন। আমিও মাতুলালয় হইতে আসিয়া চিন্তার ক্রোড়ে আশ্রয় পাই। আমার জ্ঞানের সঞ্চার হইলে দেখিতাম যে চিন্তাই আমাদের হর্ত্রী-কর্ত্রী। আমরা তাহাকে দাসী বলিয়া মনে করিতাম না, চিন্তা দিদি বলিয়া ডাকিতাম। চিন্তা সকল কার্যেই পটু ছিল। বন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিত, জাল পোলো প্রভৃতি লইয়া গ্রামের প্রান্তবর্তী খাল হইতে মাছ ধরিয়া আনিত, গো দোহন করিত, বাজার হাট করিত, ধান ভানিত, সর্বোপরি আমাদের প্রতি কেহ কোনো অত্যাচার করিলে বাঘিনীর ন্যায় তাহার ঘাড়ে গিয়া পড়িত। চিন্তার প্রতাপে পাড়ার লোক সশঙ্কিত থাকিত। চিন্তা এমন সুস্থ ও সবল ছিল যে প্রাতে উঠিয়া ১৮।১৯ মাইল হাঁটিয়া আমার মাতুলালয়ে তত্ত্ব লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কিছুই কষ্টকর ছিল না।

সেই শৈশবকালে চিন্তাদাসী বোধ হয় আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছিল যে, আমাদের বাটীর সম্মুখস্থ নারিকেলের গাছ রাত্রিকালে দেশ ভ্রমণ করে। এক ডাকিনী তাহাতে চাপিয়া বেড়াইতে যায়। ইহাতে আমাদের শিশুদলে মহা ভয় হইয়াছিল, পাছে আমাদের নারিকেল গাছ হারাইয়া যায়; কি জানি, ডাকিনী যদি কোথাও ফেলিয়া আসে। চিন্তাদাসী ইহা বলিয়া দিয়াছিল, গাছের গায়ে লোহা মারিয়া রাখিলে ডাকিনীতে গাছ লইতে পারে না। আমার স্মরণ হয়, আমরা কয়েকজন শিশুতে মিলিয়া সন্ধ্যার পূর্বে গাছের গায়ে গজাল মারিয়া রাখিয়াছিলাম।

বাংলা স্কুলের ছাত্র। গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের রাজত্বকালে দেশে কতকগুলি আদর্শ বাংলা স্কুল স্থাপিত হয়। তাহার একটি আমাদের গ্রামে স্থাপিত হইয়াছিল। কাঁচড়াপাড়ানিবাসী শ্যামাচরণ গুপ্ত নামক একজন ভদ্রলোক তাহার প্রথম পণ্ডিত নিযুক্ত হন। মা পাঠশালের গুরুমহাশয়ের প্রতি বিরক্ত হইয়া আমাকে পাঠশালা ছাড়াইয়া সেই স্কুলে ভর্তি করাইয়া দিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া আমি 'স্কুল বুক সোসাইটি'র প্রকাশিত বর্ণমালা ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নবপ্রকাশিত শিশুশিক্ষা পড়িতে লাগিলাম। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষায় অনেক পাঠ মিত্রাক্ষর ও কবিতার মতো ছিল, সেগুলি আমার বড় ভালো লাগিত, দুই-একবার পড়িলেই মুখস্থ হইয়া যাইত। ইহাতে বর্ণপরিচয়ের ব্যাঘাত হইত বটে, কিন্তু আমি বর্ণ মিলাইয়া মুখে মুখে কবিতা করিতে পারিতাম।

গ্রামে ইংরাজী স্কুল। হার্ডিঞ্জ বাংলা স্কুল স্থাপনের পরেই আমাদের গ্রামে এক ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। হরিদাস দত্ত নামে জমিদারবাবুদের বাড়ির একজন যুবক তখন দেশে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে বড়ই উৎসাহী ছিলেন। ইনি অল্পদিন হইল পরলোকগত হইয়াছেন। অনুমান করি, প্রধানত ইঁহার ও ইঁহার বয়স্যদিগের যত্নে ও জমিদারবাবুদের সাহায্যে ঐ ইংরাজী বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। আমার মনে আছে যে সেই স্কুলে একজন ইংরাজ হেডমাস্টার লওয়া হইয়াছিল। সেটা গ্রামবাসীদের পক্ষে এক নূতন ব্যাপার। সাহেবের সঙ্গে এক কুকুর স্কুলে আসিত, সে সাহেবের টেবিলের তলায় শুইয়া থাকিত। আমরা তাহাকে দেখিয়া বড় ভয় পাইতাম। সাহেব জমিদারবাবুদের এক বাগান-বাড়িতে থাকিতেন। আমরা তাঁহার পালিত মুরগী ও অন্যান্য পাখি দেখিবার জন্য গিয়া সেই বাগানে উঁকি ঝুঁকি মারিতাম। সাহেবকে

রাস্তায় দেখিলে সে পথ হইতে অন্তর্ধান করিতাম। ইহাতেই প্রমাণ, আমাদের গ্রামে নূতন সভ্যতার আলোক আমার বাল্যদশাতেই প্রবেশ করিয়াছিল। কেবল তাহা নহে; হরিদাস দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন যুবকের উৎসাহে 'মজিলপুর পত্রিকা' নামে একখানি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, এবং কিছুদিন চলিয়াছিল। তদ্ভিন্ন ব্রজনাথ দত্ত নামে আমাদের গ্রামে একজন মধ্যাবস্থ বিষয়ী লোক ছিলেন। জ্ঞানচর্চাতে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও জ্ঞানী মানুষদিগকে লইয়া সর্বদা জ্ঞানালোচনা করিতে ভালোবাসিতেন। শুনিয়াছি, তিনি ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লইতেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবকৃষ্ণ দত্ত মজিলপুর পত্রিকার সহিত সংযুক্ত ছিলেন এবং গ্রামের উন্নতি বিষয়ে বড়ই উৎসাহী ছিলেন। শুনিয়াছি, তিনিই গ্রামে ব্রাহ্মধর্মকে প্রবিষ্ট করেন এবং আমার ভক্তিভাজন স্বগ্রামবাসী গুরুস্থানীয় উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিকে ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী করেন। এই শিবকৃষ্ণ দত্ত ইহার কিছু দিন পরে 'লুক্রিসিয়ার উপাখ্যান' বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন, এবং বাংলা কাব্য বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক হন। পরে ইনি উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেই বহুদিন পরে গতাসু হন। ইঁহার উন্মাদরোগ সম্বন্ধে একটি স্মরণীয় কথা আছে। ইঁহার পিতা ব্রজনাথ দত্ত জ্ঞানানুরাগী ও গুণীগণের উৎসাহদাতা মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু অতিশয় সিদ্ধি খাইতেন। লোকে যেমন ঘরের দেওয়ালে গোবরের ঘুটে দিয়া রাখে, তেমনি তিনি তাঁহার বৈঠক ঘরের দেওয়ালে ছোট ছোট ঘুঁটের মতো সিদ্ধি দিয়া রাখিতেন, মধ্যে মধ্যে তাহা লইয়া নিজে খাইতেন এবং বন্ধুদিগকে খাইতে দিতেন। আশ্চর্য এই, দেখা গেল, ইঁহার কয়েকটি সন্তান পাগল হইয়া গেল। ইঁহার অতিরিক্ত সিদ্ধি পান ও ভোজন তাহার কারণ হইতে পারে। যাহা হউক, আমার শৈশবে ও আমার গ্রাম ত্যাগ করিবার সময়ে মজিলপুর শিক্ষাদি বিষয়ে চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ প্রদেশে একটি অগ্রগণ্য গ্রাম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই গ্রামে ব্রাহ্মধর্মের ও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের আন্দোলন চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা যাইবে।

'আঢ্য' কথার মানে। এই সময়ের আর কয়েকটি বিষয় স্মরণ আছে। মাতাঠাকুরাণীর আহার করানোর গুণে আমার ভুঁড়িটি বিলক্ষণ বড় হইয়াছিল। রুগ্নাকৃতি হাত পা, কিন্তু ভুঁড়িটি বেশ গোলগাল। সেজন্য শ্যামাচরণ পণ্ডিতমহাশয় আমাকে 'আফিং-খেকো বামণ' বলিতেন; এবং আমাকে কাছে পাইলেই, দুই আঙুল দিয়া আমার পেট টিপিতেন। আমি ভুঁড়ির জন্য অনেক শিক্ষকের কাছে এই পেট টেপার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। এক-একদিন স্কুলে পেঁৗছিলেই পণ্ডিতমহাশয় আমার কাপড়খানি খুলিয়া মাথায় বাঁধিয়া দিতেন, এবং পেট টিপিয়া বলিতেন, "আফিংখোর বামণ, তোমার মা তোমাকে কত ভরি আফিং খাওয়ান?" ফলত পণ্ডিতমহাশয় আমাকে বড় ভালোবাসিতেন, তাহার কারণ এই, আমি ক্লাসে পড়াতে সর্বদা প্রথম কি দ্বিতীয় স্থানে থাকিতাম। তাহার কারণ ছিলেন আমার মা। আমি মায়ের কাছে পড়া শিখিয়া যাইতাম। তবে আমার এইটুকু প্রশংসার বিষয় যে পড়াতে আমার মনোযোগ ছিল। মা প্রাতে উঠিয়া গৃহকর্মে ব্যস্ত হইতেন। আমি বইখানা হাতে লইয়া, "মা, এটা কি?" "মা, এ কথার অর্থ কি?" এই বলিতে বলিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতাম। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। শিশুশিক্ষাতে আছে, আ ও ঢ-য়ে য-ফলা—উদাহরণ "আঢ্য লোক সদা সুখী"। মা ফিরিয়া বলিলেন, "ওটা আঢ্য"। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইতাম না। প্রশ্ন, "আঢ্য কাকে বলে মা?" উত্তর, "আঢ্য বলতে বড়মানুষ, যেমন গোপালবাবু"

(গ্রামের একজন জমিদার)। স্কুলে পণ্ডিতমহাশয় যেই 'আঢ্য' শব্দ বানান করিতে বলিলেন, অমনি সর্বাগ্রে আমি বানান করিলাম, "আ ও ঢ-য়ে য-ফলা—আঢ্য, আঢ্য বলতে বড়মানুষ, যেমন গোপালবাবু।" পণ্ডিতমহাশয় শুনিয়াই হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "হাঃ হাঃ—ও তুই কোথায় পেলি রে?" উত্তর, "কেন, আমার মা বলে দিয়েছেন।" এইরূপে মায়ের গুণে কোনো বালক আমাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। ইহার এক ফল এই হইল যে অন্যান্য বালকেরা বাড়িতে গিয়া নিজ-নিজ মায়ের কাছে আবদার আরম্ভ করিল, "শিবের মা কেমন পড়া বলে দেয়। তুই কেন দিস্ না?" মায়েরা বলিতে লাগিলেন, "আরে ম'লো, আমি কি লেখাপড়া জানি? শিবের মা তো ভালো জ্বালা ঘটালে।" এইরূপে আমার মা একটু লেখাপড়া জানিয়া ঘরে-ঘরে গোল বাধাইয়া দিয়াছিলেন।

প্রথম শিক্ষকতা। আমাদের বাড়ির পাশে জ্ঞাতিদের বাড়িতে এক গৌরাঙ্গী বিধবা যুবতী থাকিতেন, তিনি সম্পর্কে আমার পিতার খুড়ী। আমার মাকে অন্নদামঙ্গল, রামায়ণ, মহাভারত, রোমিও জুলিয়েট প্রভৃতি পড়িতে দেখিয়া তাঁহার লেখাপড়া শিখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি আমাকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া খাইবার জন্য কিছু মিষ্টদ্রব্য হাতে দিয়া, অনেক খোসামোদ করিয়া বর্ণপরিচয় করিতে বসিতেন, এবং হাতে তালি দিয়া আমাকে নাচাইতেন, আর বলিতেন, "শিব নাচি নাচি যায়, শিব ডম্বুরু বাজায়, ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডম্বুরু বাজায়।" আমি তালে তালে নাচিতাম। ইহার পরে আমার সহৃদয় খুড়ী জেঠী দিদিরা আমাকে দেখিলেই "শিব নাচি নাচি যায়" বলিয়া আমার অভ্যর্থনা করিতেন।

খেলার সাথী খোঁড়া মেয়ে। আমি বোধ হয় ভিতরে ভিতরে চিরদিন প্রশংসাপ্রিয় মানুষ। এ দুর্বলতাটা শৈশব হইতেই আছে। আমাদের পাশের বাড়িতে আমার একজন জ্ঞাতি জেঠার একটি খোঁড়া মেয়ে ছিল, সে বোধ হয় আমার অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের বড় ছিল। সে আমাকে ভুলাইয়া রোজ প্রাতে আমার খাবার হইতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য চাহিয়া খাইত। আমি যেই খাবারের ধামীটি হাতে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতাম, অমনি সে আমাকে মিষ্ট স্বরে ডাকিত, "আগাশ দাদা! এখানে এস।" সে তাহাদের দাবা হইতে নামিতে পারিত না, কাজেই আমাকে যাইতে হইত। কেন যে সে আমাকে 'আগাশ দাদা' বলিত জানি না। যতই আমি তাহাদের দাবার দিকে অগ্রসর হইতাম, ততই তাহার মিষ্ট কথার মাত্রা বাড়িত, "কি লক্ষ্মী ছেলে, কি সুন্দর ছেলে," ইত্যাদি। আমি আহ্লাদে আটখানা হইয়া যেই দাবায় গিয়া উঠিতাম, অমনি সে বলিত, "এস না ভাই, দুজনের খাবার মিশিয়ে খাই।" এই বলিয়া তাহার ধামীর খাবারগুলি আমার ধামীতে ফেলিয়া খাবা-খাবা করিয়া খাইতে আরম্ভ করিত। তাহাতে আমার আনন্দই হইত। হাসির কথা এই, খাবারগুলি শেষ হইলেই আর সে আমার প্রতি প্রেম দেখাইত না। সামান্য একটু কিছু মনের অনভিমত কাজ করিলেই আমাকে খামচাইয়া, গালি দিয়া, দাবা হইতে নামাইয়া দিত। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে আসিতাম। মা বলিতেন, "খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে; পাঁচশো বার বলি, খুড়ীর কাছে যাসনি, তবুও মরতে যাস।" মা বারণ করিলে কি হয়, আমি খুড়ীর কাছে না গিয়া থাকিতে পারিতাম না, বোধ হয় প্রশংসাটুকুর লোভে। ইংরাজ কবি কাউপার নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'ডিউপ অভ টুমরো ইভন্ ফ্রম্

এ চাইল্ড।' আমিও নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারি, 'ডিউপড্ বাই প্রেইজ ইভন্ ফ্রম্ এ চাইল্ড।'

সুন্দরী খেলার সঙ্গিনী। সেকালের আর একটা কথা মনে আছে। একটি সুন্দর ফুটফুটে গৌরবর্ণ মেয়ে আমাদের পাশের বাড়িতে তাহার মাসীর কাছে আসিত। সে আমার সমবয়স্ক। ঐ মেয়ে আসিলেই আমার খেলাধুলা লেখাপড়া ঘুচিয়া যাইত। আমি তাহার পায়ে পায়ে বেড়াইতাম। আমরা পাড়ার বালক-বালিকা মিলিয়া "চাঁদ চাঁদ, কেন ভাই কাঁদ" প্রভৃতি অনেক খেলা খেলিতাম। তখন সে আমাদের সঙ্গে খেলিত। খেলার ঘটনাচক্রে যদি আমি তাহার সঙ্গে এক দলে না পড়িতাম, আমার অসুখের সীমা থাকিত না। আমি তাহার হাত ধরিয়া খেলার সঙ্গীদিগকে বলিতাম, "আমি এর সঙ্গে থাকব, তোমরা আমার বদলে এ-দল হতে ও-দলে আর কারুকে দাও।" বালকেরা আমার অনুরোধ রাখিত না; বকিয়া, ঠেলিয়া, গলা টিপিয়া আমাকে আর এক দলে দিয়া আসিত। ঐ বালিকার বাড়ি আমাদের স্কুলের পথে ছিল। আমি স্কুল হইতে আসিবার সময় তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া একটু খেলা করিয়া আসিতাম। ইহার পর আমি যখন কলিকাতায় আসিলাম ও এখানকার পাঠাদিতে ব্যস্ত হইলাম, তখন গ্রামে তাহার বিবাহ হইয়া গেল। সে দূরে শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল। আর বহু বৎসর তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে বড় হইয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার পর গ্রামে গিয়া আবার তাহাকে দেখিলাম, দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। সে প্রস্ফুটিত পুষ্পসম কান্তি বিলীন হইয়াছে, সন্তানভারে ও সংসারভারে সে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মনে যে ভাব হইয়াছিল তাহা "তুমি কি আমার সেই খেলার সঙ্গিনী?" নামে একটি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছি। আমার যত দূর স্মরণ হয়, আমার বন্ধু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সেই কবিতাটি জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া তাঁহার 'অবলাবান্ধবে' ছাপিয়াছিলেন। আমি সেটিকে সংগ্রহ করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু অবলাবান্ধবের পুরাতন ফাইল না পাওয়াতে পারি নাই।

এই পঠদ্দশার স্মৃতি হৃদয়ে বড় মিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। গ্রীষ্মের কয় মাস মর্নিং স্কুল হইত। আমি পাড়ার বালকদের সঙ্গে মিলিয়া অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ফুল তুলিতে যাইতাম। কোঁচড় ভরিয়া ফুল লইয়া স্কুলে যাইতাম। জমিদারবাবুদের বাড়ির সম্মুখে একটা চাঁপা গাছ ছিল, সেই গাছে চড়িয়া ফুল পাড়িতাম। আমি গাছে চড়িতে তত পরিপক্ক ছিলাম না। কখনই ডানপিটে ছেলে ছিলাম না। কিন্তু পাড়ার ডানপিটে ছেলেরা আমাকে গাছে চড়িতে শিখাইতে ত্রুটি করিত না। চড়িতে ভয় পাইলে ভীরু বলিয়া উপহাস করিত, সেটা প্রাণে সহিত না।

গানের দল। সে কালের আরও কয়েকটি কথা মনে আছে। একবার পাড়াতে একদিন রামায়ণ গান হইল। তাহা দেখিয়া পাড়ার ছেলেরা এক রামায়ণ গানের দল করিল। আমি গাহিতে পারিতাম না, সুতরাং মূল গায়েন হইতে পারিলাম না। কিন্তু আমার উৎসাহে দলটি জমিয়া গেল। এক ছেলের গলায় একটা ঢোল, আর একজনের হাতে করতাল, ও মূল গায়েনের হাতে চামর দিয়া, আমরা নূপুর পায়ে দিয়া দোহার হইলাম। সন্ধ্যার সময় বাড়িতে বাড়িতে গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। সে গানের মাথা মুণ্ডু ভাব অর্থ কিছুই থাকিত না। পাড়ার একজন কৌতুকপ্রিয় লোক হাসাইবার মতো কতকগুলো ছড়া বাঁধিয়া আমাদিগকে শিখাইয়া দিলেন, তাহাই আমরা বাড়িতে

বাড়িতে মেয়েদিগকে শুনাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। মেয়েরা হো হো করিয়া হাসিয়া কে কার গায়ে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। তাহাতেই আমরা পরমানন্দিত হইয়া আপনাদের শ্রম সার্থক বোধ করিতে লাগিলাম।

পিঁপড়ে কি কথা বলে? আমি তখন পশুপক্ষী পুষিতে বড় ভালোবাসিতাম। পুষি নাই এমন জন্তুই নাই। টুনটুনি, বুলবুলি, দোয়েল, ছাতারে, শালিক, টিয়া, ও-সকল তো পুষিয়াছি, পিঁপড়েও পুষিতাম। ফড়িং ও পিঁপড়ে পোষা আমার একটা বাতিক ছিল। তাহাদিগকে অতি যত্নে কৌটার মধ্যে রাখিতাম। ফড়িংদিগকে কচি কচি দুর্বা ঘাস খাওয়াইতাম, পিঁপড়েদিগকে চিনি মধু প্রভৃতি খাইতে দিতাম। পিঁপড়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে এতই ভালো লাগিত যে, আমি যখন ৬।৭ বৎসরের ছেলে, তখনো পিঁপড়ে হইয়া চারি হাত পায় পিঁপড়েদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতাম। মাছি মারিয়া খ্যাংরা কাঠির অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া সেই কাঁটা দ্বারা সেই মাছি দাবার মাটিতে পুঁতিয়া দিতাম, দিয়া কখন পিঁপড়ে আসিয়া মাছি ধরিয়া টানাটানি করিবে সেই অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতাম। হয়তো আধঘণ্টার পর সেখানে একটি পিঁপড়ে দেখা দিল। সে প্রথমে আসিয়া মাছিটির পা ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। যখন দেখিল সহজে টানিয়া লইতে পারে না, তখন চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল। আমার খ্যাংরা কাঠিটির উপরে একবার উঠে একবার নামে, বড়ই ব্যস্ত। অবশেষে সে চলিয়া গেল। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ি মারিয়া চলিলাম। সে গিয়া গর্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। আমি দ্বারে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। আর আধ ঘণ্টা গেল। শেষে দেখি সৈন্যদল বাহির হইল। পিঁপড়ের সারি, মধ্যে মধ্যে দুইটা করিয়া বলবান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতি পিঁপড়ে। পরে ভাবিয়াছি, তাহারা সেনাপতি হইবে। প্রকাণ্ড সৈন্যদল ক্রমে আমার মাছির নিকট উপস্থিত, তখন মহা টানাটানি আরম্ভ হইল। অবশেষে আমি খ্যাংরা কাঠিটি তুলিয়া লইলাম। তখন মাছি লইয়া সকলে গর্তের দিকে দৌড়িল। ইহারা ফিরিতেছে, তখন অপরেরা আসিতেছে, পথে মুখোমুখি করিয়া কি সঙ্কেত করিল যে, যাহারা আসিতেছিল তাহারাও ফিরিল। আমি মনে করিতাম, ইহারা নিশ্চয় কথা কয়। তখন মাটির নিকটে কান পাতিয়া রহিলাম, তাহাদের শব্দ শোনা যায় কি না। কান পাতিয়া আছি, তখন কেহ শব্দ করিলে বারণ করিতাম, "চুপ কর, চুপ কর, পিঁপড়েরা কি বলছে শুনি।" ইহা দেখিয়া বাড়ির লোকেরা হাসাহাসি করিতেন। এই ব্যাপার প্রায় সর্বদাই ঘটিত।

পাখি ধরা। তৎপরে, পাখি ধরিবার ও পুষিবার জন্য অতিশয় উৎসাহ ছিল। পাখির বাসা হইতে বাচ্চা চুরি করিয়া আনিতাম, আনিয়া তাহার মায়ের মতো যত্নে তাহাকে পালন করিতাম। সে জাতীয় পাখিরা কি খায়, তাহাদের মায়েরা কিরূপে খাওয়ায়, এ সকল সংবাদ পাড়ার ডানপিটে ছেলেদের কাছে পাইতাম, সেইরূপ করিয়া দিনের মধ্যে দশবার করিয়া খাওয়াইতাম। হাঁড়ির গায়ে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে কুটিকাটি দিয়া বাসা বাঁধিয়া তাহার মধ্যে বাচ্চা রাখিতাম। রাখিয়া একখানি সরা দিয়া ঢাকিয়া হাঁড়িটি ঘরের চালে ঝুলাইয়া রাখিতাম, পাছে সাপে খাইয়া যায়। তাহার পর খেজুরগাছের ডাল কাটিয়া, অগ্রভাগের পাতাগুলি চিরিয়া খ্যাংরার মতো করিতাম; তাহাকে বলে ছাট। সেই ছাট হাতে করিয়া মাঠে মাঠে ঘাস বনে ফড়িং ধরিতে যাইতাম। ঘাসের উপর ছাটগাছি বুলাইলেই ফড়িং লাফাইয়া উঠিত। অমনি সেই

ছাট সজোরে তাহার পৃষ্ঠদেশে মারিয়া তাহাকে অর্ধমৃতপ্রায় করিতাম। সেই অচৈতন্য অবস্থাতে তাহাকে এক বাঁশের কেঁড়ের মধ্যে পুরিতাম। এইরূপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফড়িং ধরিতাম। ধরিয়া আনিয়া পাখিকে খাওয়াইতাম। পাখির বাচ্চা পোষা প্রায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে হইত। বাবা তখন ছুটিতে বাড়িতে থাকিতেন। তিনি আমার পাখি পোষা দেখিতে পারিতেন না। পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়, ইহা সহিতে পারিতেন না। পাখির বাচ্চাকে খাওয়াইতে দেখিলেই আমাকে মারিতেন। সুতরাং তাঁহার অনুপস্থিতিকালে আমাকে ঐ বাচ্চার মায়ের কাজ করিতে হইত। পিতার হস্তে এত প্রহার খাইয়াও কিরূপে আমি তাহাদিগকে পালন করিতাম, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য বোধ হয়।

মা আমার পাখি পোষার বড় বিরোধী ছিলেন না। বোধ হয় ছেলে বাড়িতে থাকে এবং একটা কাজে ভুলিয়া থাকে, এই তাঁহার মনের ভাব ছিল। কিন্তু তাঁহারও পাখি পোষা শখ ছিল। আমি চলিয়া আসিবার পরও তিনি অনেক পাখি পুষিয়াছেন।

আমি যে কেবল পাখির বাচ্চা পুষিতাম তাহা নহে, ধাড়ী পাখিও পুষিতাম। বড় পাখি ধরিবার তিন প্রকার কৌশল ছিল। প্রথম, আমাদের উঠানে একটি ধামা খাড়া করিয়া তাহার সম্মুখে চাল কড়াই ছড়াইয়া, ধামার পৃষ্ঠে একগাছি বাঁকারির অগ্রভাগ লাগাইয়া, অপর প্রান্ত দাবাতে লাগাইয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতাম। কোনো ঘুঘু বা পায়রা বা শালিক যেই আসিয়া একমনে চাল কড়াই খাইত, অমনি বাঁকারির দ্বারা ধামাটি ঠেলিয়া তাহাকে ধামা চাপা দিতাম। দ্বিতীয়, গাছের ডালে যখন পাখিতে পাখিতে ঝগড়া ও মারামারি করিত, তখন তাহার নিচে গিয়া কাপড়ের জাল পাতিতাম। তাহারা মারামারি করিবার সময় রাগে এমন অন্ধ হয় যে, দুজনে জড়ামড়ি করিয়া পাকা ফলটির মতো গাছের তলায় পড়িয়া যায়। কখনো কখনো ঐরূপে আমার কাপড়ে পড়িয়া যাইত। তৃতীয়, টুনটুনি দোয়েল প্রভৃতি ক্ষুদ্র পাখিরা যখন অন্যমনস্ক ভাবে গাছের ডালে বসিয়া থাকিত, তখন ভোঁ করিয়া তাহার পায়ের নিকটস্থ ডালে সজোরে ঢিল মারিতাম। হঠাৎ তাহাদের পায়ের নিকটস্থ ডালে সজোরে ঢিল লাগাতে তাহারা দিশেহারা হইয়া পড়িয়া যাইত, আমি অমনি তাহাদিগকে ধরিতাম।

ঢিল ছোঁড়া বিষয়ে আমার অদ্ভুত বিদ্যা ছিল। পাখিকে বাঁচাইয়া ডালে ঢিল মারিতে পারিতাম। বলা বাহুল্য যে অনেক সময় ডালে ঢিল না লাগিয়া পাখির মাথায় লাগিত এবং পাখিটির প্রাণ যাইত। এইরূপে আমার হস্তে অনেক পাখির প্রাণ গিয়াছে। বলিতে কি, পুকুরে ব্যাঙটি ভাসিতেছে বা গাছে পাখিটি বসিয়া আছে দেখিলেই আমার ঢিল মারিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিত। শুনিলে হয়তো অনেকে হাসিবেন, এই বৃদ্ধ বয়সেও সময় সময় বৃক্ষশাখায় পাখিটি আছে দেখিয়া আমার ঢিল মারিতে ইচ্ছা করে, অমনি হাসিয়া সে ইচ্ছা নিবারণ করি।

আমার ঢিল ছোঁড়া বিষয়ে দুইটি ঘটনা স্মরণ আছে। একবার আমার পিতার সহিত কোথায় যাইতেছিলাম। তখন আমার বয়স ১৩।১৪ হইবে। পিতা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। আমি পশ্চাৎ হইতে দেখিতে পাইলাম, আমার পিতার সম্মুখস্থিত একটি বৃক্ষের শাখাতে একটি শালিক পাখি অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া আছে। আর সে প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলাম না। যে পিতাকে যমের মতো ভয় করিতাম তিনি সঙ্গে, সে কথাও মনে থাকিল না। ভোঁ করিয়া আমার ঢিলটি ছুটিল। পাখিটির কোথায় যে লাগিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু পাখিটি পাকা

ফলাটির মতো বাবার সম্মুখে পড়িয়া গেল। বাবা বুঝিতে পারেন নাই যে আমি পশ্চাৎ হইতে ঢিল ছুঁড়িয়াছি, সুতরাং তিনি মনে করিলেন, আর কোনো কারণে পড়িয়াছে। তিনি পাখিটিকে কুড়াইয়া লইলেন। নিকটবর্তী এক পুষ্করিণীর ঘাটে লইয়া অংগুলির অগ্রভাগে করিয়া তাহার মুখে জল দিতে লাগিলেন। সুখের বিষয় পাখিটি মরিল না। তিনি পথের একজন লোককে পাখিটি দিয়া গন্তব্য স্থানের অভিমুখে চলিলেন। আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

আর একবার আমি পথে যাইতেছি, আমার সম্মুখে আর একজন লোক যাইতেছে। আমি দেখিতে পাইলাম, দূরে আমাদের সম্মুখস্থ রাস্তার পার্শ্বে একটি ছাগল বাঁধা রহিয়াছে। অমনি ঢিল ছুঁড়িবার প্রবৃত্তি আসিল। বলিতে লজ্জা হইতেছে, ভোঁ করিয়া এক ঢিল ছুঁড়িলাম। সে নিরপরাধ প্রাণী চরিতেছিল, আমার ঢিল গিয়া বোধ হয় তাহার মাথায় লাগিল। বুঝিতে পারিলাম না, কেবল মাত্র দেখিলাম, ছাগলটি একবার ভ্যা করিয়া ডাকিয়া মাটিতে মুখ থুবড়াইয়া থুবড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ঐ দেখিয়াই আমি পশ্চাৎ হইতে চম্পট। আর এক পথ ধরিয়া পাড়া ঘুরিয়া কিছু পরে গিয়া দেখি, কয়েকজন লোক জুটিয়াছে, ছাগলটিকে শোয়াইয়া জল ঢালিয়া বাঁচাইতেছে; বোধ হইল ছাগলটি মরিবে না।

তখন আমি যেমন পিঁপড়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিতাম, তেমনি পাখির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেও ভালোবাসিতাম। যদি দৈবাৎ উঠানে কোনো পাখি আসিত, তাহা হইলে আমি, মা খুড়ী জেঠী যে কেহ সে সময় কথা কহিতেন, সকলের মুখ চাপিয়া ধরিতাম, "চুপ কর, চুপ কর, পাখি এসেছে।"

একবার পাখি দেখিতে গিয়া হাতির পায়ের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। তখন আমাদের গ্রামে পোলবন্দী ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের হাতি যাইত, কারণ, রেল বা রাস্তা ঘাট ছিল না। একবার আমি পাঠশালে বা স্কুলে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছি, দপ্তরটি বগলে আছে; এমন সময় হঠাৎ একটি নূতন রকমের পাখি দেখিলাম, যাহা পূর্বে কখনও দেখি নাই। সে লেজ তুলিয়া চমৎকার শিস দিতেছে। আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া গেলাম, "এ কি পাখি?" নিমগ্ন চিত্তে তাহার প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। ওদিকে পোলবন্দী সাহেবের হাতি আসিতেছে। মাহুত চেঁচাইতেছে, পাড়ার লোকেরা "ওরে অমুকের ছেলে, ম'লি ম'লি, পালা পালা" বলিয়া চেঁচাইতেছে। আমার সেদিকে খেয়াল নাই, কানে একটা আওয়াজ আসিতেছে মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণ চেতনা হইতেছে না। এমন সময় হঠাৎ দেখি হাতি শুঁড় দিয়া আমাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। মাহুত বোধ হয় আমাকে সরাইয়া দিতে ইঙ্গিত করিতেছে। হাতির শুঁড় দেখিয়াই ভয়ে চীৎকার করিয়া সরিয়া গেলাম।

আমি যে কিছু দেখিলেই এত মনোযোগী হইতাম, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, শৈশব হইতেই আমার কারণানুসন্ধিৎসা বড় প্রবল ছিল। মায়ের মুখে শুনিয়াছি যে, আমি দাঁড়াইতে ও কথা কহিতে শিখিলেই সকল বিষয়ে 'কেন' 'কেন' বলিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিতাম। যথা, তাঁহার কোলে চড়িয়া আর এক পাড়ায় নিমন্ত্রণে যাইতেছি, হঠাৎ পথে একটি নূতন গরু দেখিলাম। অমনি প্রশ্ন—ও কাদের গরু? উত্তর—পুটেদের গরু। প্রশ্ন—এখানে কেন রেখে গেছে? উত্তর—ঘাস খাবে বলে। প্রশ্ন—কেন ঘাস খাবে? উত্তর—ক্ষিদে পেয়েছে বলে। প্রশ্ন—কেন ক্ষিদে পেয়েছে? উত্তর—সমস্ত রাত কিছু খায়নি বলে। প্রশ্ন—কেন খায়নি? উত্তর—ওরা রাত্রে গরুকে জাবনা দেয় না বলে। প্রশ্ন—কেন রাত্রে জাবনা

দেয় না? উত্তর—ওরা গরীব বলে। প্রশ্ন—গরীব কাকে বলে? ইত্যাদি। সময়ে সময়ে এই 'কেন'র মাত্রা এত অধিক হইত যে উত্তরের পরিবর্তে চপেটাঘাত পাইতাম। এই কারণানুসন্ধান-প্রবৃত্তি হইতেই বোধ হয়, পিঁপড়ে ও পাখির গতিবিধি এত লক্ষ্য করিতাম।

রুপী বিড়াল। কেবল যে পাখি ভালোবাসিতাম তাহা নহে, অন্যান্য জন্তুও পুষিতাম। বিড়ালছানা আনিয়া উন্মাদিনীকে দিতাম, সে পুষিত। অনেক সময়ে আমাদের উভয়ের অতিরিক্ত প্রেমবশত তাহাদের প্রাণ যাইত। বিড়ালের মধ্যে রুপীর কথা স্মরণ আছে। রুপী একটি মেনি বিড়াল ছিল। এমন সুন্দর বিড়াল কম দেখা যায়। শাদার উপরে পেটের দুই পাশে ও মাথায় কাল দাগ। লোমগুলি পুরু-পুরু, চক্ষু দুটি হরিদ্রাবর্ণ, ও লেজটি মোটা। এখন মনে করি, রুপী বোধ হয় দোআঁশলা বিড়াল ছিল। কে যে তাহাকে দিয়াছিল মনে নাই। উন্মাদিনী ও আমি তাহাকে পুষিয়াছিলাম। তিনি এমনি আদুরে হইয়াছিলেন যে, উনান কাঁথায় শোয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভ্রমের হানি বোধ হইত, বিছানার উপর না হইলে তিনি শুইতেন না। উন্মাদিনী ও আমি যখন সন্ধ্যার সময় আসিয়া শয়ন করিতাম, তখন রুপী বাবা ও মা'র পাতের মাছের কাঁটার লোভও ত্যাগ করিয়া আমাদের দুজনের মধ্যে আসিয়া শুইত। অনেক সময় তিনজনে গলা জড়াজড়ি করিয়া ঘুমাইতাম। মা শয়ন করিতে আসিয়া তাহাকে মশারির বাহিরে ফেলিয়া দিতেন। ভোরে যদি কোনো দিন ঘুম ভাঙিত, দেখিতাম রুপী গরীব দুঃখীর মতো মশারির বাহিরে পড়িয়া আছে। তখন বড় দুঃখ হইত, তাহাকে আবার মশারির মধ্যে আনিতাম। তাহা লইয়া মাতা-পুত্রে বিবাদ হইত।

আর এক খেলার সঙ্গী। আমাদের তখনকার আর একজন খেলার সঙ্গীর কথা স্মরণ আছে। সে শেয়ালখাকী। শেয়ালখাকী একটা মাদী কুকুর। তাহার ইতিবৃত্ত এই। আমার বাবা একদিন দেখিলেন একটি কুকুরের বাচ্চাকে শেয়ালে লইয়া যাইতেছে। দেখিয়া তাঁহার দয়ার আবির্ভাব হইল। তিনি হৈ হৈ করাতে ও ঢিল ঢেলা মারাতে শেয়ালটা বাচ্চাটাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। বাবা বাচ্চাটা কুড়াইয়া আনিলেন। সে তখন অতি শিশু। তাহার পৃষ্ঠের শেয়ালের কামড়ের ঘা শুকাইতে অনেক দিন গেল। সে বড় হইল, বাবা তাহার নাম শেয়ালখাকী রাখিলেন। শেয়ালখাকী আমাদের বাড়িতেই রহিয়া গেল এবং পাড়ার বালক-বালিকার খেলিবার একটা মস্ত সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল। এখন আমার ভাবিয়া আশ্চর্য বোধ হয়, আমরা শেয়ালখাকীকে আমাদেরই একজন ভাবিতাম। সে সকল খেলাতেই সঙ্গে থাকিত। আমরা পাড়ার বালক-বালিকাদের সঙ্গে মিশিয়া কখনো কখনো বনভোজনে যাইতাম। পাড়ার নিকট কোনো জঙ্গলময় স্থান পরিষ্কার করিয়া সেখানে উনান করিয়া প্রত্যেকের বাড়ি হইতে কাঠ কুটা চাল ডাল বহিয়া লইয়া যাইতাম। বালিকারা রাঁধিত, বালকেরা হইত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ, এবং তাহাদের মা খুড়ী জেঠীরা হইতেন অতিথি। পরম সুখে বনভোজন হইত। শেয়ালখাকী আমাদের সঙ্গে সমস্ত দিন বনে থাকিত। আহারান্তে আমরা যখন বনে লুকোচুরি খেলিতাম, তখন শেয়ালখাকী বনের মধ্যে লুকাইত, আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতাম। আমরা তাহাকে খেলার সঙ্গী বলিয়া জানিতাম।

শেয়ালখাকীর দুইটি কীর্তি স্মরণ আছে। একবার আমরা কয়েকজন বালকে

পরামর্শ করিলাম যে প্রতিবেশীদের একটা পুরাতন ভাঙা দালানে ঢুকিয়া পায়রা ধরিব। ঐ দালানের মধ্যে অনেক পায়রা থাকিত। আমরা মধ্যে মধ্যে ঘরে ঢুকিয়া দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া তাড়া দিয়া পায়রা ধরিতাম। কিন্তু দ্বার জানালা ভাঙিয়া তাহাতে এত গর্ত হইয়া গিয়াছিল যে সেগুলি বন্ধ করিবার জন্য প্রায় পাঁচ-ছয়জন বালককে ঘরে প্রবেশ করিতে হইত। দরজা জানালার গর্তে-গর্তে পিঠ দিয়া এক-একজন বালক দাঁড়াইত, আর একজন পায়রাদিগকে তাড়াইয়া ধরিত। সেদিন আমাদের পাঁচজনের মধ্যে চারিজন বৈ জুটিল না। আমরা আর একটি বালক খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে দেখি শেয়ালখাকী আসিতেছে। শেয়ালখাকীকে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম, ভাবিলাম আর বালকের প্রয়োজন নাই শেয়ালখাকীর দ্বারাই কাজ চলিবে। বলিলাম, "শেয়ালখাকি! আয় আয় পায়রা ধরিতে যাই।" শেয়ালখাকী অমনি প্রস্তুত। আমাদের সঙ্গে চলিল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া এক-একজন বালক এক-এক ছিদ্রে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। দ্বারের নিচে চৌকাঠের উপরে একটা ছিদ্র ছিল, শেয়ালখাকীকে বলা গেল, "শেয়ালখাকি! এই গর্তের মধ্যে লেজ দিয়ে বসে থাক, দেখিস যেন এ জায়গা ছেড়ে উঠিসনে।" তখন আশ্চর্য বোধ হয় নাই, এখন যতবার ভাবি আশ্চর্য বোধ হয়, শেয়ালখাকী কিরূপে আমাদের কথা বুঝিল। সেই ছিদ্রের মধ্যে লেজ দিয়া নিজের পিঠের দ্বারা ছিদ্রটি ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। পরে পায়রাদিগকে যখন তাড়া দিতে আরম্ভ করা গেল এবং পায়রাগুলি তাহার মুখের সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল, তখন না জানি শেয়ালখাকীর পক্ষে স্থান ত্যাগ করিয়া পায়রার সঙ্গে ছুটিবার কি প্রলোভনই হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে তা করিল না, আমরা যেরূপ পিঠ দিয়া ছিদ্র ঢাকিয়া স্থির থাকিলাম, সেও সেই প্রকার রহিল।

আর একটি ঘটনা এই : আমাদের বুধী বলিয়া একটা গাভী ছিল। তাহার একটি রাখাল ছিল। শেয়ালখাকী অনেক সময় রাখালের সঙ্গে বুধীকে লইয়া মাঠে যাইত। সমস্ত দিন মাঠে থাকিয়া বৈকালে ঘরে আসিত। একবার বাবা কি কারণে রাগ করিয়া রাখালটাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তখন বুধী ঘরে বাঁধা পড়িল। তাহাকে চরায় কে? এইরূপে দুই-একদিন গেল। পরে আমি বলিলাম, "বাবা, শেয়ালখাকীকে দিলে সে গরু চরিয়ে আনতে পারে।" শুনিয়া বাবা হাসিলেন, "হাঃ, কুকুরে আবার গরু চরাবে!" মা শেয়ালখাকীকে চিনিতেন, তিনি তখন আমার কথাতে যোগ দিলেন। তখন শেয়ালখাকীর সঙ্গে গরু পাঠানো স্থির হইল। কেমন করিয়া গরু চরাইতে হইবে তাহা শেয়ালখাকীকে বুঝাইয়া দেওয়া গেল। সে গরু লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। একদিন সন্ধ্যা হইয়া গেল, গরু আর আসে না। বাবা ও মা চিন্তিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে দেখা গেল যে, একা শেয়ালখাকী মহা চীৎকার করিতে করিতে আসিতেছে, সঙ্গে গরু নাই। আসিয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া চীৎকার করে, একটু দৌড়িয়া যায়, আবার দাঁড়ায়, আবার নিকটে ছুটিয়া আসে, মুখের দিকে চায়, ডাকে, আবার দৌড়িয়া যায়, আবার দাঁড়ায়। শেষে বাবা বুঝিলেন যে আমাদিগকে সঙ্গে যাইতে বলিতেছে। তখন আমাদের দুইজন বালককে সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন। আমরা সঙ্গে গিয়া দেখি, একজনেরা আমাদের গরু বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহারা শেয়ালখাকীকে দেখিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে, কুকুরটা আবার এসেছে, নিজে মা'র খেয়ে গিয়ে বাড়ির লোক ডেকে এনেছে।"

এই শেয়ালখাকীর ন্যায় আরও অনেকবার অনেক কুকুর পুষিয়াছি।

আমার প্রপিতামহ। সর্বশেষে, আমার প্রপিতামহকে এই কালের মধ্যে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতেছি। আমার স্মৃতিশক্তি যত দূর যায়, আমার জ্ঞানোদয় পর্যন্ত আমি তাঁহাকে অন্ধ বধির ও বাড়ির বাহিরে যাইতে অসমর্থ দেখিয়াছি। সে সময়ে বোধ হয় তাঁহার বয়স ৯৫ বৎসর ছিল। তিনি খর্বাকৃতি ও কৃশাঙ্গ মানুষ ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে একটি বালকের মতো দেখাইত। আমার মা তাঁহার ধর্মভাব ও সাধননিষ্ঠা দেখিয়া এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে কুলগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া তাঁহারই নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎপরে কোলের শিশুটির ন্যায় তাঁহাকে হাতে ধরিয়া পালন করা আমার মা'র এক প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রাতে উঠিয়া গলবস্ত্রে তাঁহার চরণে প্রণত হইতেন, তৎপরে ছোট শিশুটির ন্যায় তাঁহার কাপড় ছাড়াইয়া কাচা কাপড় পরাইয়া পূজার আসন ও কোশাকুশী দিয়া তাঁহাকে পূজায় বসাইয়া দিতেন। বসাইয়া দিয়া নিজের গৃহকর্মে যাইতেন। পূজা অন্তে আমি তাঁহার হাত ধরিয়া বসিবার আসনে বসাইয়া দিতাম।

আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি ছোট কোঠা-ঘর ছিল, তাহার এক অংশে প্রপিতামহ মহাশয় থাকিতেন, আর এক অংশে ঠাকুরঘর ছিল। সে জন্য সমগ্র ঘরটি ঠাকুরঘর বলিয়া উক্ত হইত। ঠাকুরঘরে এক পাথরের বড় শিব, এক কাষ্ঠনির্মিত পঞ্চানন, এক স্ফটিকনির্মিত বাণলিঙ্গ শিব, এক শালগ্রাম শিলা, এই চারি ঠাকুর থাকিতেন। বোধ হয় প্রপিতামহের অন্নপ্রাশনের সময় পাথরের শিবের প্রতিষ্ঠা হয়, আমার পিতার অন্নপ্রাশনের সময় কাষ্ঠনির্মিত পঞ্চাননের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং অপর দুইটি ঠাকুর বোধ হয় কুলক্রমাগত। প্রপিতামহের যত দিন শক্তি ছিল, তিনি নিত্য ঠাকুরঘরে গিয়া ঐ ঠাকুরগুলি পূজা করিতেন। কিন্তু আমি যখন দেখিয়াছি, তখন তিনি আর ঠাকুর পূজা করিতে ঠাকুরঘরে যান না, আমার পিসামহাশয় প্রভৃতি অন্য লোকে ঠাকুর পূজা করেন।

স্নানের প্রতি প্রপিতামহ মহাশয়ের বড় ভয় ছিল, এজন্য মাসে দুই-চারিবার মাত্র স্নান করানো হইত। কেন যে স্নানে ভয় ছিল বলিতে পারি না। দেখিতাম, মাথায় বা গায়ে জল দিলে 'বাপরে মারে' করিয়া পাড়ার লোক জড়ো করিতেন। সেই জন্য প্রতিদিন প্রাতে কাপড় ছাড়াইয়া সন্ধ্যা আহ্নিকে বসানো হইত।

আমি চলিতে বলিতে শিখিলেই তাঁহাকে ধরিয়া ঘরের বাহির করা, শৌচে লইয়া যাওয়া, তাঁহার মুখ ধুইবার জল আনিয়া দেওয়া, কাপড় আনিয়া দেওয়া, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যের ভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি আমাকে অতিশয় ভালোবাসিতেন। আমি তাঁহাকে সরু গলাতে 'পো' বলিয়া ডাকিলেই তিনি পুলকিত হইয়া উঠিতেন। কোনো কাজে আমার দরকার হইলেই আমাকে 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেন। সর্ববিষয়ে আমাকে অতিরিক্ত আদর দিতেন। মা আমাকে মারিলে আমি কাঁদিতাম, আমার ক্রন্দনের স্বর যদি তাঁহার কানে যাইত তাহা হইলে "বাবা কাঁদে কেন?" বলিয়া রাগিয়া ফাটাফাটি করিতেন। এইজন্য মা মারিলেই আমি আকাশ-পাতাল হাঁ করিয়া পো-র নিকট গিয়া কাঁদিতাম।

পো অধ্যাপক ছিলেন, বাড়িতে বসিয়া বিদায় আদায় যাহা উপার্জন করিতেন তাহাতেই সুখে সংসার চলিত। কখনো কখনো গ্রামের বিষয়ী লোকদিগের গৃহে ক্রিয়াকর্ম হইলে, পো-র জন্য বিদায়ের ডালি আসিত। ডালির অর্থ, একখানি সরাতে একটু চিনি ও দশ-বারোটি সন্দেশ, তৎসহ একটি ঘড়া, কি একটি গাড়ু, কি কতক-

গুলি মন্ত্র। আমি বাহিরে খেলা করিতে করিতে যদি দেখিতাম যে ডালি আমাদের ভবনের অভিমুখেই যাইতেছে, তখনই সঙ্গ লইতাম। প্রপিতামহ মহাশয় বাহির বাড়ির দিকে এক রকে বসিয়া জপ করিতেন। লোকে ডালিটি সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ছুঁয়াইয়া দিত। তিনি বুঝিতেন যে ডালি আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতেন, "কার বাড়ি হতে?" ডালি-বাহক চীৎকার করিয়া নামটা বলিয়া দিত। তখন পো আমাকে ডাকিতেন, "বাবা!" আমি অমনি ছোট ছোট অঙ্গুলিতে তাঁহার গা ছুঁইয়া দিতাম; ভাবিতাম, বেশি চেঁচাইলে মা শুনিতে পাইবেন। প্রপিতামহ বুঝিতেন, বাবা উপস্থিত। টাকাগুলি নিজের কাছে রাখিয়া বলিতেন, "এই সন্দেশের সরা মাকে নিয়া দেও।" বাবা তো সরাখানি লইয়া একান্তে দাঁড়াইয়া অধিকাংশ সন্দেশ খাইলেন, শেষে রান্নাঘরের কাছে গিয়া বলিলেন "মিত্রের বাড়ি থেকে ডালি এসেছিল, ঐ সে সরা," এই বলিয়া রান্নাঘরের দাবাতে সরাখানি রাখিয়াই দৌড়। মা রাগিয়া পো-র নিকট আসিয়া বকাবকি করিতেন। বলিতেন, "আমাকে কি ডাকতে পার না? বড় যে 'বাবা' 'বাবা' কর, ঐ বাবা সব সন্দেশ খেয়ে ফেলেছে।" প্রপিতামহ মহাশয় শুনিয়া হাসিয়া উঠিতেন, "হাঃ হাঃ, বেশ করেছে, ওর জন্যই তো সব।" যখন সরাখানি আমার হাতে না পড়িয়া মায়ের হাতে পড়িত, তখন পো হাত দিয়া সন্দেশ-গুলি গণিয়া রাখিতেন। তাহার পর তাঁহাকে প্রতিদিন কয়টা করিয়া সন্দেশ দেওয়া হইত তাহা গণিতেন। যদি দেখিতেন অধিকাংশ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে ফাটাফাটি করিতেন, "আমাকে যদি সব দিলে তো বাবা খেলে কি?"

এ সকল লিখিতে আমার চক্ষে জল আসিতেছে। হায়! তখন আমি তাঁহার এতটা প্রেম বুঝি নাই।

আমাদের বাড়িতে প্রায়ই ২।৩টা বিড়াল থাকে। সে সময় একটা কদাকার বিড়াল ছিল। সে কদাকার বলিয়া মা তাহাকে হনুমান বলিয়া ডাকিতেন, আমরাও হনুমান বলিতাম। হনু বড় চোর ছিল। পো-র পাতের মাছ চুরি করিয়া খাইত, তিনি দেখিতে পাইতেন না। এইজন্য মা প্রথম প্রথম পো-কে আহারে বসাইয়া বাম হস্তে একগাছি ছড়ি দিয়া আসিতেন; বলিয়া আসিতেন, "মধ্যে মধ্যে বাড়িগাছটা আপ্‌সো, বেরাল আসে।" পো মধ্যে মধ্যে ছড়িগাছটা লইয়া বিড়ালের উদ্দেশে মারিতেন। একদিন দেখা গেল, হনুমান লম্বা হইয়া পো-র পাত হইতে চুরি করিয়া মাছ খাইতেছে, পো তাহার উদ্দেশে ছড়ি মারিতেছেন, সে ছড়ি হনুর পৃষ্ঠে চপ চপ করিয়া পড়িতেছে, হনুর গ্রাহ্যই নাই। তাহার পর হইতে মা আমাকে পো-র পাতের নিকট ছড়ি হস্তে বিড়াল তাড়াইবার জন্য বসাইয়া রাখিতেন। তাহার পর আর বিড়াল আসিতে পারিত না। কিন্তু একদিন যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা বলিতে হাসিও পাইতেছে, লজ্জাও হইতেছে। সেদিন আমি বসিয়া আছি, পো আহার করিতেছেন। শুক্ত, ডাল, মাছের ঝোল, একে একে সব খাইলেন; আমি ঠিক বসিয়া আছি, কিছুই বিভ্রাট ঘটিল না। কিন্তু শেষে যখন দৈ কলা ও সন্দেশ দিয়া ভাত মাখিলেন, তখন এই পেটুকের পক্ষে স্থির থাকা কঠিন হইল। অলক্ষিতে ক্ষুদ্র হস্তে এক-এক থাবা ভাত গালে তুলিতে লাগিলাম। আমার প্রপিতামহের নিয়ম ছিল যে আহারে বসিয়া কথা কহিতেন না; এ নিয়ম তিনি ৮ বৎসর হইতে ১০৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত পালন করিয়াছিলেন। আর একটি নিয়ম এই ছিল যে, আহারের সময় কেহ স্পর্শ করিলে আহার হইতে বিরত হইতেন। আমার ক্ষুদ্র হাতের থাবা উঠিতেছে উঠিতেছে, একবার হাতে হাতে ঠেকিয়া গেল। অমনি পো শিহরিয়া মাকে ইশারাতে ডাকিতে লাগিলেন,

"উ', উ'!" অর্থাৎ কে আমাকে ছুঁইয়া দিল, দেখ। মা আসিয়া দেখেন, পেটুক পুত্রটির হাতে মুখে দইয়ের দাগ, আর লুকাইবার যো নাই। গো-স্ব কানে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আর উ' কি? ঐ 'বাবা'। বড় যে আদর দেও!" শুনিয়া প্রপিতামহ মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন, "হাঃ হাঃ, বেশ করেছে, তবে ও-ই সব থাক," বলিয়া আহার ত্যাগ করিলেন। কিন্তু এ বন্দোবস্ত মা'র সহ্য হইল না। তিনি আমার গলা টিপিয়া থাবড়া দিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন; বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা তো বেরাল তাড়াতে বসিয়েছি, নিজেই বেরাল হয়েছে।"

আমি বাল্যকালে প্রপিতামহদেবের অধর্মের প্রতি যে বিরাগ দেখিয়াছিলাম, তাহা ভুলিবার নহে। পরিবার মধ্যে আমার পিতা বা মাতা কাহারও কার্য ধর্ম বা নীতি-সংগত হয় নাই, এরূপ মনে করিলে তিনি নিজের গালে মুখে চড়াইতেন বা মাথা খুঁড়িতেন। ক্রোধ কোনো প্রকারেই সম্বরণ করিতে পারিতেন না। আমার কোনো দুষ্টামি তাঁহার কর্ণগোচর হইলে মাকে ডাকিয়া আমাকে শাসন করিতে আদেশ করিতেন। পাছে আমি পাড়ার কুসংগে মিশিয়া দুষ্টামি শিখি, বোধ হয় এই ভয় করিতেন; কারণ, দেখিতে পাইতাম যে কুকুরটা বাছুরটা তাঁহার ঘরের রকের সম্মুখ দিয়া গেলে, ঝাপসা-ঝাপসা দেখিয়া, "ওই বাবা বাইরে গেল" বলিয়া মাকে ডাকাডাকি ও মহামারি উপস্থিত করিতেন। এইজন্য আমাকে পা টিপিয়া টিপিয়া বা পিছন দিয়া অনেক সময়ে পলাইতে হইত।

প্রপিতামহের শাস্ত্রজ্ঞান ও সংস্কৃতানুরাগ। প্রপিতামহদেব একজন সংস্কৃতজ্ঞ ও সংস্কৃতানুরাগী মানুষ ছিলেন। আমার স্মরণ আছে, গ্রামের পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে মধ্যে মধ্যে কঠিন কঠিন প্রশ্ন বিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা জানিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিতেন। তখন চীৎকার করিয়া প্রশ্নগুলি তাঁহাকে বোঝানো ও ব্যবস্থা লওয়া এক মহা ব্যাপার পড়িয়া যাইত। বয়সে অতি প্রাচীন হইলেও তিনি সেরূপ স্মৃতিশক্তি হারান নাই। তিনি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতেন।

সেই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার জ্ঞানালোচনাতে আনন্দ দেখিতাম। তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞান বিষয়ে দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। প্রথমটি এই। অনুমান ১৮৫১ কি ১৮৫২ সালে আমাদের গ্রামের স্কুলের মধ্যে একটি সংস্কৃত শিক্ষার শ্রেণী খোলা হয়। আমাদের জ্ঞাতিবর্গের বাড়ির অনেক ছেলে তাহাতে ভর্তি হয়, এবং আমার মাতার জ্যাঠতুতো ভাই চাঙ্গড়িপোতা গ্রাম নিবাসী কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সেই সংস্কৃত শিক্ষা শ্রেণীর শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি কর্ম লইয়া আমাদের গ্রামে গিয়া আমাদের বাড়িতেই বাস করিতে থাকেন, এবং সংস্কৃত কাব্যাদির বিচার বিষয়ে আমার প্রপিতামহের একজন সহায় ও সংগী হইয়া পড়েন। প্রাতে গ্রামের কোনো কোনো ব্রাহ্মণ যুবক তাঁহার নিকট পড়িতে আসিতেন। তাঁহাদের মুখে প্রপিতামহ মহাশয় সংবাদ পাইতেন, তাঁহারা কি পড়েন; তাহাতে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতেন। আমি কলিকাতা হইতে বাড়ি গেলেই দেখিতে পাইতাম, তিনি কৈলাসমামাকে ডাকিয়া তিন চরণ সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিয়া, শেষ চরণ কি তাহা জানিতে চাহিতেছেন; কৈলাসমামা আশ্চর্যান্বিত হইয়া আমার মাকে বলিতেছেন, "দিদি, কি আশ্চর্য! এ সকল শ্লোক এখনো ওঁর স্মরণ আছে!"

অপর ঘটনাটি হাস্যজনক।

'রাম' শব্দের টা-তে কি হয়? আমি ১৮৫৬ সালে যখন কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হইলাম, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সেখানকার কর্তা। তিনি তৎপূর্বে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়ানো বন্ধ করিয়া নিম্ন শ্রেণীতে তাঁহার প্রণীত উপক্রমণিকা ধরাইয়াছেন। আমরা উপক্রমণিকা অনুসারে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করিলাম। তৎপরে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে আসিলে আমার প্রপিতামহদেব শুনিলেন যে আমি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হইয়াছি, তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় আমাকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! রাম শব্দের 'টা'-তে কি হয়, বল তো।" আমি বালকের কণ্ঠস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "রাম শব্দের আবার 'টা' কি?—রামটা।" তখন তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ঘোড়ার ঘাস কাটবে।" "রাম শব্দের তৃতীয়ার এক বচনে কি হয়"—বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিতে পারিতাম 'রামেণ'। কিন্তু আমি তো মুগ্ধবোধ পড়ি নাই, কাজেই রাম শব্দের 'টা' যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইহা লইয়া আমার বাবার সহিত প্রপিতামহদেবের কথা হইল, বাবা সমুদয় কথা বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িতেছি না শুনিয়া তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন।

বাবার মুখে শুনিয়াছি, প্রপিতামহ মহাশয়ের সময়ে কলাপ ব্যাকরণ পড়িবার রীতি ছিল, তদনুসারে তিনি যৌবনে কলাপ ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আমার পিতা মহাশয়ের পঠদ্দশাতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িবার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। তদনুসারে প্রপিতামহ মহাশয় বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে আমি মুগ্ধবোধ পড়ি, সেই জন্যই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "রাম শব্দের 'টা'-তে কি হয়?"

প্রপিতামহদেব আমার মাতার মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। সুতরাং সময়ে অসময়ে মাতাকে ডাকিয়া, কোন স্থলে কিরূপ কর্তব্য, সে বিষয়ে উপদেশ দিতেন। এই সকল উপদেশ আমার মাতার অন্তরে এরূপ দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি সমগ্র জীবনে ঐ সকল উপদেশ হইতে একপদও বিচলিত হন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রপিতামহ মহাশয় আমার জননীকে বিবাহিতা হিন্দু রমণীর যে গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন, মাতা চিরদিন সেই পথে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

আমার শৈশবে আমার মাতৃদেবীর ও আমার প্রপিতামহের যে ধর্মভাব দেখিয়াছি, তাহা ভুলিবার নহে। আমাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য মা'র ইষ্টদেবতার নিকট মানতের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাহাই কেবল নহে, ধর্ম সাধন তাঁহার প্রতি দিনের প্রধান কার্য ছিল। মাটি দিয়া শিব গড়িয়া নিত্য পূজা করিতেন। সে পূজাতে অনেকক্ষণ থাকিতেন। খাবার অন্ন ঠাকুরদিগকে নিবেদন না করিয়া কাহাকেও খাইতে দিতেন না। বিশেষ বিশেষ দিনে ব্রত নিয়ম উপবাসাদি চলিত, প্রতি দিন পূজোর ফুল আনিয়া আমার মাথায় দিতেন এবং নিজের পদধূলি দিয়া আশীর্বাদ করিতেন।

সাধুপুরুষ প্রপিতামহ। প্রপিতামহদেবের ধর্মভাবও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি বিশ্বাসী ভক্ত শাক্ত সাধক ছিলেন। তাঁহার ইষ্টদেবতাকে সর্বদা 'দয়াময়ী মা' বলিয়া ডাকিতেন। যৌবনে নিজের দুই কন্যা সন্তান জন্মিলে তাঁহাদের নাম 'দয়াময়ী' ও 'করুণাময়ী' রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা বাল্যকালেই গত হন। দয়াময়ী করুণাময়ীর চিন্তা তাঁহার মনে কিরূপ লাগিয়া ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহাদের মৃত্যুর প্রায় ষাট বৎসর পরে যখন আমার প্রথমা ভগিনী উন্মাদিনী জন্মিল, তখন তাঁহার মনে হইল দয়াময়ী আবার আসিয়াছে।

প্রপিতামহদেব জপতপ পূজাদিতে প্রতিদিন প্রাতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় যাপন করিতেন। প্রথমত প্রায় একঘণ্টা কাল দেব দেবীর পূজন ও জপ প্রভৃতিতে যাইত, তৎপরে প্রায় আধ ঘণ্টা কাল পিতৃপুরুষের তর্পণে অতিবাহিত হইত। তৎপরে প্রায় আধ ঘণ্টা কাল মাটিতে মাথা ঠুকিয়া ইষ্টদেবতার চরণে প্রণাম ও প্রার্থনা হইত। এই প্রণাম করিয়া করিয়া তাঁহার কপালের উপরে একটা আবের মতো মাংসের গুলি জমিয়াছিল। মাথা ঠুকিয়া যখন প্রার্থনা করিতেন, তখন আমার মা কোনো কোনো দিন কান পাতিয়া শুনিতেন। একদিন মা শুনিলেন যে, তিনি মুখে মুখে বাংলা ভাষাতে তাঁহার ইষ্টদেবতার চরণে আমার বিদেশবাসী পিতার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। বলিতেছেন, "মা দয়াময়ি! সে বিদেশে পড়ে আছে, তাকে রক্ষা করো। সে কাহারও বারণ শোনে না, তাকে সুমতি দেও," ইত্যাদি। সর্বশেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া করতালি দিয়া নাচিতেন। নাচিবার সময় আমার ডাক হইত, 'বাবা!' আমি তখন দিগম্বরমূর্তি বালক, মা আমাকে খেলার ভিতর হইতে ধরিয়া আনিতেন এবং প্রপিতামহের হাতে হাত দিয়া নাচিতে বলিতেন। অমনি দুইজনে হাতে হাত ধরিয়া নৃত্য আরম্ভ হইত। তিনি তিনশত পঁয়ষট্টিদিন নাচিবার সময় একই গান করিতেন, তাহার দুই পংক্তি মাত্র আমার মনে আছে—

"দুর্গা দুর্গা বল ভাই,
দুর্গা বই আর গতি নাই।"

মা প্রপিতামহদেবকে আমার ধর্মশিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাই তিনি আমাকে লইয়া প্রাতে নাচিতেন এবং প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে সায়ংসন্ধ্যার পর কাপড় মুড়ি দিয়া নিজ শয্যাতে বসিয়া আমাকে কোলে লইয়া মুখে মুখে ধর্মোপদেশ দিতেন, দেবতাদের স্তব প্রভৃতি শিখাইতেন, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সকল শিখাইতেন। যথা—"প্রপিতামহের নাম কি?" প্রশ্ন করিয়াই তদুত্তরে বলিতেন, "বল, শ্রীরামজয় ন্যায়ালঙ্কার।" আমি বাল্যস্বরে বলিতাম, "শ্রীরামজয় ন্যায়ালঙ্কার," ইত্যাদি। তৎপরে দেবদেবীর যে সকল স্তব মুখস্থ আবৃত্তি করিতেন এবং আমাকে আবৃত্তি করাইতেন, তাহার সকলগুলি মনে নাই। একটি মনে আছে, তাহা এই—

সর্বমঙ্গলা-মঙ্গল্যে, শিবে, সর্বার্থসাধিকে,
শরণ্যে, ত্র্যম্বকে, গৌরি, নারায়ণি, নমোঽস্তু তে।

সে সময়কার আর একটি শ্লোক আমার স্মরণ আছে, তাহা মনে হইলে ক্ষোভ-মিশ্রিত বিস্ময়ের উদয় হয়। মনে হয়, অল্পদিনের মধ্যে আমাদের গৃহে কি পরিবর্তনই ঘটিয়া গেল! আমার প্রপিতামহ আমাকে অপরাপর প্রশ্নের মধ্যে প্রশ্ন করিতেন, "বাবা, তোমরা কোন জাতি?" বলিয়াই বলিতেন, "বল, আমরা ব্রাহ্মণ।" পরে প্রশ্ন—"কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ?" আবার উত্তর—"দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ" আবার প্রশ্ন—"তোমরা কত দিন ব্রাহ্মণ?" উত্তর—

"যাবন্মেরৌ স্থিতা দেবা, যাবদ্ গঙ্গা মহীতলে,
চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ, তাবদ্বিপ্রকুলে বয়ম্।"

অর্থাৎ, দেবগণ যতদিন মেরুতে আছেন, গঙ্গা যতদিন পৃথিবীতে আছেন, চন্দ্র

সূর্য যতদিন আকাশে আছেন, ততদিন আমরা ব্রাহ্মণকুলে আছি। এখন ভাবি, তিনি কি ভাবিয়াছিলেন, আর আমি কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

আমি জ্বরে পড়িলে বা অন্য কোনো প্রকার পীড়াতে আক্রান্ত হইলে আমার মা সন্ধ্যাকালে আমাকে লইয়া তাঁহার ক্রোড়ে বসাইয়া দিতেন, এবং পীড়ার কথা জানাইতেন। তৎপরে প্রপিতামহদেব আমার দেহে হাত বুলাইয়া ঝাড়িতে আরম্ভ করিতেন, সমগ্র দেহে ফুৎকার দিতেন, ও মুখে-মুখে ইষ্টদেবতার স্তব আবৃত্তি করিতেন। আশ্চর্যের বিষয় এই, ঝাড়িয়া দেওয়াতেই অনেক সময়ে বোধ হয় আমার জ্বর সারিয়া যাইত। এইজন্য জ্বরে আমার গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইলেই, আমি "পো-র কাছে নে যা" বলিয়া কাঁদিতাম।

এই সাধু ও সিদ্ধ পুরুষের স্মৃতি আমাদের পরিবারে জীবন্ত রহিয়াছে। তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন যাহা কিছু আছে, আমাদের গৃহে যত্ন পূর্বক রক্ষিত হইতেছে। সে সকলকে সকলেই পবিত্র চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ব্রাহ্ম হইয়া উপবীত ত্যাগের পর আমার একবার যক্ষ্মা রোগের সূচনা হয়, তখন আমার জননী আমার পরিচর্যার জন্য কলিকাতা আসিয়া আমাকে লইয়া কয়েক মাস ছিলেন। তিনি আমার পূজ্য পো-ঠাকুরদার লাঠি যোগপট্ট ও মালা আনিয়া আমার শয্যাতে রাখিয়াছিলেন, বিশ্বাস এই ছিল, তাহার গুণে আমি রোগমুক্ত হইব। তিনমাস কাল ঐ সকল দ্রব্য আমার শয্যা হইতে সরাইতে দেন নাই। তৎপরে এ-লোক হইতে যাইবার সময় পো-র জপের মালা আমার ভগিনীকে ও তাঁহার আহারের বাটি আমাকে দিয়া গিয়াছেন, আমি প্রতিদিন তাহা ব্যবহার করিতেছি।

আমি আর কি বলিব, তাহার পর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে, অনেক মানুষ দেখিয়াছি, নিজে অনেক ভ্রম প্রমাদ করিয়াছি, কিন্তু যখনই সেই সাধু পুরুষের সেই ধর্মনিষ্ঠার কথা স্মরণ করি, তখনই নিজের দুর্বলতা স্মরণ করিয়া লজ্জাতে অভিভূত হইয়া যাই। বহু বর্ষ পরে যখন আমার মা কাঁদিয়া বলিতেন, "হায় রে, এমন সাধু পুরুষের এত আশীর্বাদ কি বৃথা গেল?" তখন আমি চক্ষের জল রাখিতে পারিতাম না। মনে মনে বলিতাম, "হায় রে, তিনি তাঁর ইষ্টদেবতাকে যেমন অকপটে 'মা' বলিতেন, আমি কেন তেমন করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে পারি না।"

ক্রমে আমি নবম বৎসরে আসিয়া উপনীত হইলাম। নবম বৎসরে আমার উপনয়ন হইল। উপনয়নান্তে পো নিজে আমাকে সন্ধ্যা আহ্নিক শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং নিজের নিকট লইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যা করাইতে লাগিলেন।

কলিকাতা যাত্রা। ইহার অল্প দিন পরেই বাবা আমাকে কলিকাতায় আনিলেন। সেদিনকার কথা আমি ভুলিব না। আমি মায়ের এক ছেলে; বাছুর লইয়া গেলে গাভী যেমন হাম্‌লায়, তেমনি আমার মা সেদিন হাম্‌লাইতে লাগিলেন। আমি বাবার সঙ্গে চলিয়া আসিলাম, তিনি পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে ক্রন্দন কোনো দিন ভুলিব না। উন্মাদিনী চিন্তাদাসীর সঙ্গে শালতী ঘাট পর্যন্ত আমাকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। যখন সে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "পাগ্‌গো দাদা, (অর্থাৎ পাগলা দাদা,) আমার জন্যে পুতুল এনো," তখন আমি কাঁদিয়া অধীর হইলাম। সে চলিয়া গেল, আমার মনে হইল, আমার বুকের হাড় খুলিয়া লইয়া গেল। আমি পিতার সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিলাম।

কলিকাতায় ছাত্রজীবন

বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজ। ১৮৫৬ সালের আষাঢ় মাসে বাবা আমাকে কলিকাতায় আনিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে আমাকে ডেভিড হেয়ারের স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়া ইংরাজী শিখাইবেন; কারণ, তিনি দেখিয়াছিলেন যে তিনি সংস্কৃত শিক্ষাতে এত বৎসর দিয়াও এবং কলেজ হইতে সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াও ২৫ টাকার অধিক বেতন পাইলেন না। সুতরাং বুঝিয়াছিলেন যে ইংরাজীর গন্ধ না হইলে কাজ কর্ম পাইবার সুবিধা নাই। কিন্তু তাঁহার অবস্থাতে তাহা করিতে দিল না। তিনি তখন বর্ধমান জেলায় আমদপুরে পণ্ডিতি করিয়া আসিয়া কলিকাতা বাংলা পাঠশালাতে ২৫ টাকা মাসিক বেতনে কর্ম করিতেন। অতএব পুত্রকে উৎকৃষ্টরূপে ইংরাজী শিখাইবার যে বাসনা ছিল তাহা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল।

কেবল তাহাই নহে। হেয়ার স্কুলে না দিবার আরও একটি কারণ উপস্থিত হইল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। ঐ কলেজে আমার মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অধ্যাপকতা করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার মাতুলের সহাধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন। তিনি সপ্তাহের মধ্যে তিন-চারি-দিন আমাদের বাসাতে আসিতেন, এবং আমাকে নিকটে পাইলেই দুইটা আঙ্গুলে চিমটার মতো করিয়া আমার পেট টিপিতেন; সুতরাং বিদ্যাসাগর আসিয়াছেন শুনিলেই আমি সেখান হইতে পলাইতাম। যাহা হউক, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তিনি আমার বাবাকে আমাকে হেয়ার স্কুলে না দিয়া সংস্কৃত কলেজেই দিতে বলিলেন; তদনুসারে আমাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করা হইল।

আমার মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় সে সময়ে পীড়িত হইয়া স্বীয় গ্রামের বাড়িতে বাস করিতেছিলেন। আমি কলিকাতায় আসিয়া চাঁপাতলা সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেনের নিকটস্থ 'মহাপ্রভুর বাড়ি' নামক এক বাড়িতে মাতুলের বাসাতে রহিলাম। ঐ বাড়ির বাহিরে নিচের তলাতে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ দুইজনের কাষ্ঠনির্মিত দুই প্রকাণ্ড মূর্তি ছিল। হরেকৃষ্ণ বাবাজী নামক এক বাবাজী ঐ বাড়ির মালিক এবং ঐ উভয় মূর্তির সেবক ছিলেন। সেই বাড়ির এক ঘরে একটি চিত্রকর থাকিতেন, তিনি বাবুদের ছবি আঁকিতেন। তাঁহার ঘরে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি ছিল। আমি স্কুল হইতে আসিয়া তাঁহার ঘরে অনেকক্ষণ থাকিতাম, নিমগ্ন-চিত্তে ছবিগুলি দেখিতাম। আমার ছবি দেখার নেশা সেই অবধি অদ্য পর্যন্ত যায় নাই। আমাকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ছবির মধ্যে রাখিয়া দিলে বোধ হয় আহার নিদ্রা ভুলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকিতে পারি।

আমরা বাড়ির ভিতর উপরতলায় থাকিতাম। সেই উপরতলায় এক পার্শ্বে আমার মাতুল গ্রামের আর কয়েকটি ভদ্রলোক থাকিতেন। তাঁহারা আমাকে বড় ভালোবাসিতেন। সে পুরুষের বাসা, সমস্ত দিনের মধ্যে একটি মেয়েমানুষের মুখ দেখিতে পাইতাম না। স্বসম্পর্কীয় ও স্বগ্রামের অনেকগুলি যুবককে আমার মাতুল অন্ন দিতেন, তাঁহারা সকলে ঐ বাসাতে থাকিতেন। এক-একটি ভীষণাকৃতি মর্দ; কেহ দেড় কুনিকা, কেহ দুই কুনিকা চাউলের ভাত খায়। কেহ পড়ে, কেহ বা কিছু কাজ করে, কেহ বা নিষ্কর্মা বসিয়া খায়। আমার বাবা সংস্কৃত দশকুমারচরিত হইতে নাম সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কাহারও নাম 'দর্পসার', কাহারও নাম 'দর্প-নারায়ণ', কাহারও নাম 'চণ্ডবর্মা' রাখিয়াছিলেন; সেই নামে তাঁহাদিগকে ডাকিতেন। তদ্ভিন্ন প্রত্যেকের ভোজনের পাথরের পৃষ্ঠে নরুন দিয়া খুদিয়া কে কত কুনিকা চাউলের ভাত খায় তাহাও লিখিয়া দিয়াছিলেন। থালা ঘটি বাটি সর্বদা চুরি যাইত বলিয়া আমার মাতামহ থালা বাটির পাট উঠাইয়া দিয়া প্রত্যেকের জন্য এক একখানি মেটে পাথর কিনিয়া দিয়াছিলেন। অতিরিক্ত লোক আসিলে শালপাতা কিনিয়া দেওয়া হইত। আমি আসিলে আমার একখানি মেটে পাথর আসিল। প্রত্যেককে আপন আপন পাথর মাজিতে হইত।

বাসার লোক। পুরুষ পুরুষের সঙ্গে থাকিলে তাহাদের আলাপ আমোদ, কথাবার্তাতে লাজ সরম থাকে না। বাসার লোক আমাকে দেখিয়াও কিছু সঙ্কোচ করিত না, অবাধে সকল প্রকার আলাপ করিত। আমার বাবা দেখিতে পাইলে কখনো কখনো তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেন, কখনো কখনো আমাকে তাড়াইয়া দিতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সহিত নিরন্তর বাস করিয়া ও এই সকল অভদ্র আলাপ নিরন্তর শুনিয়া আমার মহা অনিষ্ট হইয়াছিল, এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছি। আমার অকাল-পক্কতা জন্মিয়াছিল। গ্রামের লোকে তাহার পর হইতে আমায় 'শিবে জেঠা' নাম দিয়াছিল। আমি অল্পবয়স্ক বালক হইয়াও কিরূপে বয়োবৃদ্ধদিগের সহিত জেঠামো করিতাম, তাহা স্মরণ করিয়া এখন লজ্জা হয়। তদ্ভিন্ন ঐ পুরুষদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অনেক খারাপ বিষয় শিখাইয়াছিল, যাহার অনিষ্ট ফল পরজীবনেও অনেক দিন ভোগ করিয়াছি। এই পুরুষদের সঙ্গে বাস ও অভদ্র আলাপাদি দ্বারা আর একটি অনিষ্ট এই হইয়াছে যে, আমার রীতিনীতি আলাপ সম্ভাষণ প্রভৃতিতে ভদ্রতা ও সৌজন্য সমুচিতরূপে ফুটিতে পায় নাই। বন্ধুরা আমাকে ভালোবাসেন বলিয়া আমার আলাপ সম্ভাষণে সৌজন্যের প্রতি তত দৃষ্টি রাখেন না। কিন্তু আমি সময়ে সময়ে অনুভব করি যে, আমার আলাপ আচরণ ভদ্রতার অনুরূপ নহে। এমন কি, যে নারী জাতির প্রতি আমার এত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা, তাঁহাদের প্রতিও সমুচিত সৌজন্য প্রকাশ করি না।

এই হরেকৃষ্ণ বাবাজীর বাড়িতে স্মরণীয় বিষয়ের মধ্যে আর একটি কথা আছে। তখন কলিকাতার অবস্থা এইরূপ ছিল যে, কেহ প্রথমে আসিলে একবার গুরুতর পীড়াতে পড়িতে হইত। আমিও আসিয়া ২।১ মাসের মধ্যে কঠিন জ্বর রোগে আক্রান্ত হইলাম। দেশে আমার মাকে সে সংবাদ দেওয়া হইল না। এই জ্বরের বিষয়ে আমার এই মাত্র স্মরণ আছে যে, আমাকে একখানা ভাঙা রথের চূড়ার উপরে বসাইয়া ভাপরা দেওয়া হইয়াছিল। সে সময়ে ভাপরা দিয়া জ্বর ছাড়ানো, ও মাথা-ব্যথা হইলে জোঁক লাগানো, চিকিৎসার প্রণালী ছিল।

কালা ছিলাম না। আর একটা ঘটনা বোধ হয় এই সময়েই ঘটিয়া থাকিবে। আমার বাবা তখন আমাকে 'হা-কালা' বলিয়া ডাকিতেন। কারণ এই। যখন আমি হাঁ করিয়া থাকিতাম, অর্থাৎ একমনে কিছু কাজ করিতাম, তখন পশ্চাৎ হইতে ডাকিলে শুনিতে পাইতাম না। বাবা অনেক সময় ডাকিয়া ডাকিয়া শেষে রাগিয়া আসিয়া মারিতেন। বাবার বিশ্বাস জন্মিল যে আমি কালা হইয়া যাইতেছি। আর এরূপ বিশ্বাস জন্মিবার কিছু কারণও ছিল, ছেলে বেলায় মধ্যে মধ্যে আমার কান পাকিত। যাহা হউক, বাবা আমাকে কালা ভাবিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য কলিকাতা মেডিকেল কলেজের আউট-ডোরে লইয়া গেলেন। তখন ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তী আউট-ডোরে বসিতেন। তিনি পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে বলিলেন, "ছোকরা, তুমি আমার দিকে পিছন করে দাঁড়াও তো?" আমি তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। তখন এক থোলো চাবি মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "কিছু শুনিলে কি?" আমি বলিলাম, "চাবি ফেলে দিয়েছেন।" তখন তিনি হাসিয়া বাবাকে বলিলেন, "এ ছেলে তো কালা নয়।" বাবার সে কথা মনঃপূত হইল না। তিনি আমাকে বাড়িতে আনিয়া অন্য কোনো ডাক্তারের পরামর্শে আমার কানে পিচকারী দিয়া, নাপিত ডাকিয়া কান পরিষ্কার করাইয়া, আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিতে লাগিলেন। তখন মাসে মাসে নাপিত ডাকিয়া আমার কান খোঁটানো হইত। নাপিতেরা তখন কুঠীওয়ালা বাবুদের ন্যায় বেনিয়ান পরিয়া পাগড়ী মাথায় দিয়া পথে পথে ঘুরিত। একজন নাপিত এলেন, যেন কেরাণীবাবু এলেন। এই শ্রেণীর নাপিতের হস্তে ঐ অন্যমনস্কতার জন্য আমার অনেক নিগ্রহ হইয়াছে।

সিপাহী মিউটিনী। হরেকৃষ্ণ বাবাজীর বাড়ির বাসা অল্পদিনের মধ্যেই ভাঙিয়া গেল। মাতুলমহাশয় উঠিয়া সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেনে এক বাড়িতে গেলেন, এবং বাবা আমাকে লইয়া বহুবাজার জেলিয়াপাড়া নামক গলিতে বাসা করিলেন। ইহাও পুরুষের বাসা। বাসার লোকেরা কর্মস্থল হইতে আসিয়া, বসিয়া তামাক খাইতেন ও গল্প করিতেন, ধীরে সুস্থে রাঁধিতে যাইতেন; আমি যে একটি ছোট বালক আছি, তাহার যে শীঘ্র-শীঘ্র আহার করা চাই, ইহা কাহারও মনে থাকিত না। তাঁহাদের রাঁধিতে রাত্রি প্রায় নয়টা সাড়েনয়টা হইয়া যাইত। আমি ততক্ষণ জাগিয়া থাকিতে পারিতাম না, কেতাব হাতে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। আহারের সময় সকলে আমাকে টানাটানি করিত, কোনো রূপে তুলিতে পারিত না। অবশেষে বাবা প্রহার করিতেন, তখন নিদ্রা ভঙ্গ হইত; কাঁদিতে কাঁদিতে আহার করিতে যাইতাম। সেই বাসাতে হরিনাভির রামগতি চক্রবর্তী নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ থাকিতেন। তিনি জ্ঞাতি সম্পর্কে আমার মায়ের খুড়া। সেই সূত্রে তাঁহাকে দাদামশাই বলিয়া ডাকিতাম। তিনি আমাকে বড় ভালোবাসিতেন। আমার বাবা আমাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি আমাকে রক্ষা করিতেন এবং তাহা লইয়া বাবার সঙ্গে বকাবকি করিতেন। এই কারণে আমি তাঁহাকে আমার রক্ষক মনে করিতাম।

জেলিয়াপাড়াতে যখন আমাদের বাসা, তখন ১৮৫৭ সালে মিউটিনী ঘটে, এবং আমাদের কলেজ পটলডাঙ্গা হইতে উঠিয়া গিয়া বহুবাজার রোডের তিনটি বাড়িতে থাকে। মিউটিনী থামিলেও ঐ স্থানে কলেজ কিছুকাল থাকে, তৎপরে নিজ আলয়ে উঠিয়া আসে।

কলিকাতায় প্রথম বিধবা বিবাহ। ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষের সহিত বিবাদ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করেন। আমি পেট টিপুনির ভয়ে পলাইয়া বেড়াইতাম বটে, কিন্তু তাঁহাকে অকপট শ্রদ্ধা ভক্তি করিতাম। তিনি তখন আমাদের আদর্শ পুরুষ। ১৮৫৬ সালের শেষভাগে যেদিন প্রথম বিধবাবিবাহ দেওয়া হয়, সেদিন আমি বাসার লোকের সঙ্গে সে বিবাহ দেখিতে গিয়াছিলাম। সে কি ভিড়! সুকিয়া স্ট্রীটের রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে ঐ বিবাহ হয়। বিধবাবিবাহের বৈধতা বিষয়ে আমাদের বাসাতে সর্বদা বিচার হইত, এবং বাসার অনেকে তাহার পক্ষ ছিল। সুতরাং আমি জ্ঞানোদয় হইতেই এই সংস্কারের পক্ষপাতী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলেজ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, আমরা বালকেরা পর্যন্ত মহা দুঃখিত হইলাম।

তাঁহার কাজে ই. বি. কাউয়েল সাহেব আসিলেন। তিনি সাধুতার মূর্তি ছিলেন। সকলেরই মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিতাম। তিনি আমাদিগকে বড় ভালোবাসিতেন, আমরা খেলা করিতেছি দেখিলে তিনি সুখী হইতেন।

কাউয়েল সাহেবের স্মৃতি। তাঁহার বিষয়ে এই সময়ের একটি ঘটনা মনে আছে। একদিন আমাদের ক্লাসের ছোকরারা একটা ছোট কাঠের সিঁড়ী লইয়া আর এক ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে একটার ছুটির সময় ভয়ানক দাঙ্গা করিল। আমি তখন খেলিতেছিলাম। আমাকে ক্লাসের ছেলেরা দাঙ্গার জন্য ধরিয়া আনিল। যে কয়জন বালক সিঁড়ী লইয়া টানাটানি করিয়াছিল আমি তাহাদের মধ্যে একজন ছিলাম, সুতরাং কিল দেওয়া অপেক্ষা কিল খাওয়া আমার ভাগ্যে অধিক ঘটিয়াছিল। ছুটির পর স্কুল আবার বসিলে এ-বিষয়ের তদন্ত আরম্ভ হইল। কাউয়েল সাহেব বড় বাড়ি হইতে তদন্ত করিতে আসিলেন। তিনি যখন ক্লাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কে কে দাঙ্গাতে ছিলে উঠিয়া দাঁড়াও," তখন তাঁহার সেই সাধুতাপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আমি যেন আর না দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি না; কে যেন ঠেলা দিতে লাগিল। কিন্তু চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ক্লাসের আর কোনো ছেলে উঠে না, ইতস্তত করিতে লাগিলাম। অবশেষে সাহেব বলিলেন, "তবে কি আমি বুঝিব, তোমরা কেহ দাঙ্গাতে যাও নাই? যে যে গিয়াছ উঠিয়া দাঁড়াও।" আমি আর না দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সাহেব বলিলেন, "তুমি কি একা দাঙ্গাতে গিয়াছ?" আমি বলিলাম, "ক্লাসের সকলেই গিয়াছিল।" ইহার পর সাহেব ক্লাসশুদ্ধ বালকের দুই টাকা করিয়া জরিমানা করিলেন, এবং আমাকে তাঁহার গাড়িতে তুলিয়া বড় বাড়িতে তাঁহার ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "তুমি সত্য বলিয়াছ বলিয়া মার্জনা করিলাম, কিন্তু দাঙ্গাতে গিয়া ভালো কর নাই।" আরও অনেক সদুপদেশ দিলেন। তিনি যখন আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "তুমি ভালো ছেলে, আমি তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়াছি," তখন ভালো ছেলে হইবার বাসনা যে মনে কত প্রবল হইল, তাহা বলিতে পারি না।

ফলত আমি তখন মিথ্যা বলিতে পারিতাম না; বড় জোর মৌনী থাকিতাম, অসত্য বলিতাম না। ইহারই কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালের আর একটি কথা স্মরণ আছে, তাহা এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করি। তখন আমি সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেনে মাতুলের নিকট থাকি। বাসার বড়-বড় ছেলেরা আমাকে তামাক খাইতে শিখাইয়াছিল। নিজে তামাক খাইয়া আমার হাতে হুঁকাটি দিয়া বলিত, "টান।" প্রথম প্রথম টানিয়া

ঘুম লাগিত, তবু শখের জন্য টানিতাম। একদিন তামাক টানিয়া বড়মামার নিকট বাজারের পয়সা আনিতে গিয়াছি, তিনি তামাকের গন্ধ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই তামাক খাস?" আমি মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলাম, "হাঁ।" তৎপর তিনি প্রশ্ন করাতে যেরূপে যেরূপে তামাক খাইতে শিখিয়াছি, ও যত বার খাই, সমুদয় বর্ণনা করিলাম। তখন আমার বয়ঃক্রম তেরো বৎসরের অধিক হইবে না। মাতুল শুনিয়া বাসার লোকের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং আমাকে তামাক না খাইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলেন। আমি তদবধি আর তামাক খাই নাই। কিন্তু একবার একটি মিথ্যা বলিয়া মাতুলকে প্রবঞ্চনা করিয়াছিলাম, তাহা যথাস্থানে বলিব।

কবিতায় হাতে খড়ি। জেলিয়াপাড়াতে অবস্থিতি কালের একটি কৌতুকজনক ঘটনা স্মরণ আছে। আমাদের ক্লাসে গঙ্গাধর নামে একটি ধনী-সন্তান পড়িত। সে বড় মোটা ছিল, এজন্য ক্লাসের ছেলেরা তাহাকে 'গঙ্গাধর হাতি' বলিত। গঙ্গাধর পড়াশোনাতে বড় মনোযোগী ছিল না, সেজন্য ওঠা-নামার সময় উপরে উঠিতে পারিত না। একদিন কিন্তু ঘটনাক্রমে গঙ্গাধর ফার্স্ট হইয়া গেল। তখন তাহার আমাদের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি দেখে কে? তাহা আমার সহ্য হইল না। পরদিন আমি তাহার নামে কবিতা বাঁধিয়া ক্লাসে উপস্থিত। একটার ছুটির সময় সমস্ত ক্লাসের ছেলেদিগকে ও তন্মধ্যে গঙ্গাধরকে দণ্ডায়মান করিয়া, সেই কবিতা পাঠ করা হইল। সমুদয় কবিতাটি আমার মনে নাই। চারি পংক্তি মাত্র স্মরণ আছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

ইজার চাপকান গায়　　　　ইস্কুলে আসে যায়
নাম তার গঙ্গাধর হাতি,
বড় তার অহঙ্কার　　　　ধরা দেখে সরাকার,
চলে যেন নবাবের নাতি।

কবিতা যখন পড়া হইল, তখন ছেলেদের করতালিতে ও অট্টহাস্যে সমুদয় স্কুলের ছেলে জড়ো হইল। গঙ্গাধর অপমানে কাঁদিয়া ফেলিল; এবং মাস্টার মহাশয়ের নিকট নালিশ করিল। কুমারখালির চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাগোবিন্দ মৈত্র তখন আমাদের ইংরাজীর মাস্টার ছিলেন। তিনি কবিতাটি আমার হাত হইতে লইয়া মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলেন, এবং আমার মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, "তোমার কবিতা বেশ হয়েছে, কিন্তু মানুষকে গালাগালি দিয়ে কবিতা লেখা ভালো নয়।" ইহার পর আমার কবিতা লিখিবার উৎসাহ বাড়িয়া গেল।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা। ফলত, আমি যে কত ছোট বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা মনে নাই। বর্ণপরিচয় হইলেই মা আমাকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন, অথবা নিজে মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। সেই সকল কবিতা আমার কানে লাগিয়া ছিল। তৎপরে কলিকাতাতে আসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা কোনো প্রকারে হাতে পাইলেই গিলিয়া খাইতাম। তৎপরে আমার বাবা কবিতার রসগ্রাহী মানুষ, তিনি বন্ধুদের সহিত ভারতচন্দ্র প্রভৃতির কবিতার সমালোচনা করিতেন। এই সকল কারণে আমার শৈশব হইতে কবিতা লিখিবার বাতিক জাগিয়া থাকিবে। আমার দশ বৎসর বয়সের লিখিত খাতা পরে দেখিয়াছি।

তাহাতে কয়েকটি কবিতা লিখিত আছে। সেগুলি এরূপ উৎকৃষ্ট যে অতটুকু বালকের লিখিত বলিয়া বোধ হয় না। অনুমান করি, সেগুলি অন্য কোনো স্থান হইতে নকল করিয়া লইয়াছিলাম। তাহাতেও এই প্রমাণ হয় যে, নয়-দশ বৎসর বয়সেও ভালো কবিতা দেখিলেই নকল করিয়া লইতাম।

এই সময়ের স্মরণীয় বিষয় আর একটি আছে। আমার দুইটি সহাধ্যায়ী বালকের মাতারা এই সময়ে আমার মাসীর কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আমি মাসী বলিয়া ডাকিতাম, সর্বদা তাঁহাদের বাড়িতে যাইতাম, তাঁহাদের কন্যাদের সঙ্গে ভাইবোনের মতো খেলিতাম। ইহাতে আমার জননীর ও ভগিনীর অভাব দূর হইত। ভালো জিনিস কিছু গৃহে হইলেই তাঁহারা আমাকে ডাকিয়া খাওয়াইতেন। পাছে আমি কুসঙ্গে পড়ি এই ভয়ে তাঁহারা কলেজের ছুটির দিনে আমাকে নিজেদের বাড়িতে রাখিতেন।

এই দশ-এগারো বৎসর বয়সের আর একটি কৌতুকজনক ঘটনা স্মরণ হয়। আমাদের কলেজের সন্নিকটের গলিতে একটি বালিকা ছিল। সে আমার সমবয়স্কা। দেখিতে যে খুব সুন্দরী ছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহার মুখখানি আমার বেশ লাগিত। সে তাহাদের বাড়ির উঠানে খেলা করিত। আমি আর একটি বালকের সঙ্গে রোজ তাহাকে দেখিতে যাইতাম। সে তার মা'র ভয়ে পথের বালকের সহিত বড় বেশি কথা বলিত না, কিন্তু জানিত যে আমরা তাহাকে দেখিতে ও তাহার সঙ্গে কথা কহিতে ভালোবাসি, তাই সে আমাদের কণ্ঠস্বর শুনিলেই বাহিরে আসিত ও এটা ওটা যাহা দিতাম গোপনে লইত। আমি বোনের মতো তাহাকে কাছে চাহিতাম, কিন্তু তাহাদের বাড়ির লোকে তাহা দিত না। বহুবাজার পাড়া হইতে কলেজ উঠিয়া গেলে আমরা তাহাকে হারাইলাম।

প্রথম মৃত্যুদর্শন। এই জেলিয়াপাড়াতে থাকিবার সময় আমাদের পরিবারে দুইটি দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথম, উন্মাদিনীর মৃত্যু, দ্বিতীয়, আমার প্রপিতামহদেব রামজয় ন্যায়ালঙ্কারের স্বর্গারোহণ।

একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে গেলাম। যাইবার সময় কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া বাড়িতে যাই। প্রথম দিন চাঙ্গড়িপোতায় মামার বাড়িতে গিয়া এক রাত্রি যাপন করিলাম; পরদিন প্রত্যূষে পদব্রজে যাত্রা করিয়া বাড়িতে গেলাম। বারো বৎসরের বালকের পক্ষে ২৮ মাইল পথ হাঁটিয়া যাওয়া বড় সহজ কথা নহে; আমি তো গলদ্ঘর্ম হইয়া বাড়িতে গিয়া উপস্থিত। কিন্তু উন্মাদিনীকে আমি এমনি ভালো-বাসিতাম যে বাড়িতে গিয়া যখন দেখিলাম উন্মাদিনী ঘরে নাই, তখন যেন সব শূন্য দেখিলাম। মাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, সে বাহিরে আমের বাগানে গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সেই দিকে দৌড়। মা চীৎকার করিতে লাগিলেন, "ওরে বোস, ওরে দাঁড়া, তাকে ডাকচি," কে বা তাহা শোনে! আমি একেবারে গিয়া উন্মাদিনীকে বুকে তুলিয়া ঘরে আনিয়া তবে নিঃশ্বাস ফেলিলাম।

এই উন্মাদিনীই সেই গ্রীষ্মকালে মারা পড়িল। বাবা একদিন তাহাকে সঙ্গে করিয়া জমিদারবাবুদের বাগানে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার প্রিয়নাথ রায়চৌধুরীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। তিনি উন্মাদিনীকে আদর করিয়া লিচু খাওয়াইলেন। উন্মাদিনী আনন্দিত অন্তরে হাসিতে হাসিতে বাবার সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই তাহার দারুণ কলেরা রোগ দেখা দিল। একবার ভেদ একবার

বমি হইয়াই সে যেন চুপসিয়া গেল। তাহার বমিতে আস্ত আস্ত লিচু উঠিল। সে কথা এই জন্য বলিতেছি যে, তাহার মৃত্যুতে এত আঘাত পাইয়াছিলাম যে তদবধি আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল ভালো মনে লিচু খাইতে পারি নাই। লিচু খাইতে গেলেই উন্মাদিনীর কথা মনে হয়। প্রাতে ৯টার সময় পীড়া জন্মিয়া অপরাহ্ণ ৩টার মধ্যে উন্মাদিনীর মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তাহাকে যখন নিকটস্থ পুকুরে নামাইল, তখন আমি গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। মনে হইল, সে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে এবং তাহার দুইচক্ষে জলধারা পড়িতেছে। সেই চক্ষের জলধারা এই দীর্ঘকাল ভুলিতে পারি নাই। উন্মাদিনী চলিয়া গেলে গৃহ শূন্য দেখিলাম। তৎপরে আমার তিন ভগ্নী জন্মিয়াছে এবং তদ্ভিন্ন পরের মাকে মাসী, পরের বোনকে বোন অনেক-বার করিয়াছি, কিন্তু শৈশবের সেই বিমল আনন্দের স্মৃতি হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হয় নাই।

বোধ হয় ইহার পূর্ব বৎসর পূজার সময় আমার প্রপিতামহদেব স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে তিনি অনুভব করিতে পারিলেন যে তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত। আমি ও আমার পিতা তখন কলিকাতায় ছিলাম। তিনি আমার পিসামহাশয়কে আমাদিগকে সংবাদ দিয়া বাড়ি লইবার জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বাবা গেলেন। আমি বোধ হয় কলিকাতাতেই থাকিলাম, কারণ তাঁহার মৃত্যুশয্যা আমার স্মরণ হয় না। তৎপরে মৃত্যুর দুই এক দিন পূর্বে নিজকে বাড়ির বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া রাখিবার জন্য আদেশ করিলেন। অনেকবার চীৎকার করিয়া বলা হইল যে যথাসময়ে লওয়া হইবে, কিন্তু কিছুতেই শুনিলেন না। তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। তৎপরে ইষ্টদেবতার নাম করিতে করিতে ১০৩ বৎসর বয়সে অমরধামে প্রস্থান করিলেন।

প্রথম বিবাহ। এই জেলিয়াপাড়ার বাসায় থাকিতে থাকিতে আমার প্রথমবার বিবাহ হয়। সাল তারিখ মনে নাই, তখন ঠিক কত বয়ঃক্রম ছিল, তাহাও স্মরণ নাই, ১২।১৩ বৎসরের অধিক হইবে না। আমার মাতুলালয়ের সন্নিকটস্থ রাজপুর গ্রামের ৺নবীনচন্দ্র চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রসন্নময়ীর সহিত আমার প্রথম বিবাহ হয়। প্রসন্নময়ীর বয়ঃক্রম তখন দশ বৎসরের অধিক হইবে না। আমাদের দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের কুলপ্রথা অনুসারে প্রসন্নময়ীর বয়ঃক্রম যখন এক মাস ও আমার বয়ঃক্রম যখন দুই বৎসর, তখন তাঁহার সহিত আমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল।

এই বিবাহকালীন সকল বিষয় আমার স্মরণ নাই। এই মাত্র স্মরণ আছে যে, আমি কানে মাকড়ি, গলায় হার, হাতে বাজু ও বালা পরিয়া বিবাহ করিতে গিয়াছিলাম। বাবা বাজনা ও আলো করিয়া আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। আমাকে লইয়া যেই আসরে বসাইল, অমনি গ্রামের সমবয়স্ক বালকেরা আসিয়া "ওরে তুই কি পড়িস? কি পড়িস?" বলিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল। আমি অল্পক্ষণ মধ্যে বরোচিত লজ্জা ভুলিয়া গিয়া তাহাদের সহিত বাগযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং আমাকে তাহারা ঠকানো দূরে থাক, আমিই তাহাদিগকে ঠকাইয়া দিলাম। ইহা স্মরণ আছে, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "ছেলেটি বড় জেঠা।" তৎপরে বাড়ির মধ্যে লইয়া গেলে সমবয়স্কা বালিকাদিগের কানমলা আরম্ভ হইল। সেইবার ঠকিয়া গেলাম, কানমলার পরিবর্তে কান মলিয়া দিতে পারিলাম না। নারীদলে আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। এত মেয়ে একত্র দেখিয়া ভ্যাবা-চ্যাকা লাগিয়া গেল।

বিবাহের পরদিন যখন এক পালকিতে বরকন্যাকে তুলিয়া দিয়া গৃহাভিমুখে বিদায় করিল, তখন আমার মুশকিল বোধ হইতে লাগিল। মেয়েটি ঘোমটা দিয়া সম্মুখে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল, হাত পা ছড়াইতে পারি না, কিছু বলিতে পারি না, মহা বিপদ! অবশেষে পথিমধ্যে একটা পড়ো বাগানে গিয়া পালকি নামাইল, আমি বাহির হইয়া বাঁচিলাম। বাহির হইয়া দেখি, লিচু গাছে লিচু পাকিয়া রহিয়াছে। গাছে উঠিয়া লিচু পাড়িয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। খাইতে খাইতে মনে হইল, মেয়েটি একা বসে আছে, তারও তো খিদে পেয়েছে, তাকে গোটা কতক লিচু দিই। এই ভাবিয়া কতকগুলি লিচু লইয়া প্রসন্নময়ীর অঞ্চলে ফেলিয়া দিয়াই দৌড়, যদি কেহ দেখিতে পায়।

ক্রমে পালকি গ্রামের প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইল। আমার পাড়ার খেলিবার সঙ্গী বালকগণ আগ বাড়াইয়া লইতে আসিয়াছে। পাড়ার দুইটি বালক আমার বড় অনুগত ছিল। তাহারা আসিয়া পালকির দ্বার খুলিয়া সরু গলাতে বলিল, "ওরে, তোর রবা কুকুর ভালো আছে।" শুনিয়া দুর্ভাবনা দূরে গেল, ভারি খুশি হইলাম। এই রবার বিবরণ একটু দেওয়া আবশ্যক। রবা একটি কুকুরের বাচ্ছা, মাদী কুকুর। শীতের ছুটির সময় বাড়িতে আসিয়া একটি বালকের নিকট হইতে লইয়া তাহাকে পুষিয়াছিলাম। যদিও মাদী কুকুর, তথাপি তাহার নাম দিয়াছিলাম 'রবার্ট'। ইহারও একটু বিবরণ আছে। কুকুরটি যখন আসিল, সঙ্গী বালকগণ জিজ্ঞাসা করিল, "ওর নাম কি হবে?" আমি নাম দিলাম 'রবার্ট'। তাহার মর্ম এই। আমার উপর ক্লাসের ছেলেরা তখন 'চেম্বার্স ফার্স্ট বুক অব্ রীডিং' পড়িত। তাহাদের মুখে শুনিয়াছিলাম যে রবার্ট একজনের নাম, সেইটা মনে ছিল। পাড়ার বালকদিগের নিকট তো বাহাদুরি দেখানো চাই, তাই নাম দিলাম 'রবার্ট'। আমি শহর হইতে গিয়াছি, আমার বাক্য তখন বেদবাক্য, তাই তাহার নাম হইল 'রবার্ট'। শিশুদের মুখে 'রবার্ট' ঘুচিয়া দাঁড়াইল 'রবা'। আমি রবাকে লইয়া পাড়ার বালকদিগের সঙ্গে সুখেই ছিলাম, আমাকে ধরিয়া লইয়া গেল বিবাহ দিতে! আমার ভাবনা হইল, রবাকে দেখে কে? মা'র উপরে বিশ্বাস হইল না, কারণ মা তখন কুকুর ভালোবাসিতেন না। কাজেই পাড়ার বালকদিগের প্রতি তাহার ভার দিয়া আসিয়াছিলাম। তাহারাই তাহাকে কয়েক দিন খাওয়াইয়াছিল ও দেখিয়াছিল। তাই আসিয়া সংবাদ দিল, "রবা ভালো আছে।"

ক্রমে পালকি বাড়িতে উপস্থিত হইল। পাড়ার মেয়েরা বৌ দেখিতে আসিল। মা হলুদ দিয়া, ধানদুর্বা ফুল চন্দন ঠাকুরের চরণামৃত প্রভৃতি দিয়া বৌ ঘরে তুলিলেন। আমি পালকি হইতে নামিয়াই তাড়াতাড়ি রবাকে দেখিতে ছুটিলাম। বড় পিসী "ওরে খা, ওরে খা" করিয়া পশ্চাতে ছুটিলেন। কে বা মিষ্ট খায়, কে বা বৌ লইয়া মেয়েদের মধ্যে বসে! তখন রবা প্রসন্নময়ী অপেক্ষা বহুগুণে আমার প্রিয়। এখন এই সব স্মরণ হইয়া হাসি পায়।

বিবাহের পরে প্রহার। বিবাহ উৎসব শেষ হইতে না হইতে একটি ঘটনা ঘটিল, যাহার স্মৃতি অদ্যাপি জাগরূক রহিয়াছে। আমার বিবাহের কয়েকদিন পরেই আমার জ্ঞাতি-সম্পর্কে এক জেঠার এক কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইল। তখনো প্রসন্নময়ী আমাদের বাড়িতে আছেন, বাপের বাড়ি ফিরিয়া যান নাই, এবং তাঁহার পিত্রালয় হইতে যাঁহারা সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কেহ কেহ তখনো আছেন। আমার ঐ জ্যাঠতুতো বোনের বিবাহ উপস্থিত হইলে, একদিন আমাদের পাড়ার ছেলেরা [illegible]

সহিত কৌতুক করিবার জন্য পঞ্চবর্ণের গুঁড়ো দিয়া আসন প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম। সেখানে আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে আমার বড়-পিসীর মেজছেলে রামযাদব চক্রবর্তীর সহিত আমার হঠাৎ বিবাদ বাধিয়া গেল। দুইজনে জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি ও ঘুষাঘুষি করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার মা এই সংবাদ পাইয়াই ছুটিয়া আসিলেন, এবং দুইজনের কানে ধরিয়া থাবড়া দিয়া বিবাদ ভাঙিয়া দিলেন। মেজদাদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাড়িতে গিয়া নিজের মাকে বলিল, "মামীমা মারে পোয়ে পড়ে আমায় মেরেছে।" বড়পিসী প্রকৃত ব্যাপারটা অনুসন্ধান করিলেন না, ছেলেদিগকে ডাকিয়া প্রকৃত ঘটনা জানিবার চেষ্টা করিলেন না, একেবারে রাগিয়া আগুন হইয়া গেলেন, এবং আমার এক পিসতুতো বোনের সঙ্গে একত্র হইয়া আমাদের বাড়িতে আসিয়া আমার মায়ের প্রতি গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুই ননদ ভাজে খুব ঝগড়া হইয়া গেল।

ইহার পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মা আমাকে বলিলেন, "আজ তোমার কপালে অনেক নিগ্রহ আছে। ভাত দিচ্ছি, শিগগির খেয়ে, ভটচায্যি পাড়ায় যাত্রা হবে সেখানে গিয়ে রাত্রে যাত্রা শোন। কর্তার রাগ পড়ে গেলে সকাল বেলায় আসবে।" মা যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। বাবা সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ি আসিতেছিলেন, পথ হইতে বড়পিসীর গালাগালি শুনিয়া তাঁহাদের বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। গিয়া বলিলেন, "তোরা কাকে এমন করে গালাগালি দিস যে রাস্তা হতে শোনা যায়?" আর কোথায় যায়! বড়পিসী বাবার কানে মা'র নামে অনেক কথা ঢালিয়া দিলেন। বাবা আর কাহারো কাছে কিছু শুনিলেন কিনা জানি না। আমার মায়ের উপরে কি বড়পিসীর উপরে রাগ করিলেন, তাহাও জানি না। তাঁহার মনে চিরদিন এই একটা ভাব ছিল যে, তাঁহার পুত্র এমনি সাধু ছেলে হবে যে তাহার নামে কেহ কখনো কোনো অভিযোগ করিবে না, তাহার কোনো দোষ কেহ দেখাইবে না, সে সকল দোষের ও সকল অভিযোগের উপরে থাকিবে। সেই ভাবের ব্যাঘাত হইল বলিয়া রাগিয়া গেলেন কি না, জানি না। যাহা হউক, যখন মায়ের ত্বরাতে আমি রান্নাঘরের এক কোণে বসিয়া তাড়াতাড়ি আহার করিতেছি, এমন সময়ে বাবা আসিয়া বাড়িতে প্রবিষ্ট হইলেন। হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে পাজীটা কোথায়?" আমার মা দুইহাত দিয়া রান্নাঘরের দরজার দুইকাঠ ধরিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন, "সে ঘরে নাই।" আমি বুঝিলাম, বাবা যদি রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে আসেন; মা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিবেন না, বাধা দিয়া রাখিবেন। কিন্তু বাবা সেদিকে আসিলেন না, বলিলেন, "দা-খানা দাও দেখি।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দা কেন?" বাবা রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কথায় কাজ কি? দাও না।" মা দা-খানা বাহির করিয়া দিলেন। বাবা দা লইয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেলেন।

আমি তাড়াতাড়ি আঁচাইয়া পিছনের দ্বার দিয়া খানা খন্দ বন-জঙ্গল পার হইয়া ভটচায্যি পাড়ায় যাত্রাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মা আমাকে মুখে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া সর্বদা ভিড়ের ভিতর থাকিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি মুখে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া ভিড়ের ভিতর বেড়াইতে লাগিলাম। ক্রমে মন হইতে ভয় ভাবনা চলিয়া গেল। নিশ্চিন্ত মনে বেড়াইতেছি, রাত্রি আটটা সাড়ে আটটার সময় কে আসিয়া পিছন হইতে আমার ঘাড়ের কাপড় ধরিল। আমি বলিলাম, "কে রে?" স্বপ্নেও ভাবি নাই যে বাবা সেখানে আসিয়া ধরিবেন। কিন্তু ফিরিয়া দেখি, বাবা! তিনি আমার পিঠে দু ঘুষা দিয়া বলিলেন, "খবরদার কাঁদতে পারবি না।"

সে ঘুষা খাইয়া কান্না গিলিয়া খাওয়া আমার পক্ষে মুশকিল হইয়া পড়িল। কি করি, কান্না গিলিতে লাগিলাম। বাবা সে অবস্থায় আমাকে বাড়ি লইয়া গেলেন, এবং উঠানের মধ্যে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "দাঁড়িয়ে থাক, নড়িস নে, আমি আসছি।" এই বলিয়া আমাকে মারিবার জন্য যে বাঁশের ছড়ি কাটিয়া গোলার গায়ে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা খুঁজিতে গেলেন; মা যে তৎপূর্বেই সে ছড়ি পুকুরের জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা জানিতেন না। আমি ২।৪ মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিতে না থাকিতেই আমার মা, বড়পিসী, পিসতুতো দিদি, বিবাহ বাড়ির লোকেরা আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে! পালা পালা, মা'র খাবার জন্যে কেন দাঁড়িয়ে থাকিস!" আমি বলিতে লাগিলাম, "না, আমি যাব না, বাবা যে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে গিয়েছেন।" এই বলিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ওদিকে বাবা আপনার ছড়িগাছা না পাইয়া, কি দিয়া মারিবেন তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। অবশেষে আর কিছু না পাইয়া একখানা চেলা কাঠ লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই কাঠ লইয়া যখন আমাকে মারিতে আসিলেন, তখন বড়পিসী আমার ও বাবার মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "ওরে ডাকাত! দে কাঠ দে। ওই কাঠের বাড়ি মারলে কি ছেলে বাঁচবে!" এই বলিয়া বাবার হাত হইতে কাঠ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই ভাইবোনে হুটোপুটি লাগিয়া গেল। বাবা বড়পিসীকে এরূপ এক ধাক্কা মারিলেন যে তিনি তিন-চারি হাত দূরে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তখন আমার মা প্রস্তরের মূর্তির ন্যায় অদূরে দণ্ডায়মানা, সাড়া নাই শব্দ নাই, নড়া নাই চড়া নাই। বাবার সহিত চোখোচোখি হওয়াতে তিনি বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখ কি? ছেলে মেরে ফেলতে হয় মেরে ফেল, আমি এক পা-ও নড়ব না।" বাবা বলিলেন, "আচ্ছা, তবে দেখ।" এই বলিয়া সেই চেলা কাঠ দিয়া আমাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আরো কেহ কেহ আমাকে বাঁচাইবার জন্য আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মাথায় ও পিঠে চেলা কাঠ পড়াতে কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। চেলা কাঠের কয়েক ঘা খাইয়াই আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। আর মানুষ চিনিতে পারি না। বোধ হইতে লাগিল, আমার চারিদিকে মুখগুলো ঘুরিতেছে। তৎপরেই আমি অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলাম।

প্রায় আধঘণ্টা পরে চৈতন্য হইল। চৈতন্য লাভ করিয়া দেখি, উঠান হইতে তুলিয়া আমাকে ঘরের দাওয়াতে শোয়ানো হইয়াছে, এবং দুই-তিনজন লোক তার্পিন তেল দিয়া আমার গা মালিশ করিতেছে; বাবা আপনি তেল জোগাইতেছেন ও তাহাদের সাহায্য করিতেছেন। আমি জাগিয়া 'মা' 'মা' করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। শুনিলাম, তিনি আমাকে অচেতন হইয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ির নিকটস্থ জঙ্গলে গিয়া পড়িয়া আছেন। আমার চেতনা হইবামাত্র লোকে তাঁহাকে আনিবার জন্য গেল। একজনের পর আর একজন গেল, তিনি কাহারও কথাতে বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে পীড়াপীড়ি করাতে বলিলেন, "কৃষ্ণচরণ নাপিত যদি আসিয়া বলে যে ছেলে বেঁচে আছে, তবে আমি যাব, আর কারও কথাতে যাব না।"

এই কৃষ্ণচরণ নাপিত পাড়ার একজন বৃদ্ধ দোকানদার ছিলেন। তিনি বড় ভক্ত ও ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন। পাড়ার লোকে তাঁহাকে 'ভক্ত কৃষ্ণচরণ' বলিয়া ডাকিত। সেই রাত্রে কৃষ্ণচরণের নিকট লোক গেল। বৃদ্ধ লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে আসিলেন,

এবং আমার সহিত কথা কহিয়া মাকে ডাকিতে গেলেন। মা তাঁহার কথা শুনিয়া জঙ্গল হইতে উঠিয়া আসিলেন, এবং "বাবা রে, তুই কি আছিস্?" বলিয়া আমার শয্যা-পার্শ্বে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে, আমার যখন চেতনা হইল, তখন আমি আমার স্বভাবসিদ্ধ জেঠামো করিয়া বলিতে লাগিলাম, "আমি মেজদাদার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম, মারামারি করেছিলাম, দোষ হয়েছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু লঘু পাপে এত গুরু দণ্ড দেওয়া বাবার পক্ষে কি ভালো হয়েছে? আমার স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বাড়িতে রয়েছে, পাশের বাড়িতে কুটুম্বরা এসেছে, তাদের সমুখে এত মারা কি বাবার পক্ষে ভালো হল?" এই কথা বলিতে না বলিতে দেখিতে পাইলাম, বাবা অদূরে মাটিতে নাক ঘষিয়া নাকে খৎ দিতেছেন। এখানে এ-কথা বলা আবশ্যক যে তাহার পরে তিনি সহস্র উত্তেজনা সত্ত্বেও আমার বা আমার ভগ্নীদের গায়ে আর হাত তোলেন নাই। এমন কি, আমি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া উপবীত পরিত্যাগ করিলেও, তিনি তর্জন গর্জন করিয়াছেন, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু আমার গায়ে হাত দেন নাই। ইহাতেই সকলে বুঝিবেন, তাঁহার অনুতাপ ও প্রতিজ্ঞা কিরূপ ঐকান্তিক ছিল।

মাতুলের সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ'। ইহার কিছুদিন পরেই আমার পিতা কলিকাতা বাংলা পাঠশালার কর্ম হইতে বদলী হইয়া আমাদের গ্রামের হার্ডিঞ্জ মডেল বাংলা স্কুলের হেড পণ্ডিতের কর্ম পাইয়া গ্রামের বাড়িতে চলিয়া যান। তখন আমাকে সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেনে আমার মাতুলমহাশয়ের বাসাতে রাখিয়া যান। এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বদাই আসিতেন, এবং আমার মাতুলের সহিত কি পরামর্শ করিতেন। পরে শুনিলাম, 'সোমপ্রকাশ' নামে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হইবে, তাহার পরামর্শ চলিতেছে। ১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশ কাগজ বাহির হইল। বাসাতে ধুম পড়িয়া গেল। বাড়িতেই ছাপাখানা খোলা হইল। কাগজ ছাপা ও কাগজ বিলির জন্য অনেক লোক বাসাতে থাকিতে আরম্ভ করিল। হৈ-হাই গোলমাল সমস্ত দিন ও রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত। তাহার ভিতরে আমি বয়সে সর্বাপেক্ষা ছোট, আমার খাওয়া দাওয়া বা কে দেখে, পড়াশোনার প্রতিই বা কে দৃষ্টি রাখে! আমি সেই পুরুষের দলে পড়িয়া, রাঁধি, বাসন মাজি, এবং কোনো প্রকারে নিজের পড়া-শোনা করি। তদুপরি, বাসার বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকগণের আলাপ আচরণ কিছুই আমার মতো বয়সের ছেলের শুনিবার ও দেখিবার উপযুক্ত নহে। সে সকল স্মরণ করিলে এখন লজ্জা হয়, এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে একেবারে অসৎপথগামী হই নাই।

সপ্তাহের মধ্যে বাসার অন্নাশ্রিত লোকগুলি মাতুলের ভয়ে অনেক শান্ত মূর্তি ধারণ করিয়া থাকিত, নিজ-নিজ কাজে মনোযোগ করিতে বাধ্য হইত। মাতুলমহাশয় শনিবার দেশে যাইতেন, শনিবার রাত্রি ও রবিবার সমস্ত দিন বাসা আর এক মূর্তি ধারণ করিত। কেহ গাঁজা কেহ মদ খাইয়া ঢলাঢলি করিত। মাতুল খরচের জন্য যে-কিছু পয়সা দিয়া যাইতেন তাহা এইরূপে ব্যয় করিয়া ফেলিত। আমাদিগকে অনেক রবিবার ভাতে-ভাত খাইয়া কাটাইতে হইত। প্রশংসার বিষয়, আমাকে তাহারা অনেক সময় একটা কিছু ছল করিয়া অন্য কোনো বাসায় থাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিত। তথাপি যাহা দেখিতাম ও শুনিতাম তাহা বালকের দেখা কোনো প্রকারেই কর্তব্য নহে। ঈশ্বরকে আজ অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি যে, সেই সকল দৃষ্টান্তের মধ্যে তিনি আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আমি একদিনের বিবরণ বলিতেছি। বাসার অন্নাশ্রিত আত্মীয়দিগের মধ্যে এক-জনকে সকলে 'মামা' 'মামা' বলিয়া ডাকিত। ঐ 'মামা' সম্পর্কে আমার মায়ের মামা, তব্ আমিও 'মামা' বলিয়া ডাকিতাম। বলিতে কি, চাকর বাকর দোকানি পসারি কেহই তাহাকে আসল নামে ডাকিত না, সকলেই 'মামা' 'মামা' বলিয়া ডাকিত। 'মামা' ইংরাজী লেখাপড়া শেখে নাই; কম্পোজিটারি, বিল সরকারি প্রভৃতি করিয়া কিছ্ উপার্জন করিত। তাহার স্রাপান ও অন্যান্য দোষ ছিল। একদিন রবিবার সন্ধ্যার পর একজন আত্মীয় আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, 'মামা' স্কিয়া স্ট্রীটের এক গণিকালয়ে মাতাল হইয়া বমি করিয়া পড়িয়া আছে। গণিকারা দ্বারকানাথ বিদ্যা-ভূষণের বাসার লোক বলিয়া তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া গালি দিতেছে। বারাঙ্গনার ম্খে মাতুলের নাম, ইহা যেন আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। আমি 'মামা'কে ধরিয়া আনিবার জন্য বাসার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে অনেক অন্রোধ করিলাম। কিন্তু তাঁহারা নেশা করিয়া ব্দ হইয়া ছিলেন, কেহই আমার কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে আমি যেদো নামক এক চাকরকে সঙ্গে করিয়া স্কিয়া স্ট্রীটের সেই গণিকালয়ের অভিম্খে বাহির হইলাম। গিয়া দেখিলাম, এক গোলপাতার ঘরের স্ত্রীলোকের দাওয়াতে 'মামা' বমি করিয়া ভাসাইয়াছে, ও অর্ধ-অচেতন অবস্থাতে পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা যাইবামাত্র স্ত্রীলোকটি গালাগালি আরম্ভ করিল। আমি বলিলাম, "চাকর সঙ্গে এনেছি, বমি পরিষ্কার করছি, ও ওকে তুলে নিয়ে যাচ্ছি; গালাগালি দিও না।" এই বলিয়া বমি পরিষ্কার করাইয়া, যেদো চাকরকে 'মামা'কে তুলিয়া আনিতে বলিয়া, নিজে দ্রতপদে বাসার অভিম্খে যাত্রা করিলাম; কারণ, তখন যদিও কলিকাতার পথে ঘাটে বাসাতে মাতাল দেখিতাম, তথাপি মাতালের প্রতি কেমন একটা বিজাতীয় ঘ্ণা ও ভয় ছিল, তাহাদের কাছে ঘেঁষিতাম না। বাসাতে আসিয়া তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি, অনেকক্ষণ পরে যেদো চাকর আসিয়া সজোরে দোর নাড়িতে লাগিল। দ্বার খ্লিয়া দেখি, 'মামা' সঙ্গে নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে 'মামা'কে অভদ্র ভাষায় গালাগালি দিয়া একখানা ছোরা আনিয়া দ্বারের নিকট বসিল; বলিল, 'মামা' আসিলেই তাহাকে কাটিবে। মনে ভাবিলাম, পথে দ্জনে মারামারি করিয়াছে। আমি মহা বিপদে পড়িয়া গেলাম। আমি জানিতাম, যেদো চাকর গাঁজাখোর, সে যাহা ভয় দেখাইতেছে করিতে পারে। বাসার লোককে ডাকাডাকি করিলাম, কেহই উঠিলেন না, বলিলেন, "মর্ক হতভাগারা।" আমি নির্পায় হইয়া বাহিরের দরজার ভিতরের দিকে এক তালা লাগাইলাম। যেদো উঠিয়া আমার হাত ধরিল, "তালা লাগাও কেন?" আমি বলিলাম, "তালার চাবি তো ভিতরে আমাদের কাছে রইল, 'মামা'র হাতে তো রইল না। এলে খ্লে দেব, তার ভয় কি?" যেদো তাহাই ব্ঝিল এবং ছোরা লইয়া বাহিরের দরজার কাছে বসিয়া রহিল। আমি বাড়ির ভিতরে উপরের ঘরে শ্ইতে গেলাম। গিয়া শ্নি, 'মামা' বাসার পশ্চাতে অপর এক গণিকালয়ে গিয়া মাতালি স্রে এক গান ধরিয়াছে। সে-রাত্রে সে আর বাসায় আসিল না।

পরদিন মাতুলমহাশয় শহরে আসিলে আমি এই ব্ত্তান্ত তাঁহার গোচর করিলাম। তিনি কুপিত হইয়া বাসা হইতে ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন।

ইহার পরে আমার মাতামহী ঠাকুরাণী ও আমার বড়মামী আসিয়া কিছ্দিন কলিকাতাতে ছিলেন। তাঁহাদের পদার্পণে বাসা পবিত্র হইয়া গেল। মাতুলমহাশয়ের শনিবার বাড়ি যাওয়া বন্ধ হইল। মামীঠাকুরাণী মাতুলের তৃতীয় পক্ষের পত্নী, আমা

অপেক্ষা চারি-পাঁচ বৎসরের বড়। তিনি মাতামহীকে গোপন করিয়া আমাকে মিঠাই আনিতে পয়সা দিতেন, মিঠাই আনিয়া রাত্রে দুইজনে খুব খাইতাম। এ পেটুকের সেই সময়টা যে কি সুখেই গিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না।

অগ্রে বলিয়াছি, বড়মামার কাছে একবার একটি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ এখানে দিতেছি। আমার দুইজন সহাধ্যায়ী বন্ধুর জননীকে আমি মাসী বলিতাম ও তাহাদের বোনকে বোন বলিতাম। তাঁহারা বাস্তবিক আমাকে মাসীর ন্যায় ভালোবাসিতেন। এই দুই বন্ধুর মধ্যে একজনের বাড়িতে আমরা কয়েকটি বালক একবার এক ছুটির দিনে সম্মিলিত হইয়াছিলাম। নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুকের মধ্যে একটি বালক একখানা বোতল-ভাঙ্গা কাঁচ লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখ ভাই, এই কাঁচ যদি কেহ চিবাইয়া ভাঙিতে পারে, তবে তাকে এখনি এক টাকা দি।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা দাও, আমি চিবাচ্ছি।" এই বলিয়া তাহার হাত হইতে কাঁচখানা লইয়া চিবাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। যেমন দুই পাটী দন্তের মধ্যে কাঁচখানা রাখিয়া ভাঙিতে যাইব, অমনি ডান দিকের নিচের ঠোঁট কাটিয়া দুখানা হইয়া গেল। এই অবস্থায় মাতুলের বাসাতে দৌড়িলাম। বড়মামা দেখিয়া ভয়ে আকুল হইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলাম যে, একখানা চাকু-ছুরি বাহাদুরি করিয়া দাঁত দিয়া তুলিতে গিয়াছিলাম। ছুরিখানা কিয়দ্দুর উঠিয়া সবেগে ঠোঁটের উপর বসিয়া গেল। মামা তাহাই বিশ্বাস করিলেন এবং ডাক্তার ডাকিয়া আমার ঠোঁট সেলাই করাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার নিকট এই একটি মিথ্যা কথা কহিয়াছিলাম। এখনো ইহা স্মরণ হইয়া লজ্জা হইতেছে, কারণ আমার সত্যবাদিতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। আমি আর তাঁহার নিকট কখনো কোনো মিথ্যা কথা বলিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। বলিতে কি, আমাকে তিনি কিরূপ বিশ্বাস করিতেন তাহা যখন ভাবি, আমার মন আশ্চর্যান্বিত হয়। পাছে তিনি ক্লেশ পান, এই ভয়ে সর্বদা কুসঙ্গ হইতে দূরে থাকিতাম। তিনি দৃঢ়চেতা কর্তব্যপরায়ণ মানুষ ছিলেন, তামাক পর্যন্ত খাইতেন না, ধীর গম্ভীরভাবে সকল কাজ করিতেন, দিন রাত্রি পাঠে মগ্ন থাকিতেন। তাঁহাকে না দেখিলে, তাঁহার চক্ষের সমক্ষে বর্ধিত না হইলে, আমার মনে যত সাধু-ভাব জাগিয়াছিল তাহা জাগিত না। তাঁহার নিকট এই মিথ্যা কথা বলিয়া বহুদিন কষ্ট ভোগ করিয়াছি।

মাতুলের কলিকাতার বাসায় থাকিবার কালের আর একটি হাস্যজনক ঘটনা আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, বালককালে আমার অতিশয় তন্মনস্কতা ছিল। কিরূপে একবার গাছের পাখি দেখিতে দেখিতে হাতির পায়ের তলায় পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম, কিরূপে আমি তন্মনস্ক চিত্তে পড়িতে বসিলে বাবা আমাকে ডাকিয়া ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া আসিয়া প্রহার করিতেন, এবং আমার হা-কালা নাম রাখিয়াছিলেন, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। এই মাতুলের বাসায় থাকিবার সময় একদিন আমি বাড়ির ভিতরের উপরের ঘরে তন্মনস্ক চিত্তে পাঠে মগ্ন আছি, এমন সময়ে বড়মামা শয়ন করিবার জন্য উপরে আসিতেছেন। আমি তন্মনস্ক চিত্তে পড়িতে বসিলেই কোমরের কাপড় খুলিয়া যাইত। সেইরূপে কাপড় খুলিয়া পড়িয়াছে, আমি পাঠে মগ্ন আছি। বড়মামার জুতার ঠক ঠক শব্দ শুনিতেছি, কিন্তু চেতনা হইতেছে না, কাপড় সামলাইয়া পরিতেছি না। অবশেষে বড়মামা যখন সেই ঘরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন আমি সজাগ হইয়া কোমরের কাপড় সামলাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। বড়মামা বলিলেন, "তুই কি ঘুমুচ্ছিলি? বসে ঘুমুচ্ছিলি কেন? শুনতে

তো পারিতস?" আমি বলিলাম, "না, ঘুমুইনি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমন থাড়ি-ঝাড়ি দিয়ে উঠলি কেন?" আমি বলিলাম, "আমি মনে করলাম ছুঁচো আসছে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ছুঁচো কি জুতো-পায়ে সিঁড়ি দিয়ে আসে?" এই লইয়া বাড়ির লোকের মধ্যে হাসাহাসি পড়িয়া গেল। অবশেষে বড়মামা আমার পাঠে মনোযোগ ও চিত্তের একাগ্রতার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

ছাত্রজীবনে পাচকবৃত্তি। ইহার কিছুদিন পরেই মাতলা রেলওয়ে খুলিল। বড়মামা ডেলি প্যাসেঞ্জার হইয়া বাড়ি হইতে কলেজে গতায়াত করিতে লাগিলেন। সোমপ্রকাশ যন্ত্র কলিকাতা হইতে চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে তাঁহার বাসভবনে উঠিয়া গেল। আমাদের বাসা আবার ভাঙিল। আমি দুদিন ইহাদের সঙ্গে, দুদিন উহাদের সঙ্গে, এইরূপ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। শেষে আমার পিতা আসিয়া আমাকে সুকিয়া স্ট্রীটে বাদুড়বাগানে এক আত্মীয়ের বাসাতে রাখিয়া গেলেন। তিনি আমার মাতার পিসতুতো ভাই। তিনি কম্পোজিটারি কাজ করিতেন, এবং একখানি সামান্য গোলপাতার ঘর ভাড়া করিয়া থাকিতেন। এরূপ স্থির রহিল যে তিনি প্রাতে ও আমি বৈকালে পাক করিব। কিন্তু কার্যকালে এই দাঁড়াইল যে আমাকেই দুইবেলা পাক করিতে হইত। কেবল তাহা নহে; বাসন মাজা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, বাজার করা, জল তোলা প্রভৃতি সমুদয় কাজ আমার উপর পড়িয়া গেল। অনেক সময় আমাকে বামহস্তে পাঠ্য পুস্তক ও দক্ষিণহস্তে ভাতের কাঠি লইয়া রন্ধন ও পাঠ এক সঙ্গে চালাইতে হইত। আমি বহুকাল পরে সেই সময়কার একখানি পুস্তক পাইয়াছি, তাহাতে বামহস্তের হলুদের দাগ এখনও রহিয়াছে। অনুমানে বোধ হয়, বাটনা বাটিয়া তৎপরে সেখানি পড়িবার জন্য লইয়াছিলাম, সেই জন্য হলুদের দাগ লাগিয়াছে।

এই স্থানে কিছুদিন বাসের পর আমার পিতা আসিয়া আমাকে কলিকাতার উপনগরবর্তী ভবানীপুরে স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে রাখিয়া গেলেন।

ধর্মজীবনের উন্মেষ

চৌধুরীবাড়ির ভট্টিবাবু। ভবানীপুরে স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতেই আমার অভিভাবকগণ হইতে বিযুক্ত হইয়া একাকী বাস আরম্ভ হয়। এই সদাশয় সাধুপুরুষ কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। ইনি বর্ধমান জেলার আমদপুর নামক গ্রামের জমিদার কুড়োরাম চৌধুরীর পৌত্র। ইঁহাদের বংশ সৌজন্য সদাশয়তা সচ্চরিত্রতার জন্য প্রসিদ্ধ। মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় চরিত্র গুণে সর্বজনের সমাদৃত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাতে যে সাধুতা ও সদাশয়তা দেখিয়াছি, তাহা কখনো ভুলিবার নহে। ইনি এবং ইঁহার পরিবারস্থ সকলে আমাকে আপনাদের স্বসম্পর্কীয় লোকের ন্যায় দেখিতেন। বাবা কলিকাতা বাংলা পাঠশালাতে আসিবার পূর্বে ইঁহাদের গ্রামে পণ্ডিতী কর্ম করিতেন। সেই সূত্রে ইঁহাদের সহিত আলাপ ও বন্ধুতা জন্মে। ইঁহারা এরূপ সদাশয় লোক যে সেই বন্ধুতাটুকুর খাতিরে আমাকে বাড়ির ছেলের মতো করিয়া লইলেন। আমি একজন গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, ইঁহাদের অন্নে প্রতিপালিত হইতেছি, আমার প্রতি ইঁহাদের ব্যবহার দেখিলে তাহা মনে হইত না। আমাকে বাড়ির ছেলে মনে হইত।

তাঁহারা আমাকে 'ভট্টি' 'ভট্টি' করিয়া ডাকিতেন। ইহার একটু ইতিবৃত্ত আছে। আমার স্বগ্রামের অল্পশিক্ষিত একজন ব্রাহ্মণ যুবক ইঁহাদের ভবনে বাসকালে একবার আমাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে আপনার নাম স্বাক্ষর করিবার সময় 'ভট্টাচার্যের' পরিবর্তে 'ভট্টীয্য' লিখিয়াছিলেন। তাহা লইয়া আমাদের মধ্যে খুব হাসাহাসি পড়িয়া গেল। তদবধি আমারও উপাধি ভট্টাচার্য বলিয়া বাড়ির লোকে আমাকে 'ভট্টীয্য' 'ভট্টীয্য' বলিতে লাগিলেন। ভট্টীয্যটা ক্রমে 'ভট্টি' হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে চাকর-বাকর সকলে 'ভট্টিবাবু' 'ভট্টিবাবু' বলিতে আরম্ভ করিল। বাড়ির কর্তাদের মুখে এই 'ভট্টি' নামটি আমার মিষ্ট লাগিত। কারণ তাহাতে অকপট স্নেহ ও আত্মীয়তা প্রকাশ পাইত।

তাঁহারা আমাকে কিরূপ আপনার লোক ভাবিতেন, তাহার একটা দৃষ্টান্ত এই স্থানেই দেওয়া ভালো। তাঁহারা একবার তাঁহাদের ভাঁড়ারের চাবি আমাকেই দিলেন। বলিলেন, "প্রাতে পড়িতে বসিবার পূর্বে তুমি ভাঁড়ারের দোর খুলিয়া চাকরদিগকে ডাকিয়া, নিজের চোখে দেখিয়া সমুদয় জিনিসপত্র বাহির করিয়া দিয়া পড়িতে বসিবে, চাবি তোমার কাছেই থাকিবে।" সেই বিস্তীর্ণ পরিবারের ভাঁড়ার এক বৃহৎ ব্যাপার ছিল। ৬০।৭০ জন খাবার লোক; ১০।১৫ জন চাকর; ৪।৫টা ঘোড়া; ৮।১০টা গরু বাছুর। মানুষদের খাবার চাল-ডাল তেল-নুন, ঘোড়ার দানা-ভূষি প্রভৃতি, গরুদের ভূষি-খইল কলাই প্রভৃতি, সমুদয় সেই ভাঁড়ারে থাকিত। প্রতিদিন

কোন জিনিস কি পরিমাণ দিতে হইবে, তাহা একটা কাগজে লিখিয়া, তাঁহারা ভাঁড়ারের মধ্যে উহা লটকাইয়া দিয়াছিলেন। আমি প্রাতে গিয়া, ভাঁড়ারের দ্বার খুলিয়া চাকরদিগকে ডাকিয়া, সমুদয় জিনিস ওজন করিয়া দিতাম। দিয়া চাবি লইয়া গিয়া উপরে পড়িতে বসিতাম। তাহার পর সমস্ত দিন আমার সঙ্গে ভাঁড়ারের সম্পর্ক থাকিত না। ঐ জিনিসপত্রের সঙ্গে চাকর-বাকরের তামাকও দেওয়া হইত।

নবীনঠাকুর বিদায়। একদিন আমার স্কুল বন্ধ। সেদিন আমি বাড়িতে আছি। রাঁধুনী বামুন নবীনঠাকুর আসিয়া আমাকে বলিল, "ভট্টি বাবু, আমাদের আর একটু তামাক দিন।" আমি প্রথমে বলিলাম, "যা তামাক দিবার কথা কাগজে লেখা আছে, তা তো দিয়েছি; আবার কেন চাও?" পরে ভাবিলাম, একটু তামাক বই তো নয়, দিয়া আসি। ভাবিয়া তামাক দিতে গেলাম। ভাঁড়ার খুলিয়া তামাক দিতেছি, এমন সময় নবীনঠাকুর আমাকে বলিল, "ভট্টি বাবু, আমাদের সঙ্গে লাগলে এখানে টিকতে পারবেন না।" রাঁধুনী বামুনের কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, ভাঁড়ারের চাবি আমার হাতে না রাখাই ভালো, চাকর-বাকর আমাকে অন্নাশ্রিত জানিয়া তেমন খাতির করে না, পদে-পদে তাহাদের সঙ্গে বিবাদের সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া পরদিন চাবিটা তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিলাম। প্রকৃত কারণটা আর কাহাকেও বলিলাম না, কেবল মাত্র মহেশচন্দ্র চৌধুরীর খুল্লতাত-পুত্র শ্রীশচন্দ্র চৌধুরীকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাকে গোপন রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমি যখন চাবি ফিরাইয়া দিতে গেলাম, তখন কর্তাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "কেন ফিরিয়ে দিচ্ছ? তোমার উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস, তোমার উপর এ-ভার থাকলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি।" এই কথা যখন উঠিল, তখন শ্রীশ আসিয়া তাঁহাদের নিকট সমুদয় কথা ব্যক্ত করিলেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্তা উঠিল, তাহা শুনিতে শুনিতে আমি চলিয়া গেলাম। যাইবার সময় দেখিয়া গেলাম, বড়দা (অর্থাৎ মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়) বারান্ডার এক ধারে বসিয়া স্নানের পূর্বে দাঁতন করিতেছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চাকর গিয়া বলিল, "ভট্টি বাবু, শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন; ভয়ানক কাণ্ড বেধেছে, বড়বাবু (মহেশবাবু) আপনাকে ডাকছেন।" আমি ফিরিয়া গেলাম। গিয়া দেখি বড়দা রান্নাঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সিংহগর্জনে নবীনঠাকুরকে বলিতেছেন, "রাখ্ রাখ্ হাতা বেড়ি রাখ্! এখনি ঘর হতে বের হয়ে যা, নতুবা গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।" আমি গিয়া কাছে দাঁড়াইলে আমাকে বলিলেন, "কি ভাই, নবীনঠাকুর তোমাকে কি বলেছে, বল তো।" আমি বলিলাম, "বেশি কিছু বলে নাই, সামান্য একটা কথা বলেছে, সে জন্য রাগ করছেন কেন?" বড়দা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আঃ! কি বলেছে, তাই বল না। সামান্য কি বেশি, আমি বুঝব।" তখন আমি বলিলাম, "ও বলেছে, ওদের সঙ্গে লাগলে আমি টিকতে পারব না।" বড়দা বলিলেন, "বলতে বাকি রেখেছে কি? দু ঘা জুতা মারলে কি সন্তুষ্ট হতে? ঐ জন্যেই লোকে তোমাদের অপমান করতে সাহস পায়।" এই বলিয়া নবীনঠাকুরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যা, এখানকার কর্ম গেল; এখানে তো তুই টিকতে পারলিই না, তারপর গ্রামে টিকতে পারিস কি না, পরে ভাবব।" (তাঁহারা আমদপুর গ্রামের জমিদার ছিলেন, ও নবীন তাঁহাদের প্রজা ছিল।)

নবীন তাঁহাদের গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া গিয়া পথের ধারে বাজারে এক দোকান আশ্রয় করিল। আমি স্কুলে যাইবার জন্য বাহির হইলেই দেখিতাম, নবীন বিষণ্ণ মুখে

দোকানে বসিয়া আছে। আমার মনে মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমি গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, এও গরীব ব্রাহ্মণ, আমার জন্য এ ব্যক্তির কর্ম যায়, এটা প্রাণে সহ্য হয় না। অবশেষে একদিন বড়দা কোর্ট হইতে আসিয়া বাহিরের উঠানে বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে নবীনের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে গেলাম। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, গায়ে পড়িয়া কথা কহিতে ভয় হইত, সুতরাং আমি নীরবে বলি-বলি করিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বেড়াইতে লাগিলাম। তিনি আমাকে পশ্চাতে বেড়াইতে দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "কি ভাই, আমাকে কিছু বলবে না কি?" আমি বলিলাম, "আপনি নবীনঠাকুরকে মাপ করুন, নতুবা আমার মন খারাপ হচ্ছে।" তিনি বলিলেন, "ছিঃ! তোমরা বড় মিল্কি-মাইণ্ডেড্! সে আপনার কাজের ফল ভুগুক। দু-দশদিন যেতে দাও না।" আমি বলিলাম, "সে নিরাশ্রয় হয়ে বাজারের দোকান আশ্রয় করেছে, মাথা রাখবার স্থান নাই, খাবার সম্বল নাই, এটা আমার সহ্য হচ্ছে না।" তখন তিনি চাকর পাঠাইয়া নবীনঠাকুরকে বাজার হইতে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "দেখ্ রে দেখ্, তুই কি মানুষের অপমান করেছিস! তোর জন্য আমার কাছে মাপ চাচ্ছে। এর জন্যই তোকে আসতে দিলাম। যা, কাজ করগে যা।" নবীন স্বীয় কর্মে প্রতিষ্ঠিত হইল, আমার প্রাণের উদ্বেগ চলিয়া গেল। সেদিনকার সে ঘটনা ও মহেশচন্দ্র চৌধুরীর অকৃত্রিম ভালোবাসা চিরদিন স্মৃতিতে জাগিয়া রহিয়াছে।

ইঁহাদের ভবনে আসিয়া আমি অনেক প্রকারে উপকৃত হইলাম। প্রথম, মহেশ-বাবুর চরিত্র আমার সম্মুখে আদর্শের ন্যায় রহিল। আমি যখনি তাঁহাকে দেখিতাম, আমার অন্তরে এক নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিত। দ্বিতীয়ত, এখানে আসিয়া রাঁধা ভাত ও পড়িবার উপযুক্ত গ্রন্থ সকল পাইয়া আমার পড়াশোনার বিশেষ সুবিধা হইল। যদিও বাসাতে আমার ন্যায় অনেকগুলি ছাত্র প্রতিপালিত হইতেছিল, এবং অনেক সময় আমাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া এক সঙ্গে বাস ও পাঠাদি করিতে হইত, তথাপি আমার যে স্বাভাবিক নিবিষ্টচিত্ততা আছে, তাহার গুণে আমার পাঠের বিশেষ ক্ষতি হইত না। তৃতীয়ত, এখানে আসিয়া সমপাঠী কতকগুলি বালক পাইলাম, তাঁহাদের দেখা-দেখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে আমার আত্মোন্নতি সাধনের ইচ্ছা অতীব প্রবল হইল।

চতুর্থত, ব্রাহ্মসমাজ গৃহ আমাদের বাসার নিকট হওয়াতে আমি মধ্যে মধ্যে বক্তৃতাদি শুনিতে ব্রাহ্মসমাজে যাইতে লাগিলাম। আমি বোধ হয় ১৮৬২ সালে ভবানীপুরে যাই, কারণ, এখানে ডেস্টিনি অভ হিউমান লাইফ বিষয়ে কেশববাবুর যে ইংরাজী বক্তৃতা হয় তাহা শুনিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বর্গীয় অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় এখানকার ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যে উপদেশ দিতেন তাহার কতকগুলিও শুনিয়াছিলাম। তখন হইতে ব্রাহ্মসমাজের দিকে মনে মনে একটু আকর্ষণ হয়।

এই আকর্ষণের আরও দুইটি কারণ ছিল। প্রথম, ভবানীপুরে আমার এক সহাধ্যায়ী বন্ধু থাকিতেন, তাঁহাকে আমি অতিশয় ভালোবাসিতাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি আমাকে অতিশয় ভালোবাসিতেন এবং সমাজে যাইতে বলিতেন।

গ্রামে ব্রাহ্মআন্দোলন। দ্বিতীয়ত, আমাদের বাসগ্রামে যে ইতিপূর্বেই ব্রাহ্মধর্মের

আন্দোলন উঠিয়াছিল ও শিবকৃষ্ণ দত্ত নামে একজন যুবক সর্বপ্রথম ব্রাহ্মধর্মের বার্তা আমাদের গ্রামে লইয়া যান, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার পিতা ব্রজনাথ দত্ত এক জন উদারচেতা বিষয়ী লোক ছিলেন, পণ্ডিতগণের সহিত সর্বদা শাস্ত্র আলোচনা করিতে ভালোবাসিতেন। তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লইতেন, ইহাও পূর্বে বলিয়াছি। সে সময়ে আমাদের গ্রামের বড় উন্নতির অবস্থা ছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য আরাধ্য ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রদ্ধেয় বন্ধু কালীনাথ দত্ত, হরনাথ বসু, রমানাথ ঘোষ প্রভৃতি শিবকৃষ্ণ দত্তের দৃষ্টান্ত ও প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী হইয়া ব্রাহ্মধর্ম অনুসারে অনুষ্ঠানাদি করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেজন্য গ্রামে মহা আন্দোলন ও এই যুবকদিগের প্রতি মহা নির্যাতন উপস্থিত হয়। সেই নির্যাতনের মধ্যে ইঁহারা বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন। সেজন্য আমরা গ্রামবাসী যুবকগণ মনে মনে ইঁহাদিগকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম।

১৮৫৯ সালে আমাদের গ্রামপ্রবাসী টাকীনিবাসী ডাক্তার প্রিয়নাথ রায় চৌধুরীর যত্নে ও ব্রাহ্মদিগের সাহায্যে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টি স্থাপিত হওয়া মাত্র আমার মা আমার ভগিনীদিগকে তাহাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রিয়নাথ-বাবু গ্রাম হইতে চলিয়া গেলে, স্কুলটি রক্ষার ভার ব্রাহ্ম যুবকগণের উপরে পড়িল।

গ্রামে ব্রাহ্মনির্যাতন। কিন্তু ইহার কিছু কাল পরে যখন উমেশচন্দ্র দত্ত, হরনাথ বসু ও কালীনাথ দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্ম যুবকগণ মৌরসী পাট্টাতে খাজনা করিয়া একটু জমি লইলেন, এবং তাহাতে স্কুলের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন জমিদারবাবুরা তাহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং বিধিমতে সে কার্যে বাধা দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম যুবকগণ স্কুলঘর নির্মাণের জন্য শালতি করিয়া সুন্দর-বনের ভিতর হইতে খুঁটি ও বেড়ার হেঁতাল প্রভৃতি আনাইলেন। গ্রামের পূর্ব পার্শ্বে খালের মধ্যে শালতি আসিয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্ম যুবকগণ সংবাদ পাইয়া খুঁটি প্রভৃতি আনিতে গেলেন। গিয়া দেখেন, চারিদিকের শ্রমজীবী লোকের প্রতি জমিদারবাবুদের হুকুম দিয়াছে, খুঁটি প্রভৃতি কেহ বহিয়া দিবে না। তাঁহারা অনেক অনুসন্ধান করিয়া এবং প্রলোভন দেখাইয়াও মুটে মজুর পাইলেন না। অবশেষে কালীনাথ দত্ত, হরনাথ বসু প্রভৃতি কাঁধে করিয়া খুঁটি প্রভৃতি বহিয়া স্কুলের জমিতে লইয়া যাইতে লাগিলেন। গ্রামের লোকে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতে লাগিল এবং চারিদিকে আলোচনা আরম্ভ হইল। কিন্তু তাঁহারা খুঁটি প্রভৃতি আনিয়া দেখেন যে, ঘর নির্মাণের জন্য যে-ঘরামিদিগকে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারা জমিদারবাবুদের আদেশে ঘরামির কাজ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। তখন ব্রাহ্ম যুবকগণ কোমর বাঁধিয়া নিজেরাই ঘরামির কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপর দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই কাজে প্রবৃত্ত রহিলেন। তাঁহারা জমি মাপিয়া, খুঁটি প্রভৃতি পুঁতিয়া রাত্রে ঘরে গেলেন। প্রাতে আসিয়া দেখেন যে তাঁহাদের পোঁতা খুঁটি প্রভৃতি নাই, তৎপরিবর্তে জমির এক পার্শ্বে একখানি ছোট খড়ের ঘর বাঁধা রহিয়াছে! দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া নিকটবর্তী পাড়ায় কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, শুকর মোল্লা নামক জমিদারবাবুদের এক চাকর রাতারাতি ঐ ঘর বাঁধিয়া ভোরে ব্রাহ্ম যুবকদের খুঁটিগুলি তুলিয়া কাঁধে করিয়া লইয়া গিয়াছে। বালিকা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতমহাশয় এবং অপর গ্রাম হইতে

শ্বশুরালয়ে-যাওয়া এক যুবক ভোরে উঠিয়া ঐ খুঁটি প্রভৃতি লইয়া যাইতে দেখিয়াছেন।

ইহার পর ব্রাহ্ম যুবকগণ আদালতে শুকর মোল্লার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সেই মামলা মজিলপুর গ্রামের পাঁচ-ছয় ক্রোশ উত্তরবর্তী বারিপুর গ্রামের আদালতে হইল। শুনিতে পাওয়া যায়, জমিদারবাবুরা ঐ মামলার জন্য শুকর মোল্লার নামে স্কুলের জমির এক জাল দলীল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মামলা উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সে স্থানের সর্বপ্রধান উকীলদিগকে নিযুক্ত করিয়া মামলা চালাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে ব্রাহ্ম যুবকগণ কলিকাতার ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে বলিয়া কতিপয় নবীন ব্রাহ্ম উকীল সংগ্রহ করিলেন। তদ্ভিন্ন মামলা দেখিবার কৌতূহল-বশত কলিকাতা হইতে অনেক ব্রাহ্ম যুবক বারিপুরে গেলেন। আদালত গৃহে ব্রাহ্ম দর্শকের ভিড়ের কথা শুনিয়া জমিদারবাবুরা না কি বলিয়াছিলেন, "ও মা! আমরা ভেবেছিলাম গ্রামের ঐ কয়েকটা ছোঁড়াই বুঝি ব্রাহ্ম; দেশে এত ব্রাহ্ম আছে তা তো জানতাম না।" যাহা হউক, মামলার শেষে শুকর মোল্লার কয়েক মাসের জন্য কয়েদ হইল। সে কয়েদ হইয়া কলিকাতার নিকটবর্তী আলিপুর শহরের জেলে আসিল। তখন আমি ভবানীপুরে থাকিতাম, আমার গ্রামবাসী ব্রাহ্ম যুবক হরনাথ বসু মহাশয় কালীঘাটে থাকিতেন। শুকর মোল্লা মনিবের আদেশে অন্যায় কাজ করিয়া কয়েদ হইয়াছে, ইহার জন্য হরনাথবাবু বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি কয়েদ-খানায় শুকর মোল্লাকে দেখিতে ও তাহার জন্য খাবার লইয়া যাইতে লাগিলেন। যত দূর স্মরণ হয়, আমি তখনও প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিই নাই, কিন্তু সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত, কালীনাথ দত্ত, হরনাথ বসু প্রভৃতি ব্রাহ্ম যুবকদিগকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। হরনাথবাবু আমাকে শুকর মোল্লার কয়েদের জন্য দুঃখিত দেখিয়া, প্রতি রবিবার আলিপুর জেলখানায় গিয়া শুকর মোল্লাকে মিঠাই প্রভৃতি খাওয়াইয়া আসিবার ভার আমার প্রতি দিলেন, আমি তাহাই করিতে লাগিলাম। এই জন্য শুকর মোল্লার কয়েদের কথা আমার মনে আছে।

স্বয়ং জমিদারবাবুরাও সেই জমি হইতে ব্রাহ্মদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হইলেন না, ইহাতে ব্রাহ্মদের প্রভাব বাড়িয়া গেল। তখন অন্য প্রকার নির্যাতন আরম্ভ হইল। একজন ব্রাহ্ম যুবক "পাড়াগাঁয়ে এ কি দায়, ধর্ম রক্ষার কি উপায়?" নাম দিয়া এক নাটক রচনা করিলেন। তাহাতে জমিদারবাবুদিগকে লোক-চক্ষে উপহাসাস্পদ করিবার চেষ্টা করা হইল। বিবাদটা আরও পাকিয়া গেল। অবশেষে জমিদারবাবুরা বাড়িতে বাড়িতে লোক পাঠাইয়া বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠাইতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "যে মেয়ে পাঠাবে, তাকে একঘরে করব।" আমি যখন প্রতি রবিবার গিয়া আলিপুর জেলে শুকর মোল্লাকে খাওয়াইতেছি, তখন জমিদার-বাবুদের শাসনে স্কুলে মেয়ে পাঠানো প্রায় বন্ধ হইয়াছে, কেবল আমার পিতামাতার দৃঢ়চিত্ততার গুণে আমার দুই ভগিনীকে লইয়া পণ্ডিত স্কুল চালাইতেছেন।

ব্রাহ্মণ পিতার তেজস্বিতা। অধিকাংশ গৃহস্থই জমিদারবাবুদের নিষেধ শুনিল, শুধু আমার বাবা ও মা শুনিলেন না। তাঁহারা উভয়ে তেজী মানুষ, অতিশয় সত্য-পরায়ণ ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রিয় লোক, তাঁহারা লোকের বিরাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতির অনেক দোষ গুণ আমার পিতাতে ছিল। তিনি বলিলেন, "কি! এত বড় আস্পর্ধার কথা? আমার

ছেলেমেয়ে পড়াব কি না, তার হুকুম অন্যে দিবে? যদি কাহারও মেয়ে স্কুলে না যায়, আমার মেয়ে যাবে; দেখি, কে কি করে।" এই বলিয়া তিনি আমার ভগিনীদ্বয়কে লইয়া স্কুলে গেলেন ও পণ্ডিতকে বলিলেন, "কেবল আমার মেয়ে আসবে ও তুমি আসবে, স্কুল এক দিনের জন্যও বন্ধ কোরো না। যদি কর, তা হলে গভর্ণমেণ্টের কাছে রিপোর্ট করে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য বন্ধ করে দেব।" বাস্তবিক কিছুদিন আমার ভগিনীদ্বয় ও পণ্ডিতমহাশয় এই তিনজনকে লইয়া স্কুল চলিল। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার হওয়াতে বাবা অগ্নিসমান জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং ব্রাহ্মদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তখন তিনি বাড়ির লোকের সমক্ষে ব্রাহ্মদের প্রশংসা করিতেন। ইহাও আমার ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইবার অন্যতম কারণ।

আশ্বিনের ঝড়। এখন নিজের জীবন বিবরণ আবার বলি। চৌধুরী মহাশয়দিগের ভবনে অবস্থান কালে ১৮৬৪ সালের আশ্বিন মাসে মহা ঝড় ঘটে। সেই ঘটনা স্মৃতিতে দৃঢ় রূপে মুদ্রিত রহিয়াছে। সেটা পূজার ছুটির সময়, বোধ হয় পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিন। অনেকে পূজার সময় কলিকাতা হইতে বাড়ি যাইতেছিল, সুতরাং পথে ঝড়ে পড়িতে হয়। আমার স্বগ্রামের একটি যুবক ও আমি দুইজনে ঝড়ের পূর্ব দিন শালতি করিয়া কালীঘাট হইতে বাসগ্রামের অভিমুখে যাত্রা করি। সেদিন সন্ধ্যা হইতেই আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া জোরে বায়ু বহিতে আরম্ভ হয় ও বৃষ্টি নামে। সেই বায়ু ও বৃষ্টিতে আমরা কোনো প্রকারে শালতিতে বসিয়া রাত্রি কাটাইলাম। শয়নের সুখ আর হইল না। পরদিন প্রত্যূষে যখন মেঘের অন্তরালে উষার আলোক দেখা দিল, তখন দেখিলাম আমাদের শালতি মগরাহাট নামক স্থানের উত্তরে জালাসি নামক দ্বীপগ্রামের কিঞ্চিৎ উত্তরে, বিশাল জলা ও ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে, ঝড় ও তরঙ্গের আঘাতে আন্দোলিত হইতেছে। বায়ুর বেগ এত অধিক যে সম্মুখ দিকে এক পা অগ্রসর হওয়া কঠিন। কোনো প্রকারে শালতির চালকদ্বয় জালাসি গ্রামের বাজারের ধারে গিয়া শালতি লাগাইল। আমরা লাফাইয়া তীরে উঠিলাম এবং একটি দোকানে গিয়া আশ্রয় লইলাম। দেখিলাম, আমাদের ন্যায় আরও কয়েকজন শালতির যাত্রী নানা স্থান হইতে আসিয়া সেখানে আশ্রয় লইয়াছে। তখনো কাহারও মনে হয় নাই যে ঝড় অবিলম্বে ভীষণ সাইক্লোনের আকার ধারণ করিবে। সকলে পরামর্শ হইতে লাগিল যে, সকলে মিলিয়া খিচুড়ী রাঁধিয়া খাওয়া যাক। যাত্রীদের মধ্যে দুইজন ব্রাহ্মণ এই কার্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, দুইজনের জন্য রাঁধাও যা, দশজনের জন্য রাঁধাও তা। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে সেই দুর্যোগের দিনে খিচুড়ী খাইতে পাইব বলিয়া আনন্দিত হইতে লাগিলাম। কিন্তু দেবতা আর এক প্রকার বন্দোবস্ত করিলেন।

সাইক্লোনে অদম্য পথিকের গান। খিচুড়ীর পরামর্শ শেষ হইতে না হইতে দোকানদারের সহিত চাউল দাউলের মূল্য নির্ধারণ হইতে না হইতে, হু-হু করিয়া সাইক্লোনের বায়ু ডাকিয়া আসিল। আমাদের চক্ষের সমক্ষে কয়েকখানি চালা-ঘর পড়িয়া গেল। অবশেষে যে দোকানে আমরা বসিয়া ছিলাম, সে ঘর কাঁপিতে লাগিল। আমরা বিপদ গণনা করিয়া কোমর বাঁধিতে লাগিলাম। তখনো দেখি যাত্রীদের মধ্যে এক ব্যক্তি তুড়ি দিয়া মন-আনন্দে 'বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের' ইত্যাদি কীর্তনটি গাইতেছেন। তাঁহাকে বলা গেল, "মশাই, গান রাখুন, কোমর বাঁধুন, এ-ঘর যে পড়ে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "রেখে দেও ঘর পড়া, গাইতে বড় ভালো লাগছে;

শোনো শোনো কীর্তনটা শোনো।" আর শোনো! চড়চড় করিয়া ঘর হেলিতে লাগিল, আমরা দৌড়িয়া বাহিরে গেলাম, সে ভদ্রলোকটি চাপা পড়িলেন। যেই ঘরের বাহির হওয়া, অমনি আমাদিগকে ঝড়ে উড়াইয়া কোথায় লইয়া গেল! সৌভাগ্যক্রমে আমার স্বগ্রামবাসী সেই যুবক বন্ধুটির সহিত আমি হাতে হাত বাঁধিয়াছিলাম, আমাদের দুইজনকে অধিক দূরে লইয়া যাইতে পারিল না। একখানা দোকানঘর পড়িয়া গিয়া তাহার দুখানা চাল মাটিতে পড়িয়া দাঁড়াইয়া ছিল, আমরা দুজনে গিয়া তাহার উপরে পড়িলাম। পড়িয়া ভাঙা ঘরের খুঁটি ধরিয়া ঝড় ভোগ করিতে ও থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখি, সেই কীর্তনকারী ভদ্রলোকটি পূর্বকার দোকানঘরের চাল ফুঁড়িয়া উপরে উঠিতেছেন। আমাদিগকে অদূরে দেখিয়াই তিনি হাসিতে লাগিলেন, এবং অতি কষ্টে আমাদিগের নিকট আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বড় পিতৃপুণ্যে বেঁচে গেছি। আপনারা বোধ হয় ভাবছিলেন মারা পড়েছি। আরও কিছুদিন কর্মভোগ বাকি আছে কি না, এখন কেন যাব?" বলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই হাসি আমার আজও মনে আছে। কতবার ভাবিয়াছি, এরূপ সুখে দুঃখে প্রসন্ন চিত্ত পাওয়া বড় সৌভাগ্যের বিষয়। কতকগুলি মানুষ এরূপ আছে, যাহাদিগকে কিছুতেই বিষন্ন করিতে পারে না। ইহাদের অবস্থা স্পৃহণীয়।

কিয়ৎক্ষণ তিনজনে ঝড় ভোগ করিয়া পরামর্শ করা গেল যে, অদূরে রাণী রাসমণির কাছারি বাড়ি দেখা যাইতেছে—সে গ্রামটা তাঁহারই জমিদারী—সেই কাছারিতে গিয়া আশ্রয় লওয়া যাউক। তিনজনে হাত ধরাধরি করিয়া বাহির হইলাম। কাছারি বাড়ির নিকটস্থ হইতে না হইতে সমগ্র বাড়ি ভূমিসাৎ হইল। চারিদিকের প্রাচীর পর্যন্ত ধরাশায়ী হইয়া সমভূম হইয়া গেল।

ঝড়ের বন্ধু। তখন বাত্যার প্রকোপ দুর্দান্ত দৈত্যের বিক্রমের ন্যায় হইয়াছে। গ্রামের প্রায় একখানিও গৃহ দণ্ডায়মান নাই, সমুদয় সমভূম হইয়াছে। চারিদিকে চাহিতে চাহিতে অদূরে একখানি গৃহ তখনো দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইল। স্থির করা গেল যে, সেখানে গিয়া আশ্রয় লওয়া যাউক। গিয়া দেখি সেই গ্রামের স্ত্রীলোক বালক-বালিকাতে সে ঘর পরিপূর্ণ। ঘরখানি নূতন ছিল বলিয়া তখনো দণ্ডায়মান আছে। সেই গৃহস্বামী অতি বৃদ্ধ। তাহার যুবক পুত্র বৃদ্ধ পিতা মাতাকে তাড়াতাড়ি খাওয়াইয়া, ঘরের ভিতরে পুরিয়া, বীরের ন্যায় কোমর বাঁধিয়াছে, এবং সেই ঝড়ে ছুটাছুটি করিয়া চারিদিকের স্ত্রীলোক বালক-বালিকা সংগ্রহ করিয়া সেই ঘরে পুরিতেছে। আমরা ঘরের নিকটে পৌঁছিয়া দেখি স্ত্রীলোকে ঘর পরিপূর্ণ। আমাদের সঙ্গের ভদ্রলোকটি ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন, আমাদের দুই বন্ধুর কিরূপ সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। আমরা দ্বার হইতে ফিরিয়া পার্শ্বের দাবাতে গিয়া দাঁড়াইলাম। তৎক্ষণাৎ সে দাবার চালটি আমাদের মাথার উপরে পড়িয়া গেল। তখন আমরা ভাবিলাম যে, এরূপে ঘর চাপা পড়িয়া মরা অপেক্ষা বাহিরের উঠানে বসিয়া ঝড় খাওয়া ভালো। এই ভাবিয়া বাহিরে যাইতেছি, এমন সময় গৃহের ভিতর হইতে এক বৃদ্ধা রমণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "বাবা, তোমরা কোথায় যাও? এত লোকের যদি জায়গা হয়ে থাকে, তোমাদের দুজনেরও হবে।" তখন আমরা বাধ্য হইয়া গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোক বালক-বালিকার ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিয়া মনে হইতে লাগিল, সেখানে না ঢুকিলেই ভালো ছিল। ক্রমে বেলা অবসান

হইল। অপরাহ্ণ চারিটার পর ঝড়ের বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল। গ্রামস্থ যাহারা সেই গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা 'বাবা রে, মা রে' করিতে করিতে স্বীয়-স্বীয় ভবনের উদ্দেশে যাত্রা করিল। আমাদের শালতির চালক দুইজন আমাদের বিছানা ও কিছু-কিছু জিনিসপত্র মাথায় করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, শালতি খাল হইতে লইয়া এক পুকুরের ধারে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, দড়ি ছিঁড়িয়া পুকুরের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। তখন আর উদ্ধার করিবার সময় নাই, সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। তাহাদিগকে সেই ভাঙা দাবাতে কোনো প্রকারে রাত্রি যাপন করিতে বলিয়া আমরা সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ভাঙা ঘরে রাত্রি যাপন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তাহারা পোদ নামক হীনজাতীয় লোকের ব্রাহ্মণ।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। সেই গৃহের বৃদ্ধ-বৃদ্ধার বীর প্রকৃতিসম্পন্ন যুবক পুত্র সমস্ত দিনের অনাহার ও গুরুতর শ্রমের পর ক্লান্ত হইয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িল। পিতা মাতা ব্যাকুল হইয়া অনুরোধ করিতে লাগিল, "ওরে, তুই মুখ হাত ধুয়ে, ওই চৌকির নিচে তোর ভাত আছে, খা।" তখন আমরা সেই ঘরে নয়জন, আমরা বিদেশীয় পাঁচজন, ও বুড়ো বুড়ি যুবক পুত্র ও গর্ভিণী পুত্রবধূ এই চারিজন। পিতা-মাতার অনুরোধ ও ব্যগ্রতা দেখিয়া যুবকটি বলিল, "বাবুরা সমস্ত দিন অনাহারে আছেন, ওঁরা ঘরে বসে থাকবেন আর আমি খাব, তা কি হয়?" কোনো রূপেই সে খাইবে না। ইহাতে আমরা বাহিরের লোক চটিয়া উঠিলাম, বলিলাম, "সে কি কথা! এই বিপদে কি কেউ আতিথ্য করতে পারে? তুমি সমস্ত দিন ছুটাছুটি করেছ, তুমি ঐ ভাত খাও, কিছুই অন্যায় হবে না।" সে তাহা শুনিল না, বসিয়া রহিল। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, তোমাদের ঘরে আমাদের খাবার মতো কিছু আছে কি না?" যুবক বলিল, "চাউল আছে, তা ভিজে গিয়েছে।" উত্তর, "আচ্ছা, ভিজা চাউল আমাদিগকে দাও।" সেই ভিজা চাউল লইয়া আমি সকলকে দিলাম, বলিলাম, "ভালো লাগুক না লাগুক আপনারা খান, তা না হলে ও-ব্যক্তি খাবে না।" আমরা ভিজা চাউল খাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। হঠাৎ মনে হইল, শালতিতে এক হাঁড়ি মাষকলাই বাড়ির জন্য লইয়া যাইতেছিলাম, সমস্ত দিন ভিজিয়া তাহাতে কল বাহির হইয়াছে। আমি সেই ভিজা কলাই আনিয়া সকলকে চাউলের সঙ্গে খাইতে দিলাম। আমাদের আহারটা বড় মন্দ হইল না। তৎপরে শয়নের ব্যাপার। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে যতগুলি লেপ-কাঁথা-মাদুর ছিল, সমুদয় সমাগত কম্পান্বিত বালক-বালিকাদিগকে চাপা দিবার জন্য দিয়াছিল, তাহাতে সে সমুদয় ভিজিয়া গিয়াছে, কেবল দুইটি সেঁতলা মাদুর তখনো শুকনো আছে। গৃহস্বামীর পুত্র প্রস্তাব করিল যে, তাহার একটিতে তাহারা সপরিবারে শয়ন করিবে, আর একটিতে আমরা পাঁচজন শয়ন করিব। আমার সঙ্গের লোকেরা তাহাতে সম্মত হইয়া আদরের সহিত মাদুরটি লইলেন, তাহা লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া হইল। আমি বলিতে লাগিলাম, "ছি ছি! ও মাদুর নেবেন না, ওরা মাদুরে শুক।" এই প্রস্তাবে সঙ্গের পথিকেরা হাসিতে লাগিলেন, "আমরা পাঁচজনে এক মাদুরে শুই, ওরা চারজনে আর এক মাদুরে শুক। এ বিপদে আর ভদ্রতা করবার সময় নাই।" এই কথাতে আমি রাগ করিয়া মাদুরের বাহিরে কাদাতে শুইয়া অগাধ নিদ্রা দিলাম।

পরদিন প্রাতে যখন চক্ষু খুলিলাম, তখন দেখি বেশ রোদ উঠিয়াছে। আমার অগ্রেই আর সকলে জাগিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেছিলেন। আমি বাহিরে গিয়া দেখি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার যুবক পুত্রটি আমাদের শালতির চালকদ্বয়ের সঙ্গে পুকুরে

ডুবিয়া ডুবিয়া শালতিখানি তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। দেখিয়া, তাহাকে ও প্রকার জলে ডুবিতে বারণ করিলাম, কিন্তু সে সে-কথার প্রতি কর্ণপাত করিল না। ক্রমে তিনজনে শালতিখানি তুলিল। চালকদ্বয় তাহার জল ছেঁচিয়া পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল, ব্রাহ্মণ যুবক কুলীর ন্যায় মাথায় করিয়া আমাদের জিনিসপত্র বহন করিতে প্রবৃত্ত হইল। আমি চাহিয়া দেখি যে, সেই সময়ে পথে পতিত একটা ভগ্ন বোতলের চাকের উপরে পা দেওয়ায় তাহার পায়ে অনেকগুলি বোতলা কামড়াইয়াছে, তাহার পা ফুলিয়া উঠিতেছে, তবু সে সেই কাজ করিতেছে। তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞতার উদয় হইল, তাহা আর ভাষায় বর্ণন করিবার নহে।

আমি ব্রাহ্মণ তনয়কে পরে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলাম, এবং পরে যখনই শালতি করিয়া বাড়ি যাইতাম, সেই গ্রামে উঠিয়া তাহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া কিছু-কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া যাইতাম। সে গ্রামটা যেন আমার তীর্থস্থানের ন্যায় হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে একবার গিয়া আর তাহাদের উদ্দেশ পাইলাম না।

চটিপায়ে উড্রো সাহেবের ঘরে। সাল ও তারিখ মনে নাই, ভবানীপুরে চৌধুরী মহাশয়দিগের আশ্রয়ে বাসের কালে, একবার আমার পিতাঠাকুর মহাশয় একখানি সরকারি কাগজ আমার নিকট পাঠাইয়া আদেশ করিলেন, তাহা আমাকে স্বয়ং গিয়া স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেবের হাতে দিতে হইবে। তদনুসারে একদিন কলেজে যাইবার পথে আমি উড্রো সাহেবের আপিসে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার আপিস গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সাহেব তখন পাশের ঘরে আহারে বসিয়াছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরেই উপস্থিত হইলেন। আমি অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্তে কাগজখানি দিলাম। তিনি কাগজখানি লইতে চাহিলেন না; বলিলেন, "তুমি আপিস ঘরের বাহিরে জুতা খুলিয়া এস নাই কেন?"

আমি। এ-ঘরে প্রবেশ করিবার সময় জুতা খুলিতে হয় এ-নিয়ম যে আছে তা তো জানিতাম না, তাহা হইলে এ-ঘরে প্রবেশ করিতাম না।

ব্যাপারখানা এই। তখন আমার এমনি দারিদ্র্য ও দুরবস্থা যে, আমাকে চটিজুতাই সর্বদা পরিতে হইত, বুটজুতা পরা ভাগ্যে ঘটিত না। সুতরাং সেদিন চটিজুতা পায়ে দিয়াই কলেজে যাইবার পথে সাহেবের আপিসে গিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়াই সাহেব চটিয়াছিলেন।

সাহেব। তুমি জুতা পরিয়া এ-ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে অপমান করিয়াছ। তুমি জুতা খুলিয়া এস।

আমি। না সাহেব, আমি জুতা খুলিব না। আমি কিরূপে আপনার অপমান করিলাম, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার পায়ে জুতা রহিয়াছে, আপনার কেরানীবাবুর পায়ে জুতা দেখিতেছি। আপনারা যদি খোলেন তবে আমি খুলিতে পারি।

সাহেব। ও যে বুটজুতা।

আমি। বুটজুতা পায়ে দিয়ে এলে আপনার মান থাকিত, আর চটিজুতা পায়ে দিয়া আসাতে আপনার মান গেল, এ নূতন কথা, ইহা আমি কিরূপে বুঝিব?

সাহেব। হাঁ, আমার আপিসের এ-নিয়ম আছে, তাহা তুমি কি জানো না?

আমি। না সাহেব, আমার জন্মে এমন নিয়ম শুনি নাই।

সাহেব। তুমি জুতা খুলিবে কি না, বল।

আমি। না সাহেব, খুলব না।

সাহেব। তবে তোমার চিঠি নেব না।

আমি। এই কাগজ আপনার ডেস্কের উপর রইল। ও আপনাদেরই কাগজ, নেন নেবেন, না নেন না নেবেন। আমার কাজ আমি করে গেলাম।

এই বলিয়া ডেস্কের উপর কাগজ রাখিয়া আমি যাইতে উদ্যত। সাহেব বলিলেন, "শোনো শোনো, দাঁড়াও।" আমি দাঁড়াইলাম।

সাহেব। রাজা রাধাকান্ত দেব অত্যন্ত পীড়িত, তুমি কি শুনেছ?

আমি। হাঁ সাহেব, শুনেছি।

সাহেব। আমার গাড়ি জোতা হচ্ছে, আমি এখনই তাঁকে দেখতে যাব। তুমি আমার সংগে যাবে?

আমি। না সাহেব, আমাকে কলেজে যেতে হবে, বেলা হয়ে যাচ্ছে।

সাহেব। আচ্ছা, যদি তুমি আমার সংগে যাও, তাঁর ঘরে প্রবেশ করবার সময় জুতা খুলবে কি না?

আমি সেখানে জুতা খুলিবার কারণ বলিতে যাইতেছি, সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, "'হাঁ' কি 'না' বল, আমি আর কিছু শুনতে চাই না।"

আমি। হাঁ সাহেব, সেখানে খুলব।

সাহেব। তবে আমার এখানে খুলবে না কেন?

আমি। আপনি কারণ শুনবেন না, তবে আমি কি করব?

কারণটা শুনিলে বলিতাম যে, বাঙালী ভদ্রলোকের বৈঠকখানাতে জাজিম পাতা থাকে, সকলেই জুতা খুলিয়া প্রবেশ করে, সুতরাং আমাকেও সেই ভাবে প্রবেশ করিতে হইত। কিন্তু সাহেব যখন আমার কথাতে কান দিলেন না, তখন বাধ্য হইয়া মৌনাবলম্বন করিলাম, এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ঘরের বাহির হইলাম। সাহেব আবার ডাকিলেন, "ছোকরা, শোনো শোনো।" আমি আবার ঘরে প্রবেশ করিলাম।

সাহেব। তুমি একটা কথা শুনেছ, 'নিজের মান যদি চাও অপরের মান আগে রাখ?'

আমি। সাহেব, ও খুব ভালো কথা; আমি অনেক দিন শুনেছি।

এই বলিয়া আবার তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ত্বরিত পদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া কলেজের দিকে ছুটিলাম।

বড়মামা বৈকালে আমাকে ডাকাইয়া সমুদয় কথা শুনিলেন। বলিলেন, "উড্রো সাহেব যে তোমাকে জুতা খোলাইতে পারেন নাই ইহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার ভাগিনার মতো কাজ করিয়াছ।" তৎপরে তিনি সোমপ্রকাশের জন্য ইহার একটি বিবরণ লিখিয়া দিতে বলিলেন। আমি "উড্রো সাহেব ও চটিজুতা" হেডিং দিয়া ইহার একটি বিবরণ লিখিয়া দিলাম। পরবর্তী সোমবারে "ফলনা সাহেব ও চটিজুতা" হেডিং দিয়া বড়মামা সেটি বাহির করিলেন, এবং বেচারি উড্রো সাহেবের উদ্দেশে অনেক উত্তম মধ্যম তিরস্কারের ব্যবস্থা করিলেন। পরে শুনিতে পাইলাম, উড্রো সাহেব তাহা পাঠ করিয়া আমার প্রতি হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন এবং আপিসের বাবুদিগকে বলিলেন, "এই ছেলে কলেজ থেকে বাহির হইয়া যদি কর্মপ্রার্থী হয়, আমাকে জানাইও।" আমি উড্রো সাহেবের ন্যায় সদাশয় পুরুষের বিষ নয়নে পড়িয়া গেলাম ভাবিয়া বড় দুঃখ হইল। তিনি অতি সদাশয় মানুষ

ছিলেন বলিয়া এ ঘটনা তাঁহার মনে রহিল না, কারণ, পরবর্তী চাকরীর সময়ে আমি যখন ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুল হইতে হেয়ার স্কুলে আসি, তখন তিনিই উদ্যোগী হইয়া আমাকে আনিয়াছিলেন। তখন তাঁহার কর্মচারীরা তাঁহার আদেশ মতো পূর্বের কথা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করেন নাই, করিলে কি দাঁড়াইত জানি না। উড্রো সাহেব যেরূপ সদাশয় পুরুষ ছিলেন, এবং আমার ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলের কাজে যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে সবিশেষ বিবরণ জানিলেও কিছু করিতেন না, এইরূপ মনে হয়। আমার মাতুলমহাশয় সোমপ্রকাশে আন্দোলন করিয়াছিলেন বলিয়াই কথাটা আমার মনে রহিয়াছে।

কাব্য চর্চা ও কবিতা যুদ্ধ। মধ্যে মধ্যে আমি সোমপ্রকাশে ও এডুকেশন গেজেটে কবিতা লিখিতাম। লোকে পড়িয়া প্রশংসা করিত। তাহাতে কবিতা লিখিতে উৎসাহিত হইতাম। কবিতা লেখা সূত্রে প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের সহিত আমার একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়। তিনি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রফেসারী করিতেন, এবং এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ও সুরাপান-নিবারিণী সভার সভাপতি ছিলেন। আমি তাঁহার কাগজে প্রথমে কয়েকটি ছোট-ছোট কবিতা মুদ্রিত করি। তাহাতে তিনি প্রীত হন, এবং আমাকে লিখিতে উৎসাহিত করেন।

ইহার পরে এক ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমার কবিত্ব শক্তিকে আর একদিকে লইয়া গেল। আমাদের ভবানীপুরে একজন বিলাত ফেরত ডাক্তার আসিয়া বসিলেন, তাঁহার হাব-ভাব চাল-চলন সবই ইংরাজী ধরনের। তিনি নিজের দ্বারে এক সাইন-বোর্ড দিলেন, তাহাতে 'ডট্' বলিয়া নিজের উপাধি লিখিলেন। এই লইয়া আমাদের যুবক দলে হাসাহাসি পড়িয়া গেল। অমনি আমি বাঙালীর সাহেবিয়ানার উপর বিদ্রূপ বর্ষণের জন্য বিলাত-ফেরত বাঙালী সাজিয়া 'এস্ এন্ ডট্' নাম লইয়া এডুকেশন গেজেটে কবিতা লিখিতে লাগিলাম, বাঙালীর প্রিয় যাহা তাহার উপরে বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে লাগিলাম, এবং ইংরাজী যাহা কিছু তাহার উপর আদর দেখাইতে লাগিলাম। স্বদেশী ভাবাপন্ন হইয়া আর একজন কবিতাতে তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই কবিতা যুদ্ধ চলিতে লাগিল, চারিদিকে একটা চর্চা উঠিয়া গেল। আমার কবিতাতে কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিল না যে, আমিও স্বদেশী ভাবাপন্ন, কেবল সাহেবী ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে বিদ্রূপ করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছি। ঐ সকল কবিতার দুই-এক ছত্র মনে আছে। তাহা দেখিলে সকলে হাসিবেন। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কবি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রশংসা করাতে আমি বঙ্গভূমির প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম—

বিদ্যার সাগর তব মূর্খের প্রধান,
টিকিদার ভট্টাচার্য, নাহি কোনো জ্ঞান।

ইংরাজ মেয়েদের প্রশংসা করিয়া লিখিলাম—

ধবলাঙ্গী তাম্রকেশী বিড়াল-লোচনা,
বিবাহ করিব সুখে ইংরাজ-ললনা।

এই সূত্রে প্যারীবাবুর নিকট আমার একটা পসার দাঁড়াইল। তাহার একটি ফল মনে আছে। ইহা বোধ হয় ইহার কিছুদিন পরে ঘটিয়া থাকিবে। একবার আমার

আমি। না সাহেব, খুলব না।

সাহেব। তবে তোমার চিঠি নেব না।

আমি। এই কাগজ আপনার ডেস্কের উপর রইল। ও আপনাদেরই কাগজ, নেন নেবেন, না নেন না নেবেন। আমার কাজ আমি করে গেলাম।

এই বলিয়া ডেস্কের উপর কাগজ রাখিয়া আমি যাইতে উদ্যত। সাহেব বলিলেন, "শোনো শোনো, দাঁড়াও।" আমি দাঁড়াইলাম।

সাহেব। রাজা রাধাকান্ত দেব অত্যন্ত পীড়িত, তুমি কি শুনেছ?

আমি। হাঁ সাহেব, শুনেছি।

সাহেব। আমার গাড়ি জোতা হচ্ছে, আমি এখনই তাঁকে দেখতে যাব। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

আমি। না সাহেব, আমাকে কলেজে যেতে হবে, বেলা হয়ে যাচ্ছে।

সাহেব। আচ্ছা, যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও, তাঁর ঘরে প্রবেশ করবার সময় জুতা খুলবে কি না?

আমি সেখানে জুতা খুলিবার কারণ বলিতে যাইতেছি, সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, " 'হাঁ' কি 'না' বল, আমি আর কিছু শুনতে চাই না।"

আমি। হাঁ সাহেব, সেখানে খুলব।

সাহেব। তবে আমার এখানে খুলবে না কেন?

আমি। আপনি কারণ শুনবেন না, তবে আমি কি করব?

কারণটা শুনিলে বলিতাম যে, বাঙালী ভদ্রলোকের বৈঠকখানাতে জাজিম পাতা থাকে, সকলেই জুতা খুলিয়া প্রবেশ করে, সুতরাং আমাকেও সেই ভাবে প্রবেশ করিতে হইত। কিন্তু সাহেব যখন আমার কথাতে কান দিলেন না, তখন বাধ্য হইয়া মৌনাবলম্বন করিলাম, এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ঘরের বাহির হইলাম। সাহেব আবার ডাকিলেন, "ছোকরা, শোনো শোনো।" আমি আবার ঘরে প্রবেশ করিলাম।

সাহেব। তুমি একটা কথা শুনেছ, 'নিজের মান যদি চাও অপরের মান আগে রাখ?'

আমি। সাহেব, ও খুব ভালো কথা; আমি অনেক দিন শুনেছি।

এই বলিয়া আবার তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ত্বরিত পদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া কলেজের দিকে ছুটিলাম।

বড়মামা বৈকালে আমাকে ডাকাইয়া সমুদয় কথা শুনিলেন। বলিলেন, "উড্রো সাহেব যে তোমাকে জুতা খোলাইতে পারেন নাই ইহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার ভাগিনার মতো কাজ করিয়াছ।" তৎপরে তিনি সোমপ্রকাশের জন্য ইহার একটি বিবরণ লিখিয়া দিতে বলিলেন। আমি "উড্রো সাহেব ও চটিজুতা" হেডিং দিয়া ইহার একটি বিবরণ লিখিয়া দিলাম। পরবর্তী সোমবারে "ফলনা সাহেব ও চটিজুতা" হেডিং দিয়া বড়মামা সেটি বাহির করিলেন, এবং বেচারি উড্রো সাহেবের উদ্দেশে অনেক উত্তম মধ্যম তিরস্কারের ব্যবস্থা করিলেন। পরে শুনিতে পাইলাম, উড্রো সাহেব তাহা পাঠ করিয়া আমার প্রতি হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন এবং আপিসের বাবুদিগকে বলিলেন, "এই ছেলে কলেজ থেকে বাহির হইয়া যদি কর্মপ্রার্থী হয়, আমাকে জানাইও।" আমি উড্রো সাহেবের ন্যায় সদাশয় পুরুষের বিষ নয়নে পড়িয়া গেলাম ভাবিয়া বড় দুঃখ হইল। তিনি অতি সদাশয় মানুষ

ছিলেন বলিয়া এ ঘটনা তাঁহার মনে রহিল না, কারণ, পরবর্তী চাকরীর সময়ে আমি যখন ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুল হইতে হেয়ার স্কুলে আসি, তখন তিনিই উদ্যোগী হইয়া আমাকে আনিয়াছিলেন। তখন তাঁহার কর্মচারীরা তাঁহার আদেশ মতো পূর্বের কথা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করেন নাই, করিলে কি দাঁড়াইত জানি না। উড্রো সাহেব যেরূপ সদাশয় পুরুষ ছিলেন, এবং আমার ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলের কাজে যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে সবিশেষ বিবরণ জানিলেও কিছু করিতেন না, এইরূপ মনে হয়। আমার মাতুলমহাশয় সোমপ্রকাশে আন্দোলন করিয়াছিলেন বলিয়াই কথাটা আমার মনে রহিয়াছে।

কাব্য চর্চা ও কবিতা যুদ্ধ। মধ্যে মধ্যে আমি সোমপ্রকাশে ও এডুকেশন গেজেটে কবিতা লিখিতাম। লোকে পড়িয়া প্রশংসা করিত। তাহাতে কবিতা লিখিতে উৎসাহিত হইতাম। কবিতা লেখা সূত্রে প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের সহিত আমার একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়। তিনি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রফেসারী করিতেন, এবং এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ও সুরাপান-নিবারিণী সভার সভাপতি ছিলেন। আমি তাঁহার কাগজে প্রথমে কয়েকটি ছোট-ছোট কবিতা মুদ্রিত করি। তাহাতে তিনি প্রীত হন, এবং আমাকে লিখিতে উৎসাহিত করেন।

ইহার পরে এক ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমার কবিত্ব শক্তিকে আর একদিকে লইয়া গেল। আমাদের ভবানীপুরে একজন বিলাত ফেরত ডাক্তার আসিয়া বসিলেন, তাঁহার হাব-ভাব চাল-চলন সবই ইংরাজী ধরনের। তিনি নিজের দ্বারে এক সাইন-বোর্ড দিলেন, তাহাতে 'ডট্' বলিয়া নিজের উপাধি লিখিলেন। এই লইয়া আমাদের যুবক দলে হাসাহাসি পড়িয়া গেল। অমনি আমি বাঙালীর সাহেবিয়ানার উপর বিদ্রূপ বর্ষণের জন্য বিলাত-ফেরত বাঙালী সাজিয়া 'এস্ এন্ ডট্' নাম লইয়া এডুকেশন গেজেটে কবিতা লিখিতে লাগিলাম, বাঙালীর প্রিয় যাহা তাহার উপরে বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে লাগিলাম, এবং ইংরাজী যাহা কিছু তাহার উপর আদর দেখাইতে লাগিলাম। স্বদেশী ভাবাপন্ন হইয়া আর একজন কবিতাতে তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই কবিতা যুদ্ধ চলিতে লাগিল, চারিদিকে একটা চর্চা উঠিয়া গেল। আমার কবিতাতে কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিল না যে, আমিও স্বদেশী ভাবাপন্ন, কেবল সাহেবী ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে বিদ্রূপ করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছি। ঐ সকল কবিতার দুই-এক ছত্র মনে আছে। তাহা দেখিলে সকলে হাসিবেন। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কবি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রশংসা করাতে আমি বঙ্গভূমির প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম—

বিদ্যার সাগর তব মূর্খের প্রধান,
টিকিদার ভট্টাচার্য, নাহি কোনো জ্ঞান।

ইংরাজ মেয়েদের প্রশংসা করিয়া লিখিলাম—

ধবলাঙ্গী তাম্রকেশী বিড়াল-লোচনা,
বিবাহ করিব সুখে ইংরাজ-ললনা।

এই সূত্রে প্যারীবাবুর নিকট আমার একটা পসার দাঁড়াইল। তাহার একটি ফল মনে আছে। ইহা বোধ হয় ইহার কিছুদিন পরে ঘটিয়া থাকিবে। একবার আমার

বন্ধু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চট্টগ্রামবাসী প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্যতম ছাত্র নবীনচন্দ্র সেনের লিখিত একটি কবিতা আনিয়া আমাকে দেখাইলেন। কবিতাটি পড়িয়া আমার বড় ভালো লাগিল। আমি উমেশের সঙ্গে নবীনবাবুর বাসাতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলাম, এবং সেই কবিতাটি এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহিত করিলাম। আমার অনুরোধে তিনি কবিতাটি আমার হাতে দিলেন। আমি কাটিয়া কুটিয়া তাহাতে নিজে কিছু যোগ করিয়া প্যারীবাবুর হাতে দিয়া আসিলাম। তিনি তাহা এডুকেশন গেজেটে ছাপিলেন এবং নবীনকে ডাকিয়া উৎসাহিত করিলেন। পরে নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের কবিতা গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে পড়িয়া দেখিয়াছি, তাহাতে সেই কবিতাটি আছে, এবং যত দূর মনে হয়, আমার প্রক্ষিপ্ত দুই-চারি পংক্তি এখনো রহিয়াছে। আমার এখন স্মরণ করিয়া হাসি পায়, আমি সেই অল্প বয়সে কাব্য জগতে কিরূপ মুরুব্বি হইয়া উঠিয়াছিলাম।

শিকারীসঙ্গ ও সুরাপান। প্যারীবাবুর সংশ্রবে আসিয়া আমার আর এক উপকার হইল। সুরাপানের উপর আমার দারুণ বিদ্বেষ জন্মিল। তাহার একটি প্রমাণ আমার মনে আছে। আমি অগ্রেই বলিয়াছি, ভবানীপুরে যে চৌধুরী মহাশয়দিগের আশ্রয়ে আমি থাকিতাম, তাঁহারা সকলেই সাধু সদাশয় লোক ছিলেন, তাঁহাদের বিমল চরিত্রের প্রভাব আমাকে অনেক পরিমাণে গঠন করিয়াছে। তাঁহাদের একজন স্বসম্পর্কীয় লোক ছিলেন, তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাদের সঙ্গে দুই-চারিদিন যাপন করিতেন। তিনি একটি সওদাগর আপিসে একটি বড় পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন এবং দুই হস্তে ব্যয় করিতেন। বন্দুক ছোঁড়া, শিকার করা, সদলে নৌকাযোগে জলপথে বিচরণ করা, প্রভৃতি আমোদে অনেক টাকা ব্যয় করিতেন। এই সব কারণে তিনি আমার ন্যায় যুবকদের চক্ষে একটা 'হিরো'র মতো ছিলেন। কিন্তু তাঁহার একটু দোষ ছিল, তিনি সুরাপান করিতেন। একবার অপরাপর কয়েক ব্যক্তির সহিত তাঁহার সঙ্গে গঙ্গার চড়াতে কয়েকদিন বাস করিতে গিয়াছিলাম। প্রতিদিন পাখি শিকারের সময় সঙ্গে যাইতাম, কিন্তু তাঁহাকে কখনো মাতাল অবস্থাতে দেখি নাই। যাহা হউক, তিনি আমাদিগকে সর্ব্দাই সুরাপান করিবার জন্য প্ররোচনা করিতেন; বলিতেন, পরিমিত সুরাপান করিলে শরীর ভালো থাকে, মনে স্ফূর্ত্তি থাকে, কাজের শক্তি বাড়ে, ইত্যাদি। আমার যেন স্মরণ হয় যে, তাঁহার প্ররোচনায় একদিন কি দুইদিন একটু-একটু সুরাপান করিয়াছিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য জগদীশ্বরের কৃপা! তৎপরেই মনে মহা নির্বেদ উপস্থিত হইল। প্যারীচরণ সরকার মহাশয়কে, মাতুল মহাশয়কে, ও পিতাঠাকুরকে স্মরণ করিয়া মহা লজ্জিত হইলাম, এবং সুরাপান নিবারণের জন্য দুর্জয় প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হইলাম। তদবধি আমি সুরাপান নিবারণের পক্ষে রহিয়াছি।

কাব্যে ছন্দপরীক্ষা : 'নির্বাসিতের বিলাপ'। মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে থাকিতে থাকিতে ১৮৬৫ কি ১৮৬৬ সালে ভবানীপুরের একটি ভদ্রসন্তান কোনো গুরুতর অপরাধে দ্বীপান্তরে প্রেরিত হয়। সেই ঘটনাতে ভবানীপুরের লোকের চিত্তকে অতিশয় আন্দোলিত করে, আমারও চিত্তকে অতিশয় আন্দোলিত করে। সেই প্রকার মনের ভাব লইয়া কবিতা লিখিতে বসি। কবিতাটি মাতুলের সংবাদপত্র সোম-প্রকাশে 'নির্বাসিতের বিলাপ' নামে প্রকাশিত হয়।

মাতুলের হস্তে যখন 'নির্বাসিতের বিলাপে'র প্রথম কয়েক পংক্তি সোমপ্রকাশে মুদ্রিত করিবার জন্য দিয়া আসিলাম, তখন ভয়ে ভয়েই দিয়া আসিলাম। মনে হইল তিনি ডাকিয়া তিরস্কার করিবেন। মনে করিয়াছিলাম, দুই-একবার লিখিয়া সমাপ্ত করিব। কিন্তু প্রথমবার কয়েক পংক্তি বাহির হইলে, তিনি কলেজে আমাকে ডাকিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এবং আরও কবিতা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি অতিশয় উৎসাহিত হইয়া গেলাম। অমনি আরও লিখিতে বসিলাম। এইরূপে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সোমপ্রকাশে কবিতা প্রকাশিত হইতে লাগিল। কয়েকবার প্রকাশিত হইতে না হইতে চারিদিকে সমালোচনা উঠিয়া গেল। পথে ঘাটে, ভাড়াটে গাড়িতে লোকে বলিতে লাগিল, "এ 'শ্রীশিঃ' কে হে?" আমার লাঙ্গুল স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল। নিজের মনে-মনে মস্ত একটা কবি হইয়া দাঁড়াইলাম। বাস্তবিক তখন আমার কবিতার মধ্যে একটু নূতনত্ব ছিল। ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাঁধা মিত্রাক্ষর অথবা মাইকেলের খোলা অমিত্রাক্ষর ছিল না, কিন্তু দুইয়ের মধ্যস্থলে যাহা তাহাই ছিল। ভাবকে ছন্দের বশবর্তী না করিয়া ছন্দকে ভাবের বশবর্তী করা হইয়াছিল। প্রধানত এই জন্য ইহা তখন সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় বিবাহ। আমি যখন কবিতারসে নিমগ্ন আছি, তখন এক পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটিল। কোনো বিশেষ কারণে আমার পিতা আমার পত্নী প্রসন্নময়ীর ও তাঁহার বাড়ির লোকের প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, তাঁহাকে আর আনিবেন না। তাঁহাকে একেবারে বর্জন করা যখন স্থির হইল, তখন এই প্রশ্ন উঠিল যে আমি তো একমাত্র পুত্র সন্তান, বংশ রক্ষার উপায় কি হইবে? অতএব আমার পুনরায় বিবাহ দেওয়া স্থির হইল। আমার এরূপ বয়স হইয়াছিল যে বহুবিবাহকে মন্দ বলিয়া জানি। প্রসন্নময়ীর প্রতি তখন আমার যে বড় ভালোবাসা ছিল, তাহা নহে। তবে তাঁহার ও তাঁহার বাড়ির লোকের সামান্য অপরাধে তাঁহাকে গুরুতর সাজা দেওয়া হইতেছে, ইহা অনুভব করিয়াছিলাম। আমি কিরূপে এইরূপ কঠিন ব্যবহারে সহায়তা করি, ইহা ভাবিয়া মন আন্দোলিত হইতে লাগিল। কিন্তু বাল্যাবধি পিতাকে এরূপ ভয় করিতাম যে, তাঁহার ইচ্ছাতে বাধা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত ছিল। তথাপি আমি নিজে ও জননীর দ্বারা তাঁহাকে জানিতে দিয়াছিলাম যে এরূপ বিবাহে আমার মত নাই।

বাবা আমাকে বিবাহ দিতে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে লইতে ভবানীপুরে মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে আসিলেন, এবং আমাকে লইয়া গেলেন। পথে আমাকে আমার দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে বুঝাইতে চলিলেন। আমি তাঁহাকে বড় ভয় করিতাম, তাঁহার মুখের উপর কিছু বলিতে পারিতেছি না, সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছি। অবশেষে আমাদের গ্রামের দুই ক্রোশ উত্তরবর্তী বারাসত গ্রামে যাইবার সময় আমি বাবাকে বলিলাম, "বাবা, আপনি মনে করিতেছেন, আমার স্ত্রীকে বিদায় করিয়া দিয়া আমার শ্বশুরবাড়ির লোকদিগকে সাজা দিবেন, কিন্তু ফলে এ-সাজা আমাদিগকেই পেতে হবে। আমার বোধ হয় এরূপ কাজ না করাই ভালো।" যেই এই কথা বলা, অমনি বাবা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নিজের পায়ের জুতা হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন, "তুই এখান হতে ফিরে যা, আর এক পা তুলেছিস কি এই জুতা মারব।" আমি বলিলাম, "চলুন, বাড়িতে গিয়ে মা'র সামনে কথা হবে। আমার বক্তব্য যা, তা আমি বললাম, তারপর করা না-করা আপনার হাত।"

তাহার পর দুজনে বাড়িতে যাওয়া গেল। আমি গিয়া মাকে বলিলাম, "মা, একি হচ্ছে? আমার স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের উপর রাগ করে একি করা হচ্ছে?" মা বলিলেন, "জানিস তো, আমার কাঁধের উপর একটা বৈ মাথা নেই, আমি বাধা দিয়ে রাখতে পারব না, যা জানে করুক।" বাবা আমাদের আপত্তির প্রতি দৃকপাতও করিলেন না। আমাকে ধরিয়া বিবাহ দিতে লইয়া গেলেন। এই দ্বিতীয় বিবাহ বর্ধমান জেলার দেপুর নামক গ্রামের অভয়াচরণ চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিরাজ-মোহিনীর সহিত হইল। বিবাহটা ১৮৬৫ কি ১৮৬৬ কোন সালে হইয়াছিল, ঠিক মনে নাই।

দ্বিতীয় বিবাহের পরিণাম। এই বিবাহের পরেই আমার মনে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইল। একটি নিরপরাধা স্ত্রীলোককে অন্যায়রূপে গুরুতর সাজা দেওয়া হইল, এবং আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই অন্যায় কার্যের প্রধান পুরুষ হইলাম, ইহা ভাবিয়া লজ্জা ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। পিতার আদেশে বিবাহ করিতে যাইবার পূর্বে আমি এই ভাবিয়া মনকে প্রস্তুত করিয়াছিলাম যে, রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ চতুর্দশ বর্ষ বনবাস করিয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন, আমি না হয় পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া চিরকাল কষ্ট পাইব। কিন্তু এই অনুতাপের মুহূর্তে সে চিন্তা আর আমাকে বল দিতে পারিল না। আমি মনে করিতে লাগিলাম, মানুষ আপনার কাজের জন্য আপনিই দায়ী, হাজার গুরুর আদেশ হইলেও পাপের অংশ কেহ লয় না। আত্মনিন্দাতে আমার মন অধীর হইয়া উঠিল। সে তীব্র আত্মনিন্দার কথা মনে হইলেও এখন শরীর কম্পিত হয়। আমি আমুদে উপহাস-রসিক বন্ধুতাপ্রিয় মানুষ ছিলাম, আমার হাস্য পরিহাস কোথায় উবিয়া গেল। আমি ঘন বিষাদে নিমগ্ন হইলাম। পা ফেলিবার সময় মনে হইত যেন কোনো নিচের গর্তে পা ফেলিতে যাইতেছি। রাত্রি আসিলে মনে হইত আর প্রভাত না হইলে ভালো হয়।

এই অবস্থাতে আমি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। আমি ঈশ্বরে অবিশ্বাস কখনো করি নাই। আমার স্মরণ আছে, এই সময়ে আমার পিতা আমার নিকট অনেক সময় সংস্কৃত নাস্তিক দর্শনের রীতি অবলম্বনে নাস্তিকতা প্রচার করিতেন। বলিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় আস্তিক নহেন, ইত্যাদি। ইহা লইয়া পিতা-মাতাতে কখনো কখনো ঝগড়া হইয়াছে দেখিয়াছি। বাবার সঙ্গে এরূপ বিচারে প্রবৃত্ত আছি দেখিলে, মা বাবার প্রতি রাগ করিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতেন। বলিতেন, "রাখ, রাখ, তোমার নাস্তিক দর্শন রাখ, ছেলের মাথা খেও না।" কিন্তু নাস্তিকতা আমার মনে ভালো লাগিত না, মনে বসিত না। আমি বালককাল হইতে পাড়ার সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা বিষয়ে আলোচনা করিতে ভালোবাসিতাম। কিন্তু ইতিপূর্বে আমি ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে কখনো গুরুতর রূপে চিন্তা করি নাই। ঈশ্বর চরণে প্রার্থনার অভ্যাস ছিল না। এই মানসিক গ্লানির অবস্থাতে তাহা করিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমার মানসিক অবসাদের কথা লইয়া আমাকে একখানি থিওডোর পার্কারের 'টেন্ সারমনস্ এ্যান্ড প্রেয়ার্স' পাঠাইয়া দিলেন। পার্কারের প্রার্থনাগুলি যেন আমার চিত্তে নবজীবন আনিল। আমি প্রতিদিন রাত্রে শয়নের পূর্বে একখানি খাতাতে একটি প্রার্থনা লিখিয়া পাঠ করিয়া শয়ন করিতে লাগিলাম। কেবল তাহাই নহে, দিনের মধ্যে প্রত্যেক দশ পনরো মিনিট অন্তর

ঈশ্বর স্মরণ করিতাম ও প্রার্থনা করিতাম। দুঃখের বিষয় আমার সে প্রার্থনার খাতাখানি হারাইয়া গিয়াছে। নতুবা ধর্মজীবনের শৈশবের সেই আধ-আধ ভাষা আজ দেখিতাম।

ধর্মজীবনের সূত্রপাত। ব্রাহ্মসমাজে উৎসাহ। প্রার্থনা করিতে করিতে হৃদয়ে দুইটি পরিবর্তন দেখিতে পাইলাম। প্রথম, দুর্বলতার মধ্যে বল আসিল, আমি মনে সংকল্প করিলাম, "কর্তব্য বুঝিব যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা, যায় যাক থাকে থাক ধন প্রাণ মান রে।" আমি ধর্মের আদেশ ও হৃদয়বাসী ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে চলিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। দ্বিতীয়, ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের উপাসনাতে যাইব স্থির করিলাম, ও যাইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু পাছে আমাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করেন, পাছে লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, এই ভয়ে উপাসনা আরম্ভ হইলে যাইতাম ও উপাসনা ভাঙিবার অগ্রেই চলিয়া আসিতাম।

এই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আমার একটু একটু করিয়া যোগ হইতে লাগিল। আমার সমাধ্যায়ী বন্ধু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (যিনি পরে বিলাতে গিয়া ডাক্তার হইয়া আসিয়াছিলেন) তখন ব্রাহ্মদের নিকট সর্বদা যাইতেন, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কথা আমাকে আসিয়া বলিতেন এবং ব্রাহ্মদের প্রকাশিত পত্রিকাদি আনিয়া আমাকে পড়িতে দিতেন। কিন্তু আমাকে ব্রাহ্মদের কাছে লইতে চাহিলে লজ্জাতে যাইতে চাহিতাম না। একদিনের কথা স্মরণ হয়। উমেশ আমাকে ও যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (যিনি পরে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন) ভজাইয়া কেশববাবুর কলুটোলার বাড়িতে লইয়া গিয়া দেখা করাইয়া দিতে চাহিলেন। আমি কেশববাবুর বাড়ির দ্বার পর্যন্ত গেলাম, কিন্তু বাড়ির মধ্যে পা বাড়াইতে পারিলাম না; উমেশের হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া গেলাম। আর একবার উমেশ ও আমি চিৎপুর রোড দিয়া আসিতেছি, এমন সময় বৃষ্টি আসিল। তখন কেশববাবু চিৎপুর রোডে 'কলিকাতা কলেজ' নামে একটি কলেজ খুলিয়াছিলেন। আমরা বৃষ্টির ভয়ে ঐ কলেজের বারাণ্ডার নিচে গিয়া দাঁড়াইলাম। উমেশ আমাকে ভিতরে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, আমি লজ্জাতে ভিতরে যাইতে পারিলাম না। এমন সময় একটি পশ্চিমে বেহারা উপর হইতে নামিয়া আসিল। আমরা কেশব-বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিতে লাগিল, "কেশববাবু মানুষ নয়, দেবতা। তাঁর কাছে চল, দুটি কথা শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যাবে।" তাহার প্রভুভক্তি দেখিয়া তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমরা কেশববাবুর কল্পিত নিন্দা আরম্ভ করিলাম। তাহাতে সে অতিশয় বিরক্ত হইল, এবং অবশেষে আকাশের দিকে দুই হাত তুলিয়া কেশববাবুর দীর্ঘ জীবনের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। আমি দেখিয়া স্তব্ধ ও মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বলিলাম, "উমেশ, এ সামান্য মানুষ নয়, যাঁর চাকর এত দূর আকৃষ্ট হতে পারে।" তখন উমেশ আবার আমাকে কেশববাবুর নিকট যাইবার জন্য চাপিয়া ধরিল, কিন্তু আমি লজ্জাবশত যাইতে পারিলাম না।

ইহার পরে, উমেশ যোগেন্দ্র ও অপরাপর ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে আমি আমাদের পূর্বতন সহাধ্যায়ী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত এই বন্ধুদ্বয়ের বাসাতে মধ্যে মধ্যে যাইতে লাগিলাম। ইঁহারা এক সময় আমাদের সঙ্গে এক শ্রেণীতে পড়িতেন, কিন্তু তখন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক হইয়াছিলেন। একদিন রাত্রে বিজয় ও অঘোর আমাকে আর ভবানীপুরে যাইতে দিলেন না, নিজেদের বাসাতে রাখিলেন। আমার

স্মরণ আছে যে, সে রাত্রে তাঁহাদের বাসাতে অন্যজাতীয়া স্ত্রীলোকের রাঁধা ভাত মাটির সানকেতে খাইয়া সমস্ত রাত্রি এত গা ঘিনঘিন করিয়াছিল যে ভালো করিয়া ঘুমাইতে পারি নাই।

পিতার বিরাগ। প্রার্থনা আমাকে বল আনিয়া দিল যে বলিয়াছি, তাহার অর্থ এই যে, মানুষের ভয় আমার মন হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল, এবং নিজ বিশ্বাস অনুসারে চলিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইতে লাগিল। পিতা কলিকাতায় আসিয়া শুনিলেন যে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে যাইতেছি। একদিন আমাকে ডাকিয়া সমাজে যাইতে নিষেধ করিলেন। আমি ধীর ভাবে বলিলাম, "বাবা, আপনি জানেন আপনার আজ্ঞা কখনো লঙ্ঘন করি নাই। আপনার সকল আজ্ঞা পালন করিতে রাজি আছি। কিন্তু আমার ধর্মজীবনে হাত দিবেন না। আমি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে যাওয়া ত্যাগ করিতে পারিব না।" পরের বাসাতে পিতা আর কোনো কথা বলিলেন না, কিন্তু এই উত্তর তাঁহার এমনি নূতন ও ভয়ানক লাগিল যে, পরে শুনিয়াছি, সেদিন অনেক কাঁদিয়াছিলেন। আর দুই-তিনদিন তাঁহার কলিকাতাতে থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু তৎপর দিনই দেশে চলিয়া গেলেন।

পরে শুনিয়াছি, তিনি বাড়িতে পোঁছিলে তাঁহার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আমার মা ভীত হইয়া গেলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মুখ এত ম্লান কেন, ছেলে কেমন আছে?" বাবা গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "সে মরেছে।" অমনি আমার মা, "কি বল গো! ওগো কি বল গো!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া পাশের বাড়ির মেয়েরা ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "কৈ, শিবুর ব্যায়রামের কথা তো শুনি নাই।" তখন বাবা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সে মরার মধ্যে। সে ব্রাহ্মসমাজে যেতে আরম্ভ করেছে, আমি বারণ করলেও শুনবে না।"

প্রার্থনার বল। যাহা হউক, প্রার্থনার দ্বারা যেমন বল পাইলাম, তেমনি আশাও পাইলাম। আমার অন্তরাত্মা বলিতে লাগিল, ঈশ্বর আমাকে পাপী বলিয়া ত্যাগ করিবেন না। আমার বোধ হয়, পার্কারের সরস ও আশান্বিত ভক্তি এ-বিষয়ে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিয়া থাকিবে। যাহা হউক, ব্যাকুল প্রার্থনা বিফলে যায় না তাহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলাম। ভগবানের প্রেরণা প্রাণে পাইয়া মন আনন্দে মগ্ন হইতে লাগিল। তদবধি প্রার্থনাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তৎপরে আমি অনেক প্রলোভনে পড়িয়াছি, সময়ে সময়ে পতিত হইয়াছি, অনেক অন্ধকার দেখিয়াছি, কিন্তু প্রার্থনাতে বিশ্বাস আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। সকল সংগ্রামের মধ্যে দুর্বলতাতে বল, নিরাশাতে আশা, নিরানন্দে আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, সেই মঙ্গলময় পুরুষ তাঁহার দুর্বল সন্তানকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। যে ছেলেটা চলিতে পারে না, বার বার পড়িয়া যায়, তাহার ধরার অপেক্ষা না রাখিয়া যেমন পিতা বা মাতাকে নিজেই সে ছেলের হাত শক্ত করিয়া ধরিতে হয়, তেমনি যেন মনে হয়, সেই মঙ্গলময় পুরুষ দেখিয়াছেন যে, এ পাপী ও দুর্বল মানুষটা নিজে ধরিয়া চলিতে পারে না, যখনি তাঁহাকে ভুলিতেছে, তখনি পতিত হইতেছে, তাই তিনি বার-বার ধুলো ঝাড়িয়া চক্ষের জল মুছাইয়া তুলিয়া ধরিতেছেন।

ঠাকুরপূজা ত্যাগ। বল ও আশা পাইয়া আমি নিজ বিশ্বাস অনুসারে চলিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলাম। এইবার আমার কঠিন সংগ্রাম আসিল। ইহার পূর্বে গ্রীষ্মের ছুটিতে বা পূজার বন্ধে বাড়িতে গেলেই আমাকে ঠাকুর পূজা করিতে হইত। আমাদের কুলক্রমাগত কতকগুলি ঠাকুর ছিল। বাবা সচরাচর তাহাদের পূজা করিতেন। আমি বাড়িতে গেলে তিনি সেই কার্যভার আমার উপর দিয়া অপরাপর গৃহকার্য করিবার জন্য অবসর লইতেন। যেবারে আমার হৃদয় পরিবর্তন হইয়া আমি বাড়িতে গেলাম, সেবার প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলাম যে আর ঠাকুর পূজা করিব না। গিয়াই মাকে সে সঙ্কল্প জানাইলাম। মা ভয়ে অবশ হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন, একটা মহা সংগ্রাম আসিতেছে। আমাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক অনুরোধ করিলেন। আমি কোনো মতেই প্রস্তুত হইতে পারিলাম না। "ধর্মে প্রবঞ্চনা রাখিতে পারিব না" বলিয়া করযোড়ে মার্জনা ভিক্ষা করিলাম।

অবশেষে সেই সঙ্কল্প যখন বাবার গোচর করা হইল, তখন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমনের ন্যায় তাঁহার ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কুপিত হইয়া আমাকে প্রহার করিয়া ঠাকুরঘরের দিকে লইয়া যাইবার জন্য লাঠি হস্তে ধাবিত হইয়া আসিলেন। আমি ধীর ভাবে বলিলাম, "কেন বৃথা আমাকে প্রহার করিবেন? আমি অকাতরে আপনার প্রহার সহ্য করিব। আমার দেহ হইতে এক-একখানা হাড় খুলিয়া লইলেও আর আমাকে ওখানে লইতে পারিবেন না।" এই কথা শুনিয়া ও আমার দৃঢ়তা দেখিয়া তিনি হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেলেন, এবং প্রায় অর্ধঘণ্টা কাল কুপিত ফণীর ন্যায় ফুলিতে লাগিলেন। অবশেষে আমাকে পূজার কাজ হইতে নিষ্কৃতি দিয়া নিজে পূজা করিতে বসিলেন।

সেইদিন হইতে আমার মূর্তি পূজা রহিত হইল। আমি সত্যস্বরূপের উপাসক হইলাম। কিন্তু আমাদের পারিবারিক আন্দোলন গ্রামবাসী আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। আমাকে সকলেই নির্যাতন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তৎপরে বাবা আমাকে গ্রামস্থ ব্রাহ্মদিগের সহিত মিশিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। আমি অন্য সময়ে মিশিতাম না, কিন্তু যেদিন তাঁহারা সকলে উপাসনা করিবেন বলিয়া সংবাদ দিতেন, সেদিন বাবা গাত্রোত্থান করিবার পূর্বেই গিয়া উপাসনাতে যোগ দিতাম, আসিয়া তিরস্কার ও গঞ্জনা সহ্য করিতাম। তখন কেহ ব্রহ্মোপাসনা করিবে শুনিলে চারি পাঁচ মাইল হাঁটিয়া গিয়া যোগ দেওয়া আমার পক্ষে কিছুই কষ্টকর ছিল না।

অথচ এই সময়ে গ্রামের কতিপয় ব্রাহ্ম, ভবানীপুরের দুই-চারিজন ব্রাহ্ম, ও বিজয় অঘোর ভিন্ন আর কোনো ব্রাহ্মের সহিত আমার আত্মীয়তা ছিল না। কাহারও সঙ্গে মিশিতাম না, লজ্জাতে কাহারও সহিত আলাপ করিতে চাহিতাম না।

শাঁখারীটোলার জগৎবাবু। ১৮৬৭ সালের শেষ ভাগে আমি ভবানীপুরের চৌধুরী মহাশয়দিগের বাটী হইতে ঐ স্থানের একটি ভদ্রপরিবারের অনুরোধে তাঁহাদের সহিত কলিকাতা শাঁখারীটোলাতে এক বাড়িতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলাম। তাহার ইতিবৃত্ত এই। জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি ভদ্রলোক ভবানীপুরে বাস করিতেন। মহিম নামে তাঁহার একটি ছেলে সংস্কৃত কলেজে পড়িত ও আমাদের সঙ্গে একগাড়িতে কলেজে যাইত। সেই সূত্রে জগৎবাবুর সহিত আমার পরিচয় হয়। জগৎবাবুর সাধুতা সদাশয়তা সৌজন্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা

জন্মে, আমার প্রতিও তাঁহার পুত্রবৎ স্নেহ জন্মে। তিনি আমাকে তাঁহার বাড়িতে লইয়া গিয়া তাঁহার গৃহিণীর সহিত আলাপ পরিচয় করাইয়া দেন।

আমি অগ্রেই বলিয়াছি, পঠদ্দশাতে শহরে থাকিতে আমার সহাধ্যায়ীদের কাহারও কাহারও মাকে আমি মাসী বলিয়া ডাকিতাম, এবং মাসীর ন্যায় স্নেহ পাইতাম। বলিতে কি, সে সময়ে আমাকে যেরূপ কুসঙ্গের মধ্যে বাস করিতে হইত, স্মরণ করিলে এই মনে হয় যে, সেই মাসীদের স্নেহের গুণে ও তাঁহাদের চরিত্রের প্রভাবেই আমি এই সকল কুসঙ্গের অনিষ্ট ফল হইতে বাঁচিয়াছিলাম। যাহা হউক, আমি জগৎবাবুর পত্নীকেও মাসী বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। আমাকে ইঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে যে কি ভালোবাসিতে লাগিলেন, তাহা বাক্যে বর্ণনা হয় না। শেষে এমনি দাঁড়াইল যে, আমি দুই-চারিদিন দেখা না করিলে মাসী ডাকিয়া পাঠাইতেন, এবং আমাকে 'কঠিন ছেলে' বলিয়া তিরস্কার করিতেন, এটা-ওটা খাওয়াইতেন, ঘরকন্নার কথা কত শুনাইতেন, আমার নিকট কিছুই গোপন রাখিতেন না। আমি আপ্যায়িত হইয়া বাসায় ফিরিতাম।

হায়, তাঁহাদের 'কঠিন ছেলে' ব্রাহ্মসমাজের কাজে ও নানা বিষয়ে মাতিয়া কোথায় গিয়া পড়িল, তাঁহারা কোথায় গিয়া পড়িলেন! মাসীকে আর কত কাল দেখিলাম না। এখন ভাবিয়া দেখি, মাসী যে আমাকে 'কঠিন ছেলে' বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলিয়াছিলেন। আমি মানুষের নিকট যতটা প্রেম পাইয়াছি ততটা প্রেম দিতে পারি নাই। এ-জীবনে যে আমি সর্বদা নানা সংগ্রামের মধ্যে বাস করিয়াছি, তাহা বোধ হয় আমার প্রেমিক বন্ধুদের প্রতি আমার সমুচিত প্রেমের অভাবের একটা কারণ। নির্যাতন বিদ্বেষ বিবাদ প্রভৃতির মধ্যে পড়িয়া মন উত্তাপের মধ্যে বাস করিয়াছে, প্রেমের সুশীতল বায়ু সেবন করিবার সময় পায় নাই।

যাহা হউক, আমি এই মাসীর এত স্নেহের এইমাত্র প্রতিদান করিতাম যে, তাঁহাদের মহিমকে রোজ কাছে আনিয়া পড়া বলিয়া দিতাম। ১৮৬৭ সালের শেষ ভাগে ইঁহারা কলিকাতার শাঁখারীটোলাতে এক বাড়িতে গিয়া থাকিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তখন মাসী আমাকে সঙ্গে যাইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। আমি তাঁহাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। আমরা আসিয়া শাঁখারীটোলাতে বাস করিতে লাগিলাম। আমি ও মহিম বাহির বাড়িতে এক দ্বিতীয় তল গৃহে বাস করিতাম। সে ঘরটি বাহির বাড়িতে হইলেও ঠাকুরদালানের ছাদের উপর দিয়া অন্দরমহল হইতে সে ঘরে যখন ইচ্ছা আসা যাইত। সুতরাং মাসী কাজকর্ম হইতে একটু অবসর পাইলেই আমার ঘরে আসিয়া বসিতেন, এবং আমার ও মহিমের পড়া দেখিতেন, এবং নানা ভালো কথায় কাল কাটাইতেন।

বালিকা বধূর বেদনা। আমরা এই বাড়িতে আসার পর মাসীর এক ভ্রাতুষ্পুত্রী, ১৫।১৬ বৎসরের বালিকা, তাঁহাদের নিকট আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। সে ২।১ দিনের মধ্যেই আমাকে 'দাদা' করিয়া লইল। পিতা-মাতা ঐ বালিকাটিকে শৈশবে একজন পরিণতবয়স্ক বিপত্নীক ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। বালিকাটি বোধ হয় পতির নিকট বা পতি গৃহে ভালো ব্যবহার পাইত না, কারণ, শ্বশুরবাড়ির কথা তুলিলেই দরদর ধারে তাহার দুই চক্ষে জলধারা বহিত, এবং তাহা দেখিয়া বাল্য-বিবাহের প্রতি আমার ঘৃণা বাড়িয়া যাইত। আমি সাবধান হইয়া বালিকাটির নিকট তাহার শ্বশুরবাড়ির কথা তুলিতাম না, তাহাকে পড়াশোনায় গল্পগাছায় ভুলাইয়া

রাখিতাম। বালিকাটি প্রাতে গৃহ কর্মে পিসীর সহায়তা করিত, আমার নিকট আসিতে পারিত না, কিন্তু বৈকালে আমি ও মহিম কলেজ হইতে আসিলেই সে আমাদের গৃহ আশ্রয় করিত। আমি তাহাকে ও মহিমকে পড়াইতাম, লিখিতে শিখাইতাম, ভালো ভালো গল্প শুনাইতাম, আমার সেই পূর্বকালের উন্মাদিনীর অভাব যেন কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ হইত। অনেকদিন এরূপ হইত যে, আমি পড়িতে বসিতাম, সে ও মহিম ঘুমাইয়া পড়িত। আমি শয়নের পূর্বে তাহাকে তুলিয়া বাড়ির ভিতর দিয়া আসিতাম।

আমি এইখানে থাকিতে থাকিতে আমার বন্ধু যোগেন্দ্র (যিনি পরে যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন) বিধবা বিবাহ করেন এবং আমি ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যোগেন্দ্রের সঙ্গে থাকিবার জন্য যাই। কিরূপে সে বিবাহ ঘটে, পরবর্তী পরিচ্ছেদে তাহা বলিতেছি। যাইবার সময় মাসীকে বিশেষত সেই বালিকাটিকে ছাড়িয়া যাইতে বড় ক্লেশ হইয়াছিল, সেজন্য সে বিচ্ছেদটা মনে আছে। সে যেন আমার স্নেহ পাইয়া প্রাণ দিয়া আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, সেই স্নেহ পাশ ছিঁড়িয়া যাওয়া আমার পক্ষে ক্লেশকর হইয়াছিল। আমি যখন তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প জানাইলাম, তখন মেয়েটি কয়দিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া ফেলিল। অবশেষে যখন আমি জিনিসপত্র লইয়া বিদায় হই, তখন বলিল, "দাদা, একটু দাঁড়াও, একবার ভালো করে প্রণাম করি।" এই বলিয়া তাহার অঞ্চলটি গলায় দিয়া গলবস্ত্র হইল এবং আমার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসে ও আমার চরণে প্রণত হয় এবং ডাক ছাড়িয়া কাঁদে, আমিও তাহার সঙ্গে কাঁদি।

সেই যে কাঁদিয়া বাল্যবিবাহকে ঘৃণা করিতে করিতে সে বাড়ি হইতে বিদায় লইলাম, সেই ঘৃণা অদ্যাপি আমার মনে জাগ্রত রহিয়াছে। কেহ দশ-এগারো বৎসরের মেয়ের বিবাহ দিতেছে দেখিলে মনে বড় ক্লেশ হয়। কি আশ্চর্য! বাল্যবিবাহের অনিষ্ট ফল পূর্বে কত দেখিয়াছিলাম, শাশুড়ীর হাতে বৌয়ের প্রাণ গেল, কতবার শুনিয়াছিলাম, বালিকা পত্নী বিরাজমোহিণীকে হাত পাা বাঁধিয়া সপত্নীর উপরে ফেলিয়া দিল, ইহাও দেখিয়াছিলাম; কিন্তু ঐ মেয়েটির চক্ষের জলে শিশু বালিকা-দিগকে হাত পা বাঁধিয়া দান করার উপরে আমাকে যেরূপ জাতক্রোধ করিল, এরূপ অগ্রে করে নাই। কোন ঘটনাতে মানুষের মনে কোন ভাব আসে, ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।

হায় হায়! ঘটনাচক্রে মেয়েটি কোথায় গেল, আমি কোথায় গিয়া পড়িলাম! তৎপরে বহু বৎসর পরে একদিন বিধবা বেশে মলিন বস্ত্রে দীনহীনার ন্যায় শিশু-কোলে তাহাকে ভবানীপুরের গলিতে কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে যাইতে দেখিয়া-ছিলাম। সে আমাকে দেখিয়াই 'দাদা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিল, কিন্তু আমার চিনিতে বিলম্ব হইল। দাঁড়াইয়া তাহার দুঃখের কাহিনী শুনিলাম ও চক্ষের জল ফেলিলাম। সেই দেখা শেষ দেখা!

ছাত্রজীবনে সমাজ সংস্কার

দ্বিতীয়বার বিবাহের পরই আমার হৃদয় পরিবর্তন হইলে, আমি নিরপরাধা প্রসন্নময়ীর প্রতি যে অন্যায়াচরণ হইয়াছে, তাহার প্রতিবিধানের জন্য ব্যগ্র হই। সে মনের কথা কেবল আমার মাতামহীঠাকুরাণীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলাম। প্রসন্নময়ীর পিত্রালয় আমার মাতুলালয়ের সন্নিকট। সুতরাং তিনি লোক পাঠাইয়া প্রসন্নময়ীকে নিজ ভবনে আনিলেন। আমাকে সংবাদ দিবা মাত্র আমি গিয়া প্রসন্নময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং অপরাধের মার্জনা ভিক্ষা করিলাম। তৎপরে বহুদিন প্রসন্নময়ী আমার মাতুলালয়েই থাকেন। আমি শনিবার শনিবার সেখানে যাইতাম।

আমি প্রসন্নময়ীর সহিত মিলিত হইয়াছি জানিয়া আমার পিতা প্রথমে অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু পরে আমার অনুনয় বিনয়ে ও মাতাঠাকুরাণীর অনুনয় বিনয়ে আর্দ্র হইয়া প্রসন্নময়ীকে নিজ ভবনে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হন। ১৮৬৭ সালে তিনি আবার আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন।

প্রথম সন্তান হেমলতা। ১৮৬৮ সালের ১১ই আষাঢ় আমার পৈতৃক ভবনে আমার প্রথম সন্তান হেমলতার জন্ম হয়। হেম জন্মিলে বাবার সহিত আমার আর এক মনোবাদের কারণ উপস্থিত হইল। অগ্রেই বলিয়াছি, আমরা দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলজাত কুলীন ব্রাহ্মণ। আমাদের মধ্যে তখন কুলসম্বন্ধের প্রথা ছিল। তদনুসারে হেমলতার শৈশবেই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিবার কথা। আমি সে পথে বিরোধী হইলাম। তাহার বিবাহ সম্বন্ধ করিতে নিষেধ করিয়া পিতাকে পত্র লিখিলাম। তাহাতে বাবা কুপিত হইলেন। আমার নিষেধ গ্রাহ্য করিলেন না। আমার অজ্ঞাতসারে গোপনে একটি শিশু বালকের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। আমি শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম।

আত্মনিগ্রহের সংকল্প। ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা দ্বারা আমার হৃদয় পরিবর্তন ঘটিলে আমার প্রাণে এক নূতন সংগ্রাম জাগিয়াছিল। সকল বিষয়ে আপনাকে ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত করিবার জন্য দুরন্ত প্রতিজ্ঞা জন্মিয়াছিল। ইহার ফল জীবনের সকল দিকেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। সকল বিষয়ে আপনাকে শাসন করিতে আরম্ভ করিলাম। যে যে বিষয়ে আসক্তি ছিল তাহা ত্যাগ করিতে এবং যে-কিছু অরুচিকর তাহা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই সময়ে আমি প্রথমে মাংসাহার পরিত্যাগ করি, প্রাণীহত্যা নিবারণের ইচ্ছায় নয়, কিন্তু মাংসের প্রতি আসক্তি ছিল বলিয়া। মাংসাহারে এমনই আসক্তি ছিল যে,

ভবানীপুরে চৌধুরী মহাশয়দিগের বাড়িতে বাসকালে প্রায় প্রতি রবিবার প্রাতে যখন কালীঘাট হইতে জীবন্ত পাঁঠা আসিত, সে পাঁঠার ডাক শুনিলেই আমার পড়াশোনা বন্ধ হইত। তাহাকে কাটিয়া কুটিয়া রাঁধিয়া পেটে না পুরিতে পারিলে আর কিছু করিতে পারিতাম না। কবিতা পড়িতে ও কবিতা লিখিতে অতিরিক্ত ভালোবাসিতাম বলিয়া কিছুদিন কবিতা পড়া বন্ধ করিয়া দিলাম, ফিলজফি ও লজিক পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বন্ধুদের সহিত হাসি-ঠাট্টা ও গল্পগাছা করিতে ভালোবাসিতাম, কিছুদিন মনের কান মলিয়া দিয়া মৌনব্রত ধরিলাম। এই মনের কান মলাটা তখন অতিরিক্ত মাত্রায় করিতাম।

হৃদয়ে ধর্মভাবের উন্মেষ হওয়া অবধি আমি কলেজের পরীক্ষাতেও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। তদবধি প্রতি বৎসর আমি কলেজে প্রথম স্থান অধিকার করিতে লাগিলাম। আত্মনিগ্রহের উদ্দেশ্যে, পাঠ্য বিষয়ে মধ্যে মধ্যে অপ্রীতিকর বোধে যে যে বিষয় অবহেলা করিতাম, তাহাতে অধিক মনোযোগী হইলাম। আমার মনে আছে, অগ্রে অঙ্কে অমনোযোগী ছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ পরীক্ষাতে কখনো এক শতের মধ্যে বিশের উপর নম্বর পাইতাম না। ১৮৬৬ সাল হইতে তাহা বদলাইয়া গেল। অঙ্কে এরূপ মনোযোগী হইলাম যে ঐ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া সেকেন্ড গ্রেড স্কলারশিপ পাইলাম, কলেজেও প্রথম হইলাম। তৎপরে সেই প্রতিজ্ঞা ও সেই দৃঢ় ব্রত রহিয়া গেল। কি কঠিন সংগ্রাম করিয়া ১৮৬৮ সালে এল. এ. পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম ও ৫৯৲ টাকা স্কলারশিপ পাইয়াছিলাম, তাহার বর্ণনা ক্রমশ করিতেছি। আমার নব ধর্মভাব আমাকে সেই সংগ্রামে শক্তি দিয়াছিল।

বলিতে কি, আমার ধর্মজীবনের আরম্ভ হইতে এই ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত কালকে শ্রেষ্ঠ কাল বলিয়া মনে করি। এই সময়টা যে ভাবে যাপন করিয়াছিলাম, সেজন্য মুক্তিদাতা প্রভু পরমেশ্বরকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ করি। বিনয়, বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা, প্রার্থনাপরায়ণতা প্রভৃতি ধর্মজীবনের অনেক উপাদান এ-সময়ে আমার অন্তরে বিদ্যমান ছিল। আমার যত দূরে স্মরণ হয়, তখন আমার মনের ভাব এই প্রকার ছিল যে, আমার ধর্মবুদ্ধিতে থাকিয়া ঈশ্বর যে পথ দেখাইবেন তাহাতে চলিতে হইবে, ক্ষতি লাভ যাহা হয় হউক। সকল বিষয়ে ও সকল কার্যে ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা করিতাম, এবং যাহা একবার কর্তব্য বলিয়া নির্ধারণ করিতাম, তাহাতে দুর্জয় প্রতিজ্ঞার সহিত দণ্ডায়মান হইতাম, ফলাফল ও জীবন মরণ বিচার করিতাম না। ইহার নিদর্শন স্বরূপ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ দাসের বিধবা বিবাহ দেওয়া, ও আমার এল. এ. পরীক্ষার জন্য গুরুতর শ্রম, প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করিতে পারা যায়। সে সকল ক্রমশ বর্ণনা করিতেছি।

বন্ধুর বিধবাবিবাহ ও সামাজিক নির্যাতন। প্রথম ঘটনা, যোগেন্দ্রের বিধবাবিবাহ। এই বিবাহ ১৮৬৮ সালের প্রথম ভাগে হয়। ইহার ইতিবৃত্ত এই। ঈশানচন্দ্র রায় নামক নদীয়া-কৃষ্ণনগর নিবাসী ও কলিকাতা প্রবাসী একটি যুবক তখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পাঠ করিতেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মাতা ও একটি বিধবা ভগিনী ছিলেন। আমার জ্ঞাতি দাদা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (যিনি পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছিলেন) ঐ মেয়েটিকে পড়াইতেন। হেমদাদার নিকট আমি মেয়েটির প্রশংসা সর্বদা শুনিতাম। তিনি আমাকে বলিতেন যে, মেয়েটির ভাই তাহার আবার

বিবাহ দিতে চায়। আমি শৈশবাবধি বিদ্যাসাগরের চেলা ও বিধবাবিবাহের পক্ষ। আমি মনে মনে ভাবিতাম, আমার আলাপী কি কোনো ছেলে পাওয়া যায় না, যে মেয়েটিকে বিবাহ করিতে পারে?

ইতিমধ্যে আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপত্নীক হইলেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর পরলোক গমনের দশ-বারোদিনের মধ্যেই তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে পুনরায় দার পরিগ্রহ করিবার জন্য অস্থির করিয়া তুলিলেন। যোগেন্দ্র আসিয়া আমাকে সেই কথা জানাইলেন এবং আমার পরামর্শ চাহিলেন। আমি বলিলাম, "যাও যাও, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না। দশ-বারোদিন হল তোমার স্ত্রী মরেছে, এর মধ্যে বিবাহের কথা! আর বিয়েই যদি কর, একটি আট-নয়-বছরের মেয়ে বিয়ে করবে তো, তাতে আমার মত নেই। তোমার যা ইচ্ছে হয় কর।" যোগেন্দ্র সেদিন বিষণ্ণ অন্তরে ঘরে গেলেন। দুদিন পরে আবার আসিয়া আমাকে ধরিলেন। আমি তাঁহাকে বিধবাবিবাহ করিবার জন্য নাচাইয়া তুলিলাম। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন আমি হেমদাদার সাহায্যে ঈশানচন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। যোগেন্দ্র ও ঈশানের ভগিনী মহালক্ষ্মী পরস্পরের সহিত পরিচিত হইলেন এবং বিবাহিত হওয়া স্থির করিলেন।

মহালক্ষ্মীর বয়স তখন বোধ হয় ১৮ বৎসর হইবে। আমাদের অপেক্ষা ২।৩ বৎসরের ছোট। বিবাহ স্থির হইলে আমি সেই সংবাদ লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গেলাম। তিনি পূর্ব হইতেই ঈশানকে ও তাহার ভগিনীকে জানিতেন, এবং যত দূর স্মরণ হয় কিছু-কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। আমার মুখে মহালক্ষ্মীর সহিত যোগেনের বিবাহের সংবাদ পাইয়া তিনি আনন্দিত হইয়া উঠিলেন এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ দিবেন বলিলেন। বিবাহের দিন স্থির করিয়া দুই-তিনজন ভদ্রলোককে মাত্র নিমন্ত্রণ করিয়া বিবাহ দেওয়া হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহের সমুদয় ব্যয় দিলেন, এবং আমার যত দূর স্মরণ হয়, কন্যাকে কিছু-কিছু গহনা দিলেন।

এই বিবাহের পরেই ভয়ানক নির্যাতন আরম্ভ হইল। যোগেন্দ্রের আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্কলারশিপ ও ঈশানের স্কলারশিপ মাত্র ভরসা দাঁড়াইল। তদুপরি চাকর-চাকরানী কেহই থাকে না, দিন চলা ভার। এই অবস্থাতে তাঁহারা আমাকে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তখন শাঁখারীটোলায় জগৎবাবুর বাটীতে থাকিতাম। যোগেন্দ্রের ও ঈশানের স্কলারশিপের সহিত আমার স্কলারশিপ যোগ করিলে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে, এবং আমি সঙ্গে থাকিলে অপরাপর নানা প্রকারে সাহায্য হইতে পারে, এই আশায় তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে ধরিয়া বসিলেন। আমি বিবাহের ঘটক, আমি তাঁহাদের বিপদের সময় কিরূপে সাহায্য দানে বিরত থাকি? সুতরাং আমি বাবাকে সমুদয় বিবরণ লিখিয়া দিয়া তাঁহাদের সঙ্গে জুটিলাম।

বাবা এই সংবাদ পাইয়া অগ্নিসমান হইয়া উঠিলেন, কারণ জ্ঞাতি কুটুম্ব ও গ্রামের লোক এই সংবাদ পাইলে গোলযোগ করিবে। তিনি আমাকে ইঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জন্য আদেশ করিয়া পত্র লিখিলেন। আমি অনুনয় বিনয় করিয়া লিখিলাম, যে বিবাহের আমি ঘটক, সেই বিবাহ নিবন্ধন বিবাহিত দম্পতি যখন ঘোর নির্যাতন ও দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়াছেন, তখন সাহায্যের উপায় থাকিতে সাহায্য না করা অধর্ম; সুতরাং সেরূপ কাজ আমি করিতে পারিব না। বাবা সে যুক্তির প্রতি

কর্ণপাত করিলেন না, পরন্তু লিখিলেন যে, তাহা হইলে তিনি আর প্রসন্নময়ীকে বাড়িতে রাখিতে পারিবেন না এবং আমাকে সস্ত্রীক গৃহ হইতে নির্বাসিত করিবেন।

আমার মাতুল। যখন এইরূপ চিঠিপত্র চলিতেছে তখন একদিন বড়মামা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে তাঁহার ভবনে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বাবার এক পত্র আমাকে দেখাইলেন। দেখিলাম, বাবা আমাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া বড়মামার শরণাপন্ন হইয়াছেন। চিঠি পড়িয়া আমি ধীর ভাবে সমুদয় ঘটনা মাতুলের নিকট বর্ণন করিলাম। কিরূপ নির্যাতন, কিরূপ দারিদ্র্য, কিরূপ সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহা ভাঙিয়া বলিলাম। বলিয়া তাঁহার উপদেশের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

মাতুলমহাশয় কিছুক্ষণ ধীর গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না, তুমি তাহাকে ত্যাগ করিতে পার না। তুমি তাহাদিগকে বিবাহে উৎসাহ দিয়া বিপদের সময় যদি তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে অধর্মের কাজ হইবে, কাপুরুষতা হইবে, আমার ভাগিনার মতো কার্য হইবে না।"

আমার হৃদয় হইতে কে যেন দশ মণ বোঝা নামাইয়া লইল। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাঁহাকে বলিলাম, "আমার বাবাকে এই কথা লিখুন।"

তিনি বাবাকে লিখিলেন যে, সে প্রকার অনুরোধ তাঁহার দ্বারা হইতে পারে না। আমি তাহাদের সাহায্য করিতে বাধ্য।

বন্ধুতার দায়িত্ব। যোগেনদের বিবাহের পর তাহাদের জন্য আমার গুরুতর শ্রম আরম্ভ হইল। এই পরিশ্রমের মধ্যে একবার আমি কয়েকদিন বিশ্রাম করিবার জন্য যোগেন ও মহালক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া মাতুলালয়ে গেলাম। দুই-তিনদিন মাতুলালয়ে মাতামহীর কাছে আছি, এমন সময় একদিন রাত্রি দশটার সময় ঈশানের এক জরুরি টেলিগ্রাম পাইলাম, "এখানে তোমার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন, অবিলম্বে এস।" তখন কি করি! রেলওয়ে স্টেশন মাতুলালয় হইতে দুই-তিন মাইল দূরে। মাঠ দিয়া স্টেশনে যাইতে হয়, কিন্তু তখন সমুদয় মাঠ জলে প্লাবিত, পথ পাওয়া দুষ্কর। মাতামহী ঠাকুরাণী ও মামীমা বারণ করিতে লাগিলেন। আমি মহা চিন্তার মধ্যে পড়িলাম। কিন্তু বড়মামা বলিলেন, "জরুরি টেলিগ্রাম যখন করিয়াছে, তখন নিশ্চয় কোনো বিপদ ঘটিয়াছে, তুমি যাও। রাত্রি শেষে ৩টা কি ৩৷৷০টার সময় একটা ট্রেন আছে, সেই ট্রেনে যাও।" আমি তাঁহার উপদেশে সেই রাত্রেই যাত্রা করিলাম। তিনি আমার সঙ্গে এক চাকর ও লণ্ঠন দিলেন। আমি জল ভাঙিয়া কোনো প্রকারে রাত্রি ১২টার সময় স্টেশনে পৌঁছিলাম, এবং সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আসিয়া শুনি, আমি মাতুলালয়ে গেলে তৎপর দিন যোগেনের মা হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যোগেনকে তাঁহার আত্মীয়গণ ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন ও গতকল্য প্রাতঃকাল হইতে কোনো না কোনো ছলে তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। সকলে মিলিয়া এই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত পূর্বক অপর একটি বালিকাকে বিবাহ করিবার জন্য যোগেনকে পীড়াপীড়ি করিতেছেন। যোগেন মাতাকে লইয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন কি, তাঁহার কাছে রাত্রি যাপন করিতে

আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া মহালক্ষ্মীর কাছে রাত্রিতেও আসিতে পারিতেছেন না। এই সময়ে মহালক্ষ্মীর কাছে থাকে কে? তাহার মাতা কন্যার পুনর্বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়াই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কাশী চলিয়া গিয়াছেন। এদিকে ঈশানেরও হাসপাতালের নাইট ডিউটি উপস্থিত। তাই আমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

আমি আসিয়াই যোগেনের মাকে দেখিতে গেলাম, ও তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম। তাঁহাকে বুঝাইয়া ও যোগেনকে বলিয়া, যোগেনকে মহালক্ষ্মীর নিকট রাত্রি যাপন করিতে প্রবৃত্ত করিলাম। তিনি সমস্ত দিন মাতার কাছে যাপন করিয়া রাত্রে বাড়িতে আসিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আসিতে অনেক রাত্রি করিতেন। ঐ সময় আমি আহারান্তে মহালক্ষ্মীর ঘরে বসিয়া তাঁহাকে বাংলা ও ইংরাজী পড়াইতাম এবং দুজনে ধর্মবিষয়ে আলাপ ও উপাসনা করিতাম।

এইরূপে আমার গুরুতর শ্রম আরম্ভ হইল। যোগেন তাঁহার ভগ্নহৃদয়া মাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে লইয়াই সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, ঈশানেরও পাঠ ও নাইট ডিউটির হাঙ্গামাতে অবসরাভাব হইল। এদিকে চাকর-চাকরানী নাই, সুতরাং আমাকেই বাজার করা, তিন তলাতে কাঁধে করিয়া জল তোলা প্রভৃতি সমুদয় গৃহ-কর্ম করিতে হইত। এই সকল স্মরণ করিয়া এখন আনন্দ হয়। এই সকল শ্রম করিতে আমার কিছুই ক্লেশ হইত না, কারণ মহালক্ষ্মীর বিমল ভালোবাসাতে আমাকে সরস রাখিত। মানুষ মানুষকে এত ভালোবাসে না! যোগেনকে সর্বদাই আত্মীয়স্বজনের কাছে যাইতে হইত, সুতরাং আমিই তাহার সঙ্গী, তাহার শিক্ষক, তাহার রান্নাঘরের চাকর, সকলই। আমি একদিন অন্যত্র গেলে সে অস্থির হইয়া উঠিত।

ফলত, এই কালকে যে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল বলিয়াছি, তাহার কারণ এই। এই কালের মধ্যে আমার অন্তরে ধর্মভাব ও ব্যাকুলতা পূর্ণ মাত্রাতে কাজ করিতেছিল; অপর দিকে বন্ধুদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা পূর্ণ মাত্রাতে ভোগ করিতে-ছিলাম। বস্তুত আমার প্রতি ঈশান ও যোগেনের প্রীতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও নির্ভরের যেন সীমা ছিল না।

লিখিতে লিখিতে একটা কথা মনে হইতেছে, তাহা ইহার অনেক পরের ঘটনা। তখন ঈশান বোধ হয় লক্ষ্মৌএর বলরামপুর হাসপাতালে কর্ম করিতেন। সেই সময় একবার ছুটি লইয়া আসিয়া কলিকাতাতে ছিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর আমি তাঁহাদিগকে দেখিতে গেলে, তিনি আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, আর বাড়িতে আসিতে দিলেন না। বলিলেন, "আমার পরিবার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, তুমি থাক।" এই বলিয়া তাঁহার পত্নীর ত্রুটির বিষয়ে আমার কানে অনেক কথা ঢালিলেন। বলিলেন, "আমি আমার স্ত্রীকে অনেক বুঝাইয়াছি, কোনো ফল হয় নাই। তুমি একবার বুঝাও।" আমি বলিলাম, "তোমার কথাতে কাজ হয় নাই, আমার কথাতে কি হবে?" তিনি বলিলেন, "তোমাকে বড় ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে, তোমার কথাতে ওর উপকার হতে পারে।" আমি অগত্যা ভৃত্যের দ্বারা প্রসন্নময়ীকে সংবাদ দিয়া সে রাত্রি সেখানেই যাপন করিলাম। অনেকক্ষণ তাঁহার স্ত্রীর সহিত তাঁহাদের দাম্পত্য বিবাদ বিষয়ে কথাবার্তা কহিলাম। আমার কথার কি ফল হইল, জানি না, কিন্তু বন্ধুদের এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতির বিষয় যখন স্মরণ করি, তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি। কারণ, ইঁহাদের সদ্ভাব প্রীতির দ্বারা আমার হৃদয় মনের অনেক উপকার হইয়াছিল।

দ্বিতীয়া পত্নীকে পুনর্বিবাহ দানের প্রস্তাব। এই সময় আমার মাথায় যত রকম আজগুবি মৎলব আসিত, ভারত উদ্ধারের যত রকম খেয়াল ঘুরিত, সকলের উৎসাহ-দায়িনী ছিলেন মহালক্ষ্মী। এ জীবনে আমার অনেক চেলা জুটিয়াছে, কিন্তু মহালক্ষ্মীর মতো চেলা অল্পই জুটিয়াছে। এই সময়ে জন স্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থ পড়িয়া যোগেন কিছুদিনের জন্য নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহা লইয়া আমার সঙ্গে রোজ তর্ক ও ঝগড়া চলিত। আমি তাঁহাকে আস্তিক করিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু ঝগড়ার ফল এই হইত যে তিনি আরও দৃঢ়তার সহিত নাস্তিকতা প্রচার করিতেন। তিনি হাসিয়া আমাকে বলিতেন, "স্ত্রীটিকে তো চেলা করিয়া লইয়াছ, যত পার ধর্ম তাহাকে ভজাও, আমাকে ছাড় না!" আমি যোগেনকে না পারিয়া মহা-লক্ষ্মীকেই ভজাইতাম। দুজনে প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা করিতাম।

আমরা তিনটি প্রাণী এমনি 'রিফর্মার' হইয়া উঠিয়াছিলাম যে, আমরা তিনজনে পরামর্শ করিয়াছিলাম যে আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে আনিয়া পুনরায় তাঁহার বিবাহ দিব। তখনও আমি বিরাজমোহিনীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই। এই ১৮৬৮ সালে আমি একবার তাঁহাকে আনিতে যাই। তখন তিনি ১১।১২ বৎসরের বালিকা। বোধ হয়, আমার পিতা-মাতার পরামর্শ ভিন্ন আনিতে গিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহারা পাঠাইলেন না। যাহাকে বিবাহ দিব ভাবিতেছি, তাহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করা কর্তব্য নয় বলিয়া তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতাম না। তাঁহাকে যে আনিয়া মহালক্ষ্মীর কাছে রাখিতে পারিলাম না, এজন্য মহা দুঃখ হইল।

এল. এ. পরীক্ষার্থী। তাহার পর, আমার এল. এ. পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়া। যোগেনের বিধবাবিবাহের ফলস্বরূপ আমাদিগকে কিরূপ নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, অগ্রেই তাহার বর্ণনা করিয়াছি। বিবাহের কিছুদিন পরেই মহালক্ষ্মীর স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে লাগিল। চাকর পাওয়া যায় না, রাঁধুনী পাওয়া যায় না, সেই অবস্থাতেই তাহাকে রাঁধিতে হয়। এদিকে, যোগেন আত্মীয়-স্বজনের নির্যাতনে অস্থির হইয়া পড়িলেন ও ঈশান মেডিকেল কলেজের ডিউটি লইয়া সর্বদা অনুপস্থিত থাকিতেন বলিয়া চাকরের অনেক কাজ আমার উপর পড়িয়া যাইতে লাগিল। বাজার করা, কাঁধে করিয়া তিনতলায় জল তোলা প্রভৃতির কাজ আমাকেই করিতে হইত—এ সকল পূর্বেই বলিয়াছি। এই সকল করিয়া আমি পড়িবার সময় বড় পাইতাম না। সম্মুখে বৎসরের শেষে পরীক্ষা আসিতেছে, কিন্তু তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিতেছি না। এইরূপে ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় আমাকে অতিশয় ভালোবাসিতেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন। তিনি এই বিধবাবিবাহে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার লেখাপড়া সব গেল দেখিয়া দুঃখিত হইতেছিলেন। তিনি অক্টোবরের প্রথমে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি একটা ভালো কাজে আছ, কিছু বলতে পারি না, কিন্তু আমি তোমার জন্য চিন্তিত হয়েছি। তুমি আগামী পরীক্ষাতে কলেজের মুখ রাখবে বলে মনে আশা করছিলাম, কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে, তুমি স্কলারশিপ পাওয়া দূরে থাক, পাস হও কি না সন্দেহ।" তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হইল, আমি যেন কোনো পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়াইয়াছি, আমার সম্মুখে গভীর গর্ত, আর এক পা বাড়াইলেই তাহার মধ্যে পড়িব! আমার সম্মুখে যে কঠিন সমস্যা উপস্থিত তাহা এক নিমিষের

মধ্যে চক্ষের সমক্ষে আসিল। মনে হইল, স্কলারশিপ যদি না পাই, তাহা হইলে যাহাদের জন্য এতটা সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাদের আর সাহায্য করিতে পারিব না। যোগেন ও মহালক্ষ্মী সাহায্যের অভাবে কষ্ট পাইবেন ভাবিয়া চক্ষে জল আসিল। "ঈশ্বর, রাখ, এই বিপদে রাখ," বলিয়া মনে-মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। এক মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্যপথ নির্ধারিত হইয়া গেল। সর্বাধিকারী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আমার প্রতি একটা অনুগ্রহ করিতে পারেন? তাহা হইলে একবার জীবন মরণ পণ করিয়া দেখি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অনুগ্রহ?" আমি বলিলাম, "আমি মনে করিতেছি, কলিকাতা হইতে পলাইয়া ভবানীপুরে থাকিব, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন কলেজে আসিব না, একাগ্র চিত্তে পাঠে মন দিব এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইব। কলেজে না আসার জন্য যদি আমার স্কলারশিপ না কাটেন, তাহা হইলেই এইরূপ করিতে পারি।" তিনি বলিলেন, "তুমি কলেজে আসবে না, অথচ স্কলারশিপ কাটা হবে না, এটা কলেজের নিয়ম বিরুদ্ধ। ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসা না করে এরূপ করতে পারি না। কি হয় তোমাকে দুদিন পরে বলব।" তৎপরে তিনি সমুদয় বিবরণ খুলিয়া লিখিয়া ডিরেক্টরের নিকট হইতে অনুমতি আনিলেন এবং আমাকে ছুটি দিলেন।

আমি যোগেন ও মহালক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া আমার পুরাতন আশ্রয়দাতা ভবানীপুরের মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহাদিগের নিকট আড়াই মাসের জন্য একটি ঘর চাহিলাম, যে ঘরে আমি একাকী থাকিব। তাঁহারা দয়া করিয়া তাহা করিয়া দিলেন। আমি সেই ঘর আশ্রয় করিয়া পাঠে একেবারে মগ্ন হইলাম। প্রাতে একবার স্নানাহারের সময় বাহিরে যাইতাম ও রাত্রে আহারের সময় আধ ঘণ্টার জন্য যাইতাম। নতুবা দিনরাত্রি ঐ ঘরে যাপন করিতাম। এই আড়াই মাসের মধ্যে শয্যাতে যাই নাই। সন্ধ্যার সময় চাকরেরা আলো জ্বালিয়া দিয়া যাইত, সেই আলো সমস্ত রাত্রি থাকিত। বড় ঘুম পাইলে দুই-চারি ঘণ্টা পুস্তক মাথায় দিয়া সেই ঘরেই ঘুমাইতাম। যত দূর স্মরণ হয়, পাঠের ঘণ্টা এইরূপ ভাগ করিয়া লইয়াছিলাম—অঙ্ক ছয় ঘণ্টা (দুইঘণ্টা গ্রন্থ পড়া ও চারঘণ্টা অঙ্ক কষা), ইতিহাস ছয়ঘণ্টা, ইংরাজী তিনঘণ্টা, সংস্কৃত একঘণ্টা, লজিক দুইঘণ্টা—সর্ব শুদ্ধ প্রায় আঠারো ঘণ্টা। এইরূপ পড়িতে-পড়িতে শরীর ও মন সময়-সময় বড় অবসন্ন হইয়া পড়িত। তখন পড়া ফেলিয়া দিয়া বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিত। সেই সময়ে যোগেন ও মহালক্ষ্মীর মুখ মনে করিয়া মনে দুরন্ত প্রতিজ্ঞা আসিত। ভাবিতাম, যাহাদের প্রধান উৎসাহদাতা হইয়া এই সংগ্রামের মধ্যে ফেলিয়াছি, তাহাদের সাহায্য করিতে না পারিলে কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিব? প্রাণ থাক আর যাক, একবার মরণ-বাঁচন চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। অমনি মনে প্রার্থনার উদয় হইত, "হে ঈশ্বর, এই সংগ্রামে আমার সহায় হও।" তখন দিনের মধ্যে বহুবার প্রার্থনা করিতাম। লোকে যেমন শ্রমের মধ্যে বার-বার চা খাইয়া সবল হয়, আমি তেমনি বার-বার প্রার্থনা করিয়া সবল হইতাম।

এইরূপ শ্রম করিতে করিতে যখন আড়াই মাস পরে পরীক্ষার সময় আসিল, তখন দেখিলাম একঘরে আড়াই মাস বদ্ধ থাকিয়া ও নিচের ঘরে শুইয়া-শুইয়া কোমরে বাত ধরিবার উপক্রম হইয়াছে। পরীক্ষা দিতে যাইবার সময় একটি বালকের কাঁধে হাত দিয়া পরীক্ষার হলে গেলাম ও পরীক্ষা দিয়া আসিলাম। তখন ডিসেম্বরের শেষে পরীক্ষা হইত।

বন্ধুপত্নীর মৃত্যু। বোধ হয় ১৮৬৯ সালের জানুয়ারীর শেষভাগে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। তখন আমরা মহালক্ষ্মীর পীড়া লইয়া ঘোর সংগ্রামের মধ্যে আছি। হঠাৎ ওলাউঠা পীড়া হইয়া মহালক্ষ্মী মৃত্যুশয্যায় শয়ানা। তাঁহার পীড়া হইলে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্র লইয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি আমাকে পূর্ব হইতেই জানিতেন ও ভালোবাসিতেন। আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া প্রতিদিন মহালক্ষ্মীকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার সাধ্যে যত দূর হয় তাহা করিতে বাকি রাখিলেন না। অবশেষে কয়েকদিনের পর মহালক্ষ্মীর প্রাণ গেল। তখন তিনি ৮।৯ মাস কাল সসত্ত্বা। এইরূপ অবস্থাতে মৃত্যু হওয়াতে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। মহালক্ষ্মীর মা ইহার কিছু পূর্বে কাশী হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি যখন আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া "বাবা রে, এত করেও বাঁচাতে পারলি না রে" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, যোগেন বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিলেন, এবং ঈশান পাগলের মতো ঘর হইতে বাহির, বাহির হইতে ঘর করিতে লাগিলেন, তখন আমি আর মহালক্ষ্মীর জন্য কাঁদিব কি? ইঁহাদিগকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। সেই ক্ষেত্রেই সংবাদ আসিল যে, আমি এল. এ. পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট গ্রেড স্কলারশিপ ৩২৲, ইংরাজী ও সংস্কৃতে ইউনিভার্সিটিতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করাতে ডফ্ স্কলারশিপ ১৫৲, ও সংস্কৃত কলেজের প্রথম স্কলারশিপ ১২৲—সর্ব সমেত ৫৯৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছি। যাহাদিগের জন্য সংগ্রাম করিতেছিলাম জগদীশ্বর তাহাদিগকে সরাইয়া লইলেন ভাবিয়া আমার চক্ষে জল ধারা বহিতে লাগিল। কিন্তু তখন বুঝি নাই যে তিনি অন্য এক সংগ্রামের জন্য পূর্ব হইতেই উপায় বিধান করিলেন। সে সংগ্রাম ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা ও পিতৃগৃহ হইতে নির্বাসন। তাহার বিবরণ পরে বলিব।

মহালক্ষ্মী চলিয়া গেলে, যখন তাহার মা আমার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমিও কি আমাদিগকে ছেড়ে যাবে?" তখন আর তাঁহাদিগকে ছাড়িতে পারিলাম না। ভবানীপুর ছাড়িয়া আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আবার কয়েক মাস রহিলাম। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই যোগেনের বাসা ভাঙিয়া গেল, আমরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে পড়িলাম, আমাদের জীবনের গতিও পৃথক হইয়া দাঁড়াইল। মহালক্ষ্মীর শোকটা আমার বড়ই লাগিয়াছিল।

মহালক্ষ্মী চলিয়া গেলে, পাঠে গুরুতর শ্রমের ফলস্বরূপ আমার এক প্রকার পীড়া দেখা দিল। অতিরিক্ত দুর্বলতার সঙ্গে সর্বাঙ্গে শাদা-শাদা চাকা-চাকা এক প্রকার ফোলা মাংস দেখা দিল, সেগুলিতে আঘাত করিলে বেদনা অনুভব করিতে পারিতাম না। কোনো কোনো ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, কুষ্ঠব্যাধি হইবার উপক্রম। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আমাকে অতিরিক্ত শ্রমের জন্য তিরস্কার করিয়া, ছয় মাস কাল তন্মনস্ক হইয়া চিকিৎসা করিলেন, এবং আমাকে রোগমুক্ত করিয়া তুলিলেন।

উপেন্দ্রনাথ দাসের বিধবাবিবাহ দেওয়া। অতঃপর উপেন্দ্রনাথ দাসের বিধবাবিবাহের বিবরণ লিখিতেছি। এই ঘটনাটি বোধ হয় ১৮৬৮ সালের মধ্য ভাগে ঘটিয়াছিল। হাইকোর্টের উকীল বাবু শ্রীনাথ দাসের জ্যেষ্ঠপুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস তখন কলিকাতায় যুবক রিফর্মারদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। তৎপূর্বে তিনি মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইণ্ডিয়ান র‍্যাডিকাল লীগ নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিতেছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি যে, কোনো পারিবারিক কারণে স্বীয়

পিতার সহিত বিবাদ করিয়া উপেন্দ্র মান্দ্রাজে পলায়ন করেন। মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া উৎসাহের সহিত যুবক সংস্কারকদিগের নেতা হইয়া দাঁড়ান। যোগেন যখন বিধবা-বিবাহ করিলেন, তখন উপেন যোগেনকে ও আমাকে একদিন নিজ সভাতে উপস্থিত করিয়া সর্বসমক্ষে বিশেষ সম্মানিত করিলেন। যুবকগণের করতালি ধ্বনিতে আমাদের লাঙ্গুল স্ফীত হইয়া উঠিল। আমরা মস্ত একটা রিফর্মার হইয়া দাঁড়াইলাম। উপেন সংস্কৃত কলেজের ছেলে, আমরাও সংস্কৃত কলেজের ছেলে, সুতরাং এই সময় হইতে উপেনের সহিত আমাদের একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। যোগেন উপেনের কাছে যাইবার জন্য সময় বড় পাইতেন না, কিন্তু আমি ও উমেশচন্দ্র মুখুয্যে দুজনে সর্বদা তাঁহার বাড়িতে যাইতাম ও উপেনের মুখনিঃসৃত ইউরোপীয় ফিলজফি ও সংস্কারের সুসমাচার হাঁ করিয়া গিলিতাম। সময়ে-সময়ে আমি উপেনের বাড়িতে রাত্রি যাপন করিতাম।

তাঁহার সহিত একটু বিশেষ যোগ হইবার কারণ ছিল। আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে পুনর্বার বিবাহ দিবার যে খেয়াল এ সময়ে আমার মাথায় ঘুরিতেছিল, উপেন সে খেয়ালের অংশী হইয়া সর্বদা নানা প্রকার পরামর্শ করিতেন। একদিন রাত্রে আমি উপেনদের বাড়িতে শুইয়াছি, উপেন আমাকে বলিলেন, "অত কেন ভাবিতেছ? তোমার দ্বিতীয়া পত্নীকে ঢাকা কি কাশী কি লাহোর কোনো দূর দেশে লইয়া অবিবাহিত বলিয়া বিবাহ দিয়া এস। তারপর তারা সেই দিকেই থাকুক। হলই বা বেআইনি কাজ?" আমি বলিলাম, "সে যে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা হয়।" উপেন বলিলেন, "মিথ্যা দুই প্রকারের আছে, হোয়াইট লাইজ অ্যান্ড ব্ল্যাক লাইজ; ওটা হোয়াইট লাই।" 'হোয়াইট লাই, ব্ল্যাক লাই' কথা আমি সেই প্রথম শুনিলাম। আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "উপেন, মিথ্যার আবার হোয়াইট ব্ল্যাক কি রকম?" তখন তিনি আমার নিকটে হোয়াইট লাই-এর ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সকল কথা আমার মনঃপুত হইল না। আমি বলিলাম, "এইরূপ প্রবঞ্চনা করিতে পারিব না।" যাহা হউক, তখন উপেনের হোয়াইট লাইজ-এর সমর্থন শুনিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু উপেনকে পরিত্যাগ করি নাই।

বোধ হয় এই ১৮৬৮ সালের মধ্য ভাগে উপেনের প্রথমা স্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যু হইল। ডাক্তার দেখাইবার সময় হইল না। উপেনের মুখে শুনিলাম, হঠাৎ কলেরা হইয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা গেলেন।

শোকটা পুরাতন হইতে না হইতে একদিন দুপুরবেলা উপেন কতিপয় বন্ধুসহ সংস্কৃত কলেজে আসিয়া আমাকে এল. এ. ক্লাস হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, "তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, আমি এক বিধবাকে বিবাহ করতে যাচ্ছি। মেয়েটি ভবানীপুরে আছে, চুরি করে আনতে হবে। তার মায়ের মত আছে, কিন্তু মামা অভিভাবক, তাঁর মত নাই।" মেয়ে এইরূপে চুরি করা ভালো কি না, আনিয়া কোথায় রাখা হইবে, কবে কিরূপে বিবাহ হইবে, এ সকল প্রশ্ন মনে উঠিল না। মেয়ে চুরি করিয়া বিধবাবিবাহ দেওয়া যাইবে, এই উৎসাহেই কলেজ হইতে বিদায় লইয়া তাঁহাদের সহিত যাত্রা করিলাম।

আমরা তিনটি যুবক, গাড়িতে মেয়েটির জায়গা মাত্র আছে। গাড়ি গিয়া ভবানীপুরে এক গলির মোড়ে দাঁড়াইল। কথা ছিল, মেয়েটির জ্যেষ্ঠ ভগিনী দিবা দ্বিপ্রহরের সময় তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া যাইবে। তাহা হইল না, আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, মেয়েটি আসিল না। পরে সংবাদ পাওয়া গেল, মেয়েটি

দিনেরবেলা আসিতে পারিল না, সন্ধ্যার পরে আবার আসিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। কার্যোদ্ধার না করিয়া বাড়িতে ফেরা হইবে না, এই পরামর্শ স্থির হওয়াতে আমরা গাড়ি হাঁকাইয়া ইডেন গার্ডেনে গেলাম, এবং পাউরুটি ও কলা কিনিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া উত্তমরূপে টিফিন করিলাম। সন্ধ্যা অতীত হইলে আবার গাড়ি করিয়া সেই গলির মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া প্রায় রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, মেয়ের দেখা নাই। অবশেষে দুইটি স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত। শুনিলাম, তাহার একজন ঐ মেয়ে এবং অপরজন ঐ মেয়েটির জ্যেষ্ঠ সহোদরা। মেয়েটি আমাদের গাড়িতে উঠিলেন। যেই উঠা অমনি আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি হাঁকাইলাম।

উপেনের আদেশক্রমে গাড়ি গিয়া তাঁহার সম্পাদিত সংবাদপত্রের প্রেস ও আপিসের দ্বারে লাগিল। মেয়েটিকে সেখানে গিয়া নামানো হইল। সেটা আপিস ও পুরুষদের বাসা, স্ত্রীলোকের বাসের যোগ্য নহে। আমি দেখিলাম মেয়েটি কাঁপিতেছে। তখন আমার হুঁস হইল। আমি উপেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কবে বিয়ে হবে, আর ততদিন এ'কে কোথায় রাখা হবে?” উপেন বলিলেন, “বিবাহ কাল রাত্রে হবে, আর ওঁকে সে পর্যন্ত এখানেই রাখা যাবে।” তখন আমি রাগিয়া উঠিলাম; বলিলাম, “তা কখনই হবে না। এমন জানলে আমি এ কাজে থাকতাম না। এই পুরুষের দলে ও মাতালের মধ্যে এ'কে রাখা হবে, তা হইতে পারে না।” এখানে বলা কর্তব্য, উপেন সুরাপান করিতেন না, সুরা দূরে থাক, চুরুট পর্যন্ত কখনও খাইতে দেখি নাই। এ সকল বিষয়ে তাঁহার আশ্চর্য সংযম ছিল। কিন্তু তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে সুরাপায়ী ছিল। যত দূর স্মরণ হয়, সেই ভবনেরই আর একঘরে সুরাপান চলিতে-ছিল। তাহা দেখিয়া মেয়েটিকে সেখানে রাখা বিষয়ে আমার মনে ঘোর আপত্তি উঠিল। অবশেষে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর উপেন আমাকে বলিলেন, “তবে তুমি যেখানে পার, এক রাত্রের জন্য এ'কে রেখে এস।” আমি মুশকিলে পড়িলাম, সংস্কারক দলের কোনো পরিবারের সহিত আমার সেরূপ আলাপ ছিল না। মেয়েটিকে কোথায় লইয়া যাই? কলিকাতার ব্রাহ্ম নেতাদিগের মধ্যে কিছু দিন পূর্বে গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহাকে অত্যগ্রসর সংস্কারক দলের লোক বলিয়া জানিতাম। সেই রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সেই কন্যাকে গাড়ি করিয়া লইয়া মহলানবিশ মহাশয়ের পরিবারে রাখিতে গেলাম। তিনি আনুপূর্বিক সমুদয় বিবরণ শুনিয়া কন্যাটিকে এক রাত্রির জন্য স্থান দিলেন।

তৎপর দিন খিচুড়ী বিবাহ হইল। এরূপ শোনা গেল, মেয়েটি কায়স্থজাতীয়া, যদিও পরে জানা যায় যে তাহা নহে, তদপেক্ষা নিম্নজাতীয়া। কায়স্থদের কন্যা ইহা শুনিয়া উপেনের মনে হইল, তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বিবাহ করিলে আইন-সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং পরদিন প্রাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বিবাহের বন্দোবস্ত হইল। তদনুসারে পুরোহিত ও ঠাকুর আসিয়া একটা বিবাহ ক্রিয়া হইল। আবার এদিকে উপেন শহরের বড়-বড় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক মহা সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। সেখানকার জন্য তো কিছু করা চাই। স্থির হইল, সেখানে একটু ঈশ্বরোপাসনা হইবে ও বরকন্যা উভয়ে একটি লেখাপড়াতে স্বাক্ষর করিবেন। কিন্তু উপাসনা করিবে কে? আমি অথবা উমেশ মুখুয্যে, কারণ, এই দুইটি ঐ যুবক দলের মধ্যে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত। আমাদের সঙ্গে আর একজন ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি প্যারীমোহন চৌধুরী, যিনি পরে আচার্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ‘প্রেরিত দলে’ প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই তিনজন ব্রাহ্মের মধ্যে কেন যে আমার দ্বারা উপাসনা

করানো সকলের মত হইয়াছিল, তাহা আমার স্মরণ নাই। যত দূর মনে হয়, এ পরামর্শ বিবাহের কিঞ্চিৎ পূর্বে স্থির হয়, এবং আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জানিতে পারি নাই।

আমি ওদিকে কন্যা আনিতে গিয়া একদল মাতালের হাতে পড়িয়া টানাটানির মধ্যে আছি। আমি যে গাড়িতে করিয়া কন্যাকে আনিতেছিলাম সেই গাড়ি ও আর একখানি গাড়ি একটি ছোট গলির মধ্যে দুই দিক হইতে আসিয়া, পাশাপাশি পার হইতে গিয়া চাকায় চাকায় আটকাইয়া গেল। কোনোখানি বাহির হয় না। আমি গাড়ি হইতে নামিয়া চাকা টানাটানি করিতেছি, এমন সময় এক দল মাতাল আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের মধ্যে একজন আমার পরিচিত। মাতালেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি বাবা! রাস্তা আটকেছ কেন?" যখন কারণ নির্দেশ করিলাম, তখন সকলে কাঁধ দিয়া গাড়ি ছাড়াইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। একবার জিজ্ঞাসা করিল, "ইজ দেয়ার এনি জেন্টলউমেন, বাবা?" আমি বলিলাম, "হাঁ।" তাহার পরে আর কেহ গাড়ির দ্বারের কাছেও যায় না, এতই সম্ভ্রম দেখাইতে লাগিল। সকলে পড়িয়া কাঁধ দিয়া গাড়ি তো ছাড়াইয়া দিল, কন্যার গাড়ি চাকরের সহিত বিবাহ সভা অভিমুখে ছুটিল। এদিকে মাতালেরা চারি-পাঁচজনে পড়িয়া আমাকে ধরিল, "এত করে গাড়ি ছাড়ালাম বাবা, কিছু দিতে হবে।" তখন আমার মনে ছিল না যে, আমার পকেটে একটা টাকা আছে। আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম, বিবাহ সভাতে যাইতে বলিলাম, কিছুতেই রাজি নয়, আমার চাদর কাড়িয়া লইতে উদ্যত। আধ ঘণ্টা টানাটানির পর মনে হইল যে সঙ্গে একটা টাকা আছে। টাকাটা দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়া বিবাহ সভাতে যেই গিয়া উপস্থিত, অমনি শুনিলাম আমাকে সভামধ্যে উপাসনা করিতে হইবে, সকলে উৎসুক অন্তরে অপেক্ষা করিতেছে!

সে কি উপাসনা করিবার অনুকূল অবস্থা? আমি শুনিয়া অস্বীকৃত হইলাম। কিন্তু শোনে কে? তৎপূর্বে কখনো প্রকাশ্য স্থানে উপাসনা করিয়াছিলাম, এরূপ স্মরণ হয় না। যে লাজুক ছিলাম, বোধ হয় করি নাই। লাজুক ছিলাম, এই কথাটি পড়িয়া বন্ধুদের অনেকে হয়তো মনে মনে হাসিবেন। কারণ তাঁহারা আমাকে এ সকল বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে চিরদিন বেপরোয়া ও বেহায়া দেখিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তখন আমি উপাসনাদি বিষয়ে বাস্তবিক বড় লাজুক ছিলাম। সেই মানুষকে ধরিয়া লইয়া যখন সভামধ্যে চেয়ারে বসাইয়া দিল, তখন কি হইল তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। প্রথমেই গিয়া শুনিলাম, গান হইতেছে "মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর; অন্যে বাক্য কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর!" যেমন উপাসনার আয়োজন, তেমনি গান! পরে শুনিলাম, যাহাকে গান করিবার জন্য ধরিয়া আনিয়াছিল, সে ব্যক্তি ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে রামমোহন রায়ের গানই জানিত, তাহাই গাহিতেছিল। গান শেষ হইলে আমি প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার প্রার্থনার মধ্যে সভাস্থল হইতে করতালির চটপটা ধ্বনি উঠিতে লাগিল। এই জন্য এ বিবাহ অনুষ্ঠানকে 'খিচুড়ী বিবাহ' বলিয়াছি। উপাসনার পর এক কাগজে বরকন্যা স্বাক্ষর করিলেন। আমার যত দূর স্মরণ হয়, সাক্ষীদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় বন্ধু আনন্দমোহন বসু একজন ছিলেন। তখন কিন্তু তাঁহার সহিত আমার আলাপ পরিচয় হয় নাই।

রিফর্মার বন্ধুর কীর্তি। বিবাহের পর উপেনের সহিত ও তাঁহার নবপরিণীতা স্ত্রীর সহিত আমার সম্বন্ধ আরও গাঢ় হইল। আমি সর্বদাই তাঁহাদিগের সংবাদ লইতাম,

এবং কিছু কাজ পড়িলে করিয়া দিতাম। এই সময় হইতে দেখিতে লাগিলাম, উপেন ঋণ শোধের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ধার করেন, বাড়ি ভাড়া করিয়া ভাড়া না দিয়া রাতারাতি পলাইয়া অন্য বাড়িতে যান, ইত্যাদি। দুই-একবার নিজে কর্জ করিয়া টাকা দিয়া এরূপ অবস্থা হইতে তাঁহাকে সপরিবারে উদ্ধার করিতে হইল। তথাপি তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ভাঙিতে অনেক দিন গিয়াছিল। একবার রাত্রি দুইটার সময় উপেন সপরিবারে পলাইয়া কলিকাতা হইতে অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষের বাড়িতে যান। তখন শিশিরবাবুরা অগ্রসর সংস্কারক ও ব্রাহ্ম ছিলেন। সেই রাত্রে আমি যোগেন ও উমেশ মুখুয্যে সশস্ত্র হইয়া তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষকে আগুলিয়া নারিকেলডাঙ্গার খালে নৌকায় তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। এখন মনে হইলে হাসি পায়।

ইহার পর ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র কিছুদিনের জন্য নিজ ব্যয়ে উপেন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রীকে কাশীতে নিজ ভবনে লইয়া যান, এবং তাঁহাদের ভরণপোষণ নির্বাহ করিতে থাকেন। এইরূপে এক বৎসরের অধিক কাল গত হয়। সেখানে উপেন গোপনে দেনা করিয়া লোকনাথবাবুকে ঋণগ্রস্ত করিয়া পীড়িত অবস্থায় কলিকাতায় আসেন। আসিয়া কিছুদিন আমার বাড়িতে থাকেন। ইহা যদিও পরবর্তী কালের ঘটনা, তথাপি এখানেই তাহার বিবরণ দিতেছি। আমি তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়া, পিতা কর্তৃক গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া, কলিকাতায় কলেজ স্কোয়ারের উত্তরে একটি গলিতে একজন ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত একগৃহে বাস করিতেছিলাম। আমার কলেজের স্কলারশিপ মাত্র ভরসা। তাহাতে একটি ঘর ভাড়া করিয়া কোনো রূপে চালাইতেছিলাম। ইহার মধ্যে উপেন্দ্রনাথ আমাকে সংবাদ না দিয়া, গুরুতর পীড়া লইয়া, স্ত্রী ও একটি শিশুপুত্র সহ কাশী হইতে আসিয়া আমার বাসার দ্বারে উপস্থিত। আমি সংবাদ পাইয়া উপেনকে সপরিবারে গাড়ি হইতে নামাইয়া নিজের ঘরে আনিলাম। একজন বন্ধু আমার পাশের ঘরে ছিলেন। তিনি এই বিপদের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ঘর ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র গেলেন। আমি উপেনের চিকিৎসার জন্য অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয়কে ডাকিলাম। তিনি আমাকে বড় ভালোবাসিতেন, তিনি বিনা পয়সায় উপেনের চিকিৎসার ভার লইলেন।

মহানুভব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সদাশয়তার এক নিদর্শন পাই, তাহা স্মরণ রাখিবার যোগ্য। আমার বাড়িতে আসিয়া উপেনের পীড়া বৃদ্ধি পাইল। এমন কি, তাঁহার জীবনের সম্বন্ধে আমরা নিরাশ হইতে লাগিলাম। এই অবস্থাতে উপেন একদিন আমাকে বলিলেন, "যদি আমার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে পার, বড় ভালো হয়। আমি বোধ হয় আর বেশি দিন বাঁচব না।" শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল না, সুতরাং আমি নিজে গিয়া অনুরোধ করিতে পারি না। কি করি, এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম। অবশেষে মনে হইল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা শ্রীনাথ দাস মহাশয়কে ধরিয়া আনিতে হইবে। তাই একদিন প্রাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গেলাম। তিনি যে উপেনের গূঢ় চরিত্রের কথা পূর্বেই শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়া, তাঁহার প্রতি হাড়ে চটিয়া ছিলেন, আমি তাহা জানিতাম না। আমি উপেনের সংশ্রবে থাকি ও তাঁহাকে বাড়িতে স্থান দিয়াছি শুনিয়াই তিনি আমাকে অনেক তিরস্কার করিলেন; বলিলেন, "কি, যাকে দেখলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জুতা মারতে ইচ্ছা করে, তার হয়ে তুই

আমাকে অনুরোধ করিস?" আমি বুঝিলাম তাঁহার দ্বারা এ কাজ হইবে না। আমি বলিলাম, "আপনি বাপ-বেটায় দেখা করিয়ে না দিলে আর কারও দ্বারা হবে না। তবে আমি যাই। কি আর করব। উপেনের শেষ অনুরোধটা রাখতে পারা গেল না।" এই বলিয়া উঠিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাকে বিরস বদনে উঠিতে দেখিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "যাস নে, রোস; মরণকালে বাপকে দেখতে চেয়েছে, শুভ বুদ্ধি হয়েছে, এটাও ভালো; দেখি কিছু করতে পারি কি না।" একটু চিন্তা করিয়াই বলিলেন, "কাল প্রাতে ৭টা-৮টার মধ্যে তার বাপকে তোর বাড়িতে আনব, তুই ঘরে থাকিস।" আমি চলিয়া আসিলাম।

তৎপরদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় যে করিয়া শ্রীনাথ দাস মহাশয়কে আমার বাসাতে আনিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহার বিবরণ এই। সেই দিন প্রাতে সাতটার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের ভবনে গিয়া উপস্থিত। উপস্থিত হইয়া শ্রীনাথবাবুকে বলিলেন, "শ্রীনাথ, তোমার গাড়ি যুততে বল দেখি, তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।" শ্রীনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন জায়গায়?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "আঃ চল না, রাস্তায় বলব।" শ্রীনাথবাবু গাড়ি যুতিতে আদেশ করিলেন। দুইজনে গাড়িতে বসিয়া শ্রীনাথবাবুদের গলি হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তায় আসিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "কোথায় নিয়ে যাচ্ছি, জানো? তোমার ছেলে উপেন পীড়িত হয়ে কাশী থেকে এসে এক বন্ধুর বাসায় উঠেছে। তার ব্যায়রাম বড় শক্ত, বাঁচে কি না সন্দেহ। সে মৃত্যু শয্যায় পড়ে তোমাকে দেখতে চেয়েছে। তাই তার বন্ধুর অনুরোধে তোমাকে নিতে এসেছি।" এই কথা শুনিয়া শ্রীনাথবাবু রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "কোচম্যান গাড়ি ফেরাও।" তাহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও; আমি নামব।" কোচম্যান গাড়ি থামাইলে তিনি যখন নামিতে যান, তখন শ্রীনাথবাবু তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এ কি? তুমি নামো যে?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "আমায় ছাড়, ছাড়। তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ বন্ধুতা। ছেলে যতই বিরাগভাজন হোক, সে মৃত্যুশয্যায় পড়ে বাবাকে দেখতে চেয়েছে, তুমি কিরূপ বাপ যে এমন সময়েও দেখা দিতে চাও না!" এই কথা শুনিয়া শ্রীনাথবাবু ধীর হইয়া বসিলেন, এবং কোচম্যানকে গাড়ি চালাইতে বলিলেন। ক্রমে তাঁহারা আমার বাড়িতে আসিলেন। শ্রীনাথবাবু পুত্রকে দেখিয়া চলিয়া গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে এই বিবরণ শুনিলাম।

যাহা হউক, পিতা-পুত্রে দেখা হইল। উপেন পিতাকে কি বলিলেন, জানি না। আমি সেখানে ছিলাম না। শুনিলাম, মাপ চাহিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণও দেখিলাম। তাহার পরে তাঁহার পিতা তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। শ্রীনাথবাবু চলিয়া গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয় দাঁড়াইয়া আমাকে উপেনের আর্থিক অবস্থার বিষয় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কপর্দক মাত্রও সম্বল নাই শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমার হাতে ১০৲ টাকা দিয়া বলিয়া গেলেন, "দেখিস, ওর স্ত্রী-পুত্র যেন না ক্লেশ পায়। টাকার অভাব হলে আমাকে বলিস। তুই কিরূপে এত ব্যয় দিবি?" যাহার প্রতি এত জাতক্রোধ ছিলেন, তাহারই দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষে জলধারা পড়িল, কি দয়া!

এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য আছে। এই সময়ে আমি সর্বদা উপেনের সাহায্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইতাম বলিয়া আমাকে অনেকে উপহাস বিদ্রূপ ও

ভর্ৎসনা করিতেন। তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে গোপনে কি শুনিয়াছিলেন, তাহা তখন জানিতাম না। আমি উপেনের পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া সকল প্রতিবাদ যেন ভুলিয়া যাইতাম। ভাবিতাম, এই মেয়েকে এই পথে আনিবার বিষয়ে আমি সাহায্য করিয়াছি, এখন ক্লেশের মধ্যে দূরে দাঁড়ানো কি আমার পক্ষে উচিত হয়? এই জন্য পুত্রসহ বাড়িতে তাহাকে স্থান দিতাম। নিজে ঋণ করিয়া উপেনের ঋণ শুধিয়া তাঁহাদিগকে আসন্ন বিপদ হইতে বাঁচাইতাম, সর্বদা তাঁহাদের বাড়িতে সংবাদ লইতাম। কিছুতেই আমাকে বিচলিত করিতে পারিত না। তখন তাঁহাদের জন্য যে ঋণ করিয়াছিলাম, তাহা শুধিতে আমার বহুদিন গিয়াছে। তাঁহাদের বিষয়ে আমার দায়িত্ব যখন স্মরণ করিতাম, তখন যথাসাধ্য সাহায্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইতাম। ইহার কয়েক বৎসর পরে উপেন বিলাতে যান, ও সেখানে কয়েদ হন। এ দেশে ফিরিয়া দেশীয় রঙ্গভূমির অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া কোনো প্রকারে কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জনের প্রয়াস পান। এই সময়ে তাঁহার পুরাতন বন্ধুরা সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। আমিও সেই সঙ্গে উপেন হইতে দূরে পড়ি।

আর একটি বিধবা বালিকার কাহিনী। এই স্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংক্রান্ত আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। যোগেন ও মহালক্ষ্মীর সহিত একত্র বাসকালে এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। যোগেনের বিবাহের কিছুদিন পরে আমরা চাঁপাতলার দীঘির পূর্ববর্তী একটি বাড়িতে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলাম। সেখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় সপ্তাহে দুই-তিনদিন আসিয়া আমাদিগকে দেখিতে লাগিলেন এবং আবশ্যকমতো সাহায্য করিতে লাগিলেন। সেই পাড়াতেই পাশের বাড়িতে একটি ছুতর জাতীয় বিধবা স্ত্রীলোক থাকিত। তাহার একটি ছয়-সাত-বৎসর বয়স্কা মেয়ে ছিল, সেটিও বিধবা। তাহার মা যখন শুনিল যে আমরা মহালক্ষ্মীর বিধবাবিবাহ দিয়াছি, তখন তাহার ইচ্ছা হইল যে নিজের বিধবা মেয়েটির আবার বিবাহ দিবে, আমাদিগকে সেই ইচ্ছা জানাইল। মেয়েটি সকাল বিকাল আমাদের বাড়িতে আসিতে ও আমাদের সঙ্গে কাল যাপন করিতে লাগিল। আমাকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিত এবং আমার গলা জড়াইয়া আমার কোলে বসিয়া থাকিত। একদিন প্রাতে সে আমার গলা জড়াইয়া কোলে বসিয়া আছে, এমন সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিলেন। মেয়েটিকে অগ্রে তিনি দেখেন নাই, আমার কোলে তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "ও মেয়েটি কে হে? বাঃ, বেশ সুন্দর মেয়েটি তো।" আমি বলিলাম, "ওটি পাশের বাড়ির একটি ছুতরের মেয়ে, আমাকে দাদা বলে, আমার কোলে বসতে ভালোবাসে। ওটি বিধবা, ওর মা ওর বিয়ে দিতে চায়, তাই আমাদের কাছে দিয়েছে।" এই কথা শুনিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় চমকাইয়া উঠিলেন; "বল কি! এইটুকু মেয়ে বিধবা!" তাহার পর তাহাকে ডাকিলেন, "আয় মা, আমার কোলে আয়।" সে তো লজ্জাতে যাইতে চায় না, আমি কোলে করিয়া তাঁহার কোলে বসাইয়া দিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বুকে ধরিয়া আদর করিতে লাগিলেন। শেষে যাইবার সময় মেয়েটিকে ও তাহার মাকে পালকি করিয়া তৎপর দিন বৈকালে তাঁহার ভবনে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন এবং আমাকে বলিয়া গেলেন, "মেয়েটিকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দেও, মাহিনা আমি দেব।"

পরদিন বৈকালে মেয়েটিকে ও তাহার মাকে পালকি করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে পাঠানো গেল। তাহারা সন্ধ্যার সময় আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী

ভগবতী দেবীর যে প্রশংসা করিল তাহা শুনিয়া আমাদের মন পুলকিত হইয়া উঠিল। শুনিলাম, ভগবতী দেবী ছুতরের মেয়ে বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করা দূরে থাকুক, মেয়েটিকে কোলে জড়াইয়াছেন, কাছে বসিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়াছেন, এবং আসিবার সময় দুজনকে কাপড় দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই মেয়েটিকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করিবার পূর্বেই সেই বাড়িতে বিষম কলেরা রোগে মহালক্ষ্মীর মৃত্যু হইল, আমাদের বাসা ভাঙিয়া গেল, আমরা ছড়াইয়া পড়িলাম। মেয়েটির মাও পাশের বাড়ি হইতে উঠিয়া গেল। মেয়েটি আমাদের হাতছাড়া হইল।

ইহার বহুদিন পরে মেয়েটির সহিত আমার আবার একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা এই সঙ্গেই বলা যাউক। তখন আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য, এবং ব্রাহ্ম-সমাজ লাইব্রেরি গৃহে বাস করি। একদিন একজন ভৃত্য কোনো স্ত্রীলোকের একখানি পত্র লইয়া উপস্থিত। খুলিয়া দেখি, সেখানি ঐ মেয়েটির পত্র। সে আমাকে লিখিয়াছে, "বহু বৎসর পূর্বে চাঁপাতলার দিঘীর কোণের এক বাড়িতে পাড়ার একটি ৭।৮ বৎসরের বালিকা আপনাকে 'দাদা' বলিত ও কোলে পিঠে উঠিত, আপনার হয়তো মনে আছে। আমি সেই হতভাগিনী। আমি বিপদে পড়িয়া আপনাকে ডাকিতেছি। একবার দয়া করিয়া আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন।" আমি মনে করিলাম, বিশেষ বিপদে না পড়িলে এতদিন পরে আমাকে স্মরণ করে নাই, আমার যাওয়াই কর্তব্য। এই ভাবিয়া তাহার বাড়িতে গেলাম। গিয়া যাহা শুনিলাম, তাহা এই। আমরা ও তাহার মা চাঁপাতলা পরিত্যাগ করিলে তাহার মা আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যায় নাই। সে বড় হইয়া উঠিলে তাহার মা তাহাকে পাপ পথে লইয়া গেল। সেই অবস্থা হইতে ক্রমে সে এক ব্যক্তির উপপত্নীরূপে বাস করিতে লাগিল ও তাহার দুইটি পুত্রসন্তান জন্মিল। তাহাদিগকে লইয়া বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় সুখেই তাহার কাল কাটিতেছিল। যে ব্যক্তি তাহাকে রাখিয়াছিল সে তাহাকে একখানি বাড়ি কিনিয়া দিয়াছিল, এবং লেখাপড়া করিয়া তাহাকে কয়েক হাজার টাকার কোম্পানির কাগজও দিয়াছিল। কিন্তু পুত্রদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই সে ব্যক্তি তাহারই বাড়িতে গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইল। এই অবস্থাতে সে ব্যক্তি কোম্পানির কাগজের লেখাপড়াগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নিজের বিবাহিতা স্ত্রী ও পুত্রের কাছে গিয়া আশ্রয় লইল। কেবলমাত্র বাড়িখানি এই মেয়েটির রহিল। ছেলে দুইটি লইয়া সে বিপদ সমুদ্রে ভাসিল। এই অবস্থাতে সে আমাকে স্মরণ করিয়াছিল।

আমি তাহার বাড়িতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুদিন পরেই দেখিলাম, তাহার এই অবস্থাতে বন্ধুতা দেখাইয়া কুলোক তাহাকে ঘিরিতেছে। তখন আমি তাহাকে সে বাড়ি ভাড়া দিয়া আমার নির্দিষ্ট অন্য কোনো স্থানে উঠিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু সে তাহা করিল না, সেই বাড়ির বাহিরের অংশ ভাড়া দিয়া ভিতরের অংশে পুত্র সহ থাকিতে লাগিল। একদিন গিয়া দেখি, একটি ১৯।২০ বৎসরের মেয়ে কোথা হইতে জুটিয়াছে, তাহার একটা ইতিবৃত্ত আমাকে বলিল, তাহা এখন স্মরণ নাই। কিন্তু ঐ মেয়ের ঘরে ফরাস বিছানা তাকিয়া বাঁধা হুকা প্রভৃতি দেখিলাম। তখন মনে হইল, নিজের রূপ যৌবন গত হওয়াতে তাহাকে অর্থোপার্জনের আশায় আনিয়াছে। তখন আমি বলিলাম, "এই আমার তোমার ভবনে শেষ আসা।"

আমার এই ভগিনীকে অনেক দিন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু তাহার বিষয় স্মরণ করিয়া এখনও দুঃখ হয়। সে এতদিন পরে 'দাদা' বলিয়া স্মরণ করিল,

তাহাকে যে হাতে ধরিয়া বিপথ হইতে সৎপথে আনিতে পারিলাম না, এই বড় দুঃখ রহিয়া গেল।

মাতৃস্নেহের প্রতিদ্বন্দ্বী আমার ঝি। মহালক্ষ্মী বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা অদ্যাপি স্মৃতিতে উজ্জ্বল রহিয়াছে। একদিন মহালক্ষ্মীর ভাই ঈশান আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের হাসপাতালে একটি স্ত্রীলোক আসিয়াছে, তাহার গলায় ঘা হইয়া গলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, গলদেশে ছেঁদা করিয়া তদ্দ্বারা আহার করানো হইতেছে। তৎপরে আর একদিন বলিলেন যে, সে স্ত্রীলোকটি কাঁদিয়া তাঁহাকে বলিয়াছে, "দাদা ঠাকুর, আমাকে রক্ষা কর, একটা কাজ জুটিয়ে দাও, সুস্থ হয়ে আমাকে যেন আর পূর্বের ঘৃণিত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হতে না হয়।" শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। আমি ঈশানকে বলিলাম, "তার একটা কাজের যোগাড় করে দাও। সে যখন বাঁচতে চায় তাকে বাঁচাও, এটা একটা অবশ্য কর্তব্য কর্ম।" শুনিয়া ঈশান হাসিয়া বলিলেন, "হাঃ! আমার আর কাজ নেই, আমি ওর চাকুরী খুঁজতে বেরুই!" আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আমাদের বাড়িতে চাকরানী করে আন না কেন?" ঈশান সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

কিন্তু আমার মনটা সুস্থির হইতে পারিল না। আমি ঈশানের মাকে ও মহালক্ষ্মীকে বুঝাইয়া তাহাকে আমাদের বাড়িতে চাকরানীর কাজে আনিলাম। সে বোধ হয় মেয়েদের নিকট শুনিল যে আমিই প্রধান উদ্যোগী হইয়া তাহাকে আনিয়াছি, কারণ, দেখিতে লাগিলাম যে আমার দিকে তাহার বিশেষ মনোযোগ। সে আমার নাম রাখিল 'ভালোমানুষবাবু'। এই 'ভালোমানুষবাবু' নাম আমার অনেক দিন ছিল। আমি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করার পর প্রসন্নময়ীকে যখন আনিলাম, তখন তিনিও এই ঝির মুখে শুনিয়া আমাকে 'ভালোমানুষবাবু' বলিয়া ডাকিতেন।

এই ঝির কথা এই জন্য মনে আছে যে, আমার প্রতি তাহার ভালোবাসার গভীরতা দেখিয়া একবার আমার মা চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। একবার তিনি মহালক্ষ্মীর মৃত্যুর পর চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন। তখন তাঁহাকে একটি স্বতন্ত্র বাড়িতে রাখিয়া ঐ ঝিকে তাঁহার পরিচর্যার জন্য দি। একদিন মা আমাকে বলিলেন, "ও রে দেখ্, তোকে আমার চেয়েও কেউ ভালোবাসে, এটা আমার সহ্য হয় না।"

আমি (বিস্মিতভাবে)। সে কি! তোমার চেয়ে তো কেউ আমাকে ভালোবাসে না।

মা। না রে, তোর ঝি আমার চেয়ে তোকে ভালোবাসে।

আমি (হাসিয়া)। এমন কথাও তুমি বল! এ কথা তোমার কেন মনে হল?

তখন শুনিলাম, মা দেখিয়াছেন যে, তিনি ঝিকে একপ্রকার বাজার করিয়া আনিতে বলেন, সে সে-পরামর্শ ভাঙিয়া চুরিয়া আর এক প্রকার করিয়া আনে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, 'ভালোমানুষবাবু' ঐ সব ভালোবাসেন। কেবল তা নয়, মা রাঁধিতে বসিলে সে রান্নাঘরের দ্বার চাপিয়া বসে, এবং 'এই রকম ক'রে রাঁধ,' 'ঐ রকম ক'রে রাঁধ,' বলিয়া অনুরোধ করিতে থাকে। মা হাসিয়া বলেন, "ও রে, আমার পেটের ছেলে, ও কি ভালোবাসে না বাসে তা কি আমি জানি না?"— পরে আমরা কলিকাতা ত্যাগ করিলে এই ঝি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিল।

সাধে কি আমি নারীজাতিকে ভালোবাসি! যে পাপে ডুবিয়াছিল, পাপ যার দৈনিক আচরণ হইয়াছিল, তাহারও হৃদয়ে এই প্রেমের শক্তি, তাহারও এই কৃতজ্ঞতা! আমার চাকর-ভাগ্য চিরদিনই ভালো। ইহার প্রমাণ পরে আরও প্রদত্ত হইবে।

বেণীসংহার নাটকে যুধিষ্ঠিরের ভূমিকা অভিনয়। ১৮৬৯ সালের বসন্ত কালে আমরা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ মিলিয়া শোভাবাজারের রাজবাড়ির নাটমন্দিরে সংস্কৃত বেণীসংহার নাটকের অভিনয় করিলাম। তাহার বিবরণ এই। সে বারে বি. এ. পরীক্ষাতে সংস্কৃত বেণীসংহার পাঠ্য ছিল। আমাদের কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা মনে করিলেন, সংস্কৃত বেণীসংহার অভিনয় করিয়া দেখাইলে বি. এ. ক্লাসের ছেলেদের বিশেষ উপকার হইতে পারে। এই ভাবিয়া তাঁহারা বেণীসংহারের অভিনয়ের যোগাড় করিতে লাগিলেন। অগ্রে তাঁহারা আমাকে সে সংবাদ দেন নাই, অথবা আমাকে তাঁহাদিগের পরামর্শের অংশী করেন নাই। যখন তাঁহাদের কাজটা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছে, তখন আসিয়া আমাকে তাহাতে যোগ দিবার জন্য ধরিলেন। আমার পরামর্শটা মন্দ বোধ হইল না। বিশেষত অভিনয় দেখা আমার বাতিক। বর্তমান বঙ্গ রঙ্গভূমি সকলে বারাঙ্গনা অভিনেত্রী প্রবিষ্ট করিবার পূর্বে আমি প্রায় প্রতি শনিবার অভিনয় দেখিতে যাইতাম। স্মরণ আছে যে সোমপ্রকাশের প্রতিনিধিরূপে হরিনাভি হইতে অভিনয় দেখিতে কলিকাতায় আসিতাম। বারাঙ্গনা অভিনেত্রী যেদিন হইতে আসিল, সেদিন হইতে আমার অন্তর্ধান।

সে যাহা হউক, সহাধ্যায়ী ছাত্রেরা যখন আমাকে ডাকিল, তখন তাহাদের কমিটিতে থাকিতে রাজি হইলাম এবং নিজে একজন অভিনেতা হইতে প্রস্তুত হইলাম। আমি হইলাম যুধিষ্ঠির, আমার বন্ধু যোগেন্দ্র হইলেন অর্জুন, ও অপর বন্ধু উমেশ হইলেন অশ্বত্থামা। কলেজের নিম্নশ্রেণীর কয়েকটি সুন্দর সুন্দর ছেলেকে মেয়েদের পার্ট দেওয়া গেল। আমরা মোহাড়া দিয়া সকলকে উত্তমরূপে শিখাইয়া, শোভাবাজারের রাজবাড়ির নাটমন্দির ঠিক করিয়া, কলিকাতা হুগলী কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কলেজ সকলের বি. এ. ক্লাসের ছাত্রদিগকে টিকিট প্রেরণ করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছি, এমন সময়ে এই অভিনয়ের বিরুদ্ধে আমাদের কলেজের মধ্যেই মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। পণ্ডিতমহাশয়েরা বলিতে লাগিলেন যে, ছেলেরা পড়াশোনা ছাড়িয়া কেবল অভিনয় লইয়া মাতিয়াছে। আর বাস্তবিক তাঁহাদের অভিযোগ করিবার কারণও ছিল। আমরা যাহাদিগকে অভিনেতা করিয়াছিলাম, তাহারা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল। যাহাকে দুর্যোধন করিয়াছিলাম সে ভানুমতীকে ক্লাসের মধ্যেই 'প্রেয়সী' বলিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং তাহার কণ্ঠালিঙ্গন প্রভৃতি করিতে লাগিল, ইত্যাদি। এই সব কারণে পণ্ডিতমহাশয়দিগের আপত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। আমি ইহার মধ্যে আছি জানিয়া তাঁহারা একদিন আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি গিয়া দেখি যে, সভাতে আমাদের প্রিন্সিপাল, বড়-বড় অধ্যাপকগণ, আমার মাতুলমহাশয়, ও অপরাপর পণ্ডিতগণ সকলেই সমাসীন আছেন। আমি তো দেখিয়াই কাঁপিয়া গেলাম। দণ্ডার্হ অপরাধীর ন্যায় তাঁহাদের সম্মুখে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইলাম। প্রিন্সিপাল সর্বাধিকারী মহাশয় তাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপ হইয়া বলিলেন, "আমাদের কাহারও ইচ্ছা নয় যে, তোমরা এই অভিনয় কর, ছেলেরা খারাপ হইয়া যাইতেছে। তুমি ইহার ভিতর কিরূপে গেলে?"

আমি। আজ্ঞে, আমি আগে ইহার ভিতর ছিলাম না, পরে গিয়াছি। এবার বেণীসংহার বি. এ. কোর্সে আছে, অভিনয় করিয়া দেখাইলে আমাদেরও উপকার, অন্য ছেলেদেরও উপকার।

প্রিন্সিপাল। তাহা হইলেও কলেজের ছেলে খারাপ করা কি ভালো?

আমি। যা কিছু দেখিতেছেন দুদিনের জন্য, তাহার পর সব থামিয়া যাইবে।

একজন অধ্যাপক। না না, তাহা হইবে না। ও সব বন্ধ করিয়া দাও।

আমি। মহাশয়দের অনভিমতে আমার কিছু করিবার ইচ্ছা নয়। আপনারা নিষেধ করিলে এখনি ও সব থামিয়া যাওয়া উচিত। তবে মহাশয়দিগকে একটা কথা ভাবিতে বলি। অভিনয়ের আর তিন-চারদিন আছে, হুগলী কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কলেজের ছেলেদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, এখন না করিলে আমাদের বড় লজ্জার কথা। অন্তত একবার অভিনয়ের জন্য অনুমতি দিন।

প্রিন্সিপাল। আচ্ছা, তুমি যাও। আমরা বিবেচনা করি, তাহার পর তোমায় আবার ডাকিব।

আমি তো 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিলাম। বন্ধু দলে আসিয়া সংবাদ দিলে মহা উত্তেজনা দৃষ্ট হইল। তাহাদিগকে থামাইতে অনেক সময় গেল। অবশেষে অধ্যাপকগণ আবার ডাকিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা একবার মাত্র অভিনয় করিতে পার। তবে তোমাকে তিনটি কাজ করিতে হইবে। প্রথম, নিম্নশ্রেণীর যে সকল বালককে অভিনয়ে লইয়াছ, তাহাদের অভিভাবকদের অনুমতি আনিতে হইবে। দ্বিতীয়, অভিনয় স্থলে গায়ক ও বাদকদের সঙ্গে কলেজের ছেলেদিগকে মিশিতে দিবে না। তৃতীয়, নিম্নশ্রেণীর ছেলেদিগকে ঘরে পাঠাইয়া তবে তুমি সে-স্থান ত্যাগ করিবে।" আমি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহাতেই সম্মত হইলাম।

যথাসময়ে রাজবাড়িতে অভিনয় হইল। অধ্যাপকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় বেশ হইল, কিন্তু আমার সেদিন গুরুতর দায়িত্বভারে আমোদ করিবার সময় হইল না। গায়ক ও বাদকদিগকে প্লাটফর্মের নিচে বসাইয়া বেড়া দিয়া দিয়াছিলাম। নিজে সমস্ত সময় সাজঘরের ভিতর ছিলাম, কেবল নিজের অভিনয়ের সময় বাহিরে আসিয়াছিলাম, এবং রাত্রি একটার সময় অভিনয় শেষ হইলে, প্রায় রাত্রি তিনটা পর্যন্ত বসিয়া ছিলাম, সকল অভিনেতাকে গাড়ি আনাইয়া বাড়িতে পাঠাইয়া তবে নিজে বাড়িতে গিয়াছিলাম। এই জন্য এই অভিনয়ের কথাটা এতদিন স্মরণ রহিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ

ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ। এখন আমার ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের বিবরণ বলি। ১৮৬৫ সালে আমার হৃদয় পরিবর্তনের দিন হইতে আমি কিরূপে অল্পে-অল্পে ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়া ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিলাম, তাহা অগ্রেই বর্ণনা করিয়াছি। বাস্তবিক, তদবধি এই ১৮৬৮ সালের শেষ পর্যন্ত আমার হৃদয়ে ব্যাকুলতা অগ্নির মতো জ্বলিতেছিল। আমার অনেক পুরাতন কুৎসিত অভ্যাস ত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম। যাহাতে নীতি বা ধর্মের উপদেশ আছে এরূপ কোনো গ্রন্থ পাইলেই তাহা অতি উপাদেয় বোধ হইত, এবং তাহা আর ছাড়িতে ইচ্ছা হইত না। এই কারণে বড়লোকদিগের জীবনচরিত পড়িতে ভালো লাগিত।

এই জীবনচরিত পড়ার বাতিকটা এখনো আছে। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, ধর্ম-বিজ্ঞান (থিওলজি) অপেক্ষা ধর্মজীবনের (প্র্যাকটিকাল রিলিজান) প্রতি আমার চিরদিন অধিক দৃষ্টি। অথচ ভাবিতে ক্লেশ হয়, লিখিতে চক্ষে জল আসিতেছে, এই প্র্যাকটিকাল রিলিজানেই আমি সর্বাপেক্ষা অধিক হারিয়া গিয়াছি। আমার আকাঙ্ক্ষা চিরদিন আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে রহিয়াছে, কিন্তু প্রবৃত্তি সকলকে সকল সময়ে সে আকাঙ্ক্ষার বশীভূত করিতে পারি নাই। নিজের নানা প্রকার দুর্বলতার সহিত মহা সংগ্রামে বাস করিতে হইয়াছে।

যাহা হউক, এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আমি অনেক জীবনচরিত পড়িয়া ফেলি। স্মরণ আছে যে, প্রতিদিন বৈকালে কলেজ হইতে আসিয়া 'বীটনস্ বাইওগ্রাফিকাল ডিকশানারি' হইতে বড় বড় লোকের জীবনচরিত পড়িতাম। মানুষ সংগ্রাম করিয়া প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজের জীবনের মহত্ত্ব সাধন করিয়াছে, ইহা দেখিলে আমার আনন্দ হয়, ভাবিতে সুখ হয়; আমি তাহার মধ্যে মানব জীবনের দায়িত্ব ও ঈশ্বরের কৃপার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাই। জীবনচরিত ভিন্ন আরও কয়েকখানি গ্রন্থে এই উপকার পাইয়াছিলাম। থিওডোর পার্কারের গ্রন্থাবলীর উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি। নিউম্যানের 'সোল্'-ও বোধ হয় এই সময় পড়িয়া থাকিব। তৎপরে আমাদের এল. এ. কোর্সে আর্থার হেল্পস-এর 'এসেজ রিটন্ ইন দি ইণ্টারভালস্ অভ বিজনেস্' ছিল। তাহা দ্বারা এত উপকৃত হইয়াছিলাম যে সেই সূত্রে হেল্পস-এর 'ফ্রেণ্ডস্ ইন কাউন্সিল' আনিয়া পড়ি। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, আমার ধর্মজীবনের সেই প্রথমোদ্যমে আমি উভয় গ্রন্থ হইতে বিশেষ সাহায্য পাই। তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৌখিক ও লিখিত উপদেশ, তাহাতে আমাকে কি শক্তি কি সাহায্য দিত, তাহা বলিতে পারি না। এক-একদিন তাঁহার উপদেশ শুনিয়া দশ-বারোদিন সেই নেশাতে থাকিতাম। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ঐ সময় আমার জ্ঞানের

বুভুক্ষা অতিশয় প্রবল ছিল। যখনই কোনো ভালো গ্রন্থ হাতে পাইতাম, অমনি ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র যেমন আমিষ খণ্ডের উপরে পড়ে, সেই ভাবে তাহার উপরে পড়িতাম।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গঠন কার্যে যে কয়েক বৎসর ব্যাপৃত ছিলাম, সে কয়েক বৎসর কার্যের ভিড়ে পড়িয়া আমার এই বুভুক্ষাকে সম্পূর্ণ চরিতার্থ করিতে পারিতাম না। আবার এতদিনের পরে সেই বুভুক্ষা প্রাণে জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু হায়! আর সে শক্তি নাই। এখন মনে হয়, আবার যদি যৌবনের শক্তি পাই ও মনের মতো লাইব্রেরি পাই, একবার প্রাণ ভরিয়া পড়ি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজ। আমার ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকর্ষণ ১৮৬৫ সাল হইতে জন্মিলেও আমি এতদিন পর্যন্ত লজ্জাবশত কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে দূরে থাকিতাম, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। যত দূর মনে হয়, ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের উন্নতিশীল দল অপেক্ষা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আদি সমাজের দিকেই আমার অধিক আকর্ষণ ছিল। আমার যত দূর স্মরণ হয়, আমার জ্ঞাতি দাদা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (যিনি আদি সমাজের ব্রাহ্ম ও তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ছিলেন এবং আমার নিকট সর্বদা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রশংসা ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের নিন্দা করিতেন) তিনিই এই আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিলেন। আমার মাতুল স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও উন্নতিশীল দলের পক্ষে ছিলেন না, তাহাও একটা কারণ হইতে পারে। সেই কারণে উন্নতিশীলদের কথাবার্তা কাজকর্ম যেন ভালো লাগিত না। বস্তুত উন্নতিশীল দলের সঙ্গে আমি অধিক সংস্রব রাখিতাম না। তবে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ ত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম।

কেশব সেনের উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ। ১৮৬৮ সালের প্রারম্ভ অবধি উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের সহিত যোগ কিঞ্চিৎ গাঢ়তর হয়। তাহা এই প্রকারে ঘটে। ঐ বৎসরের প্রারম্ভে শুনিলাম, মাঘোৎসবের সময় উন্নতিশীল দল আপনাদের উপাসনা মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিবেন এবং তদুপলক্ষে নগরকীর্তন হইবে। এই সংবাদে আমার মাতুল-মহাশয় তাঁহার কাগজে ও কথাবার্তাতে ইহাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, "এ নেড়ানেড়ী কাণ্ড কেন?" তদ্ভিন্ন হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ও অনেক উপহাস বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। সর্বোপরি, আমি শাক্ত বংশের ছেলে, বৈষ্ণবদের কীর্তনের প্রতি পূর্বাবধি অতিশয় অশ্রদ্ধা ছিল। এমন কি, কোনো যাত্রা গান শুনিতে গিয়া যদি দেখিতাম খোল করতাল আসিল ও কীর্তন আরম্ভ হইল, অনেক সময় সে স্থান পরিত্যাগ করিতাম। আমি ভাবিলাম, উন্নতিশীল দল রাস্তাতে ঢলাঢলি করিতে যাইতেছে। এই ভাবিয়া বিরক্ত চিত্তে ১১ই মাঘ সকালবেলা সে দলের দিকে না গিয়া আদি সমাজের উপাসনাতে গেলাম। উপাসনান্তে আদি সমাজের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছি, এমন সময় কয়েকজন বাবু আসিতেছেন, তাঁহারা বলিতে বলিতে আসিতেছেন, "মহাশয়, দেখলেন না তো, কেশব শহর মাতিয়ে তুলেছেন।"

নগরকীর্তনে হাস্যাস্পদ না হইয়া কৃতকার্য হইয়াছে, এই কথাটা বড় নূতন লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, সে কি রকম?" তখন তাঁহারা আমার হস্তে নগর কীর্তনের কাগজ দিলেন। আমি সেই সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে আছে—

তোরা আয় রে ভাই, এত দিনে দুঃখের নিশি হল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার। ইত্যাদি।

এই আহ্বান ধ্বনি আমার প্রাণে বাজিল, আমার যেন মনে হইল, আমাকে ডাকিতেছে। ইহাতে ব্রাহ্মধর্মের যে আদর্শ আমার নিকট ধরিল, তাহাতে আমার প্রাণ মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইঁহাদের উৎসব হবে কোথায়?" শুনিলাম সিন্দুরিয়াপটীস্থ গোপাল মল্লিকের বাড়িতে, আমি সেইদিকে চলিলাম। উপাসনার পর প্রাতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল, তখন আর তাহা মনে থাকিল না। গোপাল মল্লিকের বাড়িতে গিয়া দেখি, কেশববাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় বাড়ি সাজাইতেছেন। তখনো উন্নতিশীল দলের লোকেরা সেখানে আসিয়া পেঁছান নাই। তখন আবার কলুটোলা কেশব-বাবুর ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। গিয়া দেখি, কেশববাবুরা সদলে সবে ফিরিয়া আসিয়া, ভিক্ষার ঝুলিতে যে টাকা পাইয়াছেন তাহা গুণিতেছেন। আমার পুরাতন সহাধ্যায়ী বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সে সঙ্গে আছেন। গোঁসাইজী আমাকে দেখিয়াই "কি ভাই!" বলিয়া আসিয়া আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন। সেই আমাকে উন্নতিশীল দলের সঙ্গে যেন বাঁধিয়া ফেলিলেন। তৎপরে আমি তাঁহাদের সঙ্গে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে গেলাম। তাঁহারা সেদিন আহার করিলেন না, আমারও আহারের কথা মনে রহিল না। উৎসব-মন্দিরে গিয়া সমস্ত দিন উৎসব চলিল। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে এক কোণে যে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই কোণেই সমস্ত দিন ও রাত্রি দশটা পর্যন্ত দাঁড়াইয়া যোগ দিলাম। সমস্ত দিন যে-কিছু কাজ হইল আমি যেন তাহার ভিতর নিমগ্ন রহিলাম।

সায়ংকালে গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স আসিলেন। সেদিন কেশববাবু রিজেনারেটিং ফেইথ্ বিষয়ে উপদেশ দিলেন। এরূপ উপদেশ আমি অল্পই শুনিয়াছি। ধর্মবিশ্বাস যদি নবজীবন আনিয়া না দেয় তবে তাহা ধর্মবিশ্বাস নয়, এই সত্য আমার সমক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য একটা নূতন দ্বার যেন খুলিয়া দিল। আমি উন্নতিশীল দলের সঙ্গে হাড়ে-হাড়ে বাঁধা পড়িলাম।

অথচ শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য বোধ করিবেন যে, ইহার পরও আমি তাঁহাদিগের সঙ্গ হইতে লজ্জাবশত দূরে থাকিতাম। তখন আমি প্রতিদিন ব্রাহ্মোপাসনা করিতাম (যদিও উপবীতটা তখন ছিল), কিন্তু ব্রাহ্মদের সঙ্গে বড় মিশিতাম না। মধ্যে-মধ্যে রবিবারে প্রাতে কেশববাবুর কলুটোলার বাড়িতে উপাসনাতে যোগ দিতে যাইতাম। কিন্তু কীর্তনের সময় ব্রাহ্মদিগের অনেকে গড়াগড়ি দিতেন, নানা প্রকার চীৎকার করিতেন, পরস্পরে পা ধরাধরি করিতেন, ও কেশববাবুর পায়ে পড়িতেন, এজন্য ভালো করিয়া উপাসনাতে যোগ দিবার ব্যাঘাত হইত। সেই কারণে সর্বদা যাইতাম না, মধ্যে-মধ্যে যাইতাম মাত্র।

নরপূজার আন্দোলন। এই ১৮৬৮ সালের অক্টোবর মাসে মুঙ্গের হইতে ব্রাহ্মসমাজে নরপূজার আন্দোলন উঠে। আমাদের বন্ধুদ্বয় বাবু যদুনাথ চক্রবর্তী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সংবাদপত্রে প্রচার করিয়া দেন যে, ব্রাহ্মেরা কেশববাবুকে 'প্রভু ত্রাণকর্তা'

প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, তাঁহার চরণে ধরিয়া পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহা লইয়া দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং যদুনাথ চক্রবর্তী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কেশবের দলকে পরিত্যাগ করিয়া যান। গোঁসাইজী নিজের শান্তিপুরের বাটীতে গিয়া চিকিৎসা কার্য আরম্ভ করিলেন। আমার স্মরণ হয়, আমি এই বৎসরের মধ্যে শান্তিপুরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি আমার সহাধ্যায়ী, তাঁহার মুখে সমুদয় শ্রবণ করা উদ্দেশ্য ছিল।

আমার স্মরণ আছে, উন্নতিশীল দলে এই বিবাদ বাধাতে আমি মর্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছিলাম। ইহাতে কেশববাবু হইতে আমার চিত্ত বিচ্ছিন্ন হয় নাই, তাঁহাদিগকে নরপূজা অপরাধে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস জন্মে নাই, ব্রাহ্মদিগের আচরণকে কেবলমাত্র ভক্তি প্রকাশের আতিশয্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কিন্তু কেশব-বাবুর পত্রিকাতে প্রতিবাদকারীদের কথার উত্তর যে ভাবে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে লোকচক্ষে হীন করিবার জন্য যেরূপ প্রয়াস পাওয়া হইয়াছিল, তাহা সত্য ও ন্যায়ের অনুগত ব্যবহার নয় বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছিল। যাহা হউক, ১৮৬৯ সালের প্রারম্ভে গোঁসাইজী তাঁহার ভুল স্বীকার করিয়া যখন আবার কেশব-বাবুর সহিত সম্মিলিত হইতে চাহিলেন, তখন যেন আমার হৃদয়ের একটা ভার নামিয়া গেল। এই পুনর্মিলন উপলক্ষে রাণাঘাটের সন্নিহিত কলাইঘাটা নামক স্থানে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে, একটা উৎসব হয়। ঐখানে গোঁসাইজী তখন সপরিবারে বাস করিতেন। আমি অপরাপর ব্রাহ্মের সহিত সেদিন সেখানে গমন করি। তৎপূর্বে কেশববাবুর সহিত সাক্ষাৎ ভাবে আমার আলাপ-পরিচয় হয় নাই। সেই উৎসব ক্ষেত্রে আলোচনা স্থলে নরপূজার আন্দোলনের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, আমি বলি, "মিরারে ও ধর্মতত্ত্বে কে লেখেন তাহা আমি জানি না, কিন্তু উক্ত উভয় পত্রিকাতে যে ভাবে গোঁসাইজী ও যদুবাবুর কথার উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহা ন্যায় ও ভদ্রতার অনুগত ব্যবহার নহে।" ইহাতে কেশববাবু কানে-কানে অপর একজনকে আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলিয়া দিলেন, "সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভাগিনা।" এটা মনে আছে, কেশববাবু সেই দিন হইতে আমাকে বিশেষ ভাবে দেখিলেন ও চিনিলেন। আমি সে যাত্রা কেশববাবুর সুপ্রসন্ন সরল ও স্বাভাবিক ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর তিনি সশিষ্যে কীর্তন করিতে করিতে নৌকাযোগে চূর্ণী নদীতে বেড়াইতে গেলেন। আমরা যাই নাই। প্রাতে উঠিয়া দেখি, কেশববাবু ব্রাহ্মদের পায়ের তলাতে এক পাশে পড়িয়া ঘুমাইতেছেন। আহার করিতে বসিয়া দেখিতাম, তাঁহার বড়মানুষী কিছুই নাই, সামান্য ডাল ভাত মনের আনন্দে আহার করিতেছেন। এ সকল আমার বড় ভালো লাগিত।

প্রকাশ্যে দীক্ষাগ্রহণ ও উপবীত ত্যাগ। ক্রমে ১৮৬৯ সালের ৭ই ভাদ্র (২২শে আগস্ট) ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন আসিল। তখন কয়েকজন যুবককে দীক্ষিত করিবার প্রস্তাব হইল। আমার কোনো কোনো বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি দীক্ষিত হইতে প্রস্তুত কি না। আমি বলিলাম, প্রকাশ্যে দীক্ষাটা তো বাড়ার ভাগ, আমি তো ব্রাহ্মই আছি। যাহা হউক, অপরাপর যুবকের সহিত আমিও উক্ত দিবস দীক্ষাগ্রহণ করিব, এইরূপ স্থির হইল। তদনুসারে আমরা ২১ জন যুবক

দীক্ষিত হইলাম। তন্মধ্যে কেশববাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, আমার সম্মানিত বন্ধু আনন্দমোহন বসু, পরলোকগত বন্ধু রজনীনাথ রায় ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীনাথ দত্ত মহাশয়দিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা চিরদিন ব্রাহ্মধর্মের ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইলেই, উপবীতটি আর রাখিব কি না, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল। তৎপূর্বে উপবীত কখনো আমার গলায় থাকিত, কখনো থাকিত না; দীক্ষার সময়ে ছিল না। আমি স্থির করিলাম, আর লইব না। কিন্তু এই বিষয় লইয়া আত্মীয়-স্বজনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইল।

আমি চিরদিন দেখিতেছি, কোনো একটা গুরুতর কর্তব্য স্থির করিলে তাহা করিয়া উঠিতে আমার বিলম্ব হয়। তদুপযোগী বল আমার প্রকৃতিতে একেবারে আসে না। বার-বার উঠি ও পড়ি, প্রবৃত্তিকুলের সহিত প্রবল সংগ্রাম করিতে হয়; কখনো তাহারা জয়লাভ করে, কখনো আমি জয়লাভ করি; অবশেষে কিছুদিনের পর বল পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াই। এক লম্ফে স্বর্গে উঠা, এক উদ্যমে নিষ্কৃতি লাভ করা, এক প্রতিজ্ঞাতে প্রবৃত্তি দমন করিয়া ফেলা, আমার ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া এই স্থির জানিয়াছি, আমি যখন উঠিতে চাহিতেছি তখনো যে পড়িয়া যাই, ইহাতে ঈশ্বর আমাকে দেখাইতে চান যে, যে-শত্রুর হস্তে আমি অগ্রে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাহার শৃঙ্খল হঠাৎ ভগ্ন করা কত কঠিন। ইহাতে যে-পাপ ত্যাগ করিতেছি তাহার প্রতি ঘৃণা বাড়ে, এবং ব্যাকুলতাও বাড়ে।

মানসিক ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব। যাহা হউক, আমি উপবীত রাখিব না, এরূপ সঙ্কল্প করিয়াও তাহা ত্যাগ করিতে কিছুদিন গেল। প্রথমে মাতাঠাকুরাণী এই সংবাদ পাইবামাত্র মাতুলালয়ে আসিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং কাঁদিয়া কাটিয়া উপবীতটা আমার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া গেলেন। তৎপরে যাহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, সেই উপবীত ফেলার বিরুদ্ধে বলে। আর আমি ভাবিতে গেলেও সম্মুখে বড় বিপদ দেখি। আমি পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র। উন্মাদিনী গত হওয়ার পর আর তিনটি ভগিনী হইয়াছে, তাহারা সকলেই ছোট। আমি পিতা-মাতার একমাত্র অবলম্বন। লোকে যখন বলে, মা মরিবে, বাবা পাগল হইয়া যাইবেন, তখন কিছুই বিচিত্র মনে হয় না। কি করি, কি করি, এমন কঠিন সমস্যা আমার জীবনে কখনো উপস্থিত হয় নাই। এদিকে উপবীত রাখিয়া উপাসনা করিতে যাই, উপাসনা করিতে পারি না। কে যেন হৃদয়ে থাকিয়া 'ছি ছি' বলে, কে যেন আমাকে চায়, কে যেন আমাকে ডাকে। এইরূপ মানসিক আন্দোলনে আমার শরীর ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল, হজম শক্তি নষ্ট হইয়া দারুণ উদরাময়ে ধরিল। অবশেষে আমি অনন্যগতি হইয়া ঈশ্বর চরণে পড়িলাম, আপনার বিচার ও কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিলাম। প্রার্থনাতে বার বার বলিতে লাগিলাম, "তুমি আমাকে লইয়া যাহা হয় কর।" কি আশ্চর্য! কিছুদিনের মধ্যে হৃদয়ে আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম। এত যে ভয় বিভীষিকা, কোথায় যেন পলাইয়া গেল! আমার মনে অভূতপূর্ব বল ও উৎসাহ আসিল। উঠিতে বসিতে, শুইতে জাগিতে, কি এক অপূর্ব আশ্বাস বাণী শুনিতে লাগিলাম। কে যেন বলিতে লাগিলেন, "তোমার কাজ আছে, তোমাকে চাই, তুমি অগ্রসর হইয়া চল।" আমি তখন আমার পত্রে পিতাকে এই কথা লিখিয়াছিলাম, তিনি পড়িয়া নিশ্চয়ই হাসিয়া থাকিবেন। আমি উপবীত ফেলিয়া দিলাম। কিরূপে বাধ্য হইয়া এ কাজ করিলাম,

তাহা পিতাঠাকুরমহাশয়কে লিখিলাম। তিনি সে পত্র আমার মাতুলের নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে ডাকাইয়া কথা কহিতে অনুরোধ করিলেন।

মাতুলমহাশয় আমাকে তাঁহার বাড়িতে ডাকাইয়া, সাধারণ ভাবে আমার সহিত উপবীত ত্যাগ সম্বন্ধে ও ধর্মভাব সম্বন্ধে তর্ক করিলেন। এই স্থানে বলা কর্তব্য, আমার মাতুল অতিশয় ধর্মভীরু ও উদারচেতা মানুষ ছিলেন, কাহারও ধর্মভাবের উপরে হাত দেওয়া তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। তিনি রাগ উষ্মা প্রভৃতি কিছুই করিলেন না; বন্ধুতে-বন্ধুতে যেরূপ কথাবার্তা হয়, সেইরূপ সৌজন্যের সহিত আমার সঙ্গে কথা কহিলেন। পরে আমি চলিয়া আসিলে আমার পিতাকে লিখিলেন, "মানুষের অনেক প্রকার অন্ধতা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ধর্মান্ধতাও এক প্রকার। ইহার ধর্মান্ধতা হইয়াছে, বল প্রয়োগে যে কিছু হইবে এরূপ মনে হয় না।" আমি পিতার ফাইল হইতে সে পত্র পরে দেখিয়াছি।

পিতৃবিচ্ছেদ। কিন্তু পিতাঠাকুর মাতুলের পরামর্শ শুনিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন, এবং প্রায় একমাস কাল আমাকে এক প্রকার নজরবন্দী করিয়া ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ব্রাহ্মণের ছেলের পক্ষে উপবীত ত্যাগ তখন তৎপ্রদেশে নূতন কথা, কেহ কখনো শোনে নাই। সুতরাং এই সংবাদে সমুদয় গ্রামের লোক ভাঙিয়া পড়িল। এমন কি, দুই-চারি ক্রোশ দূর গ্রামের চাষার মেয়েরা পর্যন্ত আমাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। তাহারা তখন আমার বিষয়ে কি ভাবিত, তাহা ভাবিলে এখন হাসি পায়। একদিন প্রাতে বসিয়া পড়িতেছি, এমন সময় কয়েকটি চাষার মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নিঃশ্বাস পড়ে কি না পড়ে, এমনি তন্মনস্ক! আমার হস্ত-পদের প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি যখন বলিলাম, "মা, একটু তেল দাও, নেয়ে আসি," তখন একটি স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল, "মা ঠাকরুণ, কথা কয়?" মা বলিলেন, "কথা কবে না কেন?" শুনিয়া আমার ভয়ানক হাসি পাইল। ভাবিলাম, আমি যেটা কর্তব্য বোধে করিতেছি, সেটা ইহাদের নিকট পাগলামি। শিক্ষাতে কি প্রভেদই ঘটাইয়াছে! আর একদিন বৈকালে একটি স্বসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোক আসিয়া দেখেন যে আমি মুড়ি খাইতেছি। দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "ও মা, এই যে মুড়ি খায়, কে বলে আমাদের মধ্যে নাই?" তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, আমি কিম্ভূতকিমাকার হইয়া গিয়াছি।

যাহা হউক, আমার বাবা আমাকে মাসাধিক কাল আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই সময়ের মধ্যে দিবারাত্র লোকের সমাগম, ও একই কথা, একই তর্ক, একই যুক্তি, একই আপত্তি, একই গালাগালি। কতই বা তর্ক করিব, কতই বা উত্তর দিব? আমি একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করিলাম। যিনি যাহা বলিতেন বা তিরস্কার করিতেন, দ্বিরুক্তি করিতাম না। শেষে বাবা আর আমাকে আবদ্ধ রাখা বিফল বোধে আমাকে বিদায় দিলেন। সেদিনের কথা মনে হইলে আর চক্ষের জল রাখিতে পারি না। তিনি অতি সহৃদয় মানুষ ছিলেন। তাঁহার ভিতরে নীচতা কিছুমাত্র ছিল না। তিনি আমার প্রয়োজনীয় সমুদয় জিনিসপত্র দিয়া নিজ ব্যয়ে আমাকে কলিকাতা পাঠাইলেন। তখন বুঝি নাই যে, আমাকে জন্মের মতো বর্জন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন। সেই অবধি ১৮ কি ১৯ বৎসর আমার মুখ দর্শন করেন নাই বা আমার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই।

আমার পিতা আমাকে গৃহ হইতে বিদায় দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আমার

মুখ দর্শন করিবেন না। কিন্তু আমি জননীর জন্য বাড়িতে না গিয়া থাকিতে পারিতাম না। আমার মা তখন কি দশাতে বাস করিতেছিলেন তাহা বর্ণনীয় নহে। আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম, কিন্তু আমার পিতার ইচ্ছা নয় যে আমি গ্রামে পদার্পণ করি। আমি তাঁহাকে গোপন করিয়াই তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বাড়িতে যাইতাম। তিনি লোক মুখে আমি মা'র কাছে গিয়াছি শুনিলেই, আমাকে প্রহার করিবার জন্য গুণ্ডা ভাড়া করিয়া লইয়া আসিতেন। পাড়ার ছোট ছেলেরা আমাকে বড় ভালোবাসিত। বাবা লাঠিয়াল লইয়া আসিতেছেন দেখিলেই তাহারা গোপনে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিয়া যাইত, আর অমনি আমি মাতার চরণধুলি লইয়া খিড়কির দ্বার দিয়া পলাইতাম। পলাইয়া আসিয়া আমার গ্রামবাসী ব্রাহ্ম বন্ধু কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে আশ্রয় লইতাম। আমি পরে শুনিয়াছিলাম, বাবা এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যে লাঠিয়াল নিযুক্ত করিবার জন্য ২২৲ টাকা খরচ করিয়াছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে আমাকে মারিবার জন্য ২২৲ টাকা ব্যয় সামান্য প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তার কথা নয়। বাবার প্রতিজ্ঞার এই দৃঢ়তা আমাতে কিছু অধিক মাত্রায় থাকিলে ভালো হইত।

শেষে বাবা কেন যে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন, বলিতে পরি না। শুনিয়াছি গ্রামের মেয়েরা বিরোধী হওয়াতে তাঁহাকে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। গ্রামের লোকে চিরদিন আমাকে ভালোবাসে। আমি পিতাকে লুকাইয়া গ্রামে যাইতাম বটে, কিন্তু গ্রামের আত্মীয়গণের সহিত দেখা করিতাম। বাড়িতে-বাড়িতে গিয়া মেয়েদের সঙ্গে দেখা করিতাম। মেয়েরা আমাকে বড় ভালোবাসিতেন, আমি মেয়েদিগকে ভালোবাসিতাম। শেষে মেয়েদের ভাব দেখিয়া গ্রামের লোকে বাবাকে বলিতে লাগিল, "তুমি তাকে বাড়িতে যেতে না দিতে পার, কিন্তু গ্রামে আসিতে দেবে না, এ কেমন কথা? তুমি কি গ্রামের মালিক?"

গ্রামের লোকের অনুকূল ভাব দেখিয়া ক্রমশ বাবাও অনুকূল ভাব ধরিলেন। তখন আমি অবাধে গৃহে গিয়া মাতাকে দেখিয়া আসিতে লাগিলাম। আমাকে বাড়িতে প্রবেশ করিতে দেখিলে বাবা নিজে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতেন, আমি গৃহে আছি জানিলে সেদিকে আসিতেন না। আমাকে দেখা বা আমার সঙ্গে কথা কহা বন্ধ রাখিলেন, কিন্তু আমাকে বাড়িতে থাকিতে ও খাইতে দিতে আপত্তি করিতেন না। বরং নিজে বাজারে গিয়া যে সকল দ্রব্য আমি ভলোবাসি তাহা কিনিয়া আনিতেন, মাকে বলিতেন, "কলা ভোঁদড় ঘরে এসেছে, কলা কিনে এনেছি, খেতে দাও।" এইরূপ কিছু কাল চলিতে লাগিল।

*

কলিকাতায় নূতন সংসার। আমি পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া যেন অকূল সমুদ্রে ভাসিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় বড় স্কলারশিপটা ছিল, সেজন্য অন্নবস্ত্রের চিন্তাতে অভিভূত হইতে হইল না। আমি আসিয়া পটলডাঙ্গা মীরজাফরস লেনে শ্রীযুক্ত বাবু হরগোপাল সরকারের সহিত একত্র বাসা করিলাম। তিনি রামতনু লাহিড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী অন্নদায়িনীকে বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়া বসিলেন। অন্নদায়িনীর ভগিনী কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী তখন আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। ইঁহাদের সংশ্রবে থাকিয়া আমি বড়ই উপকৃত হইতে লাগিলাম। ইঁহাদিগকে দেখিয়া আমার নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়া গেল। বিশেষত ইঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধ সূত্রে রামতনুবাবুর সহিত আলাপ পরিচয় হইয়া তাঁহাতে আমি সাধুতার

যে আদর্শ দেখিলাম, তাহা ভুলিবার নহে। আমি শ্বশুরকুল হইতে প্রসন্নময়ীকে আনিয়া ইঁহাদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলাম।

প্রসন্নময়ী কলিকাতাতে আসিয়া গৃহধর্মে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া গেল। আমার স্কলারশিপ মাত্র অবলম্বন, এদিকে আবার বি. এ. পরীক্ষার বৎসর উপস্থিত। সাংসারিক চিন্তা, রোগীর সেবা, শিশুকন্যা হেমলতার রক্ষণাবেক্ষণ, এই সকল কারণে আমার পাঠের সমূহ ক্ষতি হইতে লাগিল। এই সময় স্বর্গীয় ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয় ও অপরাপর কতিপয় ডাক্তার বন্ধু সহায় না হইলে এই বিপদ সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম না।

১৮৭০ সালের ৮ই শ্রাবণ আমার দ্বিতীয়া কন্যা তরঙ্গিণীর জন্ম হইল। সে সাত মাসে জন্মিয়াছিল। তাহাকে তুলার বিছানা করিয়া কৃত্রিম তাপ দিয়া বাঁচাইতে হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম 'তুলী' হইয়া গিয়াছে, এবং তাহাই অদ্যাপি আছে। তাহার জীবন রক্ষা খাস্তগির মহাশয়ের চিকিৎসা-পারদর্শিতার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। সে যে বাঁচিবে, কেহই তাহা মনে করে নাই। দুই-একমাস পরেই বায়ু পরিবর্তনের জন্য, কলাইঘাটার যে কুঠীতে উৎসব হইয়াছিল এবং যেখানে তদবধি আমাদের ব্রাহ্ম বন্ধু নীলকমল দেব ছিলেন, সেখানে প্রসন্নময়ীকে রাখিয়া আসি; এবং আমি ৩৩নং মুসলমান পাড়া লেনে, যে বাসাতে রজনীনাথ রায়, নন্দলাল রায়, সারদানাথ হালদার, শ্রীনাথ দত্ত, কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী প্রভৃতি সহদীক্ষিত ব্রাহ্ম বন্ধু-গণ বাস করিতেছিলেন, সেই বাসাতে তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া বাস করিয়া বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি।

তখনকার মেম-মাস্টার। এ সময়ের একটি স্মরণীয় ঘটনা গণেশসুন্দরীর খৃীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ ও তৎপরে ব্রাহ্মসমাজে আগমন। গণেশসুন্দরী কলিকাতা নিবাসী এক বৈদ্য পরিবারের বিধবা কন্যা। মিশনারী মহিলাগণ তখন হিন্দু গৃহস্থদিগের বাড়িতে বাড়িতে অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু ললনাদিগকে পড়াইয়া বেড়াইতেন। অতি অল্প ব্যয়েই তাঁহাদিগকে পাওয়া যাইত। এইজন্য অনেক ভদ্রলোক নিজ গৃহে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া স্বীয়-স্বীয় ভবনের মহিলাদিগকে পড়াইতে দিতেন। আমিও প্রসন্নময়ীকে আনিয়া প্রথমে এইরূপে পড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। তৎসম্বন্ধে একটি কৌতুককর গল্প মনে আছে। তাহা এই স্থানে বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। যে মেম প্রসন্নময়ীকে পড়াইতেন তিনি সপ্তাহে দুইদিন আসিতেন। একবার আসিয়া, মেম মানবের আদি পিতা মাতা আদম ও হবার (এ্যাডাম এ্যান্ড ঈভ) বিবরণ মুখে মুখে প্রসন্নময়ীকে বলিয়া গেলেন। তাহার পর গৃহকর্মে ব্যাপৃত হইয়া প্রসন্নময়ী আদম-হবার কথা সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। দ্বিতীয় দিনে আসিয়া মেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌ, মানবের আদি পিতা মাতা কে ছিল?" প্রসন্নময়ী তো অন্ধকার দেখিলেন, আদম ও হবা মনে আসিল না। তখন মেম তিরস্কার করিয়া বলিয়া গেলেন, "তোমার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পার না?" মেম পুনরায় আসিবার দিন প্রাতে প্রসন্নময়ী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গো, মানুষ আগে কি করে হল?" আমি বলিলাম, "তা কে জানে? তবে একজন পণ্ডিত বলেছেন যে আগে মানুষ বানর ছিল, বানর হতে মানুষ হয়েছে।" সেদিন মেম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানুষ কেমন করে হল?" প্রসন্নময়ীর আবার আদম-হবা মনে নাই। মেম তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন,

"তোমার বাবুকে জিজ্ঞাসা কর না কেন?" প্রসন্নময়ী ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছেন, 'বানর হতে মানুষ হয়েছে'।" মেম বলিলেন, "তোমার বাবু বড় দুষ্টু, তোমাকে তামাশা করেছে।" প্রসন্নময়ী বলিলেন, "না, তামাশা করেননি, সত্যি সত্যি বলেছেন।"

সেদিন ঘটনাক্রমে আমি অন্য ঘরে ছিলাম, মেম যাইবার সময় আমার নিকট আসিলেন। তখন ডারুইনের নূতন মত সম্বন্ধে সমুদয় কথা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি প্রসন্নময়ীকে পরে বলিয়াছিলেন, "তোমার বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না।" শুনিয়া আমি অনেক হাসিয়াছিলাম।

এইরূপ একজন মিশনারী মেম গণেশসুন্দরীকে পড়াইতেন। একদিন গণেশসুন্দরী স্বীয় বিধবা মাতাকে ও ভ্রাতৃগণকে কিছু না বলিয়া মিশনারীদিগের আশ্রয়ে পলাইয়া গেলেন। পরে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, মেম যখন তাঁহাকে বলিতেন যে তিনি অনন্ত নরকের ধারে দাঁড়াইয়া আছেন, তখন ভয়ে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত এবং তিনি ত্বরায় যীশুর আশ্রয় লইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। যাহা হউক, যে কারণেই হউক, তিনি মিশনারীদিগের আশ্রয়ে পলাইয়া গেলেন। ইহা লইয়া শহরে তুমুল আন্দোলন ও হাইকোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। মোকদ্দমায় গণেশসুন্দরীর ভ্রাতৃগণ হারিয়া গেলেন। সে বয়ঃপ্রাপ্ত ও স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়াছে বলিয়া স্থির হইল। আন্দোলন ও সংবাদপত্রের গালাগালি চলিতে লাগিল। কেবল সংবাদপত্রের গালাগালি নহে, একদিন হাতাহাতিও হইল। সেদিন পাদরী ভনসাহেব, যাঁহার আশ্রয়ে গণেশসুন্দরী ছিলেন, কলেজ স্কোয়ারের কোণে প্রচার করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন। কোথা হইতে গণেশসুন্দরীর ভ্রাতা চন্দ্র সদলে বৃক যূথের ন্যায় আসিয়া পড়িয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। পাদরীসাহেব ঘুঁষি ঢিল ঢেলা খাইয়া ধাবিত হইয়া সংস্কৃত কলেজের সম্মুখস্থিত শ্যামাচরণ দে বিশ্বাস মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় লইয়া নিরাপদ হইলেন। ঐ বাড়ির লোকে আক্রমণকারী যুবকদিগকে তাড়া করিল, তাহারা কোন গলি দিয়া কোথায় পলাইল। তখন পাদরীসাহেব বলিলেন, "কি বলিব, পুরোহিত, নতুবা আমি তিন ব্যক্তি নিপাত করিতে পারিতাম।" শুনিয়া আমরা অনেক হাসিয়াছিলাম।

যাহা হউক, সংবাদপত্রের আন্দোলন থামিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম যুবকগণ গণেশসুন্দরীর ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে খৃষ্টীয়দিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য লাগিল। শোনা গেল, তিনি খৃষ্টীয়গণের নিকট সুখে নাই, আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন এবং স্বীয় জননীর নিকট আসিতে চাহিতেছেন, কিন্তু তিনি জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন বলিয়া জননী লইতে সাহস করিতেছেন না। এই অবস্থাতে উদ্ধারকারী ব্রাহ্মগণ আসিয়া গণেশসুন্দরীকে স্বীয় পরিবারে লইবার জন্য আমাকে ধরিলেন। আমি তখন নূতন সংসার পাতিয়া ঘরকন্না করিতেছি। আমি বালিকাটির অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া 'না' বলিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, আমাদের আহারের যদি দু-মুঠো জুটে তো তাহারও জুটিবে।

গণেশসুন্দরী আবার পলাইয়া খৃষ্টীয়দিগের আশ্রয় হইতে আমার ভবনে আসিলেন। আমার বাড়িতে তিনি আমার ভগিনীর ন্যায় হইয়া আমাদের কষ্টের অংশ লইয়া কয়েক বৎসর ছিলেন। তৎপরে ঈশ্বর কৃপায় অতি উপযুক্ত ব্যক্তির সহিত (রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নামক আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সহিত) বিবাহিত হইয়াছেন। আমি তাঁহার গণেশসুন্দরী নাম তুলিয়া দিয়া তাঁহার অপর নাম

মনোমোহিনীই প্রবল করিয়াছি। তিনি সেই নামে এখনো আমার ভগিনী বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে পরিচিতা।

ব্রাহ্মসমাজে 'আনন্দবাদী দল'। কলিকাতাতে সকল দলের ব্রাহ্মেরাই আমাকে বন্ধু-ভাবে ডাকিতেন। তখন উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের মধ্যে 'আনন্দবাদী দল' নামে একটি দল হইয়াছিল, অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এই দলের নেতা বলিয়া গণ্য ছিলেন। ইহার একটু ইতিবৃত্ত আছে। ১৮৬৬ সালে কেশববাবু 'জীশাস ক্রাইস্ট, এশিয়া এ্যান্ড ইয়োরোপ' নামে সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা করেন। তাহাতে গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স তাঁহার প্রতি প্রীত হন, এবং তাঁহার সঙ্গে কেশববাবুর বন্ধুতা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ক্রমে কেশববাবুর দলের লোকদিগের যীশু খৃষ্টের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক হইয়া পড়ে। বড়দিনের সময় যীশুর ধ্যানে দিন যাপন করা, বাইবেল পড়া, বাইবেলের ব্যাখ্যা করা, খৃষ্টীয় মিশনারীদিগের সহিত মিশামিশি করা, ইত্যাদি হইতে থাকে। এ কথা এখানে বলা আবশ্যক যে, বাইবেল পাঠ ও খৃষ্টীয় মিশনারীদিগের সহিত মিশামিশি কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই চলিতেছিল, এখন সেই ভাবটা কিছু প্রবল হয়। ইহার ফলস্বরূপ খৃষ্টীয় ধর্ম ভাবে যে অনুতাপ ও প্রার্থনা, তাহা উন্নতিশীল দলকে প্রবল রূপে অধিকার করে। পাপবোধ নব্য ব্রাহ্মদের সকলের অন্তরে প্রবল হইয়া উঠে, অনুতাপব্যঞ্জক সঙ্গীতাদি রচিত হইতে থাকে। ইহার উপরে, বোধ হয় ১৮৬৭ সালে, গোঁসাইজী উদ্যোগী হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠকে ডাকিয়া আনিয়া উন্নতিশীল দলকে বৈষ্ণব সংকীর্তন শোনান। তদবধি সংকীর্তন প্রথা ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রবেশ করে। এই সকল উত্তেজনার ফলস্বরূপ ১৮৬৮ সালে নরপূজার হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। এই পাপবোধ ও ব্যাকুলতার ভাব হইতেই ব্রাহ্মেরা কেশববাবুর চরণে পড়িয়া কাঁদিতেন।

যখন একদিকে অনুতাপ ব্যাকুলতা ও প্রার্থনার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, তখন অপরদিকে ব্রাহ্মদের মধ্যে একদল লোক বলিতে লাগিলেন, "এত অনুতাপ ও ক্রন্দন কেন? প্রেমময়ের গৃহে এত ক্রন্দনের রোল কেন? আনন্দময়ের প্রেমমুখ দেখিয়া আনন্দিত হও।" এই দলকে ব্রাহ্মেরা তখন 'আনন্দবাদী দল' বলিতেন। শিশির-বাবু ইঁহাদের অগ্রণী ছিলেন। নরপূজার হাঙ্গামা দেখিয়া ইঁহারা আমাদের ভিতর হইতে সরিয়া পড়িলেন। ১৮৬৯ সালের মাঘোৎসবে একজন মুঙ্গের হইতে সমাগত ব্রাহ্ম উপাসনান্তে কেশববাবুর চরণ ধরিয়া কি প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শিশিরবাবুর দাদা হেমন্তবাবু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া, এইরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া, রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয়কেও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বাহিরে যাইতে দেখিলাম। এই মাঘোৎসব ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দিরের অসম্পূর্ণ বাড়িতে চাঁদোয়া খাটাইয়া সমাধা করা হইয়াছিল।

ইহার পরে অমৃতবাজারের দলকে আর আমাদের উপাসনাতে বড় আসিতে দেখিতাম না। কলিকাতা পটলডাঙ্গা, পটুয়াটোলা লেনে যশোরের লোকদের এক বাসা ছিল। শিশিরবাবু সেখানে মধ্যে মধ্যে আসিতেন। তিনি আসিলেই আনন্দবাদী দলের সমাগম হইত। তাঁহারা আমাকে ডাকিতেন। সে সময়ে প্রধানত সঙ্গীত ও সংকীর্তন হইত। টাকী নিবাসী শ্রদ্ধেয় বন্ধু হরলাল রায় সেই কীর্তনে গড়াগড়ি দিতেন। শিশিরবাবু চমৎকার কীর্তন করিতে পারিতেন। তাঁহার কীর্তনে আমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিত। সেখানে নূতন ধরনের সঙ্গীত হইত। কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত

করিলে তাহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে। একটি সঙ্গীতে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলা হইত,

তোমার রাগে রাঙা নয়ন তলে বহে দেখি প্রেমধার।

আর একটি সঙ্গীত যাহা তাঁহাদের মুখে সর্বদা শুনিতাম, তাহা এই :

মা যার আনন্দময়ী তার কি বা নিরানন্দ?
তবে কেন রোগে শোকে পাপে তাপে বৃথা কান্দ?
মাঝখানে জননী বসে, সন্তানগণ তার চারি পাশে,
ভাসাইয়াছেন প্রেমময়ী প্রেমনীরে।
একবার বাহু তুলে মা মা বলে নৃত্য কর সন্তানবৃন্দ।

এই গান করিয়া সকলে নৃত্য করিতেন।

একদিকে যেমন অনুতাপ ও ক্রন্দন শুনিতাম, অপর দিকে ইঁহাদের কাছে গিয়া আনন্দ ও নৃত্য দেখিতাম। তখন ইহা বেশ লাগিত। শিশিরবাবুদের ভাইয়ে ভাইয়ে ভাব দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। ইহার পরেই তাঁহারা কলিকাতা হিদেরাম বাঁড়ুয্যের গলিতে আসিয়া বাসা করিয়া থাকেন। সে সময়ে তাঁহাদিগকে সর্বদা দেখিতাম। শিশিরবাবুর অমায়িকতা দেখিয়া আমার মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। একদিনের কথা স্মরণ আছে, তিনি সেদিন আমাকে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আহারের সময় উপস্থিত হইলে বলিলেন, "কি পরের মতো বাহিরে বসে খাবে! চল, রান্নাঘরে গিয়ে মাকে বলি, হাঁড়ি হতে গরম-গরম ভাত তরকারি মা'র হাতে না খেলে সুখ হয় না।" এই বলিয়া দুজনে গিয়া রান্নাঘরে আহারে বসিলাম। যত দূর স্মরণ হয়, তাঁহার জননী গরম-গরম ভাত তরকারি দিতে লাগিলেন ও আমরা আহার করিতে লাগিলাম।

ইহার পর হইতে শিশিরবাবুরা অল্পে অল্পে ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়িলেন।

খ্যাতির বিড়ম্বনা। কিন্তু একটি কারণে এই সময় কিছুদিন ধরিয়া আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা বড়ই অসন্তোষকর হইয়া গিয়াছিল। সে কারণটি এই। যতদিন আমি ব্রাহ্মদের পশ্চাতে ছিলাম ও আপনাকে অনেকাংশে হীন বলিয়া মনে করিতাম, ততদিন আমার অন্তরে বিনয় ও ব্যাকুলতা ছিল। আমি আপনাকে সাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মরূপে পরিচিত হইবার অযোগ্য বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু দীক্ষার দিন হইতে সে অবস্থা চলিয়া গেল। আমি যেন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম; এবং হঠাৎ যেন একজন বড় ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইলাম। আমি তখন ব্রাহ্ম দলের মধ্যে সর্বত্রই সমাদর পাইতে লাগিলাম। সে সমাদরের উপযুক্ত আমি ছিলাম না। বোধ হয় এতটা সমাদর পাইবার দুইটি কারণ ছিল। প্রথম, ১৮৬৮ সালের শেষে আমার 'নির্বাসিতের বিলাপ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, প্রকাশিত হইবামাত্র উহা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও সর্বত্র প্রশংসিত হয়। তদনুসারে আমি একজন উদীয়মান কবিরূপে পরিচিত হইয়াছিলাম। দ্বিতীয়ত, আমার দীক্ষার সময় হইতে আমার মাতুল উন্নতিশীল ব্রাহ্ম দলকে 'কৈশব দল' নাম দিয়া সোমপ্রকাশে তাহাদের প্রতি গোলাগুলি বর্ষণ আরম্ভ করেন, তাহাতেও আমার নামটা সাধারণের মুখে উঠে। যে

কারণেই হউক, আমি তখন হইতে লোক চক্ষুর গোচর হইয়া একজন মস্ত ব্রাহ্ম হইয়া দাঁড়াই। ইহাতে কিছুদিন আমার বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল। আমার পূর্বকার ব্যাকুলতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আমি কিছু অসাবধান হইয়া পড়ি, যে সকল দুর্বলতা ও কদভ্যাস অনেক চেষ্টাতে দমনে রাখিয়াছিলাম, তাহা আবার মাথা জাগাইয়া উঠে।

কিন্তু আমার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ দয়া বলিতে হইবে যে, আমি অচিরকালের মধ্যে আত্মদৃষ্টির সাহায্যে নিজের অবস্থা লক্ষ্য করিতে পারি ও তাহার সংশোধনে প্রবৃত্ত হই। দীক্ষার সময় ও এই সময় কয়েকটি কবিতাতে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলাম। যত দূর স্মরণ হয়, সেগুলি ধর্মতত্ত্ব পত্রিকাতে প্রকাশ হইয়াছিল, অনুসন্ধান করিলে উক্ত পত্রিকার ফাইলে পাওয়া যাইতে পারে। কেবলমাত্র দুই চারি পংক্তি স্মৃতিতে আছে। পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া লিখিয়াছিলাম—

ভাসায়ে জীবন তরী বিপত্তির সাগরে,
যাই দেব! দেখ দেখ রক্ষা কর আমারে।
মোর পক্ষ ছিল যারা,
বিপক্ষ হইল তারা,
ঘেরিল সকল দিক অপবাদ-আঁধারে,
বহিল প্রলয়-ঝড় মস্তকের উপরে।

অগ্রে যে আধ্যাত্মিক অবস্থার অবনতির কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম—

নিজ দলে গেলে পরে সমাদর পাই হে,
আপনারে বড় ভাবি তাই হে!
কিন্তু কি যে বড় আমি
জান তুমি অন্তর্যামী,
তব অগোচর প্রভু কোনো কথা নাই হে।

যাহা হউক, দীক্ষা ও সাধারণ সমাদরের ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে কিছুদিন গেল। আমি যে ব্রাহ্ম দলে হঠাৎ কিরূপ সমাদৃত হইয়া পড়িলাম, তাহার প্রমাণ স্বরূপ দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

আমার দীক্ষার কয়েক মাস পরেই শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব উপস্থিত হইল। তখন উক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠাকর্তা কাশীশ্বর মিত্র মহাশয় জীবিত ছিলেন। তিনি আমার নিকট লোক পাঠাইয়া অনুরোধ করিলেন যে, আমাকে উক্ত উপাসনাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয়দের সহিত বেদীতে বসিতে হইবে ও উপদেশের ভার লইতে হইবে। আমি ভয়ে সংকুচিত হইলাম, কিন্তু তাঁহারা কোনো মতেই ছাড়িলেন না। অবশেষে রাজি হইলাম। কিন্তু তাঁহারা চলিয়া গেলে, বেদীতে বসিতে হইবে ভাবিয়া লজ্জা ও ভয়ে মন অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু কি করি, কথা দিয়াছি। তখন অনন্যোপায় হইয়া উপদেশটি লিখিতে বসিলাম। লিখিয়া এক প্রকার দাঁড় করাইলাম। উপাসনা স্থলে সেইটি ভয়ে-ভয়ে পাঠ করিলাম। কিন্তু বেদী হইতে নামিলেই দ্বিজেন্দ্রবাবু কোলাকুলি করিয়া আমার উপদেশের অনেক প্রশংসা করিলেন। সভাস্থলেও অনেকে সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পরদিন কলেজে বি. এ. ক্লাসে পড়িতেছি, এমন সময় ভূতপূর্ব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের নিকট হইতে কলেজের অধ্যক্ষের নামে এক পত্র আসিয়া উপস্থিত, "শিবনাথ ভট্টাচার্য নামে তোমাদের বি. এ. ক্লাসে এক ছাত্র আছে, তাহাকে আমি কিছুক্ষণের জন্য চাই।" তদানীন্তন অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশ্বর ঘোষাল তোমাকে ডাকিয়াছেন কেন?" আমি বলিলাম, "কিছুই জানি না, তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় নাই।" তখন তিনি আমাকে পাঠাইবার পূর্বে ঈশ্বর ঘোষাল সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া দিলেন, বলিলেন, "সাবধান, তিনি তোমাকে খৃষ্টীয় ধর্ম ভজাইবেন।" সর্বাধিকারী মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, গিয়া তাহাই শুনিলাম। ঘোষাল মহাশয় পূর্বদিনে শ্যামবাজারের উপাসনাতে উপস্থিত ছিলেন এবং আমার উপদেশে প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি আমাকে খৃষ্টীয় ধর্মের মহৎ ভাব দেখাইবার জন্য আদিম প্রফেটদিগের ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত পরবর্তী ঘটনা তুলনা করিয়া দেখাইতে লাগিলেন, এবং আমাকে একখানি বাইবেল উপহার দিলেন। আমার প্রতি পুত্রাধিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া বিদায় করিলেন। আমি ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম, "ইনি কেন খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হন না?"

শ্যামবাজারের উপদেশের ধাক্কা এখানেও থামিল না। কয়েকদিন পরেই সিন্দুরিয়াপটী 'পারিবারিক সমাজ' হইতে ক্ষেত্রনাথ শেঠ নামে একজন সভ্য আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, উক্ত পারিবারিক সমাজের সকলের ইচ্ছা যে আমি তাঁহাদের সমাজের আচার্যের ভার গ্রহণ করি। অগ্রে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় সেই সমাজের আচার্যের কার্য করিতেন, কিন্তু কার্যবাহুল্য নিবন্ধন তিনি সেই ভার পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। পাকড়াশী মহাশয়ের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। আমি তাঁহার উপদেশে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। আর বাস্তবিক ব্রাহ্ম আচার্যদিগের মধ্যে চিন্তাশীলতা মৌলিকতা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বিষয়ে এরূপ অল্প লোক দেখিয়াছি। তাঁহার পরিত্যক্ত বেদী আমি গ্রহণ করিব, ইহা ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইলাম। কিন্তু তাঁহাদের হাত এড়াইতে পারিলাম না। শেষে, এক শুক্রবারে গিয়া উপাসনা করিতে স্বীকৃত হইলাম। এবারেও উপদেশ লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। এই একবার উপদেশ দিয়া আমার বিপদ দশগুণ বাড়িয়া গেল। তাঁহারা আমাকে নাছোড়বান্দা হইয়া ধরিলেন। কাজেই আচার্যের ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হইল। এই ভার আমার প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতির ও আচার্যের কার্য শিক্ষার উপায়স্বরূপ হইল। আমি কয়েক বৎসর এই কাজ করিয়াছিলাম। যেখানেই থাকি, শুক্রবার সন্ধ্যার সময় সিন্দুরিয়াপটীতে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। কি বলিব, সে বিষয় সপ্তাহ কাল ভাবিতাম। উপাসক-মণ্ডলীর অভাব নিজ চিত্তে ধারণ করিবার চেষ্টা করিতাম, প্রত্যেকের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইবার চেষ্টা করিতাম। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আচার্যের দায়িত্ব অনেকটা অনুভব করিতাম। এই দায়িত্ব-জ্ঞানই আমাকে ফুটাইয়াছে।

ক্রমে সেই ক্ষুদ্র উপাসক-মণ্ডলীর সকলের সঙ্গে ভালোবাসা জন্মিয়া গেল। সে সম্বন্ধ বহু কাল রহিয়াছে। গোপালচন্দ্র মল্লিক, নেপালচন্দ্র মল্লিক, সিন্দুরিয়াপটী পরিবারের দুই ভাই যতদিন জীবিত ছিলেন, আমাকে বিধিমতে নানা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। শেষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে গোপালচন্দ্র মল্লিক আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে ইহাতে প্রবেশ করেন ও ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিয়া স্বীয় পিতা কর্তৃক

পরিত্যক্ত হন। তাঁহার পিতা স্বগীয় মণিলাল মল্লিক আদি সমাজভুক্ত ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনিই ঐ পারিবারিক সমাজ স্থাপন করেন।

১৮৭১ সালের ১৪ই আষাঢ় আমার পুত্র প্রিয়নাথের জন্ম হয়।

ঢাকার অবলাবান্ধব পত্রিকা। এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, অবলাবান্ধব সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত মিলন। তখন ঢাকা সমাজ সংস্কারের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে 'মহাপাপ বাল্য-বিবাহ' নামে এক পত্রিকা ঢাকা হইতে বাহির হয়, তাহাতে সেখানকার যুবক দলের উপরে আমাদের অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মে। এই রঙ্গভূমিতে অবলাবান্ধব দেখা দিল। আমরা ভাবিলাম, এ কে বঙ্গদেশের এক কোণ হইতে নারীকুলের হিতৈষী হইয়া দেখা দিল? অবলাবান্ধবের সম্পাদককে তখন চিনিতাম না, কিন্তু তাঁহার তাজা-তাজা কথা প্রাণ হইতে আসিতেছে বোধ হইত ও আমাদের বড় ভালো লাগিত। ক্রমে ঢাকার প্রসিদ্ধ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অভয়াচরণ দাসের পুত্র প্রাণকুমার দাস একবার কলিকাতায় আসিয়া আমাকে ও অপরাপর কয়েকজনকে তাঁহার লেখক শ্রেণী-ভুক্ত করিয়া গেলেন। আমার যত দূর স্মরণ হয়, আমি কুমারী রাধারাণী লাহিড়ীকে বলিয়া কহিয়া তাহাকেও লেখিকা করিয়াছিলাম। অবলাবান্ধবে আমার গদ্যপদ্যাত্মক প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইত। দুঃখের বিষয়, উক্ত পত্রিকার একখানি ফাইলও খুঁজিয়া পাই নাই।

অবলাবান্ধবের সহিত যোগ রহিয়াছে, সেই সময়ে একদিন কলেজে পড়িতেছি এমন সময়ে উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসিয়া আমাকে বলিল, "ও রে ভাই, অবলা-বান্ধবের এডিটর কলিকাতায় এসেছে, আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।" অমনি আমি আমাদের 'হিরো'কে দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। গিয়া দেখি, এক দীর্ঘাকৃতি একহারা পুরুষ, স্কুল মাস্টারের মতো লম্বা চাপকান পরা, দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সেদিন আর অধিক কথা হইল না। সে যাত্রা বোধ হয় তিনি কয়েকদিন পরেই দেশে চলিয়া গেলেন; কিন্তু কিছুদিন পরেই অবলাবান্ধব লইয়া কলিকাতায় আসিলেন, এবং পূর্ববঙ্গীয় যুবকদিগের নেতাস্বরূপ হইয়া ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতার পাতাকা উড্ডীন করিলেন।

এই সময় ঢাকা হইতে তাঁহার, ও বরিশাল হইতে স্বর্গীয় বন্ধু দুর্গামোহন দাসের, কলিকাতাতে আগমন স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে যেন মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। ইহার ফল পরে বলিব।

কেশবচন্দ্রের ভারত আশ্রমে

দীক্ষার পর কেশবচন্দ্র সেনের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁহাতে আমাতে এমন একটা কি ছিল, যাহাতে তিনি আমাকে দেখিলেই প্রীত হইতেন, আমিও তাঁহাকে দেখিলে প্রীত হইতাম। আমার সঙ্গে তাঁহার হাসি ঠাট্টা রসিকতা চলিত। একবার একজন আমাকে বলিয়াছিলেন, "কেশববাবুর মনের একটা চাবি তোমার কাছে আছে।" তাঁহার নিকট আমার মনের ভালো মন্দ কোনো কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ হইত না। অবাধে সকল কথা তাঁহার কানে ঢালিতাম। এমন কি তাঁহার যে কথা আমার মনের সঙ্গে না মিলিত তাহাও তাঁহাকে জানাইতে আমার সঙ্কোচ বোধ হইত না।

তাঁহার সহিত আমার কিরূপ হাসি ঠাট্টা চলিত, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা মন্দ নয়। একবার হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে প্রাতঃকালীন উপাসনাতে আচার্যের কার্য করিবার জন্য আমি তাঁহাকে রাজি করি। আমি তখন হরিনাভি স্কুলের হেডমাস্টার। তিনি প্রত্যুষে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া প্রাতে গিয়া আমার বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহার প্রাতরাশের জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত রাখিয়াছিলাম। আমি জানিতাম, তিনি প্রাতে অপরাপর জিনিসের মধ্যে ভিজা ছোলা ও আদা খাইয়া থাকেন। সুতরাং ভিজা ছোলা ও আদা প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল। ভিজা ছোলা দেখিয়াই তিনি ভারি খুশি হইলেন। বলিলেন, "বাঃ, আমি যে প্রাতে ভিজে ছোলা খাই, তাহা জানিলে কিরূপে?" আমি বলিলাম, "এ আবার আশ্চর্যের বিষয় কি? আপনার দৈনিক রীতির যদি এতটুকুও না জানলাম, তবে আপনার সঙ্গে কি মিশলাম? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি এত ভিজে ছোলা ভালোবাসেন কেন?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ভিজে ছোলা খাব না! গাড়িতে যুতে টানাও কেমন?" বলিয়াই হাসিয়া আবার বলিলেন, "শুধু গাড়িতে যুতে টানানো নয়, চাবুক মারতেও তো কসুর কর না।" তখন আমরা মধ্যে মধ্যে তাঁহার কাজের সমালোচনা করিতাম। এই চাবুক মারার অর্থ তাহাই। শুনিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, "বেআদবী মাপ করবেন, আপনি বেদীতে বসে চাট মারতেও তো ছাড়েন না।" এই কথা লইয়া খুব হাসাহাসি পড়িয়া গেল।

আর একবার আমার একটি বন্ধুর কন্যার নামকরণে তাঁহার উপাসনা করিবার কথা। সন্ধ্যা ৭টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইবে, এইরূপ স্থির ছিল। আমরা বসিয়া আছি, তিনি আর আসেন না। তিনি গবর্ণর জেনারেলের বাড়িতে এক সান্ধ্য সমিতিতে গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন, তিনি একবার দেখা দিয়াই চলিয়া আসিবেন। এদিকে ৮টা বাজিয়া গেল, ৮॥টা বাজিয়া গেল, তাঁহার দেখা নাই। অবশেষে প্রায় ৯টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনি বড়-

লোকদের সঙ্গে সঙ্গে কেন এত বেড়ান? কই, আপনাকে তো কোন টাইটেল দেয় না?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কেন হে বাপু? কে. সি. এস. আই. (অর্থাৎ কেশবচন্দ্র সেন আমি), আমার টাইটেলের অপ্রতুল কি?"

আর একবার আমি তাঁহার ঘরে গিয়া দেখি, তিনি ঘুমাইতেছেন, কিন্তু চোখে চশমা আছে। জাগিলে আমি বলিলাম, "যদি ঘুমাচ্ছেন, তবে চোখে চশমা কেন?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ওহে বাপু, স্বপন তো দেখতে হয়।"

কেশবচন্দ্রের বিদেশ যাত্রা। ১৮৭০ সালের প্রারম্ভে তিনি যখন ইংলন্ড যাত্রা করিলেন, তখন একদিন আমাদের অনেককে একত্র করিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বিদেশে যাইতেছেন, কি হয় স্থিরতা নাই। তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার যে সকল মত লইয়া বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, সে সকল বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটা কথা মনে আছে। তিনি মহাপুরুষের মতের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি মহাপুরুষদিগকে মনে করেন যেন চশমা—অর্থাৎ চশমা যেমন চক্ষুকে আবরণ করে না, কিন্তু দৃষ্টির উজ্জ্বলতা সম্পাদন করে, তেমনি মহাপুরুষগণ ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঈশ্বর দর্শনের ব্যাঘাত করেন না, কিন্তু ঈশ্বর দর্শনের সহায়তা করেন। অথবা মহাপুরুষেরা যেন দ্বারবান, দ্বারবান যেমন আগন্তুক ব্যক্তিকে প্রভুর সমীপে উপনীত করিয়া দেয়, তৎপরে আর তাহার কাজ থাকে না, তেমনি মহাপুরুষগণ ঈশ্বর চরণে মানবকে উপনীত করিয়া দেন, নিজেরা আর মধ্যে থাকেন না। আমার মনে হইতেছে, আমি তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "মহাপুরুষেরা চশমা, তাহা ঠিক। কিন্তু কাহাকেও যদি বার-বার বলা যায়, 'দেখ, দেখ, ঐ তোমার চোখে চশমা, ঐ তোমার চোখে চশমা,' তাহা হইলে দ্রষ্টব্য পদার্থ হইতে তাহার দৃষ্টিকে তুলিয়া, সে দৃষ্টিকে চশমার উপরেই ফেলিয়া দেওয়া হয়। তেমনি মহাপুরুষগণ ঈশ্বর দর্শনের সহায় হইলেও, 'ঐ মহাপুরুষ, ঐ মহাপুরুষ' করিয়া যদি তাঁহাদের প্রতিই দৃষ্টিকে অধিক আকৃষ্ট করা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে পশ্চাতে ফেলা হয়।"

যাহা হউক, কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করিলে তাঁহার বিচ্ছেদে আমি বড়ই ক্লেশ পাইয়াছিলাম, এবং তৎকালের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম; সেটি তাঁহার পত্নীর উক্তিতে। তাহা বোধ হয় অবলাবান্ধবে কি অন্য কোনো পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি কেশববাবুর নিকট অনেক শিখিয়াছি। কি ভাবে ঈশ্বরের কাজ করিতে হয়, তাহা তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিয়াছি। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর কাহাকে বলে, তাহা তাঁহাকে দেখিয়া জানিয়াছি।

কেশববাবু কয়েক মাস পরে ইংলন্ড হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়াই নানা নূতন কাজের প্রস্তাব করিলেন। ইণ্ডিয়ান রিফরম্ এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া, তাহার অধীনে টেম্পারেন্স, এডুকেশন, চীপ লিটারেচার, টেকনিকাল এডুকেশন প্রভৃতি অনেক বিভাগ স্থাপন করিলেন। আমি সকল কাজেই তাঁহার অনুসরণ করিতাম। আমি সুরাপান বিভাগের সভ্যরূপে 'মদ না গরল' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিলাম। তাহাতে সুরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিয়া গদ্যপদ্যময় প্রবন্ধ সকল বাহির হইত। সে সমুদয়ের অধিকাংশ আমি লিখিতাম। তদ্ভিন্ন 'সুলভ সমাচার' নামক এক পয়সা মূল্যের যে সংবাদপত্র বাহির হইয়াছিল, তাহাতেও লিখিতাম।

এই সময়ে কেশববাবু পুরাতন সোসাইটি অব থীইস্টিক্ ফ্রেণ্ডস্-কে

পুনরুজ্জীবিত করেন, তাহাতে আমাকে বক্তৃতা করিতে বলেন। তদনুসারে আমি ইংরাজীতে এক বক্তৃতা করি, কেশববাবু সভাপতি ছিলেন। সে বক্তৃতার দিনের অন্য-কথা অধিক মনে নাই। এইমাত্র মনে আছে, আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান মিশনারী সুপ্রসিদ্ধ ড্যাল সাহেব সেদিনকার সভাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আপনাকে ব্রাহ্ম ফলোয়ার অভ ক্রাইষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

এই ইণ্ডিয়ান রিফরম্ এ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ হইতে কেশববাবু আর একটি কাজ করিয়াছিলেন। তিনি এক মুদ্রিত পত্র দ্বারা দেশের প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের নিকট হইতে, এদেশীয় বালিকাগণের বিবাহের উপযুক্ত কাল কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে অধিকাংশ স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ডাক্তার ১৬ বৎসরের ঊর্ধ্বে সেই কালকে নির্দেশ করেন। কেবল ডাক্তার চার্লস চতুর্দশ বর্ষকে সর্বনিম্ন বয়স বলিয়া নির্দেশ করেন। তদনুসারে ১৮৭২ সালের তিন আইনে চতুর্দশ বর্ষকে বালিকার সর্বনিম্ন বিবাহের বয়স বলিয়া নির্দেশ করা হয়। তিন আইনের এই আন্দোলনে আমরা সকলেই তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলাম।

এই সময়েই বা ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে বা পরে আদি সমাজের ভূতপূর্ব সভাপতি ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'র তদানীন্তন সম্পাদক ও বিলাতের টাইমস পত্রিকার পত্রপ্রেরক জেমস রুট্লেজ সাহেব তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ টাইমস পত্রিকাতে প্রেরণ করেন। তাহার ফলস্বরূপ এদেশে ও সেদেশে সেই বক্তৃতা সম্বন্ধে চর্চা উপস্থিত হয়। সেই বক্তৃতাতে রাজনারায়ণবাবু ব্রাহ্মধর্মকে উন্নত হিন্দুধর্ম বলিয়া প্রতিপাদন করেন। উন্নতিশীল দল এ মতের বিরোধী ছিলেন। কেশববাবু আমাকে ও পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায়কে এই বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়া পড়িতে আদেশ করেন। তদনুসারে আমি ইংরাজীতে ও গৌরবাবু বাংলাতে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করি। কেশববাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কেশবচন্দ্রের ভারত আশ্রম। এই সময়কার সর্বপ্রথম কার্য 'ভারত আশ্রম' স্থাপন। কেশববাবু ইংলণ্ডে ইংরাজদের গৃহকর্ম দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছিলেন। সর্বদা বলিতেন, মিডল ক্লাস ইংলিশ হোম-এর ন্যায় ইনস্টিটিউশান পৃথিবীতে নাই। তাঁহার মনে হইল, কতকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারকে একত্র রাখিয়া, কিছুদিন সময়ে আহার, সময়ে বিশ্রাম, সময়ে কাজ, সময়ে উপাসনা, এইরূপ নিয়মাধীন রাখিয়া, শৃঙ্খলামতো কাজ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা সেই ভাব লইয়া গিয়া চারিদিকের ব্রাহ্ম পরিবারে ব্যাপ্ত করিতে পারে। এই ভাব লইয়া তিনি ভারত আশ্রম স্থাপন করিলেন। তাঁহার অনুচর প্রচারকগণ সর্বাগ্রে গেলেন। তৎপরে আমরাও অনেকগুলি পরিবার বাহির হইতে গেলাম। আমরা কেশববাবুর মনের ভাবটা কাজে করিয়া দেখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

ভারত আশ্রম স্থাপিত হইলে কেশববাবু কলুটোলার বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সঙ্গে আসিয়া থাকিতে লাগিলেন। কলিকাতা ১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট ভবনে (বর্তমান সিটি স্কুলের ভূমিস্থিত ভবনে) প্রথমে কিছুদিন থাকিয়া পরে শহরের বাহিরে কোনো কোনো বাগানে গিয়া থাকা হয়। প্রথম বেলঘরিয়ায় এক বাগানে, তৎপরে কাঁকুড়াগাছির এক বাগানে কিছুদিন থাকা হয়। এই সকল স্থানে গিয়া আমরা কেশববাবুর বিমল সহবাসে থাকিবার অবসর পাইলাম। স্বীয়-স্বীয়

ব্যয়ের অংশ দিয়া সকলে একান্নভুক্ত পরিবারের ন্যায় থাকিতাম। একসঙ্গে খাওয়া, একসঙ্গে বসা, একসঙ্গে বেড়ানো—সুখেই কাল কাটিত। শহরে যাঁহাদের কাজ থাকিত, তাঁহারা দিনের বেলায় শহরে গিয়া কাজ করিয়া আসিতেন। প্রাতে ও সন্ধ্যাতে একসঙ্গে উপাসনা ও একসঙ্গে ধর্মালাপ চলিত। আমরা সকল বিষয়েই কেশববাবুর পরামর্শ ও সদুপদেশ পাইতাম।

আমি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কার্যে আপনাকে অর্পণ করিব বলিয়াই ভারত আশ্রমে বাস করিতে গিয়াছিলাম। আমার অগ্রে অভিপ্রায় ছিল যে, আমি কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী করিব, সেই জন্য উকীল বন্ধুদের পরামর্শে তিন বৎসর 'ল লেক্‌চার' শুনিয়া শেষ করিয়া রাখিয়াছিলাম। যত দূর স্মরণ হয়, আমার বি. এল. দিবার ইচ্ছা হইবার আর একটি কারণ ছিল। তদানীন্তন লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আমি জুডিশ্যাল সার্ভিস-এ তোমাদের কলেজের ছেলে চাই, কারণ তাহারা 'হিন্দু ল' বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়।" তদনন্তর সর্বাধিকারী মহাশয় আসিয়া আমাদিগকে বি. এল. পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করেন; এবং আমার ভক্তিভাজন মাতুলমহাশয়ও সে বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তদনুসারে আমি 'ল লেকচার' শুনিতে আরম্ভ করি। কিন্তু বি. এ. পাশ করিয়াই অন্যবিধ আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে আসিল। আমি কেশববাবুর পদানুসরণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কার্যে আমার জীবন দিব, এই বাসনা হৃদয়ে উদয় হইল। গোপনে পত্র দ্বারা কেশববাবুকে এরূপ অভিপ্রায় জানাইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, "তুমি আস্তে আস্তে ক্রমে আমাদের সঙ্গে যোট, তারপর দেখা যাবে কি হয়," এবং আমি ১৮৭২ সালের প্রারম্ভে এম. এ. পাস করিয়া 'শাস্ত্রী' উপাধি পাইয়া কলেজ হইতে বাহির হইবামাত্র, তাঁহার নব প্রতিষ্ঠিত মহিলা বিদ্যালয়ে আমাকে শিক্ষকতা কার্য দিয়া আশ্রমে সপরিবারে থাকিতে আদেশ করিলেন। আমার নামে বেতন রূপে যাহা দেওয়া হইত, তাহা প্রচারকগণের চির-পরিচারক শ্রদ্ধাস্পদ কান্তিচন্দ্র মিত্রের হস্তে জমা হইত, তিনি আমার স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ দেখিতেন, তাহার সহিত আমার কোনো সংশ্রব থাকিত না। বলা বাহুল্য, তখন প্রচারকগণ সকলে, ও তৎসঙ্গে আমি, সপরিবারে ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিতাম।

আমি কেশববাবুর আশ্রমোৎসাহের মধ্যে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছিলাম। সে সময়ে আশ্রমের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখি, তাহা বোধ হয় ধর্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সে সময়ে কেশববাবুর ও তাঁহার পত্নীর যে সাধুতা ও ধর্মনিষ্ঠা দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে ভুলিবার নয়। প্রতিদিন দুপুরবেলা আশ্রমবাসিনী মহিলাদিগকে লইয়া স্কুল করা হইত। আমি ঐ স্কুলে পড়াইতাম। একদিন কেশববাবু তাঁহার পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া আমাকে বলিলেন, "ওহে, তুমি ওঁকে ইংরেজী শেখাও তো।" তদনন্তর তিনি আমার ছাত্রী হইলেন। কেশববাবু তাঁহার প্রকৃতির সরলতা জানিতেন। তিনি বিলাত হইতে কতকগুলি চিলড্রেনস ম্যাগাজিন ও রীডিং বুক্স আনিয়াছিলেন। তাহার একখানি তাঁহাকে পড়াইবার জন্য দিলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, "এ যে ছোট ছেলেদের বই।" তিনি বলিলেন, "আ রে, উনি প্রথম ইংরেজী পড়বেন তো? হলই বা ছোট ছেলেদের বই। তুমি পড়াতে আরম্ভ কর না, দেখবে, উনি মনে ছোট ছেলেই আছেন।" কাজেও তাহার প্রমাণ পাইলাম। তাঁহার পাঠ্য পুস্তকে একটি ছোট মেয়ের ছবি ছিল, তাহার মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। মেয়েটি দেখিতে সুন্দর,

কিন্তু বড় দুষ্ট। ঐ ছবির সঙ্গে তাহার দুষ্টামির অনেক গল্প আছে। আচার্য-পত্নী তাঁহার জীবনে এত দুষ্টামির কথা বোধ হয় শোনেন নাই। তিনি পড়িয়া বড়ই বিরক্ত হইয়া গেলেন, ছবিটা পর্যন্ত তাঁহার চক্ষের শূল হইয়া দাঁড়াইল। একদিন পড়িবার জন্য যেই বই খুলিয়াছেন, অমনি সেই ছবিটা বাহির হইল। তিনি দেখিয়া রাগিয়া গেলেন ও নিজের মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "মা গো মা! কি দুষ্টু মেয়ে! দেখলেই রাগ হয়।" আমি শুনিয়া হাসিয়া বলিলাম, "রাগেন কার উপরে? ও যে ছবি! আর ও সব যে কল্পিত গল্প!" তিনি সেদিকে কান দিলেন না। তাঁহার দ্বিতীয় কন্যার উল্লেখ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার চুলগুলো কি কেটে দেব? তারও চুলগুলো ঠিক এমনি কোঁকড়া কোঁকড়া, দেখলে ঐ ছবিটা মনে পড়ে।" আমি শুনিয়া হাসিতে লাগিলাম।

আর একদিনের আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন আমি কেশববাবুর সহিত কোনো বিশেষ বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য তাঁহার ঘরে গেলাম। তখন তাঁহার বিশ্রাম করিবার সময়। কিন্তু দেখিলাম, তিনি ঘরে নাই। তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "আমাকে কোনো কারণে রাগতে দেখে, তিনি প্রথমে বললেন, 'তাই তো, তুমিও রেগে উঠলে?' এই বলে এই ঘরেই কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলেন, পাষাণের মূর্তি, তারপর বাহির হয়ে গেলেন। খুঁজে দেখুন, বোধ হয় বাগানের কোনো গাছ তলায় চোখ বুজে বসে আছেন।" শুনিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, "হাসেন কি? ঐ চোখ বুজে-বুজেই আমায় সেরে আনছেন। আমি কিছু অন্যায় করলেই, রাগ নাই উষ্মা নাই, চোখ বুজে একেবারে পাষাণপ্রতিমা হয়ে যান। আমি লজ্জায় মরে যাই। ভবিষ্যতে যাতে আর ওরূপ না করি, তার জন্য ঈশ্বর চরণে বার-বার প্রার্থনা করতে থাকি।"

আমি শুনিয়া ভাবিতে লাগিলাম, যাঁহার বাহিরে এত তেজ, বক্তৃতাতে যিনি অগ্নি উদ্গিরণ করেন, যাঁহার মনুষ্যত্বের প্রভাবে ধরা কম্পিত হয়, গৃহের মধ্যে তাঁহার এই আত্মসংযম! বাস্তবিক, কেশবচন্দ্রের আত্মসংযম শক্তি অতি অদ্ভুত ছিল। বাদ বিসম্বাদ তর্কযুদ্ধে আমরা অনেকেই অনেক সময় উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইতাম, কিন্তু তিনি ধীর ও স্থির থাকিয়া আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিতেন। মনে হয়তো গভীর বিরক্তির আবির্ভাব, কিন্তু বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই। সুযুক্তি পরম্পরা দ্বারা শ্রোতাকে কোণঠাসা করিয়া ধরিতেন। দীর্ঘকাল একত্র বাস করিয়া কেবল দুই-এক স্থলে মাত্র তাঁহাকে উত্তেজিত দেখিয়াছি। নতুবা তিনি সর্বত্র সর্ব কালে ও সর্ব বিষয়ে আমাদের নিকট সংযমের আদর্শ স্বরূপ থাকিয়াছেন। এ কথা যখনই স্মরণ করি, হৃদয় উন্নত হয় এবং নিজেদের দৈনিক ব্যবহারের জন্য লজ্জা হয়। তাঁহার সংযমের এই দৃষ্টান্তটি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। উপসংহারে বক্তব্য যে, কেশববাবুর ঘর হইতে বাহির হইয়া বাগানে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে গিয়া বাস্তবিক দেখিলাম যে, তিনি এক বৃক্ষের তলে নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন।

আচার্য-পত্নীর সরলতা ও আমার প্রতি অকপট ভালোবাসার আর একটি নিদর্শন মনে হইতেছে, তাহা বলিয়া ফেলি। আমি একদিন স্কুলে পড়াইবার সময় দেখিলাম, তিনি পড়া করিয়া আসেন নাই। তাই তাঁহাকে বলিলাম, "দুপুরবেলা খাওয়ার পর ঘরে গিয়ে শয়ন করলে আপনি তো আপনার পতির নিকট কঠিন বিষয়গুলো জেনে নিতে পারেন, পড়া তয়ের করে আসতে পারেন।" তদনুসারে তিনি তৎপরদিন দুপুর-বেলা পড়া জানিতে বসেন। কেশববাবু এটা ওটা বলিয়া দিতেছেন, এমন সময়ে

তাঁহার পত্নী বলিয়া উঠিলেন, "যাও যাও, তুমি শিবনাথবাবুর মতো পড়াতে পার না।" এই কথায় কেশববাবু খুব হাসিতে লাগিলেন। তৎপরদিন তাঁহারা যখন পতি-পত্নীতে একত্র আছেন, এমন সময়ে কোনো কাজের জন্য আমি সেখানে গেলাম। আমাকে দেখিয়া কেশববাবু হাসিয়া বলিলেন, "শিবনাথ! তুমি আমার সমক্ষে পড়াও তো, আমি দেখি। তুমি এমন পড়া কি পড়াও যে আমার পড়ানো ওঁর মনে লাগে না? আমাকে বলেছেন, 'তুমি শিবনাথবাবুর মতো পড়াতে পার না'।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "বুঝলেন না, আমাকে ভারি ভালোবাসেন কি না, তাই আমি যা করি ভালো লাগে। আপনাকে জেনেছেন সর্বোৎকৃষ্ট, উপদেষ্টা, আমাকে জেনেছেন সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক। যা হোক, এ কথা শুনে আমার শ্রমটা সার্থক বোধ হচ্ছে।"

এই ভারত আশ্রমে বাসকালে আচার্য-পত্নীর পতিভক্তি ও শিশুসুলভ সরলতার আর এক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল, তাহা এখানে উল্লেখ করা ভালো। আশ্রম স্থাপিত হইয়া প্রথমে কিছু দিন ১৩ নম্বর মির্জাপুর ষ্ট্রীট ভবনে ছিল। তখনও 'বয়স্থা মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপিত হয় নাই। সে সময়ে কেশববাবু খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচারিকা কুমারী পিগটকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তিনি সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন বৈকালে আসিয়া আশ্রমবাসিনী মহিলাদের সঙ্গে বসিবেন, তাঁহাদের লেখাপড়া দেখিবেন, ও তাঁহাদের সঙ্গে নানা হিতকর বিষয়ে আলাপ করিবেন। কুমারী পিগট কেশববাবুকে ভালোবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন, এই অনুরোধ করিবামাত্র তিনি আসিতে লাগিলেন। একদিন মহিলাদের সহিত অপরাপর কথার মধ্যে কুমারী পিগট বলিলেন, "আমরা বিশ্বাস করি, যাহারা খৃষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ না করে তাহাদের অনন্ত নরক বাস হইবে।" আচার্য-পত্নী সেখানে ছিলেন, তিনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ও মা সে কি গো! যে সরল ভাবে বিশ্বাস করতে পারছে না, তার সাজা অনন্ত নরক বাস?" কুমারী পিগট বলিলেন, "হাঁ, আমাদের ধর্মে তাই বলে। এমন কি, তোমার পতিও যদি খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত না হন, তাঁহার ভাগ্যেও নরক বাস।" এই কথা শুনিয়া আচার্য-পত্নী গম্ভীর মূর্তি ধারণ করিলেন, তাঁহার চক্ষে দরদর ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি উঠিয়া নিজের ঘরে গেলেন। তৎপরে কুমারী পিগটের নিকট আসা ত্যাগ করিলেন। আমরা বুঝাইয়া আনিতে পারিলাম না, কেশববাবুও নিজে বুঝাইয়া রাজি করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "কুমারী পিগটের মুখ আর দেখব না।" কত বলা গেল, "খৃষ্টিয়ান ধর্মে যাহা আছে তাহাই তিনি বলিয়াছেন, কেশববাবুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য কিছু বলেন নাই।" তথাপি শুনিলেন না। কিছুদিন পরে বোধ হয় কুমারী পিগটের সহিত পুনর্মিলিত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয়া পত্নীর আগমন। ইতিমধ্যে আমার পারিবারিক জীবনে এক সুমহৎ পরিবর্তন উপস্থিত হইল। আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে আনিতে হইল। ইহার দুই বৎসর পূর্বে তাঁহার পিতা মাতা ভাই ভগিনী প্রভৃতি সমুদয় অকালে গত হন। তিনি একাকিনী তাঁহার পিতৃব্যগণের গলগ্রহ হন। তদনন্তর তাঁহার পিতৃব্যমহাশয় আসিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য আমাকে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করেন। আমি তাঁহার পুনরায় বিবাহ দিবার আশায় তাঁহাকে অগ্রে কয়েকবার আনিতে গিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া, সে চেষ্টা কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহার পিতৃব্যের অনুরোধে পুরাতন কর্তব্যজ্ঞানটা আমার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু

আমার ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে আনিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ব্রাহ্ম দুই স্ত্রী লইয়া একত্র বাস করিবে, ইহা বড়ই খারাপ কথা। বহুবিবাহের প্রতিবাদ আমাদের এক প্রধান কাজ। দুই স্ত্রী লইয়া একত্র থাকিলে তুমি বহুবিবাহের প্রতিবাদ করিবে কিরূপে?" আমি বলিলাম, "আমি তো দুই স্ত্রী নিয়ে ঘরকন্না করব বলে আনতে যাচ্ছি না। সে বেচারির অপরাধ কি যে, পিতা মাতা গত হওয়ার পরেও তাকে আশ্রয় দিব না? এ বহুবিবাহের অপরাধ তো তার নয়, সে অপরাধ আমার। আমি তাকে এনে লেখাপড়া শিখাব, সে রাজি হলে তার আবার বিয়ে দেব বলে আনতে যাচ্ছি।" এই মতভেদ লইয়া আমি কেশববাবুর শরণাপন্ন হইলাম। তিনি বিরাজমোহিনীকে আনিতে পরামর্শ দিয়া বলিলেন, "বাল্য বিবাহের দেশে বহুবিবাহে মেয়েদের অপরাধ কি? একজন যদি দশটি মেয়ে বিবাহ করে ব্রাহ্ম হয়, পরে সে দশজনকে আশ্রয় দিতে বাধ্য। এমন কি, আশ্রয় না দেওয়াতে উক্ত স্ত্রীলোকদের কেহ যদি বিপথে যায়, তার জন্য সে দায়ী।"

পত্নীকে পুনর্বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব। আমি কর্তব্য বোধে ১৮৭২ সালের মধ্যভাগে বিরাজমোহিনীকে আনিতে গেলাম। তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিব না, কিন্তু পুনঃ-পরিণীতা না হওয়া পর্যন্ত রক্ষা ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করিব, যত দূর মনে হয় এই ভাবেই আনিতে গিয়াছিলাম। আশ্রমে রাখিব ও মহিলা বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিব। পরে তিনি যদি পুনঃপরিণীতা হইতে না চান, লেখাপড়া শিখিলে কোনো ভালো কাজে বসাইয়া দিব। তিনি সুখী হইবেন, ও আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন— ইহা ভাবিয়া মনে মনে আনন্দ হইতে লাগিল। প্রসন্নময়ীকে বুঝাইয়া তাঁহাকে আনিতে গেলাম। আনিয়া আশ্রমে প্রসন্নময়ীর সহিত রাখিলাম। বিরাজমোহিনীর বয়স তখন ১৪।১৫ বৎসর হইবে। বিরাজমোহিনীকে বলিলাম, "আমি যে এতদিন তোমাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই, তাহার কারণ এই যে, আমার মনে আছে তুমি বড় হইয়া যদি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে চাও, করিতে দিব। আর যদি লেখা পড়া শিখিয়া কোনো ভালো কাজে আপনাকে দিতে চাও, দিতে পারিবে, এজন্য তোমাকে স্কুলে দিতেছি। তুমি এখন লেখা পড়া কর।" এই বলিয়া তাঁহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলাম। কিন্তু দিলে কি হয়? তিনি প্রথম প্রস্তাব শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, "মা গো! মেয়েমানুষের আবার ক'বার বিয়ে হয়!" তাঁহার ভাব দেখিয়া, পুনর্বিবাহের প্রতি দারুণ ঘৃণা দেখিয়া, আমার এতদিনের পোষিত মাথার ভূত এক কথাতে নামিয়া গেল। আমি বুঝিলাম, দ্বিতীয় প্রস্তাবই কার্যে পরিণত করিতে হইবে।

দাম্পত্য সঙ্কট। কিন্তু আর একদিক দিয়া আমার আর এক পরীক্ষা উপস্থিত হইল। প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী যখন এক ভবনে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন, অথচ আমি বিরাজমোহিনীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে বিরত রহিলাম, তখন প্রসন্নময়ী হইতেও সেই সময়ের জন্য আমার স্বতন্ত্র থাকা উচিত বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহার সঙ্গে বহুদিনের স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ রহিয়াছে, তৎপূর্বে হেমলতা, তরঙ্গিণী ও প্রিয়নাথ তিনজন জন্মিয়াছে। কিন্তু আশ্রমে স্কুল-ঘর ও কেশববাবুর আপিস-ঘর ভিন্ন অধিক বাহিরের ঘর ছিল না। রাত্রে প্রসন্নময়ীর ঘরে না শুইলে শুই কোথায়? দূরে গিয়া থাকা আমার পক্ষে ঘোর সংগ্রামের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। প্রসন্নময়ীর পক্ষেও তাহা অতীব ক্লেশকর হইল। অবশেষে প্রসন্নময়ীকে বুঝাইয়া বিদায় লইয়া

এখানে ওখানে শুইতে আরম্ভ করিলাম। ঘটনাক্রমে এক উপায় আবিষ্কার হইল। হিন্দু কলেজের বারাণ্ডাতে দপ্তরীদের একটা টেবিল পড়িয়া থাকিত। রাত্রে তাহাতে জিনিসপত্র কিছু থাকিত না। রাত্রে আহারের পর একখানা পুস্তক লইয়া সেখানে গিয়া সেই পুস্তক মাথায় দিয়া টেবিলে শুইয়া বেশ নিদ্রা যাইতাম। দীঘির মাঠের হাওয়ায় বেশ নিদ্রা হইত। প্রাতে আসিয়া স্নান করিয়া কেশববাবুর উপাসনাতে যোগ দিতাম, বন্ধুদের সহিত আহার করিতাম, আহারান্তে মহিলা স্কুলে পড়াইতাম, অপরাহ্নে বন্ধুদের সহিত ধর্মালাপে কাটাইতাম, সন্ধ্যার পর আহার করিয়া আবার হিন্দু কলেজের বারাণ্ডায় টেবিলের উপর গিয়া শুইতাম। সেখানে আমার সময় বড় ভালো যাইত। গভীর রাত্রের নির্জনে অনেক দিন ঈশ্বর চিন্তাতে যাপন করিতাম। রজনী প্রভাত হইবার পূর্বেই আমাকে উঠিতে হইত। ঊষাকালের সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত আমার পক্ষে বড়ই স্পৃহণীয় ছিল।

আমি জানিতাম, আমি যে গোলদীঘির ধারে টেবিলের উপরে রাত্রি যাপন করি, তাহা কেহ জানেন না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী উভয়েই সে কথা জানিতে পারিলেন। শুইবার স্থানাভাবে কলেজের বারাণ্ডায় পড়িয়া থাকি শুনিয়া প্রসন্নময়ী কাঁদিতে লাগিলেন। বিরাজমোহিনী মনে করিলেন, তিনিই এই সমুদয় কষ্টের কারণ, ইহা ভাবিয়া ঘোর বিষাদে পতিত হইলেন, তাঁহারও চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল।

স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন। এই সময় আবার আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃষ্ণনগর হইতে কর্ম ছাড়িয়া প্রচারক দলে যোগ দিবেন বলিয়া আসিলেন। তাঁহার আসিবার কথা যেদিন স্থির হয়, সেদিন কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সহিত কেশববাবুর যে কথোপকথন হয়, তাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেদিনের কথা কখনই ভুলিব না। কান্তিবাবু আসিয়া বলিলেন, "নগেন্দ্র আসিতে চাহিতেছেন, কি করা যাবে?"

কেশববাবু। সে তো ভালই, তিনি আসুন। করা যাবে কি, কেন ভাবছ? আবার করা যাবে কি?

কান্তিবাবু। কিরূপে চলবে?

কেশববাবু। তা ভাববার তোমার অধিকার কি? যিনি আনছেন, তিনিই তার উপায় করবেন।

তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ও নির্ভয়ের ভাব অনেক স্থলে দেখিয়াছি। নগেন্দ্রবাবু কৃষ্ণনগরে তাঁহার জননীকে রাখিয়া একটি পুত্র ও পত্নী সহ আশ্রমে আসিলেন।

কিন্তু তাঁহার আসিবার অচিরকালের মধ্যে কেশববাবুর অনুগত প্রচারক দলের সহিত আমার ও নগেন্দ্রবাবুর অপ্রীতি জন্মিতে লাগিল।

আমার প্রতি অপ্রীতি জন্মিবার দুই কারণ। প্রথম কারণ, এই সময়ে স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত হইল। ১৮৭২ সালে আমার বন্ধু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, দুর্গামোহন দাস, রজনীনাথ রায়, অন্নদাচরণ খাস্তগির প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্ম কেশববাবুকে বলিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের পরিবারস্থ মহিলাদিগকে লইয়া মন্দিরে পরদার বাহিরে বসিতে চান। কেবল এ কথা যে বলিলেন তাহা নহে, একটা কিছু স্থির হইতে না হইতে একদিন অন্নদাচরণ খাস্তগির ও দুর্গামোহন দাস স্বীয়-স্বীয় পত্নী ও কন্যাগণ সহ পরদার বাহিরে সাধারণ উপাসকদিগের মধ্যে গিয়া

বসিলেন। এইরূপ কয়েকবার বসিতেই উপাসক-মণ্ডলীর অপরাপর সভ্যগণ আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। অনেকে এত দূর গেলেন যে, কেশববাবুকে বলিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মন্দিরে আসা ত্যাগ করিতে হয়। ঐ সময়ে একদিন সমাগতা মহিলাদিগকে পরদার বাহিরে বসিতে নিষেধ করা হইল, তাহাতে অত্যগ্রসর দল রাগিয়া গেলেন। কেশববাবু বিপদে পড়িলেন। কিরূপে উভয় পক্ষ রক্ষা হয়, সেই চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী দল বিলম্ব সহ্য না করিয়া মন্দিরে আসা পরিত্যাগ করিলেন, এবং প্রথমে বহুবাজার ষ্ট্রীটে খাস্তগির মহাশয়ের ভবনে, ও তৎপরে অপর স্থানে, উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা একবার মহর্ষিকে আনিয়া আপনাদের সমাজে উপাসনা করাইলেন। আমার বন্ধু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই স্ত্রী-স্বাধীনতা পক্ষের প্রধান নেতা হইলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক দিন আমি এক বাড়িতে এক পরিবারে বাস করিয়াছিলাম। হৃদয়ে-হৃদয়ে একটা প্রীতির যোগ ছিল। আমি তাঁহাদের স্ত্রী-স্বাধীনতা দলের একজন পাণ্ডা হইলাম না বটে, কিন্তু তাঁহাদের সহিত আমার মনের যোগ ছিল। স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে বসিতে দিতে আমার আপত্তি ছিল না। বরং, যখন তাঁহারা বসিতে চাহিতেছেন, তখন বসিতে দেওয়া উচিত, এই মনে করিতাম। তবে দ্বারিকবাবুর ন্যায় মনে করিতাম না যে, বাহিরে বসিতে দিলেই পরিত্রাণের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। তখন আমার এই প্রকার ভাব ছিল। যাহা হউক, তাঁহারা স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিয়াই সেখানে মধ্যে মধ্যে উপাসনা করিবার জন্য আমাকে ধরিলেন। আমি জানিতাম, ইহাতে কেশববাবু অসন্তুষ্ট হউন বা না হউন, তাঁহার অনুগত প্রচারক দলের অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা পক্ষীয় সকলেই আমার বন্ধু এবং তাঁহাদের সহিত আমার হৃদয়ের যোগ, উপাসনা করিবার অনুরোধ কিরূপে লঙ্ঘন করি? কাজেই সম্মত হইলাম, এবং তাঁহাদের সমাজে উপাসনা করিতে লাগিলাম। ইহা প্রচারক মহাশয়দিগের সহিত আমার মতভেদের একটা কারণ হইল।

ক্রমে কেশববাবু তাঁহার ব্রহ্মমন্দিরের এক কোণে পরদার বাহিরে অগ্রসর দলের মহিলাদের জন্য বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। তখন স্ত্রী-স্বাধীনতার দল স্বতন্ত্র সমাজ তুলিয়া দিয়া আবার মন্দিরে আসিতে লাগিলেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে মতভেদ। মন্দিরে মহিলাদের বসিবার স্থান লইয়া যে বিবাদ তাহা মিটিয়া গেল বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে কেশব-বাবুর সহিত এই অগ্রসর দলের যে মতভেদ ঘটিয়াছিল, তাহা এরূপ সহজে মিটিবার জিনিস ছিল না। আশ্রমে যে মহিলা বিদ্যালয় ছিল, তাহাতে কেশববাবু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রীতি অনুসারে শিক্ষা দিবার বিরোধী ছিলেন। এমন কি, জ্যামিতি পড়ানো লইয়াও তাঁহার সহিত আমার তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। আমি জ্যামিতি লজিক ও মেটাফিজিক্স্ পড়াইতে চাহিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, "এ সকল না পড়াইলে প্রকৃত চিন্তাশক্তি ফুটিবে না।" কেশববাবু বলিলেন, "এ সকল পড়াইয়া কি হইবে? মেয়েরা আবার জ্যামিতি পড়িয়া কি করিবে? তদপেক্ষা এলিমেণ্টারি প্রিন্সিপল্স্ অব সায়েন্স মুখে মুখে শিখাও।" আমি সায়েন্স-এর মধ্যে মেণ্টাল সায়েন্স আনিলাম। তখন আমি তাজা কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, মেণ্টাল সায়েন্স-এ মাথা পূরিয়া রহিয়াছে, আমার ছাত্রীদিগকে তাহা না পড়াইয়া কি থাকিতে

পারি? আমি মুখে মুখে মেণ্টাল সায়েন্স বিষয়ে ও লজিক বিষয়ে উপদেশ দিতাম, ছাত্রীরা লিখিয়া লইতেন। সে সকল নোট এখনো আমার পুরাতন ছাত্রীদের কাহারও কাহারও নিকট থাকিতে পারে। আমার প্রধান ছাত্রী ছিলেন তিনজন, রাধারাণী লাহিড়ী, সৌদামিনী খাস্তগির (যিনি পরে মিসেস বি. এল. গুপ্ত হইয়াছিলেন) ও প্রসন্নকুমার সেনের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী সেন। ইঁহারা সকলেই তখন বয়স্থা ও জ্ঞানানুরাগিণী, ইঁহাদিগকে পড়াইতে আমার অতিশয় আনন্দ হইত।

কেশবচন্দ্রের আদেশ ঈশ্বরের আদেশ কিনা। স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন ও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে মতভেদ ব্যতীত আমার প্রতি বিরক্তির আরও একটি কারণ ছিল। আমি কেশব-বাবুর কোনো কোনো মত লইয়া সর্বদা তর্ক উপস্থিত করিতাম। এই তর্ক অনেক সময়েই কেশববাবুর সাক্ষাতে হইত। তন্মধ্যে আদেশের মত লইয়া বড় তর্ক হইত। কেশববাবু তাঁহার সমুদয় কার্য যেরূপ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া উপস্থিত করিতেন, এবং সকলকে ঈশ্বরাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং তদনুরূপ আচরণ করিতে হইবে বলিয়া উপদেশ দিতেন, তাহাতে আমার মনে ভয় হইত যে, তাঁহার সঙ্গের লোকের চিন্তার স্বাধীনতা নষ্ট হইবে। হয় তাঁহার আদেশ ফর্জ করিতে হইবে, নতুবা নিজের হাত পা বাঁধিয়া তাঁহার হাতে আপনাকে দিতে হইবে। আমি কেশব-বাবুকে বলিতাম, "আপনি আদেশ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, সেই ভাবে কাজ করিয়া যান। আমরা আদেশ বলিয়া লইতেছি কি না, দেখিবেন না।" তিনি আমার কথার প্রতি কর্ণপাত করিতেন না। ইহা লইয়া তাঁহার সঙ্গে মুখে ও চিঠিপত্রে তর্ক হইত। আমি মানব চিন্তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইতাম। তাঁহাকে বলিতাম, "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তো তাঁহার সকল কাজ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া নির্বাহ করিয়াছেন। কই, তিনি তো তাহা অপরের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করেন নাই, অন্যে সে ভাবে না লইলে তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই?"

কেশববাবু যখন আশ্রম স্থাপন করিলেন, তখন ইহাকে ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য বলিয়া স্থাপন করিলেন। কেবল তাহা নহে, ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য ব্রাহ্মদিগকে আহ্বান করিলেন, এবং সে ভাবে যাঁহারা গ্রহণ করিলেন না, তাঁহাদের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কেহ-কেহ প্রথমে ইহাকে এ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অধিক কি, যত দূর স্মরণ হয়, শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও প্রথমে ইহাকে এ ভাবে গ্রহণ করিলেন না। আমরা সপরিবারে আশ্রমে গেলাম, কিন্তু তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরার'-এ আবদ্ধ থাকাতে যাইতে পারিলেন না। তিনি ভয় পাইতে লাগিলেন যে, আশ্রমকে এরূপে 'ঈশ্বরাদেশ' বলিয়া ঘোষণা করিলে সমাজে বিরোধ উৎপন্ন হইবে। আমার বেশ স্মরণ আছে, আমরা বেলঘরিয়া বা কাঁকুড়গাছির উদ্যান ভবনস্থ আশ্রম হইতে আসিয়া কলিকাতার বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন, "কি হে, তোমাদের স্বর্গরাজ্য কত দূর এল?" যদিও পরে তিনি আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু এ কারণে তিনি সে সময়ে কিছুদিনের জন্য প্রচারকগণের নিন্দা ও তিরস্কারের পাত্র হইয়াছিলেন।

নগেন্দ্রবাবুর প্রতি প্রচারকগণের অপ্রীতি জন্মিবার আর এক প্রকার কারণ ছিল। নগেন্দ্রবাবুর তখন এক প্রকার শিরঃপীড়া ছিল, যাহাতে তিনি সময়-সময় লোকের সঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেন না, একাকী-একাকী থাকিতে ভালোবাসিতেন, অথবা

নিজের অন্তরঙ্গ কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে থাকিতেন। আশ্রমের উপাসনায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন বটে, কিন্তু অপরাপর অনেক সময়ে প্রচারকগণের সহিত বসিতেন না। তাঁহারা যখন দশজনে কেশববাবুর নিকট বসিয়া কথাবার্তা করিতেছেন, তখন হয়তো তিনি তাঁহার প্রিয়বন্ধু খ্যাতনামা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ভবনে শয়ন করিয়া তাঁহার মুখে জ্ঞানের কথা শুনিতেছেন। নগেন্দ্রবাবুর আর একটা স্মরণীয় দুর্বলতা এই ছিল যে, যে-কেহ বিরুদ্ধ ভাবে তাঁহার সমালোচনা করে, তিনি তাহার দিক দিয়া যাইতেন না। আমি দেখিতে লাগিলাম যে, নগেন্দ্রবাবুর সহিত প্রচারক মহাশয়দিগের বিচ্ছেদ দিন-দিন বাড়িতে লাগিল। আমি অনেক সময় তাঁহাকে বলিতাম, যাঁহাদের সঙ্গে কাজ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ হইতে এরূপ দূরে থাকা উচিত নয়। কিন্তু বলিলে কি হয় মানুষের প্রকৃতিতে যাহা আছে, তাহা কি হঠাৎ চলিয়া যায়?

তিনি যে একাকী বেড়াইতেন, অনেক সময় গভীর আত্মচিন্তাতে যাপন করিতেন। একদিনের কথা মনে আছে। একদিন আমরা সকলে কাঁকুড়গাছির বাগানে ভারত আশ্রমে, সায়ংকালীন উপাসনার পর কেশববাবুর সহিত নানা প্রকার কথাবার্তাতে আছি, এমন সময় কেশববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নগেন্দ্র কই?" অমনি নগেন্দ্র-বাবুর অনুসন্ধান হইল। জানা গেল যে তিনি বৈকাল হইতে নিরুদ্দেশ আছেন। রাত্রি প্রায় ৯টা বাজিয়া গেল, তখন চট্টোপাধ্যায়মহাশয়ের আবির্ভাব হইল। আমি তাঁহাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলাম, "আপনার খোঁজ হইয়াছিল, আপনি কোথায় ছিলেন?" তিনি বলিলেন, "আজ মনটা বড় খারাপ আছে, তাই তিন-চারি ঘণ্টা মানিকতলার খালের ধারে বেড়াইতেছিলাম ও একটা গান বাঁধিয়া গাইতেছিলাম। এই বলিয়া গানটা গাইয়া আমাকে শুনাইলেন। সেটা এই—

আমি কি বলে প্রার্থনা বল করি আর!
আমার সকল কথা ফুরাইল, ফিরিল না মন আমার।
তুমি দেখ সব থেকে অন্তরে, তোমায় কথায় কে ভুলাতে পারে,
প্রাণের প্রাণ, বলব কি আর, কি আর আছে বলিবার!
ওহে, প্রাণ যদি চাহে তোমারে, তুমি থাকিতে কি পার দূরে?
আপনি এস পাপীর দ্বারে, তাই পতিতপাবন নাম তোমার।

আমি শুনিয়া ভাবিলাম, নগেন্দ্রবাবু যে সন্ধ্যার সময় আমাদের সঙ্গে না বসিয়া একলা ছিলেন, সে ভালোই হইয়াছে। কিন্তু প্রচারক বন্ধুগণ সকল সময়ে সেরূপ ভাবিতে পারিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন, নগেন্দ্র যখন আমাদের সহিত কাজ করিতে আসিয়াছেন, তখন আমরা যেরূপে বসি দাঁড়াই, তাঁহাকেও সেইরূপ করিতে হইবে। তাঁহারা দিন-দিন নগেন্দ্রবাবুর উপর চটিতে লাগিলেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের সহিত আমার বিবাদ হইতে লাগিল। আমি নগেন্দ্রবাবুর পক্ষ হইয়া তাঁহাদের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলাম। তাঁহারা আমাকে আলস্যের প্রশ্রয়দাতা বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

নিয়মতন্ত্র প্রণালী লইয়া মতভেদ। আর একটা বিষয়ে একটু মতভেদ ঘটিল। কেশব-বাবু ইংলণ্ড হইতে আসিয়া, অপরাপর কাজের আয়োজনের মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরের উপাসকদিগকে ডাকিয়া একটি ঘনিবিষ্ট মণ্ডলী করিবার চেষ্টা করিতে

লাগিলেন। কিন্তু উপাসকদিগকে ডাকিলেই তাঁহারা স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অনেক বিষয়ে মতভেদ ও তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইতে লাগিল। যুবকদলের অনেকে উপাসক মণ্ডলীর কার্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপনের জন্য উৎসুক হইলেন। সেটা স্বাভাবিক কিন্তু কেশববাবু বোধ হয় তাহা পছন্দ করিলেন না। কারণ, কিছুদিনের মধ্যেই দেখিলাম, উপাসক মণ্ডলীর সভ্যগণকে মধ্যে-মধ্যে ডাকা রহিত হইল। বৎসরান্তে একবার একটা সম্মিলিত সভার মতো হইত, এই মাত্র অবশিষ্ট রহিল। অনেক যুবক ব্রাহ্ম-উপাসকগণের ঘনিবিষ্ট মণ্ডলী গঠনের জন্য উৎসাহিত হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আমি একজন। নিয়মতন্ত্র প্রণালী মতে কাজ হয়, তাহাও আমরা কয়েকজনে চাহিতেছিলাম। সে আকাঙ্ক্ষাও একবার জাগিয়া আবার ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় রহিল।

পল্লীসংস্কারে আত্মনিয়োগ

পীড়িত মাতুলের আহ্বান। এই সকল মতভেদের মধ্যে ১৮৭৩ সালের প্রথমে আমার পূজ্যপাদ মাতুল, সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, পীড়িত হইয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তিনি আর কাজ করিতে পারিতেছিলেন না। ত্বরায় পেনসন লইয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকতা হইতে বিদায় লইয়া, বায়ু পরিবর্তনের জন্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সোমপ্রকাশ, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গ্রামস্থ সংস্কৃত-ইংরাজী স্কুল, তাঁহার বিষয়, তাঁহার পরিবার-পরিজনের দেখিবার ভার কে নেয়? আমার মাতুলপুত্রদিগের মধ্যে কেহই কাজের লোক ছিল না। বড়মামা আমাকে নিজের চক্ষের উপরে মানুষ করিয়াছিলেন। আমি বাল্যাবধি তাঁহার দৃষ্টান্ত না দেখিলে, ধর্ম ও নীতির ভাব যাহা হৃদয়ে পাইয়াছি, তাহা পাইতাম কি না সন্দেহ। মামা আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, এখন তুমি আসিয়া আমার স্কন্ধের সব ভার না লইলে আমি বায়ু পরিবর্তনের জন্য যাইতে পারি না।

আমি বিপদে পড়িয়া গেলাম। কেশববাবুর অনুরোধে একটা কাজের ভার লইয়াছি, আবার মামার অনুরোধ অপরদিকে। প্রথম দিনে কোনো উত্তর না দিয়া ভাবিতে-ভাবিতে কলিকাতায় আসিলাম। আসিয়া মনে অনেক চিন্তা করিলাম, নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতির সহিত অনেক পরামর্শ করিলাম। সকলেই মামার সাহায্যার্থ যাইতে বলিলেন। অবশেষে অনেক চিন্তার পর কেশববাবুকে গিয়া বলিলাম, "নূতন বৎসর আরম্ভ হইতেছে, এখন মহিলা স্কুলে আমার স্থলে পড়াইবার ভার অপর কাহারও উপর দেওয়া যাইতে পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করুন। আমাকে আমার মাতুলের সাহায্যের জন্য যাইতে হইবে।" তিনি কিছু বলিলেন না, মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন কি না, তখন বুঝিতে পারিলাম না। পরে বুঝিয়াছি যে, আমার চলিয়া যাওয়া তিনি পছন্দ করেন নাই। আমি প্রচার কার্যে জীবন দিবার জন্য আসিয়া বিষয় কর্মে গেলাম, ইহা তাঁহার ভালো লাগে নাই।

যাহা হউক, আমি মাতুলের সাহায্যের জন্য হরিনাভিতে গেলাম। গিয়া মাতুলের সোমপ্রকাশের সম্পাদক, স্কুলের সম্পাদক ও হেডমাস্টার, তাঁহার বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক, ও তাঁহার পরিবার-পরিজনের রক্ষক ও অভিভাবক হইয়া বসিলাম। বড়মামা আমাকে বসাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীতে গেলেন।

দুই-একদিনের মধ্যেই একদিন কেশববাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন, আমার দুই পত্নীকে যে ভাবে আশ্রমে রাখিয়াছি, তাহা আর চলিবে না। তিনি ভয় করেন যে, বিরাজমোহিনী আত্মহত্যা করিবেন, যদিও আমার মনে সে

প্রকার ভয় ছিল না, কারণ, আমি কলিকাতায় আসিলেই তাঁহাকে বুঝাইতাম। যাহা হউক, অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, প্রসন্নময়ী আমার সঙ্গে হরিনাভিতে থাকিবেন এবং বিরাজমোহিনীকে আশ্রম হইতে অন্য কোথাও রাখা হইবে, আমি শনিবারে সেখানে আসিয়া রবিবার তাঁহার সঙ্গে যাপন করিব।

অতঃপর প্রসন্নময়ী আমার সহিত হরিনাভিতে গেলেন। নগেন্দ্রবাবু আশ্রম ছাড়িয়া আর এক স্থানে কতিপয় বন্ধুর সহিত বাসা করিলেন, বিরাজমোহিনী তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। আমি প্রতি শনিবার কলিকাতায় আসিয়া রবিবার তাঁহার সঙ্গে যাপন করিতে লাগিলাম।

তখন আমি যে প্রণালীতে কার্য করিব বলিয়া স্থির করিলাম, তাহা এই। বিরাজ-মোহিনী আমা হইতে বিযুক্ত হইতে চাহিলেন না দেখিয়া এই স্থির করিলাম যে, যখন তিনি ও প্রসন্নময়ী একত্র থাকিবেন, তখন আমি উভয় হইতে বিযুক্ত থাকিব, আর যখন তাঁহারা ভিন্ন-ভিন্ন গৃহে পরস্পর হইতে পৃথক থাকিবেন, তখন পতিভাবে মিলিব। তদনুসারেই কার্য আরম্ভ হইল। প্রসন্নময়ীর জীবিত কালে বহু বৎসর এই প্রণালীতে কার্য চলিয়াছে।

এই ১৮৭৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনের দিন, হরিনাভিতে আমার তৃতীয়া কন্যা সুহাসিনীর জন্ম হইল।

হরিনাভিতে আমি মহা কার্যের আবর্তের মধ্যে পড়িলাম। প্রথম, মামার স্কুলটির ভার লইয়া দেখি যে, তৎপূর্বে কয়েক বৎসর গ্রামে ম্যালেরিয়া জ্বরের আবির্ভাব হওয়াতে, স্কুলের ছাত্র সংখ্যা হ্রাস হইয়া স্কুলের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়াছে। ইহার ফল এই হইল যে, আমি নামে হেডমাস্টার রূপে একশত টাকা পাইতে লাগিলাম বটে, কিন্তু তাহা হইতে সেক্রেটারী রূপে মাসে ৪০।৫০ টাকা অপরাপর শিক্ষকের বেতনের সাহায্যের জন্য দিতে লাগিলাম। ওদিকে, সোমপ্রকাশের কার্যভার প্রধানত আমার উপর পড়িয়া যাওয়াতে সংবাদপত্রাদি পাঠে ও লেখাতে অনেক সময় দেওয়া আবশ্যক হইল। তাহার উপর, মধ্যে মধ্যে বড়মামার তালুক দেখিবার জন্য লবণাম্বু-পূর্ণ সুন্দরবনের মধ্যে গিয়া দুই-একদিন বাস করিতে লাগিলাম। ইহার উপরে আমাকে ম্যালেরিয়াতে ধরিল। ঘন-ঘন জ্বর হইয়া লিভারে বেদনা দাঁড়াইল। লিভারে ব্লিষ্টার দিয়া, ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করিয়া তদুপরি পূর্বোক্ত কার্য সমুদয় চালাইতে লাগিলাম।

গ্রাম সংস্কারের চেষ্টা। পূর্বোক্ত বিষয়গুলি ভিন্ন আমাকে আরও কয়েক প্রকার সংগ্রামের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। প্রথম, আমি সোমপ্রকাশের কার্যভার হাতে লইয়াই দেখিতে পাইলাম যে, রাজপুর হরিনাভি প্রভৃতি গ্রামগুলি কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবর্তী বেহালা প্রভৃতি গ্রামের সহিত এক মিউনিসিপ্যালিটিতে আবদ্ধ হইয়াছে। তদবধি প্রায় দশ বৎসর কাল হরিনাভি, রাজপুর, চাঙ্গড়িপোতা প্রভৃতি গ্রামের প্রজাগণ রীতিমতো মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দিয়া আসিতেছে, যথাসময়ে ট্যাক্স না দিলে তাহাদের ঘটিবাটি নিলাম হইতেছে, কিন্তু দশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের অনেক রাস্তাতে এক মুঠা মাটি পড়ে নাই; এমন কি, এই দীর্ঘকালে অনেক নরদামা হইতে এক মুঠা মাটি তোলা হয় নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম, মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে বেহালা ও তৎসন্নিকটবর্তী স্থানের লোক অধিক হওয়াতে, অধিকাংশ টাকা সেইদিকেই ব্যয় হইতেছে।

ইহা আমার বড় অন্যায় বোধ হইল। আমি এই অবস্থা ঘুচাইবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া সোমপ্রকাশে লেখনী ধারণ করিলাম, সোমপ্রকাশের বাহিরের পাঠকগণ বিরক্ত হইয়া যাইতে লাগিলেন। কাগজে লিখিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া, আমি স্কুলগৃহে গ্রামবাসীদিগকে ডাকিয়া এ বিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ করিলাম। বহু জনের স্বাক্ষর করাইয়া কর্তৃপক্ষের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করিলাম। যদিও এই সকল আন্দোলনের ফল হরিনাভি ত্যাগ করিবার পূর্বে আমি দেখিয়া আসিতে পারি নাই, তথাপি সুখের বিষয় এই যে, ইহারই ফলে রাজপুর প্রভৃতি গ্রাম বেহালা হইতে পৃথক হইয়া এক স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটি রূপে পরিণত হইয়াছে এবং গ্রামের অবস্থা অনেক ফিরিয়াছে।

আমি এই সময়ে আর এক বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করি, এবং ঈশ্বর কৃপায় তাহাতেও কৃতকার্য হই। সোমপ্রকাশে লিখিতে আরম্ভ করি যে, রাজপুর প্রভৃতির ন্যায় ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত গ্রাম সকলের মধ্যে একটি গবর্ণমেণ্ট চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি থাকা উচিত। আমি হরিনাভিতে থাকিতে থাকিতেই গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। প্রথম ডাক্তার ও ঔষধের বাক্স আমার নিকট প্রেরিত হয়। আমি ডাক্তার মহাশয়কে ও ঐ ডাক্তারখানাকে হরিনাভির এক ভদ্রলোকের বাহির বাড়িতে স্থাপন করি। পরে সেই দাতব্য চিকিৎসালয়ের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

তৃতীয় এক বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করিতে হয়। সেটি মামার স্কুলটিকে স্থায়ী ভূমির উপর দণ্ডায়মান করিবার চেষ্টা করা। মামা স্কুলটি স্থাপন করিবার সময় একটি অবিবেচনার কার্য করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে বোধ হয় ছিল যে স্কুলটি উঁচু দরের স্কুল হইবে। সে জন্য তিনি শিক্ষকদিগের বেতনের হার চড়াইয়া বাঁধিয়া-ছিলেন যথা, প্রথম পণ্ডিতের বেতন ৪০্ টাকা। কিন্তু ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, কেহই তৎপূর্বে ঐ উচ্চ হারে বেতন পান নাই, হেড পণ্ডিত মহাশয় তৎপূর্বে পাঁচ বৎসর মাসে ২৫্ টাকাই পাইয়া আসিতেছিলেন। এইরূপ অপরেরাও স্কুল প্রতিষ্ঠা কালে নির্দিষ্ট বেতন অপেক্ষা অনেক কম বেতন পাইতেন। বেতনের হার বড় রাখার ফল এই হইয়াছিল যে, যখনই ছাত্র দত্ত বেতন হইতে কিছু টাকা উদবৃত্ত হইত, তাহা ঐ উচ্চ হারের কুক্ষিতে যাইত। বহুদিন হইতে বেঞ্চ ম্যাপ গ্লোব লাইব্রেরি প্রভৃতির জন্য কিছু ব্যয় করা হইত না। এ সকলের অতীব অভাব ছিল, অথচ তাহা পূর্ণ হইত না। শিক্ষকদিগের কল্পিত বেতনের হার কমাইয়া আমি স্কুলটির উন্নতি করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম, এবং সর্বাগ্রে আমার বেতন ১০০্ হইতে ৮০্ করিয়া, অপরাপর শিক্ষকগণ তৎপূর্বে পাঁচ বৎসর যাহা পাইয়া আসিতেছিলেন তাহাই তাঁহাদের নির্দিষ্ট বেতন বলিয়া স্থির করিবার জন্য ইনস্পেক্টরকে লিখিলাম। শিক্ষকদিগের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমার মাতার জ্যাঠতুতো ভাই কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তখন স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন, তিনি এই আন্দোলনে প্রধান নেতা হইলেন। শিক্ষকদিগের মধ্যে কেহ-কেহ স্কুল ভাঙিয়া আর এক স্কুল করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আমি কিছুদিন চুপ করিয়া থাকিলাম, তাঁহাদিগকে গোপনে বুঝাইলাম, আমার উদ্দেশ্য যে স্কুলটির উন্নতি করা, ইহা ভালো করিয়া দেখাইয়া দিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা থামিলেন না। অবশেষে একদিন ছুটির পরে সমুদয় শিক্ষককে একত্র করিয়া ঘাড় খুলিয়া তাঁহাদের সম্মুখে বসিলাম। বলিলাম, "যিনি-যিনি স্কুল ছাড়িয়া যাইতে চান ও স্কুলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে দশ মিনিট সময় দিতেছি। ইহার মধ্যে স্থির

করিয়া বলিতে হইবে, তিনি থাকিবেন কি যাইবেন। যদি থাকেন, স্কুলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিতে হইবে।" সকলেই নিরুত্তর রহিলেন, দশ মিনিটের পর সকল আন্দোলন থামিয়া গেল। কিন্তু অনেকে মনে-মনে আমার প্রতি বিরক্ত রহিলেন। কি করিব, কর্তব্য বোধে লোকের অপ্রিয় হইতে হইল।

যাত্রাদলের সং স্কুলের শিক্ষক। আর একটি আন্দোলন ইহা অপেক্ষাও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। আমি স্কুলের ভার লইয়া দেখি, স্কুলের কয়েকটি শিক্ষক গ্রামস্থ শখের যাত্রার দলে সং সাজেন। একজন 'ভগি দিদি' সাজেন, আর একজন আর একটা কি সাজেন। ঐ শখের যাত্রার দলটি কতকগুলি নিষ্কর্মা ধনীসন্তানের কার্য ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সুরাসক্ত এবং অপরাপর দুষ্ক্রিয়াতে লিপ্ত ছিলেন। স্কুলের শিক্ষক দুইটি সেই দলে থাকাতে বালকগণ তাঁহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত, স্কুলের বোর্ডে লিখিয়া রাখিত, "ভগিদিদি! চ'টো না," ইত্যাদি। ইহা আমার পক্ষে অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। আমি এক সার্কুলার জারি করিলাম যে, স্কুলের কোনো শিক্ষক শখের দলের অভিনেতার মধ্যে থাকিলে তাহা তাঁহার পক্ষে শিক্ষকতার অনুপযুক্ত কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহাতে ঐ দুই শিক্ষক যাত্রার দল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। শখের দলের ইয়ারেরা আমার প্রতি হাড়ে চটিয়া গেল।

এই ক্রোধ তাহারা বহুদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়া, অবশেষে ১৮৭৪ সালের চৈত্র মাসের শেষে গোষ্ঠযাত্রার সময় সুরার ঝোঁকে সদলে আমার বাড়ি আক্রমণ করিল ও আমার সঙ্গের একটি যুবকের মাথা ফাটাইয়া দিল। যে কারণে তাহারা দাঙ্গা করিতে আসিল, তাহা এই। গোষ্ঠযাত্রার সময় গ্রামের জমিদারবাবুদের বাড়িতে মহাসমারোহে ঐ উৎসব সম্পন্ন হইত, এবং স্কুলের সম্মুখস্থিত রাস্তাতে তাঁহাদের বাড়ি পর্যন্ত হাট বসিত। আমি স্কুলবাড়ির ভিতর দিকেই সপরিবারে থাকিতাম। ঐ দিন বৈকালে স্কুলের পাঠগৃহে বসিয়া পড়িতেছি, এমন সময়ে সম্মুখের হাট হইতে একটি ছেলে আসিয়া বলিল যে, এক তাশখেলার দোকানদার তাহার এক সহাধ্যায়ীকে তাশের খেলা দেখাইয়া ঠকাইয়া তাহার সমুদয় পয়সা লইয়াছে, ছেলেটি কাঁদিতেছে। ইহা শুনিয়া আমি ঐ তাশখেলার দোকানে গেলাম, এবং ছেলেটিকে প্রতারণা করার জন্য তাশওয়ালাকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম। বলিলাম, "এরূপ প্রবঞ্চনার খেলা আইন বিরুদ্ধ, আমি পুলিস ইনস্পেক্টরকে জানাইব।" এই বলিয়া চলিয়া আসিলাম। পরে শুনিলাম, সেই দোকানদার আমার নামে নালিশ করিবার জন্য জমিদারবাবুদের বাড়িতে গেল। তাঁহারা তখন বন্ধুবান্ধব লইয়া মজলিসে বসিয়া আছেন, তাহার মধ্যে এই সংবাদ পাইয়া, বলিতে লাগিলেন, "কি, এত বড় আস্পর্ধা! আমাদের গ্রামে চাকুরী করতে এসে আমাদের কাজের উপর হাত! একবার গিয়ে শোনো তো কি বলেন।" আর কোথায় যায়! অমনি সেই বাড়ির কয়েকটি যুবক লাঠি সোটা লইয়া স্কুলবাড়ির অভিমুখে ধাবিত হইল। তাহারা আসিতেছে শুনিয়া আমি আমার নিকটস্থিত একটি ছাত্রকে বাড়ির ভিতরের দিকে একটা তালা লাগাইতে বলিলাম। মনে করিলাম, ভিতরে তালা লাগানো থাকুক, উত্তেজনা থামিয়া গেলে জমিদারবাবুকে সকল কথা ভাঙিয়া বলিব। ছেলেটি তালা দিতে গিয়াছে, ওদিকে আক্রমণকারী দল উপস্থিত। তাহারা লাঠি মারিয়া ছেলেটির মাথা ফাটাইয়া দিল, পরে স্কুলবাড়িতে প্রবেশ করিল। আমি আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া নির্ভয়ে গিয়া তাহাদের সমক্ষে

দাঁড়াইলাম। তাহারা আমাকে মারিল না। একজন আসিয়া তাহাদের কানে-কানে কি বলিল, তাহারা একে-একে বাহির হইয়া গেল। আদালতে মোকদ্দমা তুলিলে ইহাদের বিশেষ শাস্তি হইত, কিন্তু তাহা করা হইল না। ভালোই হইল, কারণ ইহার পর জমিদারবাবু আমার প্রতি ও স্কুলের প্রতি বিশেষ সদ্ভাব দেখাইতে লাগিলেন।

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ। এই সকল কাজের মধ্যে হরিনাভিতে পদার্পণ করিয়াই আমি হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজকে উজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করি। কতকগুলি যুবক এই সময় হইতে আকৃষ্ট হইয়া সমাজে যোগ দেন। আমার অনুরোধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য কেশবচন্দ্র সেন উভয়েই হরিনাভি সমাজের উৎসবে গিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন। এই সময়ে আমার বন্ধু প্রকাশচন্দ্র রায়কে আমি স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার নিযুক্ত করি। তিনি আমার সহিত স্কুলবাটীতেই থাকিতেন। প্রসন্নময়ী তাঁহাকে জ্যেষ্ঠের ন্যায় দেখিতেন। প্রকাশের ন্যায় ব্যাকুলাত্মা আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। আমাদের পারিবারিক উপাসনা হইত। তদ্ভিন্ন প্রকাশ ও আমি ধর্ম-জীবনের গভীর তত্ত্ব সকলের আলোচনাতে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ যাপন করিতাম। ফলত তাঁহার সহবাসে আমি ও প্রসন্নময়ী এই সময়ে বিশেষ উপকৃত হইলাম। তদবধি প্রকাশচন্দ্রের সহিত এরূপ গাঢ় বন্ধুতা জন্মিয়াছিল যে, তাহা পরবর্তী সমাজ বিপ্লবেও নষ্ট হয় নাই। এই সময়ে প্রকাশের পত্নী অঘোরকামিনী কিছুদিন হরিনাভিতে গিয়া আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াও উপকৃত হইলাম।

পতিতা নারীর কন্যা লক্ষ্মীমণি। এই হরিনাভি বাসকালের আর একটি ঘটনা উল্লেখ-যোগ্য। এই সময়ে লক্ষ্মীমণি আমার আশ্রয়ে আসে। লক্ষ্মীমণি ঢাকা শহরের একটি পতিতা নারীর কন্যা। তাহার মাতা তাহাকে বাল্যকালে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িতে দিয়াছিল। লক্ষ্মীমণি ঐ স্কুলে একজন খৃষ্টিয়ান শিক্ষয়িত্রী ও এক ব্রাহ্ম শিক্ষকের সংশ্রবে আসে। ইঁহাদের সংশ্রবে আসিয়া, তাহার মাতা যে জীবন যাপন করিতেছিল তাহার প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মে। লক্ষ্মীর বয়ঃক্রম যখন ১৩। ১৪ হইল, তখন তাহার মাতা তাহাকে নিজ বৃত্তিতে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার জননী প্রথমে প্ররোচনা অনুরোধ প্রভৃতি করিয়া অকৃতকার্য হইয়া অবশেষে বল প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। একদিন বেচারিকে একটা পুরুষের সঙ্গে একঘরে সমস্ত দিন বন্ধ করিয়া রাখিল। আঁচড়, কামড়, হাত-পা ছোঁড়ার দ্বারা যত দূর হয়, লক্ষ্মী সমুদয় করিয়া সমস্ত দিন আত্মরক্ষা করিল। সন্ধ্যার সময় একবার দ্বার খোলা পাইয়া লক্ষ্মী সরিয়া পড়িল, এবং একেবারে সেই ব্রাহ্ম শিক্ষকের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে লইয়া একটি ব্রাহ্ম পরিবারে রাখিলেন। লক্ষ্মীর মাতা দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় কন্যা লাভের জন্য আদালতে নালিশ উপস্থিত করিল। সৌভাগ্যক্রমে একজন ইংরাজ বিচারকের নিকট এই মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সমুদয় বিবরণ জ্ঞাত হইয়া লক্ষ্মীকে মাতার হাত হইতে লইয়া সেই ব্রাহ্ম অভিভাবকের হস্তে অর্পণ করিলেন।

লক্ষ্মীর মাতা মোকদ্দমাতে হারিয়া আর এক প্রকারে লক্ষ্মীকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। লক্ষ্মীকে দেখিতে আসিতে আরম্ভ করিল, বারণ করিলে শুনিত না। এইরূপে, যে গৃহস্থের গৃহে সে আশ্রয় লইয়াছিল,

তাহাদিগকে এক প্রকার অস্থির করিয়া তুলিল। তখন উদ্ধারকারী ব্রাহ্মগণ লক্ষ্মীকে নিরাপদ রাখিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আনিলেন। আনিয়া, রাখিবার উপযুক্ত স্থান না পাইয়া, হরিনাভিতে আমার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি প্রসন্নময়ীর সহিত পরামর্শ করিয়া লক্ষ্মীকে আশ্রয় দিলাম। এখানে বলা আবশ্যক যে, গণেশ-সুন্দরী বা মনোমোহিনী তৎপূর্বেই বিবাহিতা হইয়া আমাদের গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

পরে একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবকের সহিত লক্ষ্মীমণির বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু সে বেচারি অধিক দিন বিবাহিত জীবনের সুখ ভোগ করিতে পারে নাই। বিবাহের পর তাহারা উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়িতে গিয়া বাস করিয়াছিল। সেখানে এক বৎসরের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়।

কলিকাতায় শিক্ষকতা

সোমপ্রকাশ পত্রিকার উন্নতি। আমি যখন হরিনাভিতে বাস করি তখন সে স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রথম আবির্ভাব; তাহার প্রকোপ তখন অত্যন্ত অধিক। সেখানে যাইবার কিছুদিন পরেই আমাকে ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরে, ও বার-বার জ্বর হইয়া আমাকে বড় কাহিল করিয়া ফেলে। তাহার উপরে পূর্বোক্ত সকল কারণে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত, তাহাতে দেড় বৎসরের মধ্যেই আমার শরীর ভাঙিয়া গেল। আমার এই অবস্থা দেখিয়া আমার শুভানুধ্যায়ী তৎকালীন স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় আমাকে ভবানীপুরের নবপ্রতিষ্ঠিত সাউথ সুবার্বন স্কুলের হেডমাস্টার করিয়া আনিলেন। যত দূর স্মরণ হয়, আমি ১৮৭৪ সালের শেষ ভাগে ঐ স্কুলে আসিলাম।

আমার স্বগ্রামবাসী ও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসম ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমার স্থানে হরিনাভির হেডমাস্টার হইয়া গেলেন। বিরাজমোহিনী তাঁহাদের সহিত হরিনাভিতে গিয়া তাঁহাদের পরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। প্রসন্নময়ী লক্ষ্মীমণি সহ আমার সঙ্গে ভবানীপুরে আসিলেন। আমি শনিবার হরিনাভিতে যাইতাম, রবিবার সোমপ্রকাশ সম্পাদন করিতাম, সোমবারে ভবানীপুরে ফিরিয়া আসিতাম। এইরূপে কিছুদিন গেল। অবশেষে আমি আমার কাজের সুবিধার জন্য মাতুলের কাগজ ও ছাপাখানা ভবানীপুরে তুলিয়া আনিলাম। সোমপ্রকাশে এক ফরমা ইংরাজী সংযোগ করিয়া ইহার উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রেসেরও অনেক উন্নতি করিলাম।

এতদ্ভিন্ন ভবানীপুরে আসিয়াই কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত সমবেত হইয়া একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলাম। আমার নিজ ভবনেই এই সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা হইত। আমাকেই অধিকাংশ দিন আচার্যের কার্য করিতে হইত। মধ্যে-মধ্যে কলিকাতা হইতে নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি কোনো-কোনো বন্ধুকে আনিয়া উপাসনা করাইতাম।

সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের যে ভার ছিল, তাহা আমি হরিনাভিতে থাকিবার সময়েও রাখিয়াছিলাম, এবং অনেক সময় জলে ঝড়ে দুর্যোগে হরিনাভি হইতে আসিয়া সম্পন্ন করিতাম; তাহা এই সময়ে আমার বন্ধু কেদারনাথ রায়ের প্রতি অর্পণ করি। তিনি ইহার পর অনেক দিন ঐ কার্য করিয়াছিলেন।

মহিলাদের উচ্চশিক্ষার আন্দোলন। আমার হরিনাভি বাস কালে, কলিকাতাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নানা আন্দোলন চলিতেছিল। ভবানীপুরে আসিয়া

আমি সেই আন্দোলন স্রোতে পড়িয়া গেলাম। ইহার কোনো-কোনো আন্দোলন আমি ভারত আশ্রমে থাকিবার সময়েই প্রথম উঠিয়াছিল। মন্দিরে পরদার বাহিরে মেয়েদের বসা ও মেয়েদের শিক্ষা, এই দুই বিষয়ে কেশববাবুর সহিত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, দুর্গামোহন দাস, রজনীনাথ রায়, অন্নদাচরণ খাস্তগির প্রভৃতি একদল ব্রাহ্মের কিরূপ মতভেদ দাঁড়াইয়াছিল, তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর দল ভারত আশ্রমের পূর্বোক্ত মহিলা বিদ্যালয়ে সন্তুষ্ট না হইয়া মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে আর একটি স্কুল স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন।

প্রথম তাঁহারা হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। বিলাত হইতে নবাগতা কুমারী এক্রয়েড ইহার তত্ত্বাবধায়িকা হইলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে কুমারী এক্রয়েড বিবাহিতা হওয়াতে, ঐ বিদ্যালয় বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় নামে পরিবর্তিত হইয়া কিছুদিন পরে বেথুন কলেজের সহিত মিলিত হয়।

বালিগঞ্জে একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া এই স্কুল খোলা হইল। গাঙ্গুলী ভায়া নিজে একজন শিক্ষক হইলেন। শিক্ষক কেন, তিনি দিন-রাত্রি বিশ্রাম না জানিয়া ঐ স্কুলের উন্নতি সাধনে দেহ-মন নিয়োগ করিলেন।

আমি ভবানীপুরে আসিয়া দেখিলাম যে ঐ স্কুল চলিতেছে। গাঙ্গুলী ভায়া ছাড়িবার লোক ছিলেন না। আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতাম। এমন সাচ্চা সত্যানুরাগী লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি, গাঙ্গুলী ভায়া স্ত্রী-স্বাধীনতার নেতা ছিলেন। আমি স্ত্রী-স্বাধীনতার ভাবটা তাঁহার মতো না লই, স্ত্রীজাতির উন্নতি হয় ইহা অন্তরের সহিত চাহিতাম। আমি ভবানীপুরে আসিলেই গাঙ্গুলী ভায়া আমাকে ছিনা জোঁকের মতো ধরিয়া বসিলেন যে, আমার কন্যা হেমলতাকে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে দিতেই হইবে। সুতরাং হেমলতাকে বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয়ে দিলাম।

প্রচারকগণের কার্যের বিচার হইতে পারে কি না? এই সময়ে আর এক আন্দোলন উঠিল। আমার হরিনাভি বাস কালের মধ্যে কেশববাবুর প্রতিষ্ঠিত ভারত আশ্রমে এক ঘটনা ঘটে। ঐ সময়ে আমার স্বগ্রামবাসী ব্রাহ্ম ভ্রাতা হরনাথ বসু মহাশয় সপরিবারে ভারত আশ্রমে থাকিতেন। হরনাথবাবু মন-খোলা, মহোৎসাহী মানুষ ছিলেন। আয় অল্প ও ব্যয় বহু হওয়াতে তাঁহার আয়-ব্যয়ের সমতা কখনোই ছিল না। তিনি সপরিবারে আশ্রমে ছিলেন, কিন্তু দেনদার হইয়া পড়িয়াছিলেন। আশ্রমের অধ্যক্ষমহাশয় পীড়াপীড়ি করাতে তিনি আশ্রম হইতে স্ত্রীপুত্রাদিগকে নিজের শ্বশুর-বাড়ি প্রেরণ করা স্থির করিলেন। কিন্তু যাইবার সময় আশ্রমের দেনা দিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার পত্নী বিনোদিনী পুত্র-কন্যা সহ গাড়ি করিয়া আশ্রম হইতে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় আশ্রমের অধ্যক্ষমহাশয়ের আদেশ ক্রমে ভৃত্যেরা আসিয়া দ্বারে গাড়ি অবরোধ করিল, দেনা শোধ না করিলে গাড়ি যাইতে দিবে না। বিনোদিনী আপনাকে অপমানিতা বোধ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এবং আপনার গাত্র হইতে গহনা খুলিয়া দিলেন। তৎপরে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

হরনাথবাবু উত্তেজিত হইয়া বিনোদিনীর নাম দিয়া এই ঘটনার বিবরণ 'সাপ্তাহিক সমাচার' নামক এক ব্রাহ্ম বিরোধী সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশ করিলেন। দেশীয় সংবাদপত্র সকল একে চায়, আরে পায়। তাহারা একেবারে আশ্রমের ও কেশববাবুর দলের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন তুলিয়া দিল। সময় বুঝিয়া অত্যগ্রসর

দলের এক ব্রাহ্মযুবক আশ্রমের প্রতি কটাক্ষ করিয়া এক ঘোর কুৎসাপূর্ণ পত্র সাপ্তাহিক সমাচারে প্রকাশ করিলেন। তখন কেশববাবু বাধ্য হইয়া সাপ্তাহিক সমাচারের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। যত দূর স্মরণ হয়, সে মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি হইল। এই বিবাদের সময় আমি হরনাথবাবু ও তাঁহার স্ত্রীকে সংবাদপত্রে যাওয়ার জন্য অনেক তিরস্কার করিয়াছিলাম, এবং মোকদ্দমার বিষয়ে কেশববাবুর পক্ষে ছিলাম।

কিন্তু এই আন্দোলন হইতে আর এক আন্দোলন উঠিয়া পড়িল। বিনোদিনীকে দ্বারাবরোধ করিয়া অপমান করাতে যুবক ব্রাহ্মদল, বিশেষত গাঙ্গুলী ভায়ার দল, আশ্রমের প্রতি চটিয়া গেলেন, এবং এই কার্যের বিচারের জন্য কেশববাবুকে সভা আহ্বানের অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইহার উত্তরে ধর্মতত্ত্ব পত্রিকাতে প্রকাশ হইল যে, প্রচারকগণ ঈশ্বর নিযুক্ত, ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের বিচারক হইতে পারেন না। ইহাতে সমাজের কার্যপ্রণালী ও শাসন সম্বন্ধে এক নূতন আন্দোলন উঠিয়া পড়িল।

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ দল এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। আমি ভবানীপুরে আসিয়া দেখিলাম, কেশববাবুর মত ও কার্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য একটি দল গড়িয়া উঠিয়াছে। আমি আসিবামাত্র ইঁহারা আমাকে আপনাদের মধ্যে লইলেন; কারণ, সমাজের কার্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন বিষয়ে এবং কেশববাবুর কোনো কোনো মতের প্রতিবাদ বিষয়ে, ইঁহাদের সহিত পূর্ব হইতে আমার মতের ঐক্য ছিল।

কেশবচন্দ্রের মতের সমালোচনা। ইহার পর আমার ভবনে এবং অপরাপর স্থানে এই প্রতিবাদী দলের ঘন-ঘন মিটিং হইতে লাগিল। অবশেষে ব্রাহ্মদিগকে সতর্ক করিবার জন্য সমর ঘোষণা করা স্থির হইল। এই সমর ঘোষণা দুই প্রকারে আরম্ভ হইল। প্রথমে, কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমী নামক স্কুলের গৃহে কেশববাবুর বিরুদ্ধে দুইটি বক্তৃতা হইল। একটি আমি দিলাম, অপরটি আমার বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দিলেন।

আমার বক্তৃতার সমুদয় কথা স্মরণ নাই। আমি প্রধানত কেশববাবুর কতকগুলি মতের সমালোচনা করিয়াছিলাম। সে সম্বন্ধে এইমাত্র স্মরণ আছে যে, রবিবাসরীয় মিরারে কেশববাবু তাহার উল্লেখ করিয়া তাহার উদার ভাবের প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা তাঁহাদের বড়ই অপ্রীতিকর হইল। নগেন্দ্রবাবু সমাজের কার্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর আবশ্যকতা প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, কেশববাবুকে নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। নেপোলিয়ন যেমন সাধারণ তন্ত্রের পক্ষে হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া, সাধারণ তন্ত্রের নিশান লইয়া কার্য করিয়া, অবশেষে সম্রাটের মুকুট নিজ মস্তকে লইয়াছিলেন, তেমনি কেশববাবু ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা স্থাপন করিয়া আদি সমাজের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করিয়া, পরিশেষে যথেচ্ছাচারী রাজা হইয়া বসিয়াছেন। এই কথাতে কেশববাবুর প্রচারক দল আমাদের উপর হাড়ে চটিয়া গেলেন।

মাসিক 'সমদর্শী'। একদিকে বক্তৃতা আরম্ভ হইল, অপর দিকে ১৮৭৪ সালের নভেম্বর মাস হইতে 'সমদর্শী' নামক দ্বিভাষী এক মাসিক পত্রিকা বাহির হইল। বন্ধুগণ আমাকে তাহার সম্পাদক করিলেন। সুতরাং সাধারণের চক্ষে আমি এই

দলের নেতা হইয়া দাঁড়াইলাম। সমদর্শীতে আমরা কেশববাবুর কোনো কোনো মতের প্রতিবাদ করিতাম ও স্বাধীন ভাবে ধর্ম তত্ত্বের আলোচনা করিতাম। সমদর্শী কিছু-দিন চলিয়াছিল, পরে বন্ধ হইয়া গেল; কিন্তু সমদর্শী দল রহিয়া গেল, এবং সমাজের কার্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপনের জন্য যে আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা চলিতে লাগিল।

আর একটি নিরাশ্রয় মেয়ে। ভবানীপুর বাস কালের কতকগুলি পারিবারিক ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের মধ্যে আমার সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সরোজিনী জন্ম গ্রহণ করে। দ্বিতীয় ঘটনা, একদিন আমি স্কুল হইতে আসিয়া দেখি, একটি নিরাশ্রয় মেয়ে তাহার বোঁচকা-বুঁচকি সহ আসিয়া আমার ভবনে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার আর যাইবার স্থান নাই, সে আশ্রয় চায়। সে নিজের জীবনের একটি ইতিবৃত্ত বলিল, সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। মহা মুশকিল, পুরুষ নয় যে অন্য এক স্থান দেখিতে বলিব। মেয়েছেলে, রাস্তায় দাঁড়াইতে বলিতে পারি না। বিশেষত প্রসন্নময়ী অতি দয়ালু ছিলেন, নিরাশ্রয় দীন দরিদ্রের প্রতি তাঁহার দয়া দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইত। মেয়েটি আসিয়া 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছে, আর যায় কোথায়? অমনি তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন। অগ্রে ছিল লক্ষ্মীমণি, এখন আসিল এই মেয়ে, তাঁহার নিজের এক পুত্র ও চারি কন্যা বাদে আর দুইটি কন্যা বাড়িল। মেয়েটি প্রসন্নময়ীর আশ্রয়ে থাকিয়া গেল।

খৃষ্টীয় হাই চর্চের সাহিত্য পাঠ। ভবানীপুর বাস কালের আর দুইটি স্মরণীয় বিষয় আছে। প্রথম, এই সময় একজন খৃষ্টীয় পাদরীর সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা হয়। তিনি হাই চর্চের বড় গোঁড়া ছিলেন। আমি তাঁহার ভবনে অনেক সময় যাপন করিতাম। তাঁহার প্ররোচনায় আমি ঐ সময় হাই চর্চের অনেক পুস্তক পড়ি। তাহার মধ্যে জন হেনরী নিউম্যানের একখানি গ্রন্থ ('এ্যাপোলোজিয়া প্রো ভিটা সুয়া') বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তকখানি পড়িয়া আমি বড়ই উপকৃত হই। দুই-তিন মাস তাহার প্রভাব আমার মনে জাগরূক ছিল। নিউম্যান কিরূপে সত্যানুরাগ দ্বারা চালিত হইয়া ভ্রমে গিয়া পড়িলেন, তাহা দেখিয়া আমার মনে বিষাদ মিশ্রিত এক আশ্চর্যের ভাব হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত যোগ। এইরূপে একদিকে যেমন খৃষ্টীয় শাস্ত্র ও খৃষ্টীয় সাধুর ভাব আমার মনে আসে, অপরদিকে এই সময়েই রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আমার আলাপ হয়। তাহার ইতিবৃত্ত এই। আমাদের ভবানীপুর সমাজের একজন সভ্য দক্ষিণেশ্বরে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে-মধ্যে শ্বশুরবাড়ি হইতে আসিয়া আমাকে বলিতেন যে, দক্ষিণেশ্বরের কালীর মন্দিরে একজন পুজারি ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহার কিছু বিশেষত্ব আছে। এই মানুষটি ধর্ম সাধনের জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। শুনিয়া রামকৃষ্ণকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। যাইব যাইব করিতেছি, এমন সময় মিরার কাগজে দেখিলাম যে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সহিত কথা কহিয়া প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছেন। শুনিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইবার ইচ্ছাটা প্রবল হইয়া উঠিল। আমার সেই বন্ধুটিকে সঙ্গে করিয়া একদিন গেলাম।

প্রথম দর্শনের দিন হইতেই আমার প্রতি রামকৃষ্ণের বিশেষ ভালোবাসার লক্ষণ দৃষ্ট হইল। আমিও তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ চমৎকৃত হইলাম। আর কোনো মানুষ ধর্ম সাধনের জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন কি না, জানি না। রামকৃষ্ণ আমাকে বলিলেন যে, তিনি কালীর মন্দিরে পূজারি ছিলেন। সেখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আসিতেন। ধর্ম সাধনার্থ তাঁহারা যিনি যাহা বলিতেন, সমুদয় তিনি করিয়া দেখিয়াছেন। এমন কি, এইরূপ সাধন করিতে করিতে তিনি ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন, কিছুদিন উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার একটা পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাঁহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইতেন। এই সংজ্ঞাহীন অবস্থাতে আমি তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি; এমন কি, অনেকদিন পরে আমাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার আলিঙ্গনের মধ্যেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া গিয়াছেন।

সে যাক। রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া এই একটা ভাব মনে আসিত যে, ধর্ম এক, রূপ ভিন্ন-ভিন্ন মাত্র। ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায়-কথায় ব্যক্ত করিতেন। ইহার একটি নিদর্শন উজ্জ্বলরূপে স্মরণ আছে। একবার আমি দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময় আমার ভবানীপুরস্থ খৃষ্টীয় পাদরী বন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়া গেলাম, তিনি আমার মুখে রামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। আমি গিয়া যেই বলিলাম, “মশাই, এই আমার একটি খৃষ্টান বন্ধু আপনাকে দেখতে এসেছেন,” অমনি রামকৃষ্ণ প্রণত হইয়া মাটিতে মাথা দিয়া বলিলেন, “যীশু খৃষ্টের চরণে আমার শত-শত প্রণাম।” আমার খৃষ্টীয় বন্ধুটি আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মশাই যে যীশুর চরণে প্রণাম করছেন, তাঁকে আপনি কি মনে করেন?”

উত্তর। কেন, ঈশ্বরের অবতার।

খৃষ্টীয় বন্ধুটি বলিলেন, ঈশ্বরের অবতার কিরূপ? কৃষ্ণাদির মতো?

রামকৃষ্ণ। হাঁ, সেইরূপ। ভগবানের অবতার অসংখ্য, যীশুও এক অবতার।

খৃষ্টীয় বন্ধু। আপনি অবতার বলতে কি বোঝেন?

রামকৃষ্ণ। সে কেমন তা জানো? আমি শুনেছি, কোনো কোনো স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়। অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোনো বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল; ধরবার ছোঁবার মতো হল। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ। অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোনো বিশেষ কারণে কোনো এক বিশেষ স্থানে খানিকটা ঐশী শক্তি মূর্তি ধারণ করলে, ধরবার ছোঁবার মতো হল। যীশু প্রভৃতি মহাজনদের যে কিছু শক্তি সে ঐশী শক্তি, সুতরাং তাঁরা ভগবানের অবতার।

রামকৃষ্ণের সহিত মিশিয়া আমি ধর্মের সার্বভৌমিকতার ভাব বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিয়াছি।

ইহার পর রামকৃষ্ণের সহিত আমার মিত্রতা আরও ঘনীভূত হয়। এমন দিনও গিয়াছে, আমাকে অনেকদিন দেখিতে না পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার ভবনে আসিয়াছেন।

বন্ধুপত্নী ব্রহ্মময়ী। এ সময়ের আর একটি স্মরণীয় বিষয়, আমার বন্ধু দুর্গা-মোহন দাস মহাশয়ের প্রথমা পত্নী ব্রহ্মময়ীর ভালোবাসা, ও তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের ক্লেশ। দুর্গামোহনবাবু এ সময় ভবানীপুরের সন্নিকটে বাস করিতেন, সুতরাং তাঁহার

ভবনে সর্বদা যাইতাম। ব্রহ্মময়ী আমার আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিলেন, তিনি আমাকে বড় ভালোবাসিতেন। তাঁহার সেই সরল পবিত্রতা মাখা মুখখানি যেন স্মৃতিতে জাগিতেছে। প্রসন্নময়ীর ন্যায়, তাঁহারও সন্তানের ক্ষুধা যেন নিজ সন্তান দিয়া মিটিত না। তিনিও কতকগুলি নিরাশ্রয় বালিকাকে নিজ ভবনে আশ্রয় দিয়া পালন করিতেছিলেন।

ব্রহ্মময়ী আমার সর্ববিধ সদনুষ্ঠানের উৎসাহদায়িনী ছিলেন। তাহার একটি নিদর্শন মনে আছে। একবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সভ্য শিতিকণ্ঠ মল্লিক ও আমি পরামর্শ করিলাম যে ভবানীপুরে একটি লাইব্রেরি ও পাঠাগার করিলে ভালো হয়। এই পরামর্শ করিয়া আমরা একদিন দুর্গামোহনবাবুর নিকট টাকা ভিক্ষা করিতে গেলাম। দুর্গামোহনবাবু অর্থ সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তাহা লইয়া তাঁহার সঙ্গে অনেক বাদবিতণ্ডা চলিল। আমি বলিলাম, "আপনার নিকট হইতে যদি কিছু টাকা আদায় না করি, তবে আমার নাম শিবনাথ শাস্ত্রী নয়।" তিনি বলিলেন, "আমার নিকট হতে যদি কিছু আদায় করতে পার, তবে আমার নাম দুর্গামোহন দাস নয়।" ইহার পর শিতিবাবুর সহিত তাঁহার তর্ক বাধিল। আমি ইতিমধ্যে সরিয়া পড়িয়া একেবারে উপরতলায় ব্রহ্মময়ীর নিকট গেলাম। প্রস্তাবটি বেশ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "জ্ঞানের চর্চা বাড়ে, সে তো ভালোই। আপনারা কি মেয়েদের পড়বার মতো বই রাখবেন? অল্প কিছু জমা দিয়ে ভদ্রলোকের মেয়েরা কি ভালো ভালো বাংলা বই নিয়ে পড়তে পারবে?"

আমি বলিলাম, হ্যাঁ, তা পারবে।

ব্রহ্মময়ী। তবে আমি এককালীন ৫০৲ টাকা, ও মাসে মাসে ৪৲ টাকা করে দেব।

আমি বলিলাম, তবে এই কাগজে নামটা স্বাক্ষর করে দিন।

এইরূপে একটা কাগজে পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা লিখিয়া তাহাতে তাঁহার নাম স্বাক্ষর করাইয়া, নিচের তলায় গিয়া দুর্গামোহনবাবুর কাছে কাগজখানা ধরিলাম। দুর্গা-মোহনবাবু ব্রহ্মময়ীর স্বাক্ষরটা দেখিয়া বলিলেন, "ও রাস্‌কেল, এই জন্যে তোমার এত জোর? তুমি আমার কাছে হেরে বিলেত আপীল করবে ভেবে এসেছিলে?" অমনি একটা হাসাহাসি পড়িয়া গেল। দুর্গামোহনবাবু উপরে ব্রহ্মময়ীকে বলিলেন, "ওগো তুমি আমাকে না জিজ্ঞেসা করে এই হতভাগাদের কোনো কথা কানে নিয়ো না। এই যে শ্রীহস্তে স্বাক্ষর করেছ, এখন আমার টাকা না দিয়ে পার নাই।"

ব্রহ্মময়ী বলিলেন, "বেশ তো, ওঁরা তো ভালো কাজ করতে যাচ্ছেন। মেয়েদের ব্যবহারের মতো একটা লাইব্রেরি হয়, সে তো ভালোই।"

ব্রহ্মময়ীর আমার প্রতি ভালোবাসার একটি নিদর্শন মনে আছে। একবার আমার টাকার বড় টানাটানি যাইতেছিল। সেই মাসের শেষ দিকে ছেলেরা প্রসন্নময়ীর চুল বাঁধিবার আয়নাখানা ভাঙিয়া ফেলিল। প্রসন্নময়ী এ কথা আর আমাকে জানাইলেন না। ভাবিলেন মাসের শেষ কয়টা দিন কোনো প্রকারে চালাইবেন, পর মাসের প্রথমে আয়না কেনা হইবে। ইতিমধ্যে একদিন ব্রহ্মময়ী অপরাহ্ণে আমাদের বাড়িতে বেড়াইতে আসিয়া দেখেন, প্রসন্নময়ী জলের জালার নিকট দাঁড়াইয়া জলে মুখ দেখিতেছেন ও চুল বাঁধিতেছেন। ব্রহ্মময়ী দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও হেমের মা, ও কি! জলের জালার কাছে কি করছ?"

প্রসন্নময়ী হাসিয়া বলিলেন, "ওগো, আয়নাখানা ছেলেরা ভেঙে ফেলেছে। ওঁর

বড় টাকার টানাটানি যাচ্ছে, তাই ওঁকে জানাইনি। মাস গেলে কিনব ভেবে জালার জলে মুখ দেখে চুল বাঁধছি।"

ব্রহ্মময়ী (হাসিয়া)। ও মা, এ তো কখনো শুনিনি!

প্রসন্নময়ী। দেখলেন, কেমন একটা নূতন বিষয় দেখালাম।

দুইজনে এই লইয়া হাসাহাসি হইতেছে, এমন সময় আমি স্কুল হইতে আসিয়া উপস্থিত। আমিও এই কথা শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলাম। প্রসন্নময়ীকে বলিলাম, "তোমার মতো স্ত্রী নিয়ে ঘর করা কিছুই কষ্টকর নয়, বেশ বুদ্ধি বার করেছ তো! যা হোক, আমাকে বললে আমি আয়না এনে দিতে পারতাম।"

প্রসন্নময়ী। তোমার টাকার টানাটানি যাচ্ছে কি না, তাই বলিনি।

কিয়ৎক্ষণ পরেই ব্রহ্মময়ী চলিয়া গেলেন। আমরা ভাবিলাম তিনি বাড়ি গেলেন। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই এক প্রকাণ্ড আয়না লইয়া আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন, "এটি আমার উপহার, নিতেই হবে।" এমন ভাবে, এমন আগ্রহের সহিত এ কথা বলিলেন যে, আমরা আর 'না' বলিতে পারিলাম না, মন একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। পরে জানিলাম, আমাদের বাড়ি হইতে আর বাড়িতে যান নাই, একেবারে বেণ্টিক স্ট্রীটে গিয়া, এক জানা দোকান হইতে আয়নাখানি কিনিয়া আনিয়াছেন।

ব্রহ্মময়ীর জন্য দুর্গামোহনবাবুর বাড়ি আমার জুড়াইবার স্থান ছিল। সপ্তাহের মধ্যে প্রায় প্রতিদিন বৈকালে স্কুল হইতে আসিয়া ব্রহ্মময়ীর কাছে যাইতাম। গিয়া দেখিতাম, বসিবার ঘর চেয়ার কৌচ টেবিল প্রভৃতি দিয়া সুন্দর রূপে সাজানো, কিন্তু ব্রহ্মময়ীর সেদিকে দৃষ্টি নাই, তিনি মেজের উপরে মাটিতে বসিয়া সমাগত কয়েকটি মেয়েকে পাশে বসাইয়া গল্প করিতেছেন। একদিনকার একটি ঘটনা বলি। একদিন একটি মেয়ে গল্পচ্ছলে বলিলেন, মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে বেশ লিচু উঠিয়াছে, তাঁহারা আনাইয়া খাইয়াছেন। ইহার পর কথাবার্তার মধ্যে ব্রহ্মময়ী একবার উঠিয়া গিয়াছিলেন, ত্বরায় আসিলেন। তৎপরে আবার কথায় বার্তায় হাসাহাসিতে সময় যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে বড় বড় লিচু আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মময়ী মেয়েদিগকে বলিলেন, "খাও, লিচু খাও।" ইহা লইয়া হাসাহাসি পড়িয়া গেল।

তাঁহার বাড়িতে পদার্পণ করিলেই তিনি তাঁহার আশ্রিতা মেয়েদের কাহার জন্য কি করা কর্তব্য, আমার সঙ্গে সেই পরামর্শে প্রবৃত্ত হইতেন। অধিকাংশ দিন সন্ধ্যার সময় নিজের হাতে আমাকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না।

এই ব্রহ্মময়ী ১৮৭৬ সালের নভেম্বর মাসে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সকলেই, বিশেষত আমি, মর্মাহত হইলাম। তিনি যখন চলিয়া গেলেন, তাঁহার এই সকল সদাশয়তার স্মৃতি আমার মনে জাগিতে লাগিল এবং আমাকে শোকার্ত করিতে লাগিল। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর আমরা একমাস কাল প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়, তাঁহার ভবনে মিলিত হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমি উপাসনার অনুকূল অনেকগুলি শোকসূচক সঙ্গীত বাঁধিয়াছিলাম। তাহার অনেকগুলি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রহ্মময়ীর শ্রাদ্ধবাসরে দুর্গামোহন-বাবু বাহিরের কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই। আমাদের ন্যায় কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, যাঁহারা ব্রহ্মময়ীকে ভালোবাসিতেন এবং তাঁহার পীড়ার মধ্যে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই লইয়া উপাসনা করেন। কিন্তু উপাসনান্তে চক্ষু খুলিয়া

দেখি, অনিমন্ত্রিত হইয়াও কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় আসিয়া উপাসনাতে যোগ দিতেছেন। ব্রহ্মময়ীর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

আমার ভবানীপুরে বাস কালে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বড় দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। অগ্রেই বলিয়াছি, তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্র সেনের সহিত একযোগে কার্য করিবেন বলিয়া, কৃষ্ণনগরের কর্ম ছাড়িয়া সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া কেশববাবুর ভারত আশ্রমে উঠিয়াছিলেন, কিন্তু কেশববাবুর ও তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দের সহিত মতভেদ ঘটিয়া তাঁহাকে আশ্রম হইতে বাহির হইতে হইয়াছিল। তিনি কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত কিছুদিন স্বতন্ত্র বাসায় থাকিলেন, কিন্তু অতি কষ্টে তাঁহার দিন নির্বাহ হইতে লাগিল। হরিনাভিতে বাস কালে আমি আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে তাঁহাদের সঙ্গে রাখিয়াছিলাম, এবং প্রতি শনিবার সেখানে আসিতাম। আমি যথাসাধ্য নগেন্দ্রবাবুর ব্যয়ের সাহায্য করিতাম, কিন্তু তাহাতে তাঁহার দুঃখ নিবারণ হইত না। তৎপরে আমি যখন ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুলের হেডমাস্টার হইয়া আসিলাম, তখন বিরাজ-মোহিনীকে হরিনাভিতে সাধু উমেশচন্দ্র দত্তের নিকটে রাখিয়া, নগেন্দ্রবাবুকে সপরিবারে আমার ভবানীপুরের বাসায় আনিয়া রাখিলাম এবং তাঁহাদের সকল ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলাম। এখানে তাঁহার একটি সন্তান জন্মিল। কিছুদিন পরে নগেন্দ্রবাবু কলিকাতায় গেলেন।

হেয়ার স্কুলের হেড পণ্ডিত। ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুল হইতে আমার উৎসাহদাতা ও সহায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখুয্যে মহাশয় আমাকে হেয়ার স্কুলে আনিলেন। ১২০৲ টাকা বেতনে হেয়ার স্কুলের হেড পণ্ডিত ও ট্রানস্লেশন মাস্টারের নূতন পদ সৃষ্টি হইল, সেই পদে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। রাধিকাবাবুর পরামর্শে উড্রো সাহেব আমাকে উক্ত পদ দিলেন। শুনিলাম সার্টক্লিফ সাহেব অন্য কাহাকে দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা রহিত করিয়া ডিরেক্টর উড্রো সাহেব আমাকে এই পদ দিলেন। পূর্বে উড্রো সাহেবের সঙ্গে যে আমার ঝগড়া হইয়াছিল এবং উড্রো সাহেব আমার প্রতি চটিয়া আছেন, রাধিকাবাবু তাহা জানিতেন। অনুমান করি, সদাশয় উড্রো সাহেবের তাহা মনে ছিল না, অথবা রাধিকাপ্রসন্নবাবু কৌশল-ক্রমে সে বিরোধের কথা পশ্চাতে রাখিয়া, আমার প্রশংসা করিয়া উড্রো সাহেবের সম্মতি লইয়াছিলেন। যাহা হউক, উড্রো সাহেব সার্টক্লিফের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে হেয়ার স্কুলে বসাইলেন।

আমি বোধ হয় ১৮৭৬ সালের প্রারম্ভে হেয়ার স্কুলে আসি। কিছুদিন ভবানীপুর হইতেই গতায়াত করিয়াছিলাম। অবশেষে আমার মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পশ্চিম হইতে সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া ভবানীপুরে তাঁহার সোমপ্রকাশ কাগজ ও প্রেসের ভার লইয়া বসিলেন। আমি তখন সপরিবারে কলিকাতায় আমহার্স্ট স্ট্রীটে এক বাড়িতে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলাম।

ভারত সভা স্থাপন

আমি কলিকাতাতে উঠিয়া আসিলে আমাদের সমদর্শী দল আরও জমাট হইল। ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্তিত করিবার চেষ্টাও দুই প্রকারে চলিতে লাগিল। প্রথম, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরটি ট্রাস্টীদিগের হস্তে অর্পণ করিবার চেষ্টা করা। দ্বিতীয়, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রতিনিধি সভা স্থাপনের চেষ্টা করা। কেশববাবু ব্রাহ্ম সাধারণের বা উপাসকমণ্ডলীর সভা আহ্বান করা বন্ধ করিয়াছিলেন, সুতরাং আমরা সর্বদা এ আন্দোলন করিবার সুবিধা পাইতাম না। বৎসরের মধ্যে একবার উৎসবের সময় ব্রাহ্মদিগের যে সম্মিলিত সভা হইত, তাহাতে আমরা ট্রাস্টী হস্তে মন্দির অর্পণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিতাম। একবার কেশববাবু এই বলিয়া আমাদের প্রস্তাব উড়াইয়া দিলেন যে, মন্দিরের দেনা আছে, দেনা থাকিতে উহা ট্রাস্টী হস্তে অর্পণ করা যায় না। দ্বিতীয়বার আমরা ঋণশোধের জন্য সময় নির্দেশ করিয়া কয়েক ব্যক্তির প্রতি ভার দিলাম। তৃতীয়বার আমরা কয়েকজন দেনার ভার লইতে চাহিলাম। কোনো ক্রমেই কেশববাবুকে এ কার্যে রাজি করিতে পারা গেল না। আনন্দ মোহন বসু মহাশয় যদিও সমদর্শী দলে যোগ দেন নাই, একটু দূরে দূরেই ছিলেন, তথাপি তিনি এ বিষয়ে গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিতেন। মন্দিরটি যাহাতে ট্রাস্টী হস্তে যায়, তাহা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল এবং কেশববাবু এত আপত্তি করাতে তিনি বিরক্ত হইতে লাগিলেন।

একদিকে এই চেষ্টা চলিল, অপরদিকে ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা নামে একটি সভা গঠনের চেষ্টা চলিল। আমরা প্রস্তাবকর্তা, কিন্তু কেশববাবু তাহাতে যোগ দিতে চাহিলেন। একটি কমিটি নিযুক্ত হইল, তাহাতে তিনি নাম দিলেন। কতকগুলি নিয়মাবলীও প্রণয়ন করা হইল।

কেশবচন্দ্র বনাম ব্রাহ্ম যুবক দল। এই সকল বিবাদের মধ্যে কেশববাবুর ভাব দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইতে লাগিলাম। তিনি সমদর্শী দলকে লক্ষ্য করিয়া রবিবাসরীয় মিরারে স্কেপটিক্‌স্‌, সেকুলারিস্টস্‌, আনবিলীভার্স, প্রভৃতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি দুঃখিত হইয়া ঐ মিরারে ইহার প্রতিবাদ করিলাম।

অতঃপর সংবাদপত্রের এই সকল উক্তি প্রত্যুক্তি, সমদর্শীর লেখা, ও যুবক ব্রাহ্ম-দলের মধ্যে কেশববাবুর আদর্শ সম্বন্ধে নানা আলোচনা উপহাস বিদ্রূপ, প্রভৃতির দ্বারা কেশববাবুর অনুগত প্রবীণ ব্রাহ্মদল ও যুবক ব্রাহ্মদলের মধ্যে চিন্তা ও ভাবগত বিচ্ছেদ দিন-দিন বাড়িতে লাগিল।

এ বিষয়ে একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ইহার কিছুদিন পূর্ব

হইতে কেশববাবু বৈরাগ্য প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে বৈরাগ্য কিরূপ তাহা একটু বলা ভালো। তিনি নিজের ত্রিতল ভবনের ছাদে একটি খোলার ঘর বাঁধিয়া নিজে রাঁধিয়া খাইতে লাগিলেন। আহারের যে নিয়ম ছিল তাহার বড় ব্যতিক্রম হইল না, কেবল জল পানের সময় ধাতুনির্মিত গ্লাসের পরিবর্তে মাটির গ্লাস ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ঝুলি লইয়া নিজের ভবনে ভিক্ষা মাগিতে লাগিলেন, পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে মুষ্টিভিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার দেখাদেখি প্রচারক মহাশয়দিগের কেহ-কেহ রাঁধিয়া খাইতে লাগিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই কোন্নগরের সন্নিকটে একটি বাগান লইয়া কেশববাবু তাহার 'সাধন কানন' নাম রাখিলেন, এবং নিজে প্রচারক দলের সহিত সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে নিজ হস্তে রাঁধিয়া খাওয়া, জল তোলা, বাগানের মাটি কাটা প্রভৃতি বৈরাগ্য আচরণ পূর্ণ মাত্রায় চলিতে লাগিল। তাহা লইয়া কলিকাতার যুবক ব্রাহ্মদলে খুব হাসাহাসি চলিতে লাগিল।

ফলত, ইহার কিছুদিন পূর্ব হইতেই যুবকদলের উপর কেশববাবুর প্রভাব হ্রাস হইতেছিল। ব্রাহ্মযুবকগণের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তিনি এক সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের সহিত বিবাদ করিয়া ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা গঠন পূর্বক ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ক্রমশ তাঁহার নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। তিনি এখন হয়তো মনে করিতেছেন যে, ধর্মসমাজের কার্যে সাধারণের হাত না থাকিয়া ঈশ্বর প্রেরিত মহাজনের হাত থাকা কর্তব্য, এই কারণে তিনি সমাজের কার্যে অপরের কর্তৃত্ব স্থাপিত হইতে দিতে চান না, নিজে সর্বময় কর্তা হইয়া থাকিতে চান। এই সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়াতে যুবকগণ তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে লাগিলেন। আমাদের মনের উপরে তাঁহার শক্তি অনেক পরিমাণে যেন হ্রাস হইতে লাগিল।

ভারত সভা স্থাপন। যখন ব্রাহ্মসমাজে এই সকল আন্দোলন চলিতেছে, তখন আনন্দ-মোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি, তিনজনে আর এক পরামর্শে ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহনবাবু বিলাত হইতে আসার পর হইতে আমরা একত্র হইলেই এই কথা উঠিত যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোনো রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কর্ম নয়, অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে তাহাদের উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক। আমাদের তিনজনের কথাবার্তার পর স্থির হইল যে, অপরাপর দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় আনন্দমোহনবাবুর বন্ধু এবং আমারও প্রিয় বন্ধু ছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে পরামর্শের মধ্যে লওয়া হইল। তৎপরে প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কেও লওয়া হইল। মনোমোহন ঘোষের বাড়িতে এই পরামর্শ চলিল। তাহার সকল পরামর্শে আমি উপস্থিত ছিলাম না, কার্যান্তরে অন্যত্র ছিলাম। কি পরামর্শ হইতেছে তাহা আনন্দমোহনবাবু ও সুরেন্দ্রবাবুর মুখে শুনিতাম।

যখন একটা সভা স্থাপন এক প্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহনবাবু ও আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বলিলেন, এতৎদ্বারা দেশের

একটি মহৎ অভাব দূর হইবে। আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রথম সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন।

এলবার্ট হলে প্রকাশ্য সভা করিয়া ভারত সভা স্থাপন করা গেল, এবং আনন্দমোহনবাবুকে তাহার সম্পাদক করা গেল। সেদিনকার কথা এই মনে আছে যে, সেদিন সুরেনবাবুর একটি পুত্রসন্তান মারা যায়, তিনি তৎসত্ত্বেও আসিয়া সভা স্থাপনে সাহায্য করিলেন। আনন্দমোহনবাবু সম্পাদক, সুরেনবাবু সহ-সম্পাদক, আমরা কয়েকজন কমিটির সভ্য, আমি প্রথম চাঁদা আদায়কারী সভ্য, এই লইয়া ভারত সভা বসিল। আমরা ৯৩নং কলেজ স্ট্রীটে একটি ঘর ভাড়া করিয়া ভারত সভার আপিস স্থাপন করিলাম। সে আপিস ঘরের অবস্থা দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ সুরসিক কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত 'ভারত উদ্ধার' কাব্যে লিখিলেন, "কড়ি আগে পড়ে কিম্বা দাঁড় আগে ছেঁড়ে।" বাস্তবিক, উহার দশা ঐ প্রকারই ছিল।

এই ৯৩নং কলেজ স্ট্রীট ভবনের ভিতর দিকে কতকগুলি ব্রাহ্ম বন্ধু থাকিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমি কিছুদিন ছিলাম। তখন ভারত সভার ঘরে কমিটির সম্মতিক্রমে সমদর্শী দলেরও বৈঠক চলিত। এখানে থাকিবার সময়ই আমি বিষয়কর্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আত্মোৎসর্গ করি। যে চিরস্মরণীয় রাত্রে কেশববাবুর নিকট প্রতিবাদ পত্র প্রেরণের প্রস্তাব নির্ধারণ হয়, সে রাত্রে এই ভারত সভার গৃহেই আমাদের বৈঠক হইয়াছিল। বলিতে কি, ভারত সভা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যেন যমজ সহোদরের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। একই লোক দুদিকে, একই ভাবে উভয়ের কার্য চালিয়াছিল।

পাঁচ বন্ধু। এদিকে আমি, কেদারনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, এই পাঁচজন বন্ধু একত্র হইয়া ধর্মসাধনের জন্য একটি ক্ষুদ্র দল করিলাম। আমরা পাঁচজনে একত্র বসিতাম, প্রাণ খুলিয়া ধর্ম বিষয়ে কথাবার্তা কহিতাম, নানা স্থানে মিলিত হইয়া উপাসনা করিতাম। মধ্যে মধ্যে ধর্মোপদেশের জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট যাইতাম। তিনি আমাদের নাম রাখিলেন 'পঞ্চ প্রদীপ'। একদিন বলিলেন, লোকে পঞ্চ প্রদীপে যেমন দেবতার আরতি করে, তেমনি তোমরা 'পঞ্চ প্রদীপে' ঈশ্বরের আরতি করিতেছ। নামটি আমাদের বড় ভালো লাগিল। আমরা আপনাদের মধ্যে আমাদের সম্মিলনকে পঞ্চ প্রদীপের সম্মিলন বলিতে লাগিলাম।

আর একটি পতিতা নারী : থাকমণি। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য আর দুইটি ঘটনা আছে। আমি যে লক্ষ্মীমণিকে স্বীয় ভবনে আশ্রয় দান করিয়াছিলাম, সে সংবাদ বোধ করি কলিকাতায় প্রচারিত হইয়াছিল। এই দুইটি ঘটনাই পরোক্ষ ভাবে সে সংবাদের সহিত জড়িত।

একদিন আমার বন্ধু প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন ও আমি দুইজনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরণ দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেছি। রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের বাড়ির সম্মুখে আসিবার সময় একটি স্ত্রীলোকের পার্শ্ব দিয়া আসিলাম, কিন্তু তত লক্ষ্য করিলাম না, তাহার মুখটা দেখিলাম না। তাহাকে অতিক্রম করিয়া কয়েক পা আসিয়াছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে বামাকণ্ঠে শুনিলাম, "হাঁ গা শাস্ত্রীমশাই,

তোমরা এখন কোথা থাক?" হঠাৎ ফিরিয়া দেখি, একটি গৌরবর্ণা যুবতী একটি শিশু কন্যার হাত ধরিয়া আসিতেছে। মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিলাম। ভবানীপুরে বাসকালে আমি এক নির্জন পল্লীতে বাস করিতাম। ঐ পতিতা নারী তাহার সন্নিকটেই থাকিত, ও আমাদের মেয়েদের সঙ্গে এক পুকুরে স্নানাদি করিত। সে যে আমাকে চিনিয়া রাখিয়াছে ও আমার নাম জানে, তাহা জানিতাম না। যাহা হউক, আমি ফিরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিবামাত্র সে হাসিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কাজ আছে। তোমার বাসা কোথায় বললে আমি গিয়ে দেখা করতে পারি, নতুবা আমার বাসা অমুক নম্বর শিব ঠাকুরের গলি, সেখানে তোমাকে একবার আসতে হবে।"

ইহার পর বিদ্যারত্ন ভায়া ও আমি দুইজনে বলাবলি করিতে লাগিলাম, "আমাকে যখন জানে, তখন আমি কি তন্ত্রের লোক তাও জানে। আমার সঙ্গে ওর কি কাজ?" কিছুই নির্ধারণ করিতে পারিলাম না, বড়ই আশ্চর্য বোধ হইল। আসিয়া আমার বন্ধু কেদারনাথ রায়কে এই বিবরণ বলিলাম। তিনি এক সময়ে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "ও যখন ব্যাকুল হয়ে তোমাকে ডেকেছে, তখন নিশ্চয় কোনো বিষয়ে তোমার সাহায্য চায়। চল, একবার শিব ঠাকুরের গলিতে ওর বাড়িতে যাই।" এই নির্ধারণ অনুসারে পরবর্তী রবিবার প্রাতে আমরা দুজনে শিব ঠাকুরের গলিতে তাহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সেই বাড়িটি এইরূপ স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ। তখন বেলা ৯টা, তথাপি তাহাদের অধিকাংশ ঘরে ঘরে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। অনেকে উঠিয়াছে, প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে।

এই মেয়েটির নাম থাকমণি। থাকমণি আমাদিগকে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল। সে বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, তাহার নিমন্ত্রণে আমি ঐরূপ স্থানে যাইব। তাহার ভাবে এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখিলাম। সে রাস্তাতে আমার সহিত কথা কহিবার সময়, হাসিয়া ঢলিয়া 'তুমি' 'তুমি' করিয়া কথা কহিয়াছিল, কিন্তু সেদিন আর এক মূর্তি ধরিল। 'আপনি' ও 'আপনারা' বলিয়া কথা আরম্ভ করিল এবং অতি গম্ভীর ও অনুতপ্ত ভাবে আপনার জীবনের বিবরণ ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে বিবরণ সংক্ষেপে এই। সে কলিকাতার সন্নিকটবর্তী কোনো স্থানের এক ভদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারের কন্যা। তাহার মাতা ও ভ্রাতা তখনো জীবিত আছেন এবং সে বিপদে পড়িয়া প্রার্থনা করিলে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। বাল্যকালে একজন কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত তাহার বিবাহ হয়। তাহার অপর অনেকগুলি স্ত্রী ছিল, সে কখনো পতিগৃহে যায় নাই, কালেভদ্রে কখনো পতিকে দেখিয়াছে এই মাত্র। এই প্রকার অবস্থায় সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, পাড়ার একজন পুরুষ তাহার পশ্চাতে লাগিল, এবং তাহাকে ফুসলাইয়া কুলের বাহির করিয়া আনিল। এই অবস্থাতে সে তৎকালীন চৌদ্দ আইনের ভয়ে কিছুকাল ভবানীপুরের সেই নির্জন স্থানে লুকাইয়া ছিল। সেখানে থাকিবার সময় সে আমাকে দেখিয়াছে ও আমার বিষয় অনেক কথা শুনিয়াছে। সেইখানে থাকিতে থাকিতে সে লক্ষ্মীমণিকে দেখিয়াছে, এবং ব্রাহ্মেরা কিরূপে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আমার গৃহে রাখিয়াছে, তাহাও শুনিয়াছে। তাই তাহার শিশু কন্যাটিকে আমার হস্তে দিবার জন্য আমাকে ডাকিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার মা ও ভাই আছেন, তাঁহাদের অবস্থা ভালো, তবে কেন তুমি এমন পথে পা দিলে?"

থাকমণি। কি করে ফিরব, যাবার যো নেই। তাই ভাবি, যার সঙ্গে ভেসেছি তাকেই আশ্রয় করে থাকি। তাই তাকেই আশ্রয় করে আছি। সে বেচারার স্ত্রী আছে, ছেলেপিলে আছে, অল্প আয়, আমার সব খরচ দিয়ে উঠতে পারে না; আমাকে বড় কষ্টে থাকতে হয়। আমার যা হবার হয়েছে, এখন ভাবি মেয়েটাকে এ পথ হতে কি করে বাঁচাই। শাস্ত্রী মশাই, আপনি লক্ষ্মীমণিকে বাঁচিয়েছেন, তাই আপনার চরণে শরণাপন্ন হচ্ছি।

আমি। তোমার মেয়ে যে এখনও মাই ছাড়েনি। এত ছোট মেয়ে কি মা ছেড়ে থাকতে পারবে?

থাকমণি। সে একটা ভাবনার কথা বটে। তবে মনে হয়, একটু ভালোবাসা যত্ন পেলে ক্রমে মাকে ভুলে যাবে। আপনার স্ত্রীর ভালোবাসার গুণে ও বশ হয়ে যাবে।

আমি। আচ্ছা, আরও দুই-তিন মাস যাক, মেয়েটা মাই ছাড়ুক, তখন অমুক ঠিকানায় আমাকে খবর দিও।

এই বলিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। হায়! সে আর খবর দিল না। ইহার পরে আমার পীড়া হইয়া, সে বাসা ভাঙিয়া গেল, আমি মুঙ্গেরে চলিয়া গেলাম। তৎপরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাজে মাতিলাম, থাকমণি ও তাহার কন্যা স্মৃতি হইতে সরিয়া পড়িল। হয়তো তাহার মন বদলাইয়া গেল, না হয় আর আমার উদ্দেশ পাইল না। যে কারণেই হউক, থাকমণির উদ্দেশ আর পাইলাম না।

খৃষ্টীয়া যুবতীর মতিভ্রম। দ্বিতীয় ঘটনাটি এই। এই ঘটনায় উল্লিখিত নারীর উদ্দেশ অনেক অনুসন্ধানেও কেহ পাইবেন না, তাই ইহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। হেয়ার স্কুলে কাজ করিবার সময় একদিন বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, একটি খৃষ্ট ধর্মাবলম্বিনী যুবতী একটি পুত্রসন্তানসহ আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম, তাহার পতি অতি দুর্বৃত্ত, তিনদিন হইল তাহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। সে তিনদিন পুত্রসহ নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমার শরণাপন্ন হইয়াছে। আমি লক্ষ্মীমণিকে আশ্রয় দিয়া কিরূপে রক্ষা করিয়াছি, তাহা সে শুনিয়াছে, সেই সাহসে আমার আশ্রয়ে আসিয়াছে। স্ত্রীলোকটি আমার ভবনে থাকিয়া গেল। আমি পরে ভাবিলাম, সে খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বিনী, কোনো খৃষ্টীয় পরিবারে তাহাকে রাখিতে পারিলে ভালো হয়, তাহার পতির সহিত শীঘ্রই মিলন হইতে পারে। এই ভাবিয়া আমার এক পাদরী বন্ধুকে গিয়া ধরিলাম। তিনি দয়া করিয়া তাহাকে পুত্রসহ এক খৃষ্টীয় বাড়িতে রাখিয়া দিলেন। সেখানে ঘরভাড়া ও মাতাপুত্রের আহারের ব্যয় আমাকে দিতে হইত, আমি নিজ অর্থ হইতে এবং ভিক্ষা করিয়া সে ব্যয় চালাইতাম।

তাহাদিগকে সেখানে স্থাপন করিয়াই তাহার পতিকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম এবং আমার ভবনে ডাকাইয়া স্বীয় পত্নীকে লইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। সে বলিল, "আপনার হাতে আছে, নিরাপদে আছে। অমনি কিছু দিন থাক, ভুগুক, চেতুক, সোজা হয়ে আসুক, পরে আমি নিয়ে যাব।" আমি মনে করিলাম, একটু ভোগা ভালো। সে সেইরূপ রহিল। আমি মধ্যে-মধ্যে স্কুল হইতে আসিবার সময় তাহাদিগকে দেখিয়া আসিতাম।

এই সময়ে তাহার ব্যবহারে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। প্রথম, আমি কিয়ৎক্ষণ বসিয়া উঠিতে চাহিলে সহজে উঠিতে দিত না। দ্বিতীয়, তাহার মুখে

বিষাদের চিহ্ন কিছুই দেখিতাম না। একদিন সে এ কথা সে কথার পর আমাকে বলিল, "আপনি আমার কষ্ট নিবারণ করতে পারেন। আমি টাকাকড়ির কষ্টের কথা বলছি না, স্ত্রীলোকের আরও কষ্ট আছে, তারি কথা বলছি।" তখন আমার চোখ যেন একটু ফুটিল। কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াই তাহার মুখ হইতে পরিষ্কাররূপে এ কথাটা বাহির করা গেল যে, সে আমাকে অবৈধ প্রণয়ের চক্ষে দেখিতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাহার ঘরের বাহিরে আসিতেই, সে ভীত হইয়াই হউক কি যে কারণেই হউক, "আর একটা কথা আছে" বলিয়া আমার পথ রোধ করিল। আমার প্রথম মনে হইল, গর্জন করিয়া উঠি এবং জোরে তাহার হাত ছাড়াইয়া যাই। কিন্তু কোলাহল ও লোক-জানাজানি হইলে একটা কলঙ্কের ব্যাপার হইবে, তাহা ইহার পক্ষে ভালো নয়, এই মনে করিয়া তাহা করিলাম না; বলিলাম, "তোমার কাছে বাঙলা বাইবেল আছে?"

সে। আছে।

আমি। সেখানা আনো দেখি।

সে। তাতে এখন কাজ কি?

আমি। আনো না? একটু প্রয়োজন আছে।

সে অনিচ্ছাক্রমে বাইবেলখানা বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। যীশু যেখানে মানসিক পাপাচরণের নিন্দা করিতেছেন, সেই স্থানটা বাহির করিয়া পড়িতে দিলাম। সে কোনো মতেই পড়িবে না, অবশেষে আমি বার বার বলাতে পড়িল।

আমি। দেখ, তোমরা যাঁহাকে প্রভু মনে কর, তাঁর কি অমূল্য উপদেশ! তুমি এ উপদেশ কতবার পাইয়াছ, তবু কেন তোমার এ প্রবৃত্তি? আর তুমি আমাকে এত খারাপ কিরূপে ভাবিলে? তোমার স্বামী তোমাকে আমার হাতে সঁপিয়া গিয়াছে। আমি কি এতই ছোটলোক যে বিশ্বাসঘাতকতা করব?

আমি সেইদিন তাহাকে যেরূপ তেজের সহিত উপদেশ দিয়াছিলাম, জীবনে আর কাহাকেও বোধ হয় সেরূপ দিই নাই। তৎপরদিন তাহার পতিকে ডাকাইয়া বলিলাম, "তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যাও, ওকে বাইরে রাখা ভালো নয়।" সে তাহাকে লইয়া গেল।

ইহার পর ঐ নারীকে আর একবার দেখিয়াছিলাম। কয়েক বৎসর পরে শহরের সন্নিকটবর্তী কোনো পথ দিয়া যাইবার সময় পথের পার্শ্ববর্তী এক বাড়ি হইতে তাহার পুত্রটি বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে বলিল, "আমরা এই বাড়িতে থাকি; মা আপনাকে দেখতে পেয়েছেন, একবার দেখা করবার জন্য ডাকছেন।" আমি বাড়িতে প্রবেশ করিলে তাহার মাতা গলবস্ত্রে আমার পদে প্রণত হইয়া, আমার বাড়ির সমুদয় সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। আমি একটু দাঁড়াইয়া তাহাদের কুশল সংবাদ লইয়া চলিয়া আসিলাম।

রাজনারায়ণ বসু। ক্রমে আমরা ১৮৭৭ সালে উপনীত হইলাম। এই সালের প্রথমে হরিনাভি সমাজের উৎসবে যাই। সেখানে ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মগণের সমাগম হয়। উক্ত অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সভাপতি স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে বড় স্নেহ করিতেন। তাঁহার সরল অকৃত্রিম ভক্তি আমাকে মুগ্ধ করিত। তিনি তখন কার্য হইতে অবসৃত হইয়া বৈদ্যনাথ দেওঘরে বাস করিতেছিলেন। আমি

মধ্যে-মধ্যে তাঁহার বিমল সহবাসে কিয়ৎকাল যাপন করিবার জন্য সেখানেও যাইতাম। তিনি অতি পরিহাসরসিক আমোদপ্রিয় পুরুষ ছিলেন, আমিও তদ্রূপ; সুতরাং দুজনের একত্র সমাগম হইলে উভয়ের 'জিগীষা' প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিত। হাসিতে হাসিতে লোকের নাড়িতে ব্যথা হইয়া যাইত। এবারেও হরিনাভিতে তাহা ঘটিল। একদিন রাত্রে সামাজিক উপাসনার পর আহারান্তে আমাদের দুইজনের গল্পের কাটাকাটিতে রাত্রি ২টা বাজিয়া গেল। ব্রাহ্মদের নাড়িতে ব্যথা হইল।

সেই কারণেই হউক, কি হরিনাভির ম্যালেরিয়াবশতই হউক, আমি কলিকাতায় আসিয়াই জ্বরাক্রান্ত হইলাম। জ্বরের সঙ্গে রক্তকাশ দেখা দিল। একজন ডাক্তার বলিলেন, হাঁপকাশের সূত্রপাত, কিন্তু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলিলেন, ক্ষয়কাশের সূত্রপাত। সেইরূপ চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

পিতামাতার ব্যবহার। এই পীড়ার সময় আমার পূজনীয় জনক-জননী কি করিয়াছিলেন, এবং আমার বিশ্বাসী অনুগত ভৃত্য খোদাই কি করিয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার উপযুক্ত। তৎপূর্বে আট বৎসর কাল আমার পিতাঠাকুর মহাশয় আমার মুখদর্শন করেন নাই। তিনি যে প্রথম-প্রথম আমাকে গ্রামে প্রবেশ করিতে দিবেন না বলিয়া গুণ্ডা ভাড়া করিতেন, ও শেষে সে প্রয়াস ত্যাগ করিয়াও আমি বাড়িতে কোনো ঘরে আছি জানিলেই সে ঘরের দিকে যাইতেন না, পথে আমাকে দেখিলে সে পথ পরিত্যাগ করিতেন, এ সকল অগ্রেই বলিয়াছি। আমি পীড়াতে পড়িয়া যখন বুঝিতে পারিলাম যে পীড়া কঠিন, আমার জীবন সংশয়, তখন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া উচিত মনে করিলাম। রোগশয্যায় পড়িয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলাম। পীড়ার সংবাদ দিয়া লিখিলাম, "যদি উচিত বিবেচনা করেন, আসিয়া দেখা দিয়া আমাকে পদধূলি দিয়া যাইবেন। তাহা না হইলে এই বিদায়, পরলোকে দেখা হইবে।" তৎপূর্বে বাবা আমার চিঠিপত্র খুলিতেন না, উপরে আমার হস্তাক্ষর দেখিলে ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। এ পত্র যে কেন পড়িলেন, বলিতে পারি না। অনুমান করি, লোকমুখে অগ্রেই আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, একদিন প্রাতে আমার ভবনের দ্বারে একখানি গাড়ি আসিয়া লাগিল। প্রসন্নময়ী জানালা হইতে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিলেন, "বাবা ও মা আসিয়াছেন।" মা উপরে আসিলেন, কিন্তু বাবা আর সে ভবনে প্রবেশ করিলেন না। মা আমার রোগশয্যার পার্শ্বে আসিয়া কাঁদিয়া বসিয়া পড়িলেন। "বাবা আসিলেন না কেন?" জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, তিনি কবিরাজ ডাকিতে গিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম, বাবা আমার চিঠি পাইয়া, মায়ের গহনা বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া আমার চিকিৎসার জন্য আসিয়াছেন, বাড়িতে প্রবেশ করিবেন না, আমার জ্ঞাতি দাদা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাসাতে থাকিয়া আমার চিকিৎসা করাইবেন।

যথাসময়ে কবিরাজ আসিলেন। বাবা তাঁহাকে আমার ভবনে প্রবেশ করাইয়া দিয়া নিজে পথপার্শ্বে দোকানে বসিয়া রহিলেন। কবিরাজ আমাকে দেখিয়া গেলে তাঁহার মুখে সমুদয় শুনিলেন।

তাঁহার এই ব্যবহারে আমার চক্ষে কত জল পড়িল। তৎপূর্বে এই আট বৎসর সংসারের আপদ-বিপদে জ্ঞাতসারে আমার এক পয়সাও সাহায্য লন নাই। পরন্তু যদি কখনো জানিতে পারিয়াছেন যে, মায়ের হাত দিয়া গোপনে কিছু অর্থ সাহায্য করিতে চাহিতেছি, তখন তুমুল কাণ্ড করিয়াছেন। তিনি আমাকে একেবারেই ত্যাজ্য পুত্র

করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পতিত পুত্র যখন বিপদে পড়িয়া স্মরণ করিল, তখন আর সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সম্বল নাই। যে সম্বল হাতের কাছে পাইলেন, তাহাই লইয়া ছুটিলেন। কি উদারতা! এই উদারতা তাঁহার প্রকৃতির এক মহা সদগুণ।

তিনি আসিয়া কয়েকদিন থাকিয়া, এক স্বতন্ত্র বাড়ি ভাড়া করিয়া মাকে আমার পরিচর্যার জন্য সেই বাড়িতে রাখিয়া গেলেন। মাতাঠাকুরাণী বিরাজমোহিনীকে ও আমাকে লইয়া সেই বাড়িতে রহিলেন। মাতাঠাকুরাণীর জপ-তপ ব্রত-নিয়ম উপবাসাদির মাত্রা অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গেল। প্রায় প্রতিদিন দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন, ইষ্টদেবতার চরণে শত-শত প্রণাম করিয়া এই অধম পুত্রের জীবন ভিক্ষা করিতেন। তৎপরে গৃহে ফিরিয়া আমারই রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মাটি দিয়া শিব গড়িয়া পূজাতে প্রবৃত্ত হইতেন। আমি শুইয়া শুইয়া তাঁহার পূজার নিষ্ঠা দেখিতাম।

ওদিকে, বাবা মাকে আমার নিকট রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া গ্রামের জ্ঞাতি কুটুম্ব-বর্গের মধ্যে কেহ-কেহ দলাদলি আরম্ভ করিলেন। বাবা তখন বজ্রের ন্যায় কঠোর হইয়া দাঁড়াইলেন। "একঘরে করে করুক, আমার কর্তব্য কাজ আমি করেছি," বলিয়া সে দলাদলির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। এই দলাদলিতে কিছুদিন গেল।

এদিকে মা আমার সেবাতে বিব্রত। আমার প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় অতি সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি মায়ের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। তাঁহার প্রতি আমাদের পরিবারস্থ সকলের ও জ্ঞাতি কুটুম্বের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তাঁহার লাঠি, তাঁহার জপ-মালা, তাঁহার যোগপট্ট প্রভৃতি যে-কিছু চিহ্ন ঘরে ছিল, সে-সমুদয়ের প্রতি মা'র এত ভক্তি যে বাড়ির কাহারও গুরুতর পীড়া হইলে, সেগুলি তাহার রোগশয্যাতে স্থাপন করা হইত, রোগমুক্তি না হইলে অন্তরিত করা হইত না। সেই নিয়মানুসারে জননী-দেবী ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের লাঠি মালা প্রভৃতি আনিয়া আমার শয্যাতে স্থাপন করিয়াছিলেন। তিন মাস সেইরূপ রহিল, অন্তরিত করিতে দিলেন না। আমার পীড়ার উপশম হইলে তবে তুলিয়া লওয়া হইল।

ভৃত্যের ভালোবাসা। এই পীড়ার সময় আমার জনক-জননীর যেমন আশ্চর্য সন্তান-বাৎসল্য দেখিলাম, তেমনি আমার বিশ্বাসী অনুগত ভৃত্য খোদাইয়ের অদ্ভুত প্রভু-ভক্তির পরিচয় পাইলাম। খোদাইয়ের স্মৃতি আমার মনে পবিত্র প্রেমের উৎস স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে আমার 'মেজবৌ' নামক উপন্যাসে অমর করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ভবানীপুরে হেডমাস্টারি করিবার সময় খোদাইকে রাখি। তখন হইতে তাহার গুণাবলি দেখিয়া আমার মন তাহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হয়। আমার প্রতিও তাহার প্রগাঢ় প্রীতি জন্মে। সে আমার হিতৈষী বন্ধু ও পরিবার-পরিজনের রক্ষক ছিল। আমি তাহার হাতে টাকাকড়ি ও সংসারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম।

পীড়া হইয়া কর্ম হইতে অর্ধ বেতনে বিদায় লইয়া যখন আসিয়া রোগশয্যায় পড়িলাম, তখন খোদাইয়ের বেতন দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য হইবে এই ভাবিয়া, আমি আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমার রোগমুক্তি পর্যন্ত অধিক বেতনে তাহাকে তাঁহার বাড়িতে রাখিয়া দিলাম। মা যখন আমাকে লইয়া স্বতন্ত্র বাসা করিয়া আছেন, তখন একদিন প্রাতে দেখি, খোদাই আসিয়া উপস্থিত।

আমি। কি খোদাই, তুমি যে এলে?

খোদাই। আপনার বেমারি বেড়েছে শুনে আমি আর থাকতে পারলাম না, কর্ম ছেড়ে এসেছি।

আমি। ভালো করনি। তোমাকে খেতে দেবে কে?

খোদাই। আপনি ভাববেন না, আমি বেতন চাই না। নারায়ণ আপনাকে বাঁচায়ে তুললে আপনি পরে বেতন হিসাব করে দেবেন। আর আপনি যদি না উঠেন, আমার বেতন থাক।

শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আমি কোনোক্রমেই এই সংকল্প হইতে তাহাকে ফিরাইতে পারিলাম না, সে থাকিয়া গেল।

তৎপরে মা চলিয়া গেলে আমি আমার পূর্ব বাসায় গেলাম। তখনো ছুটিতে আছি। দিনের পর দিন যায়, দেখি প্রসন্নময়ী আমার নিকট সংসার খরচের টাকা চান না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "কে জানে খোদাই কোথা হতে চালাচ্ছে। সে বলেছে, 'মা, বাবুকে এখন বিরক্ত কোরো না, টাকা না থাকলে আমাকে বল।' " পরে অনুসন্ধানে জানিলাম, খোদাই আপনার গলার সোনার দানা বাঁধা দিয়া টাকা আনিয়া প্রসন্নময়ীর হাতে দিতেছে।

ইহার পর আমরা বায়ু পরিবর্তনের জন্য মুঙ্গেরে যাই। খোদাই আমাদের সঙ্গে যায়। সেখানে গিয়া তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। আমি তাহার সমুদয় ঋণ শোধ করিয়া, তাহাকে টাকা দিয়া তাহার দেশে পাঠাইলাম। সেখানে গিয়া তাহার মৃত্যু হইল। সে যে কয় মাস জীবিত ছিল, আমি তাহার সমস্ত মাসিক বেতন তাহাকে পাঠাইয়া দিতাম। হায়, তাহাতে তো তাহার প্রেমের ঋণ শোধ হইল না! শুনিলাম, মরিবার সময় নিজ সন্তানকে বলিয়া গেল, "যদি কখনো কাজ করতে কলকেতায় যাস, আমার বাবুর কাছে থাকিস।"

প্রথম সন্তান বিয়োগ। আমি ছুটি লইয়া বায়ু পরিবর্তনের জন্য মুঙ্গেরে গেলাম। সেখানে গিয়াই এক বিপদ ঘটিল। মুঙ্গেরে বাড়িগুলির দোতলার বারান্ডার রেলিং বড় ছোট-ছোট। আমাদের পঁহুছিবার পরদিন বৈকালে আমি কয়েকজন সমাগত বন্ধুর সহিত বসিয়া কথোপকথন করিতেছি, এমন সময় দুম করিয়া একটা শব্দ হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখি, আমার সর্বকনিষ্ঠা কন্যা এক বৎসর দশ মাসের বালিকা সরোজিনী সেই বাড়ির বারান্ডার রেলিঙে উঠিয়া তাহা টপকাইয়া নিচের উঠানের পাথরের মেঝের উপর পড়িয়া গিয়াছে। সে আর কাঁদিল না, নড়িল না, পাথরখানার মতো অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল।

দৌড়িয়া নিচে গিয়া তাহাকে কুড়াইয়া আনা গেল, চেতনা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা গেল, আর চেতনা হইল না। রাত্রি চারি দণ্ডের পর তাহার মৃত্যু হইল। বন্ধুরা তাহার মৃতদেহ লইয়া শ্মশানে দাহ করিতে গেলেন।

আমি প্রসন্নময়ীকে সবলে চাপিয়া ধরিয়া সমস্ত রাত্রি শয্যায় শোয়াইয়া রাখিলাম, কারণ তিনি উন্মত্তার ন্যায় ছুটিয়া রাস্তায় যাইতে চাহিতে লাগিলেন। আমি শোক করিব কি, সেই সংগ্রামে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। আমার শোক একটি কবিতাতে প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা 'পুষ্পাঞ্জলি'তে প্রকাশিত হইয়াছে।

সরোজিনীর মৃত্যুর পর আমি কিছুদিন মুঙ্গেরে থাকিয়া, পরিবারদিগকে সেখানে রাখিয়া কলিকাতার কর্মস্থানে আসিলাম। এই সময় হইতে প্রসন্নময়ী ও বিরাজ-

মোহিনী একত্র বাস করিতে লাগিলেন। আমিও পূর্ব নিয়মানুসারে তাঁহাদের উভয় হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে লাগিলাম। এই সংগ্রামে অনেকদিন গিয়াছিল।

কাব্যগ্রন্থ। বোধ হয় এই সময়েই আমার লিখিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কবিতা সংগ্রহ করিয়া 'পুষ্পমালা' নামক গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। আমার রচিত পুস্তকের মধ্যে কয়েকখানি আমার নিজের বিশেষ প্রিয়, তন্মধ্যে পুষ্পমালা একখানি। ইহাতে আমার অনেক প্রাণের কথা আছে।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ

কেশবচন্দ্রের কন্যাদান। মুঙ্গের হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম কেশব-বাবু তাঁহার পৈতৃক ভবনের অংশ বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে মিস পিগটের স্কুলের বাড়ি ক্রয় করিয়া তাহার নাম 'কমল কুটির' রাখিলেন, এবং সেখানে কুচবিহারপক্ষীয় ঘটকদিগকে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা দেখানো হইল।

জীবনের সত্যব্রত। অপরদিকে এই সময়েই কয়েকজন উৎসাহী ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া আর-এক কার্যের সূত্রপাত করিলেন। তাঁহারা একটি ঘনিবিষ্ট দল সৃষ্টি করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। এইরূপ স্থির হইল, তাঁহারা কয়েকটি মূল সত্যকে জীবনের ব্রতরূপে অবলম্বন করিবেন, এবং তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া একটি ঘনিবিষ্ট দলে বদ্ধ হইবেন। তন্মধ্যে কয়েকটি ব্রত প্রধান রূপে উল্লেখযোগ্য। প্রথম, তাঁহারা একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। দ্বিতীয়, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের চাকুরি করিবেন না। তৃতীয়, পুরুষের ২১ বৎসর ও কন্যার ১৬ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে বিবাহ দিবেন না, বা সেরূপ বিবাহে পৌরোহিত্য করিবেন না। চতুর্থ, জাতিভেদ রক্ষা করিবেন না, ইত্যাদি। আমাকে আমন্ত্রণ করাতে আমি ঐ দলে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হইলাম। একদিন বিশেষ উপাসনার দিন স্থির হইল। ঐ দিন বিশেষ উপাসনানন্তর প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া, আগুন জ্বালিয়া, ঈশ্বরের নাম লইতে-লইতে তাহা প্রদক্ষিণ পূর্বক, আমরা ঐ অগ্নিতে আমাদের নিজ-নিজ নাম অর্পণ পূর্বক, প্রার্থনানন্তর প্রতিজ্ঞাপত্র পুনরায় পাঠ করিয়া স্বাক্ষর করিলাম। সুখের বিষয় যে, ইহার পর আমি ও ঐ দলের আর একজন গবর্ণমেণ্টের চাকুরি পরিত্যাগ করি, এবং সেই সকল প্রতিজ্ঞা চিরদিন পালন করিয়া আসিতেছি। বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মবন্ধুগণ ঐ দলে ছিলেন। যত দূর স্মরণ হয়, ময়মনসিংহের শরচ্চন্দ্র রায়ও ঐ দিন উপস্থিত ছিলেন। যখন ইঁহারা ভগবানের নাম কীর্তন করিতে-করিতে আগুনের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন এক আশ্চর্য বল ও আশ্চর্য প্রতিজ্ঞা আমার মনে জাগিতে লাগিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে কুচবিহার বিবাহের আন্দোলন উঠিয়া, সেই ঝড়ে আমাদের ক্ষুদ্র দলটি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। সে আন্দোলনে ইঁহারা সকলেই মহোৎসাহে কার্য করিয়াছিলেন।

এই সময় হইতে আমার গবর্ণমেণ্টের চাকুরী ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাকে দিবার প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল হইল। কিন্তু সে চাকুরী ত্যাগ করিয়া অন্য চাকুরী লইবার ইচ্ছা আমার ছিল না। এ বিষয়ে আমি বন্ধুবর আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে পরামর্শদাতা রূপে বরণ করিয়াছিলাম। আমার

প্রচারকার্যে জীবন দেওয়ার বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ সায় ছিল, কিন্তু আমার একটা উপায় না করিয়া কর্ম ছাড়া উচিত নয় বলিয়া তিনি বাধা দিতে লাগিলেন।

হিন্দু রাজপরিবারে কেশবচন্দ্রের কন্যাবিবাহ। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইতে না হইতে কুচবিহার বিবাহের ঝটিকা উপস্থিত হইল, এবং উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল ভাঙিয়া দুখান হইয়া গেল।

১৮৭৮ সালের জানুয়ারির প্রারম্ভে কুচবিহারের ম্যাজিস্ট্রেট, আমার প্রাচীন পরিচিত যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়, নাবালক রাজার বিবাহের বিষয়ে সমুদয় কথা স্থির করিবার জন্য ভারপ্রাপ্ত হইয়া কলিকাতাতে আসিলেন। কাশীর সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয় তখন কলিকাতাতে বাস করিতেছিলেন। বন্ধুতাসূত্রে আমি মধ্যে-মধ্যে তাঁহার ভবনে যাইতাম, সেখানে যাদববাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত। আমি তাঁহার মুখে শুনিলাম যে, কেশববাবু কন্যার বিবাহোপযুক্ত বয়সের পূর্বে তাহাকে বিবাহ দিতে রাজি হইয়াছেন। কি-কি নিয়মে বিবাহ হইবে, সেই সকল কথাবার্তা চলিতেছে। সে সকল কথাবার্তার প্রকৃতি কি, তাহা তিনি আমাকে বলেন নাই। ক্রমে শুনিলাম যে, পদ্ধতি স্থির করিবার জন্য কুচবিহার হইতে রাজপুরোহিত আসিতেছেন। ক্রমে কি-কি বিষয় স্থির হইল, তাহাও প্রকারান্তরে আমাদের কর্ণগোচর হইল। জানিলাম যে, কন্যার ও বরের বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বেই বিবাহ হইবে, তবে বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিবেন। কেশববাবু জাতিচ্যুত বলিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিবেন না, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কন্যা সম্প্রদান করিবেন। রাজপরিবারের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইবে, কেবল তাহাতে দেবদেবীর নামের পরিবর্তে ঈশ্বরের নাম লিখিত হইবে, রাজপুরোহিত বিবাহ দিবেন, ইত্যাদি।

আবার ইহাও শুনিলাম যে, যাদববাবু বিবাহের প্রস্তাব লইয়া দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের ভবনে গিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী ব্রহ্মময়ী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "না না, আমার মেয়ের রাজারাজড়ার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে না। প্রথম তো ছেলে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক, তার পর রাজারাজড়ার সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ ভালো নয়, আমার ছেলেমেয়েরা রানী-বোনের সঙ্গে ভালো করে মিশতে পারবে না।" যাদববাবু সেখান হইতে নিরাশ হইয়া আসিয়া কেশববাবুর কাছে গিয়াছেন।

এই সংবাদে কলিকাতার ব্রাহ্মদলের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমরা স্থির করিলাম যে, এই সঙ্কটে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত সত্য সকলকে জোর করিয়া ধরা আমাদের কর্তব্য, এবং তাহা করিবার জন্য কেশববাবুর কার্যের প্রতিবাদ করা কর্তব্য। যে কেশববাবু মহা আন্দোলনের পর ১৮৭২ সালের ৩ আইনে বর-কন্যার বিবাহের বয়স নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তিনিই তাহা ভাঙিতে যাইতেছেন, ইহা কেমন কথা? সুতরাং এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত কার্যপ্রণালী রক্ষা করিবার জন্য জোরে দাঁড়ানো কর্তব্য। কিন্তু তৎপূর্বে বন্ধুভাবে একবার কেশববাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমুদয় কথা তাঁহার প্রমুখাৎ শুনিবার চেষ্টা করা উচিত। তদনুসারে ২রা ফেব্রুয়ারি আমরা তিনবন্ধু মিলিয়া কেশববাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। যাইবার দিন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই। তিনি বিশেষ কোনো সংবাদ দিতে পারিলেন না, বলিলেন, "আমি সবে বোম্বাই হইতে আসিয়াছি, আমি কোনো সংবাদ জানি না। তোমরা কেশববাবুর কাছে যাও, আমিও পশ্চাতে আসিতেছি।" আমরা গিয়া কেশববাবুর সহিত কথা কহিতেছি,

তিনিও আসিয়া এক পার্শ্বে বসিলেন। কেশববাবু কোনো মতেই বিশেষ সংবাদ দিতে চাহিলেন না, বলিলেন, "এখন কোনো সংবাদ দিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "এই সংবাদে ব্রাহ্মদের মন অতিশয় উত্তেজিত। আপনার উচিত আমাদিগকে সকল সংবাদ দেওয়া। লোকে তো আপনার নিকট আসে না, আমাদিগকেই পথেঘাটে ধরে, আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে। আমরা উত্তর দিতে পারি, লোককে শান্ত করিতে পারি, এমন সংবাদ আমাদের কাছে থাকা আবশ্যক।" তিনি কোনোক্রমেই কিছু বলিলেন না। অবশেষে আমি যখন এই ভাবের কথা বলিলাম, "খাস্তগির মহাশয়ের কন্যার বিবাহে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ রক্ষা হয় নাই বলিয়া তাঁহাকে আপনারাই কত চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। আপনার কন্যার বিবাহে ব্রাহ্মদের অবলম্বিত কোনো নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে ব্রাহ্মেরা আবার সেইরূপ করিতে পারে," তখন কেশববাবু অতিশয় বিরক্ত হইলেন। আমি পূর্বে কখনো তাঁহাকে এত উত্তেজিত দেখি নাই। আমাদের মনে হইল, আর তাঁহাকে বিরক্ত করা উচিত নয়। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, "আপনি বিরক্ত হইতেছেন, তবে এ কথা থাক।" এই বলিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম।

অতঃপর আমাদের দলে মন্ত্রণা চলিল। এইবার সমদর্শী দল, স্ত্রী-স্বাধীনতার দল, নিয়মতন্ত্রের দল, সকল দল এক হইল। এমন কি, বৃদ্ধ শিবচন্দ্র দেব মহাশয় পর্যন্ত আমাদের দলে যোগ দিলেন। সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে মহা বিপদ উপস্থিত। আমাদের মনে কি দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাষাতে বর্ণনা করিবার নহে। আনন্দমোহনবাবু তখন মুঙ্গেরে পরিবার রাখিয়া আসিয়া হাইকোর্টের নিকট আপনার চেম্বারে বাস করিতেন। আমি সর্বদা তাঁহার নিকট যাইতাম এবং দুজনে বসিয়া হায়-হায় করিতাম। এমন কতদিন গিয়াছে, আমি তাঁহার কৌচে বসিয়া আছি, তিনি কোটের দুই পকেটে দুই হাত দিয়া গভীর চিন্তান্বিত ভাবে সেই একটুকু ঘরের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাদচারণা করিতেছেন। দুজনের মুখেই কথা নাই। বহুক্ষণ পরে এক-একবার কৌচের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "শিবনাথবাবু, কি হবে? কি করা যায়?"

কেশবচন্দ্রের নিকট প্রতিবাদ-পত্র। অবশেষে স্থির হইল যে, সকলে একদিন একত্রে বসা আবশ্যক। তদনুসারে ৯৩নং কলেজ স্ট্রীট ভবনে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের হলে একদিন রাত্রে সকলে বসা গেল। কেশববাবুকে কিছু বলা উচিত কি না, যদি বলা হয়, কি বলা হইবে, কে কে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এই বিচারে রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিয়া গেল। স্থির হইল, একখানি প্রতিবাদ-পত্রে কয়েক ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়া কেশববাবুর হাতে দেওয়া হইবে। কিন্তু সেই গভীর রাত্রে বন্ধুদ্বয় দুর্গামোহন দাস ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী বলিলেন, "এই প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণের অনিবার্য ফল, কেশববাবু তাহার সমুচিত ব্যবহার না করিলে স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তাহা করিতে তোমরা প্রস্তুত আছ কি না?" আনন্দমোহনবাবু ও আমি বলিলাম, "স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা এখনো আমাদের মনে নাই, সে বিষয়ে কথা দিতে পারি না। যেটুকু আপাতত কর্তব্য বোধ হইতেছে, তাহাই করিতে যাইতেছি। ফলাফল জানি না।" দুর্গামোহনবাবু বলিলেন, "ছেলেখেলার মধ্যে আমরা নাই। যাঁরা আমাদের সঙ্গে সমগ্র পথ যাইতে প্রস্তুত নন, তাঁদের সঙ্গে স্বাক্ষর করিব না।" এই বলিয়া তিনি ও দ্বারিবাবু চলিয়া গেলেন।

ইঁহারা দুইজনে চলিয়া গেলে প্রতিবাদ-পত্রে উল্লেখ্য বিষয়গুলি স্থির হইয়া গেল।

পরদিন হইতে তাহাতে বিশিষ্ট ব্রাহ্মদিগের স্বাক্ষর লওয়া হইতে লাগিল। সকলের ভক্তিভাজন শিবচন্দ্র দেব মহাশয় স্বাক্ষরকারীদের অগ্রণী হইলেন। কি জানি কি ভাবিয়া দুর্গামোহনবাবু ও দ্বারিবাবু দুইদিন পরে উক্ত পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এদিকে ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ দিবসের ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকাতে কুচবিহার বিবাহ সুনিশ্চিত বলিয়া প্রকাশিত হইল। সেই দিবসই আমাদের নিযুক্ত তিন ব্যক্তি ২৬জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত ঐ পত্র কেশববাবুকে দিয়া আসিলেন। কেশববাবুর প্রচারক কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাহা লইয়াছিলেন।

আমরা কেশববাবুর নিকট প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করিয়াই, তাহা মুদ্রিত করিয়া মফঃসলের সকল সমাজে প্রেরণ করিলাম, ও তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। চারিদিক হইতে কেশববাবুর হস্তে প্রতিবাদ-পত্র আসিতে লাগিল।

সরকারী কর্মত্যাগ। এদিকে আমার জীবনের দ্বিতীয় সংকট উপস্থিত। প্রথম সঙ্কট গিয়াছিল, উপবীত ত্যাগের সময়। দ্বিতীয় সংকট আসিল, কর্ম ছাড়িবার সময়। আমি সেই বিশেষ প্রতিজ্ঞার দিন হইতে গবর্ণমেণ্টের চাকুরি ছাড়িব বলিয়া কৃতসংকল্প হইয়াছি। কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাকে দিব এই সংকল্প ছিল, সেজন্যই কেশববাবুর ভারত আশ্রমে গিয়াছিলাম। তাঁহাদের সঙ্গে মিশ খাইল না বলিয়া দুঃখিত অন্তরে কিছুদিন বিষয়কর্ম করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু আত্মা শান্তিতে ছিল না। অন্তরাত্মা 'কি করি কি করি' ভাবিয়া সর্বদাই বিষণ্ণ হইত। অবশেষে ১৮৭৬ সালের শেষ হইতে কর্ম ছাড়াই স্থির করিয়াছিলাম। কেবল সকল কাজের সঙ্গী ও সকল বিষয়ের পরামর্শদাতা আনন্দমোহন বসু মহাশয়, "কিছুদিন বিলম্ব করুন, কিছুদিন বিলম্ব করুন" বলিয়া আমাকে টানিয়া রাখিয়াছিলেন।

এখন সেই সংকল্প আবার মনে জাগিয়া মনকে অস্থির করিয়া তুলিল। আবার আমি সন্দেহ দোলায় দোলায়মান হইতে লাগিলাম। একদিকে কত চিন্তা, কত বিভীষিকা মনে আসে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তখনো ভবিষ্যতের গর্ভে, যাহাদের মুখ চাহিব, এরূপ কেহ কোথাও নাই। বৃদ্ধ পিতা-মাতার কথা মনে হইতে লাগিল। তাঁহারা চিরদারিদ্র্যে বাস করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের একমাত্র পুত্র। তাঁহাদের দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচিবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার দুই স্ত্রী ও শিশু পুত্র-কন্যা, তাহাদিগকেই বা কে দেখিবে? আমার সংসার ভার বহন করিব কিরূপে? এই চিন্তায় মন আন্দোলিত হইতে লাগিল। অপরদিকে, ব্রাহ্মসমাজের এই নব আন্দোলন আমাকে ঘেরিয়া লইতে লাগিল, আমার ধ্যানে জ্ঞানে প্রবেশ করিতে লাগিল, আমি স্কুলের কাজেও ভালো করিয়া মন দিতে অসমর্থ হইতে লাগিলাম। কি করি কি করি, এই চিন্তাতে মন পূর্ণ হইয়া গেল। আমি আর ভালো করিয়া আহার করিতে পারি না, বা ভালো করিয়া নিদ্রা যাইতে পারি না। এই উদ্বেগের মধ্যে হজম শক্তি খারাপ হইয়া শরীর দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল।

অবশেষে আমার চিরদিনের বিপদের বন্ধু যে ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা, তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম। জীবনের প্রধান-প্রধান সংকটে ব্যাকুল প্রার্থনা আমার জন্য আলোক আনয়ন করে, আমি ঈশ্বরের বাণী শুনি। একদিন বড় ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিতে বসিলাম। সে প্রার্থনার মর্ম এই:—"নারী যখন প্রেমাস্পদের জন্য পিতা-মাতা গৃহ-পরিবার আত্মীয়-স্বজন সকলকে ত্যাগ করে, তখন পথের সম্বল বলিয়া আপনার

অলঙ্কারের বাক্সটি সঙ্গে লয়। কিন্তু আবশ্যক হইলে পরে তাহাও পথে ফেলিয়া চলিয়া যায়। তেমনি আমি তোমার জন্য সকলকে ছাড়িয়াও সংসারের সম্বল বলিয়া যে চাকুরিটি ধরিয়া আছি, হে ভগবান, আবশ্যক হইলে সেটিও ছাড়াইয়া আমাকে লইয়া যাও।" এই প্রার্থনার পর আমার মনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিল, সংসারের জন্য ভয় ভাবনা যেন কোথায় চলিয়া গেল। অন্তর হইতে "চাকুরি ছাড়, ছাড়," এই বাণী আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। বন্ধুগণের অনেকে নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না! একটা দিন যায়, যেন এক বৎসর যায়! মার্চের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করিলে হেয়ার স্কুলের নিয়মানুসারে সে বৎসরের বোনাস স্বরূপ স্কুল ফণ্ড হইতে দুইশত কি তিনশত টাকা পাইতে পারিতাম। শিক্ষক বন্ধুগণ সেজন্য বার-বার অপেক্ষা করিতে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্তরের বাণী অপেক্ষা করিতে দিল না। ১৫ই ফেব্রুয়ারি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের হস্তে পদত্যাগ পত্র দিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। ১লা মার্চ হইতে স্বাধীন হইয়া এই আন্দোলনে ডুবিলাম। আমার পদত্যাগ-পত্র পাইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব ও ডিরেক্টর সাহেব আমাকে ডাকাইয়া সে পত্র ফিরাইয়া লইবার জন্য অনেক বলিলেন, কিন্তু আমি কোনো অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। বন্ধুরা যদি জিজ্ঞাসা করিতেন, "কিরূপে চলবে?" আমি বলিতাম, "কিছুই জানি না। আর থাকতে পারছি না।"

তদবধি ঈশ্বর আমার ভার সমুচিতরূপে বহন করিয়া আসিতেছেন। আমি তাঁহার করুণার কথা আর কি বলিব! তিনি যে কিরূপে আমার সকল অভাব পূরণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। যে সকল অভাব আমার কল্পনারও অতীত ছিল, তাহাও তিনি পূরণ করিবার উপায় করিয়া রাখিয়াছিলেন। ধন্য তাঁহার কৃপা!

প্রগতিশীল ব্রাহ্মদলের পত্রিকা। এদিকে আমরা আন্দোলন চালাইবার জন্য ১৭ই ফেব্রুয়ারি হইতে 'সমালোচক' নামে এক বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ, ও ২১শে মার্চ হইতে 'ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন' নামক এক ইংরাজি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিলাম। দুর্গামোহনবাবু ও আনন্দমোহনবাবু উক্ত উভয় কাগজের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্গামোহনবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভুবনমোহন দাস মহাশয় ইংরাজি কাগজের এবং আমি বাংলা কাগজের সম্পাদক হইলাম। তাহাতে চারিদিকের ব্রাহ্মগণের মতামত প্রকাশিত হইতে লাগিল।

ব্রাহ্মসমাজ কমিটি। এই সকল মতামত ও সংবাদ প্রচার হওয়ায় কলিকাতাতে ও অপরাপর স্থানে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঘোর আন্দোলন পাকিয়া দাঁড়াইল। আমরা গভীর চিন্তার মধ্যে পড়িয়া গেলাম। আমাদের বন্ধু গোষ্ঠীতে এই পরামর্শ স্থির হইল যে, এই মহা বাত্যার মধ্যে কাণ্ডারীর কাজ করিবার জন্য সমাজের বিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তিকে লইয়া 'ব্রাহ্মসমাজ কমিটি' নামে একটি কমিটি নিয়োগ করা ভালো। তাঁহারা লোকের ভাব অবগত হইবেন, তাঁহারা কর্তব্য নির্ধারণ করিবেন, তাঁহারা আন্দোলনকে চালাইবেন। এই কমিটি নিয়োগের মানসে আমরা মিটিং করিবার জন্য কেশববাবুর নিকট ২৩শে ফেব্রুয়ারি এলবার্ট হল চাহিলাম, কারণ তিনি উহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি অনুমতি দিলেন, কিন্তু আমরা মিটিং করিতে গিয়া দেখি যে গ্যাস জ্বালিবার

হুকুম নাই। কারণ শোনা গেল যে, এলবার্ট হল ব্যবহার করিতে চাওয়াতে কেশববাবু তাহার সম্পাদকরূপে সভা করিবার অধিকার দিয়াছেন, কিন্তু গ্যাসের আলো ব্যবহার করিবার অধিকার না চাওয়াতে তাহা দেন নাই। ইহা লইয়া মহা বিভ্রাট উপস্থিত হইল। শত শত ভদ্রলোক উপস্থিত, যতদূর স্মরণ হয় কতিপয় নারীও তাহার মধ্যে ছিলেন। সভাস্থলে সমাগত লোকেরা অন্ধকারে বসিবার স্থান নির্দেশ করিতে পারেন না। সভার উদ্যোগকর্তৃগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি বাজার হইতে বাতি কিনিয়া আনা হইল। কিন্তু অপর পক্ষীয় কতকগুলি যুবক এত চীৎকার ও গালাগালি করিতে লাগিল যে, মিটিং করিতে পারা গেল না। তৎপরে ২৮শে ফেব্রুয়ারি টাউন হলে ব্রাহ্মদের মিটিং করিয়া 'ব্রাহ্মসমাজ কমিটি' নিয়োগ করা হয়।

এই 'ব্রাহ্মসমাজ কমিটি'র নিয়োগ সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ আছে। রিজো-লিউশনটি লিখিবার সময় কোনো কোনো বন্ধু এমন কঠিন ভাষা ব্যবহার করিতে চাহিলেন, যাহা ব্যবহার করার পর, আর কেশববাবুর সহিত একত্র থাকা সম্ভব নয়। আমি ও আনন্দমোহনবাবু তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলাম, "আমরা এখনো এমন কথা বলিতে পারি না যে কেশববাবুকে ছাড়িবই, সুতরাং এমন কথা লেখা হইবে না যাহাতে আমাদিগকে ছাড়িতে বাধ্য করে।" আমাদের আপত্তিতে ভাষাটি নরম করিয়া দেওয়া হইল।

এদিকে আমি বড় নরম লোক বলিয়া বন্ধুরা আমার হাত হইতে সমালোচক তুলিয়া লইয়া দ্বারিবাবুর হাতে দিলেন। তিনি একেবারে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যত দূর স্মরণ হয়, সে সময়ে দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ৯৩নং কলেজ স্ট্রীটে আমাদের সঙ্গে থাকিতেন, তিনি দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সহিত একযোগে সমালোচকের ভার লইলেন।

কুচবিহার হিন্দুবিবাহ। কেশববাবু ব্রাহ্মগণের প্রতিবাদের প্রতি দৃকপাতও না করিয়া কন্যা লইয়া কুচবিহারে বিবাহ দিতে গেলেন। কুচবিহারে আমাদের লোক ছিল, তাঁহার নিকট হইতে আমরা সমুদয় ভিতরকার সংবাদ পাইতে লাগিলাম, এবং সমালোচকে 'সারস পাখির উক্তি' বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলাম। সংবাদ পাওয়া গেল—প্রথম, কেশববাবু কন্যা সম্প্রদান করিতে পাইলেন না। দ্বিতীয়, বিবাহে রাজপুরোহিত ব্রাহ্মণগণ পৌরোহিত্য করিলেন, গৌরগোবিন্দ রায় উপস্থিত ছিলেন মাত্র, কিছু করিতে পান নাই। তৃতীয়, বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা হইতে পারিল না। চতুর্থ, বিবাহে অগ্নি জ্বালিয়া হোম হইল, বর সেখানে থাকিলেন, কন্যাকে উঠাইয়া লওয়া হইল। পঞ্চম, বিবাহস্থলে রাজকুলের প্রথানুসারে হরগৌরী নামক দুইটি পদার্থ স্থাপন করা হইল, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বন্ধুগণের বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাহা অন্তর্হিত করা হইল না, ইত্যাদি।

আচার্য পদ হইতে কেশবচন্দ্রকে অপসারণ। ১৮ই মার্চ কেশববাবু কন্যার বিবাহ দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। শহরে ব্রাহ্মদলে তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল। তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। উক্ত সমাজের মিটিং ডাকিবার জন্য শিবচন্দ্র দেব প্রমুখ ব্রাহ্মগণের এক আবেদনপত্র তাঁহার নিকট গেল। তিনি মিটিং ডাকিতে স্বীকৃত হইলেন না, সে মিটিং ডাকার উপায় রহিল না। তাঁহাকে আচার্যের পদ হইতে অপসৃত করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক-মণ্ডলীর মিটিং

ডাকিবার অনুরোধ করিয়া এক আবেদন গেল। কেশববাবু সে আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না, তদনুসারে মিটিং ডাকা হইল না। কিন্তু আবেদনকারীদের আবেদনের উল্লেখ না করিয়া তিনি নিজের নামে ২১শে মার্চ এক মিটিং ডাকিলেন। যে বিজ্ঞাপনে তাহা ডাকা হইল তাহা অদ্ভুত : বাবু কেশবচন্দ্র সেন উইল প্রোপোজ দ্যাট বাবু কেশবচন্দ্র সেন বি ডিপোজড্। এরূপ অদ্ভুত বিজ্ঞাপনের মর্ম আমরা কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, যথাসময়ে দলে-দলে আমরা ২১শে মার্চের সভাতে উপস্থিত হইলাম। কার্যারম্ভেই মহা গোলযোগ উঠিল। সভাপতি হন কে? কেশববাবুর বন্ধুরা তাঁহাকে সভাপতি করিতে চাহিলেন; আমরা বলিলাম, "তাহা কিরূপে হয়? যাঁর কার্যের বিচার করিবার জন্য মিটিং, তিনি কিরূপে সভাপতি হন?" আমরা দুর্গামোহনবাবুকে সভাপতি করিতে চাহিলাম, তাঁহারা রাজি হইলেন না। কে সভাপতি হইবেন, এই বিচার লইয়া অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। শেষে কেশববাবু দুর্গামোহনবাবুকে সভাপতি করিতে রাজি হইলেন। কিন্তু এ বিষয়ে ভোট গণনা করিবার সময়, কে সভ্য কে সভ্য নয়, এই বিচার আবার উঠিল। কেশববাবুর বন্ধুগণ বিরোধী দলের অনেকের সম্বন্ধে আপত্তি করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, অবশেষে কেশববাবুর সম্মতিক্রমে দুর্গামোহনবাবুকে সভাপতি করা হইল। তদনন্তর কেশববাবু নিজের পদচ্যুতি সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চাহিলেন। দুর্গামোহনবাবু সভাপতি রূপে সে প্রস্তাব উত্থাপনের ভার আমার প্রতি অর্পণ করিলেন। আমি যেই প্রস্তাব করিতে দাঁড়াইলাম, অমনি কেশববাবু সদলে সভা ত্যাগ করিয়া গেলেন। এদিকে সেনবংশীয় বালকগণ ও তাহাদের বালক বন্ধুগণ চীৎকার ও গোলমাল করিতে লাগিল।

আমরা সেই গোলমালের মধ্যে কয়েকটি নির্ধারণ (রেজোলিউশান) পাস করিলাম। একটির দ্বারা কেশববাবুকে আচার্যের পদ হইতে নামানো হইল, অপরটির দ্বারা কয়েকজন আচার্য নিয়োগ করা হইল।

কৌতুককর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই গেল ২১শে মার্চ বৃহস্পতিবারে। পরবর্তী রবিবারে (২৪শে মার্চ) সংবাদ আসিল যে কেশববাবু মন্দিরের দ্বারে চাবি দিয়াছেন, এবং মন্দির রক্ষার জন্য কয়েকজন অনুচরকে তন্মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়াই দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ভায়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত, "চলুন, আমরাও ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারে তালা চাবি দিয়া আসি। মন্দির তো আমাদেরও, কারণ সকলে মিলিয়া টাকা দিয়াছি, কেশববাবু একলা কেন বলপূর্বক অধিকার করিবেন?" আমি এ সব বিবাদে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া, তিনি অপর দুইজন বন্ধুকে লইয়া তালা চাবি দিতে গেলেন।

সেই তালা চাবি দেওয়ার ব্যাপার এক কৌতুককর ঘটনা। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ও দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী তালা চাবি লইয়া গেটে উপস্থিত হইয়া দেখেন, তাহাতে তালা চাবি লাগানো আছে এবং ভিতরে কেশববাবুর কয়েকজন অনুগত শিষ্য রহিয়াছেন। ইঁহারা গিয়া গেটের নিকট দাঁড়াইবামাত্র তাঁহারা ছুটিয়া অপর দিকে আসিলেন। তর্ক-বিতর্ক ও বাগবিতণ্ডা আরম্ভ হইল। ইঁহারা বলিলেন, "মন্দির তো কেবল আপনাদের নয়, আমাদেরও। আপনারা কেন বলপূর্বক অধিকার করিবেন? আপনারা ভিতরে চাবি দিয়াছেন, আমরা বাহিরে দিব।" এই বলিয়া দ্বারিবাবু ও দেবীপ্রসন্নবাবু চাবি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেশববাবুর বন্ধুগণ ভিতর হইতে বাধা

দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হাত ঠেলাঠেলি, ধরাধরি, হুড়াহুড়ি চলিল। এই টানাটানির অবস্থাতে ভিতরকার কেশবশিষ্যগণের একজনের হাতে বোধ হয় গেটের লোহার রেলের আঘাত লাগিয়া থাকিবে। বাহিরে কথা উঠিল, প্রতিবাদীরা হাতে কামড়াইয়া দিয়া গিয়াছে। ইহা লইয়া হাসাহাসি ও সংবাদপত্রে কিছুদিন ঠাট্টা তামাশা চলিয়াছিল।

এই সংবাদ শহরে ছড়াইয়া পড়াতে সেই দিন বৈকালে মন্দিরের দ্বারে শহরের লোক জড় হইল। আমাদের পক্ষীয় বন্ধুরা আবার সন্ধ্যার সময় সাজিয়া-গুজিয়া আপনাদের নিযুক্ত আচার্য রামকুমার বিদ্যারত্নকে সঙ্গে লইয়া বেদী অধিকার করিবার জন্য গেলেন। আমাকে সঙ্গে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করাতেও আমি গেলাম না। ব্রহ্মোপাসনার অধিকার স্থাপন করিতে যাওয়া আমার ভালো লাগিল না। বন্ধুরা গিয়া দেখেন, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত অপরাহ্ণ ৪টা হইতে বেদী অধিকার করিয়া বসিয়া শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। তাঁহারা স্থির ভাবে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে উপাসনার ঘণ্টা বাজিল, অঘোরবাবু নামিতেছেন, ওদিকে বিদ্যারত্ন ভায়া অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় কে পশ্চাৎ হইতে তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিয়া রাখিল। ওদিকে কেশববাবু পুলিস-বেষ্টিত হইয়া আসিয়া বেদী অধিকার করিলেন। অমনি প্রতিবাদীর দল, প্রায় ৭০।৮০জন, মন্দির ত্যাগ করিয়া আসিলেন। আমি তখন মন্দিরের পার্শ্বে আমার পরিচিত এক বন্ধু ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে কি হয় জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, লজ্জা ও সঙ্কোচবশত প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে যাই নাই। প্রতিবাদীর দল মন্দির হইতে তাড়িত হইয়া ডাক্তার বসুর বাড়িতে আসিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া আমি ব্রহ্মোপাসনা করিলাম।

এই আমাদের স্বতন্ত্র উপাসনা আরম্ভ হইল। উপাসনান্তে প্রতিবাদকারী দল আবার মন্দিরে অধিকার স্থাপন করিতে গেলেন। আমি সে সঙ্গে গেলাম না। শুনিলাম কেশববাবুর উপাসনা তখনো শেষ হয় নাই। তাঁহার উপাসনা শেষ হইবামাত্র প্রতিবাদকারী দল নিচে বসিয়াই সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। যেই তাঁহাদের সঙ্গীত আরম্ভ হওয়া, অমনি উমানাথ গুপ্ত প্রভৃতি কেশববাবুর কয়েকজন অনুগত শিষ্য খোল করতালের ধ্বনি করিতে করিতে নিচে আসিলেন। তাঁহাদের "দয়াল বল জুড়াক হিয়া রে" এই গান ও খোল করতালের ধ্বনি অপর পক্ষের সঙ্গীত চাপা দিয়া ফেলিল। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কালীনাথ বসু সদলে আসিয়া প্রতিবাদকারী দলের মানুষদিগকে বাছিয়া বাছিয়া মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিতে লাগিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ইহার পরে পত্র চালাচালিতে কিছুদিন গেল। ওদিকে ব্রাহ্ম-সমাজ কমিটি সমুদয় বিবরণ দিয়া কলিকাতার ও মফঃসলের ব্রাহ্মগণের অভিপ্রায় জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অধিকাংশই স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপনের পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে পরবর্তী ২রা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে) দিবসে টাউন হলে ব্রাহ্মদিগের সভা ডাকিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল।

এই বিবাদের বিষয় ভাবিতেও ক্লেশ, লিখিতেও ক্লেশ, কিন্তু বিবাদটা যখন ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিবৃত্তের অঙ্গ হইয়া গিয়াছে, তখন সে বিষয়ে যতটা স্মরণ হয় লিখিয়া রাখা ভালো বলিয়া লিখিলাম। দলাদলিতে মানুষকে কিরূপ অন্ধ করে, তাহা দেখাইবার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই অংশের উপসংহার করিতেছি।

এই গোলমালের মধ্যে আমাদের দলে যিনি যিনি লেখনী ধারণ করিতে জানিতেন, তাঁহারা সকলেই কেশববাবুর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে লাগিলেন। আমি "এই কি ব্রাহ্মবিবাহ?" নাম দিয়া এক পুস্তিকা লিখিলাম। পূর্বোক্ত ঘনিষ্ঠ মণ্ডলীর সভ্য বজ্রযোগিনী নিবাসী আনন্দচন্দ্র মিত্র সুকবি বলিয়া সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তিনি এই সময়ে কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করিলেন। এ সংবাদ আমরা জানিতাম না। তাহা যে আমার বন্ধু কেদারনাথ রায়ের প্রেসে ছাপা হইতেছে, তাহাও জানিতাম না। যখন বাহির হইল, তখন একখানা আমার হাতে পড়িল। আমি দেখিলাম, তাহাতে অতি লঘু ভাবে কেশববাবুকে ও তাঁহার দলকে আক্রমণ করা হইয়াছে। বিশেষ অপরাধের কথা এই, আচার্য-পত্নীকে তাহার মধ্যে আনিয়া তাঁহার প্রতিও লঘু ভাবে শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। আমি আচার্য-পত্নীকে মনে মনে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম। আমি দেখিয়া জ্বলিয়া গেলাম। তৎক্ষণাৎ আনন্দ মিত্রকে ডাকাইয়া, কেদারকে অনুরোধ করিয়া, ঐ পুস্তিকা প্রচার বন্ধ করিয়া দিলাম। দিয়া মিরার আপিসে গিয়া কেশববাবুর দলস্থ প্রচারক বন্ধুদিগকে বলিয়া আসিলাম, যদি ঐ পুস্তিকা তাঁহাদের হাতে পড়ে, কিছু যেন মনে না করেন। আমরা অগ্রে জানিতাম না, পরে জানিয়া উহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছি।

হায়, হায়, দলাদলিতে মানুষকে কি অন্ধ করে! ইহার পরও তাঁহারা বিরোধী দলের প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করিলেন যে, তাহারা নাটক লিখিয়া আচার্য-পত্নীর প্রতি লঘু ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে। আবার এই কথা এরূপভাবে লিখিলেন, যেন আমিই ঐ নাটক লিখিয়াছি। তখন আমি লজ্জাতে মরিয়া গেলাম। এরূপ দলাদলির মাথায় ধর্ম টেকে না। আমরা সেই যে ধর্ম হারাইয়াছি, তাহার সাজা এত-দিন ভোগ করিতেছি, আর কতদিন ভোগ করিব, ভগবান জানেন। ব্রাহ্মসমাজ এতদ্দ্বারা লোক সমাজে যে হীন হইয়াছে, তাহা আজিও সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। ব্রাহ্মসমাজের অধঃপতন আমাদের পাপের শাস্তি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রবে যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাই আমার জীবনের প্রধান কাজ। এখন ভাবিয়া আশ্চর্য বোধ হইতেছে, কিরূপে ঈশ্বর এই ঘূর্ণিপাকের মধ্যে আমাকে আনিয়া ফেলিলেন, তাঁহার বাণী আমাকে কিরূপে অধিকার করিল! আমার প্রকৃতি নিহিত দুর্বলতা কতবার আমাকে তাঁহার প্রদর্শিত পথ হইতে ও তাঁহার নির্দিষ্ট কাজ হইতে দূরে লইতে চাহিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাকে দূরে যাইতে দিলেন না—যেন আমার চুলের টিকি ধরিয়া আমাকে বাঁধিয়া রাখিলেন।

এরূপ মহৎ ব্রত ধারণ করিয়াও আমার সুখাসক্ত চিত্ত বহুদিন সুখের প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারে নাই; বার-বার আত্মবিস্মৃতির ও ঈশ্বরবিস্মৃতির মধ্যে পড়িয়া সুখের পশ্চাতে ছুটিয়াছে। বলিতে কি, এই আন্তরিক সংগ্রামের জন্যই আমার দ্বারা যতটা কাজ হইতে পারিত, তাহা হইতে পারে নাই। আমি বহু বৎসর যেন দুই হাত দিয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে পারি নাই। এক হস্ত প্রবল প্রবৃত্তিকুলের সহিত সংগ্রামে আবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে এবং অপর হাত দিয়া ঈশ্বরের সেবা করিয়াছি। সময় সময় মনে হইয়াছে, আমার মতো দুর্বল ব্যক্তির প্রতি প্রধান কার্যের ভার না থাকিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ভালো হইত, ইহার প্রতি লোকের আরও শ্রদ্ধা জন্মিত।

বাস্তবিক, এতদিন পরে যতই চিন্তা করিতেছি ততই মনে হইতেছে যে, যেরূপ গুরুতর কার্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলাম, তাহার গুরুত্ব যেন বহুদিন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই, সমুচিত দায়িত্বজ্ঞান যেন জাগে নাই। বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে উৎসাহের সহিত নানা কাজে ছুটিয়াছি, ধীর চিত্তে নিজের প্রকৃতির দুর্বলতা লক্ষ্য করিবার ও তদুপরি উঠিবার আয়োজন করিবার সময় পাই নাই। কাজকর্মে অতিরিক্ত ব্যস্ততার মধ্যে নিবিষ্ট চিত্তে ধর্মজীবনের গাঢ়তা ও গভীরতা সাধন করিবার সময় পাই নাই। কতবার মনে করিয়াছি, দূর হোক সরিয়া পড়ি, সকলের পশ্চাতে থাকিয়া উৎসাহ দান দ্বারা কার্য করি, কিন্তু ঘটনার পর ঘটনার স্রোতে আমাকে টানিয়া সম্মুখে লইয়াছে। ঈশ্বর আমাকে দূরে বা পশ্চাতে যাইতে দেন নাই। সে সকল কথা আর ভাঙিয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। এখন সে সব সংগ্রাম চলিয়া গিয়াছে। যে প্রবৃত্তি সর্প মধ্যে মধ্যে আমাকে বেষ্টন করিয়া শক্তিহীন করিত, ঈশ্বর তাহাকে হত করিয়া আমাকে মুক্তি দিয়াছেন। তিনি যাহা করেন তাহাই ভালো। আমাকে যে এতদিন কঠিন সংগ্রামে রাখিয়াছিলেন, তাহাও মঙ্গলের জন্য। যে সকল বলদ পথে চলিতে চলিতে উভয় পার্শ্বের তৃণ গুল্ম খাইতে চায়, তাহাদের মুখে চামড়ার ঠুলি দিয়া, চাবুকের উপর চাবুক লাগাইয়া, তাহাদিগকে সোজা পথে চালাইতে হয়, বিধাতা

এই গোলমালের মধ্যে আমাদের দলে যিনি যিনি লেখনী ধারণ করিতে জানিতেন, তাঁহারা সকলেই কেশববাবুর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে লাগিলেন। আমি "এই কি ব্রাহ্মবিবাহ?" নাম দিয়া এক পুস্তিকা লিখিলাম। পূর্বোক্ত ঘনানিবিষ্ট মণ্ডলীর সভ্য বজ্রযোগিনী নিবাসী আনন্দচন্দ্র মিত্র সুকবি বলিয়া সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তিনি এই সময়ে কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করিলেন। এ সংবাদ আমরা জানিতাম না। তাহা যে আমার বন্ধু কেদারনাথ রায়ের প্রেসে ছাপা হইতেছে, তাহাও জানিতাম না। যখন বাহির হইল, তখন একখানা আমার হাতে পড়িল। আমি দেখিলাম, তাহাতে অতি লঘু ভাবে কেশববাবুকে ও তাঁহার দলকে আক্রমণ করা হইয়াছে। বিশেষ অপরাধের কথা এই, আচার্য-পত্নীকে তাহার মধ্যে আনিয়া তাঁহার প্রতিও লঘু ভাবে শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। আমি আচার্য-পত্নীকে মনে মনে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম। আমি দেখিয়া জ্বলিয়া গেলাম। তৎক্ষণাৎ আনন্দ মিত্রকে ডাকাইয়া, কেদারকে অনুরোধ করিয়া, ঐ পুস্তিকা প্রচার বন্ধ করিয়া দিলাম। দিয়া মিরার আপিসে গিয়া কেশববাবুর দলস্থ প্রচারক বন্ধুদিগকে বলিয়া আসিলাম, যদি ঐ পুস্তিকা তাঁহাদের হাতে পড়ে, কিছু যেন মনে না করেন। আমরা অগ্রে জানিতাম না, পরে জানিয়া উহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছি।

হায়, হায়, দলাদলিতে মানুষকে কি অন্ধ করে! ইহার পরও তাঁহারা বিরোধী দলের প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করিলেন যে, তাহারা নাটক লিখিয়া আচার্য-পত্নীর প্রতি লঘু ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে। আবার এই কথা এরূপভাবে লিখিলেন, যেন আমিই ঐ নাটক লিখিয়াছি। তখন আমি লজ্জাতে মরিয়া গেলাম। এরূপ দলাদলির মাথায় ধর্ম টেকে না। আমরা সেই যে ধর্ম হারাইয়াছি, তাহার সাজা এত-দিন ভোগ করিতেছি, আর কতদিন ভোগ করিব, ভগবান জানেন। ব্রাহ্মসমাজ এতদ্দ্বারা লোক সমাজে যে হীন হইয়াছে, তাহা আজিও সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। ব্রাহ্মসমাজের অধঃপতন আমাদের পাপের শাস্তি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রবে যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাই আমার জীবনের প্রধান কাজ। এখন ভাবিয়া আশ্চর্য বোধ হইতেছে, কিরূপে ঈশ্বর এই ঘূর্ণিপাকের মধ্যে আমাকে আনিয়া ফেলিলেন, তাঁহার বাণী আমাকে কিরূপে অধিকার করিল! আমার প্রকৃতি নিহিত দুর্বলতা কতবার আমাকে তাঁহার প্রদর্শিত পথ হইতে ও তাঁহার নির্দিষ্ট কাজ হইতে দূরে লইতে চাহিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাকে দূরে যাইতে দিলেন না—যেন আমার চুলের টিকি ধরিয়া আমাকে বাঁধিয়া রাখিলেন।

এরূপ মহৎ ব্রত ধারণ করিয়াও আমার সুখাসক্ত চিত্ত বহুদিন সুখের প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারে নাই; বার-বার আত্মবিস্মৃতির ও ঈশ্বরবিস্মৃতির মধ্যে পড়িয়া সুখের পশ্চাতে ছুটিয়াছে। বলিতে কি, এই আন্তরিক সংগ্রামের জন্যই আমার দ্বারা যতটা কাজ হইতে পারিত, তাহা হইতে পারে নাই। আমি বহু বৎসর যেন দুই হাত দিয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে পারি নাই। এক হস্ত প্রবল প্রবৃত্তিকুলের সহিত সংগ্রামে আবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে এবং অপর হাত দিয়া ঈশ্বরের সেবা করিয়াছি। সময় সময় মনে হইয়াছে, আমার মতো দুর্বল ব্যক্তির প্রতি প্রধান কার্যের ভার না থাকিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ভালো হইত, ইহার প্রতি লোকের আরও শ্রদ্ধা জন্মিত।

বাস্তবিক, এতদিন পরে যতই চিন্তা করিতেছি ততই মনে হইতেছে যে, যেরূপ গুরুতর কার্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলাম, তাহার গুরুত্ব যেন বহুদিন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই, সমুচিত দায়িত্বজ্ঞান যেন জাগে নাই। বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে উৎসাহের সহিত নানা কাজে ছুটিয়াছি, ধীর চিত্তে নিজের প্রকৃতির দুর্বলতা লক্ষ্য করিবার ও তদুপরি উঠিবার আয়োজন করিবার সময় পাই নাই। কাজকর্মে অতিরিক্ত ব্যস্ততার মধ্যে নিবিষ্ট চিত্তে ধর্মজীবনের গাঢ়তা ও গভীরতা সাধন করিবার সময় পাই নাই। কতবার মনে করিয়াছি, দূর হোক সরিয়া পড়ি, সকলের পশ্চাতে থাকিয়া উৎসাহ দান দ্বারা কার্য করি, কিন্তু ঘটনার পর ঘটনার স্রোতে আমাকে টানিয়া সম্মুখে লইয়াছে। ঈশ্বর আমাকে দূরে বা পশ্চাতে যাইতে দেন নাই। সে সকল কথা আর ভাঙিয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। এখন সে সব সংগ্রাম চলিয়া গিয়াছে। যে প্রবৃত্তি সর্প মধ্যে মধ্যে আমাকে বেষ্টন করিয়া শক্তিহীন করিত, ঈশ্বর তাহাকে হত করিয়া আমাকে মুক্তি দিয়াছেন। তিনি যাহা করেন তাহাই ভালো। আমাকে যে এতদিন কঠিন সংগ্রামে রাখিয়াছিলেন, তাহাও মঙ্গলের জন্য। যে সকল বলদ পথে চলিতে চলিতে উভয় পার্শ্বের তৃণ গুল্ম খাইতে চায়, তাহাদের মুখে চামড়ার ঠুলি দিয়া, চাবুকের উপর চাবুক লাগাইয়া, তাহাদিগকে সোজা পথে চালাইতে হয়, বিধাতা

তেমনি করিয়া আমাকে তাঁহার সেবার পথে আনিয়াছেন। ধন্য তাঁহার মহিমা! দর্পহারী ভগবান আমার দর্প চূর্ণ করিবার জন্যই সময়ে সময়ে আমার মনঃকল্পিত অভিমান মন্দির ভাঙিয়া ধূলিসাৎ করিয়াছেন, নতুবা আমার দম্ভপ্রবণ প্রকৃতি অহংকারে পূর্ণ হইয়া থাকিত। তিনি আমাকে কি শিক্ষাই দিয়াছেন!

আর একটি কথা। আমি যদি নিজে প্রলুব্ধ না হইতাম, যদি নিজে সংগ্রামের মধ্যে না পড়িতাম, কোন পথ দিয়া মানুষ অধঃপাতে যায় তাহার আভাস যদি না পাইতাম, তাহা হইলে কি প্রলুব্ধ ও অধঃপতিত নরনারীকে সমবেদনা দিতে পারিতাম? বুদ্ধিমান গৃহস্থ যেমন যে ছেলেকে কোনো বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক করিতে চান, তাহাকে সেই বিষয়ের নিম্নতম ধাপ হইতে পা-পা করিয়া তুলিয়া থাকেন, তাহার শ্রম দুঃখ প্রলোভন সংগ্রাম সমুদয় তাহাকে দেখাইয়া থাকেন, তেমনি মুক্তিদাতা বিধাতা তাঁহার যে দাসকে অপরের সাহায্যের জন্য নিযুক্ত করেন, তাহাকেও ভালো মন্দ দুই দেখাইয়া থাকেন। বিচিত্র তাঁহার বিধাতৃত্ব, ধন্য তাঁহার করুণা!

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নামকরণ ও তাহার ফল। এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কথা বলি। প্রথম বক্তব্য, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নাম কিরূপে হইল? আমরা যখন স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করি, তখন আমাদের মনে দুইটি ভাব প্রবল ছিল। প্রথম, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে একনায়কত্ব দেখিয়াছি, কেশববাবু সর্বেসর্বা, এখানে তাহা হইবে না, এখানে সাধারণতন্ত্র প্রণালী অনুসারে কার্য হইবে। দ্বিতীয়, কেশববাবু ব্রাহ্মগণের ও ব্রাহ্মসমাজ সকলের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে তাহা হইবে না, এখানে সভ্যগণের ও সমাজ সকলের মত গ্রহণ করিয়া কার্য হইবে। আমাদের মনে এই দুইটি প্রধান ভাব ছিল, সুতরাং আমরা সমাজের নিয়মাবলী প্রণয়নের সময় এই দুইটি বিষয়ই সমাজের উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রধান রূপে লিখিয়া দিয়াছিলাম। ধর্ম বিষয়ে কোনো নূতন মত, বা ধর্মজীবনের কোনো নূতন আদর্শ যে স্থাপন করিতে হইবে, তাহা আমাদের লক্ষ্য স্থলে ছিল না। বরং আমাদের ভাব এই ছিল যে, আমরাই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত কার্য করিতেছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নামটা যে কেমন করিয়া উঠিল, ঠিক মনে নাই। যত দূর স্মরণ হয়, আমাদের প্রধান ভাবের দ্যোতক বলিয়া, আমাদের উৎসাহী বন্ধু পরলোক-গত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই নামটার উল্লেখ করিয়াছিলেন। গোবিন্দবাবু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনকর্তাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। এক্ষণে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থাপন বিষয়ে ও ইহার প্রথম নিয়মাবলী নির্ণয় বিষয়ে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। এমন কি, এই সময়ে তাঁহার এক পুত্রের নামকরণ হইল, তাহার নাম 'সাধারণচন্দ্র' রাখিলেন। নাম শুনিয়া আমরাই হাসিলাম, অপরে হাসিবে তাহাতে আশ্চর্য কি? নামকরণ অনুষ্ঠান হইতে ফিরিবার সময় আমি আনন্দমোহনবাবুর গাড়িতে আসিতেছিলাম। 'সাধারণচন্দ্র' নাম লইয়া গাড়িতে খুব হাসাহাসি হইতে লাগিল। আনন্দমোহনবাবু বলিলেন, "আমার ছেলের নাম দিবার সময় তার নাম 'অনুষ্ঠানপদ্ধতিচন্দ্র' রাখিব।"

নূতন সমাজের নামটা কি হয়, নামটা কি হয়, আমাদের মধ্যে কিছুদিন এই আলোচনা করিয়া, অবশেষে একদিন কতিপয় বন্ধু মিলিয়া আমরা মহর্ষির চরণ দর্শন করিতে গেলাম। তিনি তখন চুঁচুড়া শহরে গঙ্গাতীরস্থ এক ভবনে একাকী বাস করিতেছিলেন। তিনি 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামটা শুনিয়া বলিলেন, "বেশ

হয়েছে। আমাদের সমাজের নাম 'আদি' সমাজ, আমরা কালে আছি। কেশববাবুর সমাজের নাম 'ভারতবর্ষীয়' সমাজ, তাঁরা দেশে আছেন। তোমরা দেশ কালের অতীত হইয়া যাও।" সেখান হইতে আমরা নূতন সমাজের নাম 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' রাখা স্থির করিয়া আসিলাম। সেই নামই রাখা হইল।

কিন্তু এই নাম রাখিয়া তিনদিকে তিন প্রকার ফল ফলিল। প্রাচীন ব্রাহ্মদিগের অনেকে এ নাম পছন্দ করিলেন না, তাঁহাদের চক্ষে যেন কেমন হাল্কা-হাল্কা বোধ হইতে লাগিল, ছেলে-ছোকরার ব্যাপার, হট্টগোল, এই ভাব তাঁহাদের মনে আসিতে লাগিল। এই কারণেই বোধ হয়, প্রাচীন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিবেন আশা করা গিয়াছিল, তাঁহাদের অনেকে তেমন করিয়া যোগ দিলেন না, দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। দ্বিতীয়ত, এই নাম লওয়াতে বাহিরের লোকে মনে করিল, এ সমাজ কাহারও বিশেষ সম্পত্তি নয়, সাধারণের সম্পত্তি; এখানে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার অধিকার আছে। এই কারণে বাহিরের লোকের মধ্যে কেহ মন্দিরের দ্বারে গোলযোগ করিলে যদি তাহাতে বাধা দেওয়া যাইত, তবে তাহারা বলিয়া উঠিত, "এটা যে সাধারণ সমাজ, এখানে আবার বাধা দেও কেন?" আমরা শুনিয়া হাসিতাম। তৃতীয় ফলটি সর্বাপেক্ষা গুরুতর। এই নামের প্রভাবে, যাঁহারা ইহার সভ্য হইলেন, তাঁহাদের মনে নিরন্তর এই কথা জাগিতে লাগিল যে, ব্যক্তিগত প্রাধান্যে বাধা দেওয়াই এ সমাজের প্রধান কাজ। কর্মচারীদিগের কাজের সহায়তা করা অপেক্ষা তাঁহাদের কাজের দোষ প্রদর্শন করা ও তাঁহাদের ব্যক্তিত্বকে সংযত করাই যেন সভ্য-দিগের প্রধান কর্তব্য। এই ভাব লইয়া কার্যারম্ভ করাতে প্রথম-প্রথম কিছুদিন আমাদের পক্ষে কর্মচারী পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বার্ষিক সভাতে কার্য-বিবরণ উপস্থিত হইলে সভ্যগণ এ ভাবে বসিতেন না যে, অবৈতনিক কর্মচারীগণ যিনি যতটা কাজ করিয়াছেন, সে জন্য ধন্যবাদ করিয়া ভবিষ্যতে আরও ভালো কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে; কিন্তু সভ্যগণ এই ভাবে উৎকর্ণ ও উৎশৃঙ্গ হইয়া বসিতেন যে, কার্যবিবরণে কোথায় কি ত্রুটি আছে তাহা বাহির করিতে হইবে, এবং কোথায় কি ভ্রম প্রমাদ আছে তাহা লইয়া ফাড়াছেঁড়া করিতে হইবে। বহু বৎসরে এই ভাব অনেক পরিমাণে গিয়াছে। কিন্তু সেই উৎকর্ণ ও উৎশৃঙ্গ ভাব, সেই ব্যক্তিগত শক্তির নামে ত্রাস, সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় ঝোঁক, সেই কার্যে একতা অপেক্ষা প্রতিবাদ-পরায়ণতার ভাব, এখনো সম্পূর্ণ যায় নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভাব বলিলে সভ্যগণের মধ্যে মতবিরোধ, দোষ প্রদর্শনেচ্ছা প্রভৃতি বুঝায়। ইহা অনেক পরিমাণে ঐ নাম গ্রহণের ফল বলিয়া বোধ হয়।

অগ্রেই বলিয়াছি আমি যখন কর্ম ছাড়ি, তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হয় নাই, সবে আন্দোলন উঠিতেছে। আন্দোলনটা একটা উপলক্ষ্য হইল বটে, কিন্তু আন্দোলন না উঠিলেও আমি কর্ম ছাড়িতাম, সেজন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা এই দুই কর্মে আপনাকে দিব, এই উদ্দেশ্যেই কর্ম ছাড়িয়া-ছিলাম। কিন্তু কর্ম ছাড়িয়াও যদি কাহারও উপরে ভারস্বরূপ না হওয়া যায় তাহাই ভালো, এটাও মনের ভাব ছিল। এই জন্য স্থির করিয়াছিলাম যে, কলেজের ছাত্রদিগের জন্য সংস্কৃত পাঠনার একটা প্রাইভেট ক্লাস খুলিব। মাসে দুই টাকা করিয়া বেতন লইব। ৩০।৪০জন ছাত্র জুটিলেই আমার আবশ্যক মতো ব্যয় চলিয়া যাইবে। আমি অবশিষ্ট সময় ব্রাহ্মসমাজের কাজে দিব। অপরাপর কাজের মধ্যে ছাত্রদের জন্য একটি সমাজ স্থাপন করিব। এরূপ কল্পনা করিয়াই কর্ম ছাড়িয়াছিলাম। কিন্তু সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হওয়ার পর এত কাজ বাড়িয়া গেল যে, ছাত্রদের জন্য রাত্রে সংস্কৃত পড়িবার বন্দোবস্ত করা আর সম্ভব হইল না। তাহাদের জন্য একটি সমাজ স্থাপন অবশিষ্ট রহিল, তাহা ১৮৭৯ সালে করা হইয়াছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলেই নানা কারণে আমার শ্রম অতিশয় বাড়িয়া গেল। প্রথমত, ইহার অগ্রণী ব্যক্তিগণ ইহার নিয়মাবলী প্রণয়নে ও মফঃসল সমাজ সকলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে ব্যস্ত হইলেন। এ কাজে তাঁহাদের সঙ্গে পূর্ণ মাত্রায় থাকিতে হইত। দ্বিতীয়ত, ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নের ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিবার ও সহকারী সম্পাদকতা করিবার এবং তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার সমগ্র সম্পাদকতা করিবার ভার লইতে হইল।

তত্ত্বকৌমুদী। এই 'তত্ত্বকৌমুদী'র প্রকাশ ও পরিচালনের ভার আমার উপরেই পড়িয়াছিল। আমরা কয়েক মাস পূর্বে সমালোচক নামে যে কাগজ বাহির করিয়াছিলাম, এবং যাহা বন্ধুগণ আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বন্ধুবর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়াছিলেন, তাহাকে নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র করা উচিত বোধ হইল না। সে নামটা ভালো লাগিল না, এবং যে ভাবে তাহা চলিতেছে তাহারও পরিবর্তন আবশ্যক বোধ হইল। তাই তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব একজন ব্রাহ্ম বন্ধুকে দিয়া, আমরা নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের নামে এক নূতন কাগজ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নূতন কাগজের নাম কি হয়, কি হয়, ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইল, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এক কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল 'কৌমুদী'; আদি সমাজের কাগজের নাম 'তত্ত্ববোধিনী'; ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কাগজের নাম 'ধর্মতত্ত্ব'। শেষোক্ত দুই কাগজ হইতে 'তত্ত্ব' এবং রাজা রামমোহন রায়ের 'কৌমুদী' লইয়া আমাদের কাগজের নাম হউক 'তত্ত্বকৌমুদী'। আমার মনের ভাব ছিল যে, রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে যে আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন মহা ধর্মের ভাব প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তত্ত্বকৌমুদী তাহাই প্রচার করিবে। ১৮৭৮ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ (২৯শে মে) তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

অনেকদিন এরূপ হইত, তত্ত্বকৌমুদীর প্রত্যেক পংক্তি আমাকে লিখিতে হইত। সাহায্য করিবার কাহাকেও পাইতাম না। এক-একদিন এমন হইয়াছে, দুই পত্রিকা একদিনে বাহির হইবার কথা। প্রত্যুষে স্নান ও উপাসনান্তে প্রেসে বসিয়াছি, ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নের কাজ সারিয়া তত্ত্বকৌমুদীর কাজ, তত্ত্বকৌমুদীর সে কাজ সারিয়া ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নের কাজ, এইরূপ সমস্ত দিন চলিয়াছে। মধ্যে এক-ঘণ্টা আহার করিয়া লইয়াছি। কাজ সারিয়া রাত্রি দশটাতে শয্যাতে যাইবার কথা, কিন্তু তখনই হয়তো নিয়মাবলী প্রণয়ন কমিটিতে গিয়া বসিতে হইল। একদিনের কথা স্মরণ আছে, যেদিন প্রাতে ৬টার সময় বসিয়া রাত্রি ১১টা পর্যন্ত একদিনে এক পুস্তিকা রচনা করিলাম, তাহার নাম "এই কি ব্রাহ্ম বিবাহ?"

সাধারণ সমাজের নিয়মাবলী প্রণয়ন। ওদিকে প্রথম নিয়মাবলী প্রণয়নের ব্যাপার এক মহা শ্রমসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিল। এক আনন্দমোহন বসু ব্যতীত আমরা আর সকলেই নিয়মতন্ত্র প্রণালী বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলাম। তিনিই এ বিষয়ে আমাদের সারথি হইলেন। তাঁহার ভবনে নিয়মাবলী প্রণয়ন কমিটির অধিকাংশ অধিবেশন

হইত। সে সকল অধিবেশনে চিন্তারও শেষ ছিল না, তর্কেরও শেষ ছিল না। কিরূপে নিয়মপ্রণালী সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, কিরূপে অতীতকালের ভ্রম প্রমাদ আর না ঘটে, কিরূপে ব্রাহ্মগণের মধ্যে একতা স্থাপিত হয়, কিরূপে ব্রাহ্মসমাজের কার্যে আবার শক্তি সঞ্চার হয়, এই সকল চিন্তা সকলেরই মনে প্রবল থাকিত। তৎপরে নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি মফঃসল সমাজ সকলে প্রেরিত হইয়া, চারিদিক হইতে প্রস্তাব সকল আসিতে লাগিল। সেই সকলের বিচারের জন্য দিনের পর দিন কমিটির অধিবেশন হইতে লাগিল। আমি হাসিয়া আনন্দমোহন বাবুকে বলিতাম, "এ কমিটি তো 'কমি'টি রইল না, এ যে 'বেশি'টি হয়ে গেল।"

একদিনের কথা মনে আছে। সেদিন প্রাতে ৬টা হইতে অপরাহ্ণ ৬॥টা পর্যন্ত আমি ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন ও তত্ত্বকৌমুদীর কাজে মগ্ন আছি, সন্ধ্যার সময় আনন্দমোহনবাবুর পত্র আসিল যে সেইদিন নিয়ম প্রণয়ন কমিটিতে আমার থাকা চাই। তদুত্তরে আমি লিখিলাম যে, "আমাকে বাদ দিয়া কাজ করুন। আমি প্রাতঃকাল ৬টা হইতে এই সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজে মগ্ন আছি।" তদুত্তরে তিনি লিখিলেন, আমাকে যাইতেই হইবে, রাত্রিকালের আহার ও শয়ন তাঁহার গৃহেই হইবে। সেখানে গিয়া আহার করিয়া আমরা ৯॥টার সময় নিয়ম প্রণয়ন কার্যে নিযুক্ত হইলাম। নিয়মাবলীর বিচার করিতে করিতে রাত্রি একটা বাজিয়া গেল। আমি আর বসিতে পারি না, নিদ্রাতে চক্ষুদ্বয় অভিভূত হইয়া আসিতেছে। অবশেষে বন্ধুদিগকে প্রশ্ন বিশেষের বিচারে অভিনিবিষ্ট দেখিয়া, আমি অজ্ঞাতসারে আনন্দমোহনবাবুর ডিনার টেবিলের নিচে নামিয়া পড়িলাম, ও ম্যাটিঙের উপর শুইয়া নিদ্রিত হইলাম। প্রায় ৩টা রাত্রির সময় আমার অনুপস্থিতি তাঁহাদের লক্ষ্য স্থলে পড়িল। তখন আমার অন্বেষণ আরম্ভ হইল। আমি কিছুই জানি না, অঘোরে ঘুমাইতেছি। অবশেষে আনন্দমোহন-বাবু টেবিলের নিচে উঁকি মারিয়া দেখেন, আমি ঘুমাইতেছি। তখন মহা হাসাহাসি পড়িয়া গেল। তখন তিনি আমার দুই ঠ্যাং ধরিয়া টানিয়া আমাকে বাহির করিলেন এবং উঠিয়া চলিয়া চক্ষে জল দিয়া নূতন প্রস্তাব শুনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

আনন্দমোহন বসু। এখানে আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থাপন ও ইহার কার্যপ্রণালী নির্দেশ বিষয়ে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ যে তাঁহাকে প্রথম সভাপতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন, তাহা সমুচিত হইয়াছিল। তিনি এ সময়ে সারথি না হইলে আমরা যাহা করিয়া তুলিয়াছি, তাহা করিয়া তুলিতে পারিতাম না। তিনি এ সময়ে কি পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা কখনো ভুলিবেন না। বলিতে কি, তিনি এই সময় ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মস্তিষ্ক, আর আমি ছিলাম দক্ষিণ হস্ত। দুজনে পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির করিতাম, তাহাই আমি কার্যে করিতাম। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, ১৮৭৪ সালে তাঁহার বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের দিন অবধি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আমি এমন কিছু করি নাই, যাহা তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া করি নাই। অথবা তিনি এমন কিছু করেন নাই, যাহা আমার সহিত পরামর্শ করিয়া করেন নাই। এই অবিচ্ছিন্ন যোগ, এই অকৃত্রিম মিত্রতা চিরদিন বিদ্যমান ছিল। আমি কত রাত্রি তাঁহার ভবনে যাপন করিয়াছি, শেষ রাত্রি পর্যন্ত কেবল ব্রাহ্মসমাজের কাজের কথা। অবশেষে রাত্রি দুইটা বা তিনটার সময় তাঁহার গৃহিণীর তাড়া খাইয়া দুইজনে শুইতে গিয়াছি।

আনন্দমোহনবাবু মিটিংএ আসিতেছেন শুনিলেই আমাদের ভয় হইত, আজ আর রাত্রি দুইটার পূর্বে মিটিং ভাঙ্গিবে না। কাজেরও অন্ত থাকিবে না, কথারও অন্ত থাকিবে না। নিজেও উঠিবেন না, আমাদিগকেও উঠিতে দিবেন না। বাস্তবিক তাঁহার হাত ছাড়াইয়া কেহ উঠিতে পারিতেন না। কেহ উঠিতে চাহিলেই তিনি চেয়ার হইতে উঠিয়া দুই হাত দিয়া ধরিয়া তাঁহাকে জোরে বসাইয়া দিতেন, বলিতেন, "আর একটু বসুন, এইবার সকলে উঠব।" সেই যে বসা, আবার দুই-তিন ঘণ্টার ব্যাপার। তাঁহার গৃহিণীর মুখে শুনিতাম, এই সময় তিনি মামলা মোকদ্দমার কাগজ পত্র দেখিলেই বলিতেন, "এগুলো যেন কাল সাপ, দেখলেই ভয় হয়। পেটের দায়ে ব্যারিস্টারি করা!" হাইকোর্টের এটর্নিরা আমাকে বলিতেন, "হায় রে! এমন শক্তি থেকেও কাজে তেমন হল না। বোস একবার বলুন যে, তিনি স্থির হয়ে শহরে থাকবেন, আমরা তাঁর ফার্স্ট প্রাকটিস করে দিচ্ছি।" বসুজ মহাশয় সে দিকে মন দিতেন না। তিনি মফঃসলে গিয়া কিছু অধিক উপার্জন করিয়া আনিয়া বসিতেন, যেন ব্রাহ্মসমাজের কাজ করিবার সময় পান। এই তাঁহার কার্যের রীতি ছিল। কতবার ইচ্ছা করিয়াছেন যে, অনন্যকর্মা হইয়া দেশের হিত সাধনে লাগেন, কেবল বৃহৎ পরিবারের পালন চিন্তাতে পারিয়া উঠিতেন না। এমন অকৃত্রিম বিনয়, এমন বিমল ঈশ্বরপ্রীতি, এমন অকপট স্বদেশানুরাগ, এমন স্বজনপ্রেম, এমন কর্তব্যনিষ্ঠা, আমি মানুষে অল্পই দেখিয়াছি। বড় সৌভাগ্য, ভগবানের বড় কৃপা যে, এমন মানুষকে বন্ধুরূপে পাইয়াছিলাম।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হওয়ার পর কয়েক মাস ইহার কার্যের ব্যবস্থা করিতে গেল। প্রথম নিয়মাবলী প্রণয়ন, সকল সমাজে তাহার পাণ্ডুলিপি প্রেরণ, সকলের মত সংগ্রহ ও তাহার বিচার, একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, সমাজের পত্রিকা পুস্তকাদির মুদ্রণ ও প্রচার, ইত্যাদি কার্যে আমাকে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিতে হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রচারক দল। এইরূপে কয়েক মাস অতীত হইলে অবশেষে সমাজের কমিটি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কার্যে মন দিবার সময় পাইলেন। চারি ব্যক্তিকে আপনাদের প্রধান প্রচারক রূপে মনোনীত করিলেন। সে চারি ব্যক্তি এই : (১ম) পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, (২য়) পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন, (৩য়) বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ, (৪র্থ) আমি।

ইহার মধ্যে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সর্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত। অগ্রেই বলিয়াছি, তিনি সংস্কৃত কলেজে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, এবং আমাকে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলে আকৃষ্ট করিবার পক্ষে তিনি এক প্রধান কারণ ছিলেন। নরপূজার প্রতিবাদের পর কেশববাবুর সহিত পুনর্মিলিত হইয়া তিনি আবার প্রচার কার্যে রত হইয়াছিলেন। ১৮৭১।৭২ সালে ভারত সংস্কার সভা ও তদধীনে দাতব্য বিভাগ ও বয়স্থা মহিলা বিদ্যালয় ও ভারত আশ্রম স্থাপিত হইলে, তিনি স্বাস্থ্যকে স্বাস্থ্য জ্ঞান না করিয়া বয়স্থা বিদ্যালয়ের পাঠনা কার্যে ও বেহালা নামক গ্রামের ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত প্রজাপুঞ্জের মধ্যে দাতব্য ঔষধ বিতরণ কার্যে প্রধানরূপে আপনাকে নিযুক্ত করেন। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান ও উপাসনান্তে ঔষধাদি লইয়া ছয়-সাত মাইল উত্তীর্ণ হইয়া বেহালা গ্রামে ঔষধাদি বিতরণ করিতে যাইতেন। সেখান হইতে দ্বিপ্রহর ১২টা কি ১টার সময় আসিয়া আহার করিতেন, আহারান্তে ২টার পর বয়স্থা বিদ্যালয়ে পাঠনা কার্যে রত হইতেন। তৎপরে অনেকদিন দেখিতাম, রাত্রে

মেয়েদের জন্য পুস্তক রচনাতে প্রবৃত্ত হইতেন। আমি বার-বার সতর্ক করিতাম, তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। এরূপ শ্রম আর কতদিন সয়? একদিন বুকে এক প্রকার বেদনা হইয়া গোঁসাইজী অচেতন হইয়া পড়িলেন। সেই বুকের ব্যথা থাকিয়া গেল। তাহা নিবারণের জন্য বহু মাত্রাতে মরফিয়া সেবন ভিন্ন উপায় রহিল না। এজন্য অতিরিক্ত মাত্রাতে মরফিয়া সেবন করা গোঁসাইজীর অভ্যস্ত হইয়া গেল। সেই মরফিয়ার মাত্রা ক্রমে অসম্ভব রূপে বাড়িয়াছিল। ইহার পরে গোঁসাইজী বাঘআঁচড়া গ্রামকে তাঁহার প্রধান কার্যক্ষেত্র করিয়া সেখানে অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। বাঘআঁচড়া হইতেই তিনি কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদ করেন। তদনন্তর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনকর্তাদিগের সহিত তাঁহার যোগ হয়। তিনি আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রচারক হইলেন।

বিদ্যারত্ন ভায়া পূর্ব হইতেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়া কার্য করিতেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁহার পত্নী তাঁহার সঙ্গে আসিলেন না। তাঁহার শ্বশুর একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন, এবং বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া স্থানে-স্থানে ভ্রমণ করিতেন। তিনি বোধ হয় বালিকা কন্যাকে ব্রহ্মজ্ঞানীর সঙ্গে আসিতে দিলেন না। যে কারণেই হউক, তাঁহার পত্নী জ্ঞানদা অনেক বৎসর আমাদের কাছে আসেন নাই। সুতরাং বিদ্যারত্ন ভায়া নিজ শ্বশুরের ন্যায় স্বাধীন ভাবে নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সমদর্শী দলের সহিত কেশব-বাবুর দলের মিশ খাইতেছে না দেখিয়া তিনি আর সে দিকে ঘেঁষিলেন না, স্বাধীন ভাবেই কার্য করিতে লাগিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন ও তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে তিনি ইহার উৎসাহী প্রচারকদিগের মধ্যে একজন হইলেন, সুতরাং তাঁহাকেও মনোনীত করা হইল।

বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ ইতিপূর্বে আসামে বিষয় কার্যে লিপ্ত ছিলেন। এই সময় বিষয় কার্য হইতে অবসৃত হইয়া স্বাস্থ্য লাভের উদ্দেশ্যে মুঙ্গের শহরে আমার পরিবারগণের সহিত বাস করিতেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে, তাঁহারও প্রচারক দলে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা হইল। তিনিও মনোনীত হইলেন।

বেহারী এক্কায় প্রচার যাত্রা। প্রচারক পদে মনোনীত হইয়াই আমরা নানা দিকে প্রচার কার্যার্থে বহির্গত হইয়াছিলাম। ২৪শে মে ১৮৭৮ তারিখে আমি বেহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দিকে যাত্রা করি। প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী তখন সন্তান-দিগকে লইয়া মুঙ্গেরে বাস করিতেছিলেন, আমি প্রথমে সেখানে গেলাম। সেখানে দ্বারকানাথ বাগচী নামে একজন সুগায়ক ব্রাহ্ম বন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। তিনি আমার অনুরোধে বিষয়কর্ম হইতে ছুটি লইয়া আমার সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। আমরা সে বারে কোন-কোন স্থানে কি-কি বিশেষ কাজ করি, তাহার সকল স্মরণ নাই। বোধ হয় অন্যান্য স্থানের মধ্যে উত্তর বেহারের নেপাল-প্রান্তবর্তী মতিহারী শহরে গিয়াছিলাম। তখন মতিহারী যাইবার রেল ছিল না। মজঃফরপুর হইতে ৫০ মাইল এক্কা চড়িয়া যাইতে হইত। এই আমার প্রথম এক্কা-গাড়িতে চড়া। দেখিলাম, এই এক্কা-গাড়ি এক অদ্ভুত যান; একটা ঘোড়াতে টানে, চালকের পশ্চাতে আরোহীর বসিবার আসন, সে একজন-যোগ্য আসন, দুইজনের ভালো স্থান সমাবেশ হয় না। আসনের উপরে ঠাকুর-চৌকির চূড়ার ন্যায় একটু আচ্ছাদন, তাহাতে জল

বৃষ্টি রৌদ্র ভালো রূপ বারণ হয় না। চাকাতে স্প্রিং নাই, খটাখট্ ওঠে ও পড়ে; অর্ধদণ্ডের মধ্যে কোমরে ব্যথা হয়, ছুটিলে চাকার শব্দে কর্ণ বধিরপ্রায় হয়। তাহার উপরে আবার অনেক গাড়িতে দুই চাকাতেই করতাল বাঁধা থাকে, চাকার খড়খড়ানি ও করতালের ঝমঝমানিতে আর কিছু শুনিতে পাওয়া যায় না। গাড়িতে চড়িয়া মনে হইল, করতাল বাঁধিয়া ভালোই করিয়াছে, আরোহী যে 'বাপ্ রে মা রে' করিবে, তাহা চালক শুনিতে পাইবে না, তাহার গাড়ি চালানোর ব্যাঘাত হইবে না।

এই এক্কা-গাড়িতে প্রথমদিন কিয়দ্দূর গিয়া অচেতনপ্রায় এক দোকানে পড়িলাম। মনে করিলাম, আর প্রাতে উঠিতে পারিব না। কিন্তু প্রাতে দেখি, কোমরের ব্যথা অনেক কমিয়াছে; আবার যাত্রা করিলাম। দুইদিনে মতিহারী পেঁৗছিলাম। মতিহারীতে কয়েকদিন থাকি। পরে সেখানে আরও দুইবার গিয়াছি।

মতিহারী হইতে ফিরিয়া আমরা বাঁকিপুর আর এলাহাবাদ হইয়া লক্ষ্ণৌ যাই। লক্ষ্ণৌ গিয়া টেলিগ্রাম পাইলাম যে, আমার জ্যেষ্ঠ কন্যা হেমলতা কলিকাতাতে অত্যন্ত পীড়িতা। মুঙ্গেরে পরিবারদিগকে প্রেরণ করিবার সময় শিক্ষার জন্য একটি বন্ধুর তত্ত্বাবধানে তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া গিয়াছিলাম। ঐ সংবাদ পাইয়া লক্ষ্ণৌএর কাজ বন্ধ করিতে হইল ও কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল। আসিবার সময় মুঙ্গের হইতে প্রসন্নময়ীকে সঙ্গে লইয়া আসিলাম, বিরাজমোহিনী অন্য সন্তানগণের ভার লইয়া মুঙ্গেরেই থাকিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্মাণের চেষ্টা। আমি কলিকাতাতে ফিরিয়া তত্ত্ব-কৌমুদীর সম্পাদকতা, উপাসক মণ্ডলীর আচার্যের কার্য, এই সকল লইয়া ব্যস্ত রহিলাম। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ত্যাগ করার পর তৎপার্শ্ববর্তী ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বসুর ভবনে কিছুদিন আমাদের উপাসনা চলে। উপেন্দ্রবাবু এই সঙ্কট কালে আমাদের সহায় হইয়া তাঁহার ঠাকুর দালানটি আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়া মহোপকার করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরেই ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেনে একটি সুপ্রশস্ত ঘর ভাড়া করিয়া সেখানে আমাদের সাপ্তাহিক উপাসনা তুলিয়া আনা হয়। এই সময়ে সেইখানেই উপাসনার কার্য চলিতেছিল।

আমি আসিয়া দেখিলাম, বন্ধুগণ ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে একখণ্ড ভূমি নির্ধারণ করিয়া, সেখানে উপাসনা মন্দির নির্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহা ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিতেছেন, এবং সেজন্য প্রত্যেকে নিজের একমাসের আয় দিবেন বলিতেছেন। আমি সে কার্যে মহা উৎসাহী হইলাম। শুনিলাম, অর্থ সাহায্যের জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকটেও এক দরখাস্ত গিয়াছে, তাহাতে আনন্দমোহনবাবুর, আমার, দুর্গামোহনবাবুর, গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের, ও অপর কাহারও কাহারও নাম আছে; মহর্ষি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে খবর লইতে বলিয়াছেন, জমির দাম কত, মন্দির নির্মাণের ব্যয় কত হইবে, ট্রাষ্টী কারা নিযুক্ত হইয়াছেন, ইত্যাদি। বোধ হইল যেন, তিনি ট্রাষ্টী নিয়োগের পূর্বে টাকা দিবেন কি না, কাহার হাতে দিবেন, কত দিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না।

একদিন আমি মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি তখন তাঁহার জোড়াসাঁকোস্থ ভবনেই আছেন। গিয়া দেখি, ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বসিয়া আছেন। তিনজনে অনেক কথা আরম্ভ হইল। মহর্ষি রাজনারায়ণবাবুকে ও আমাকে বড় ভালোবাসিতেন। রাজনারায়ণবাবুতে ও আমাতে মিলন, মহর্ষির নিকট

যেন মণিকাঞ্চনের যোগ বোধ হইল; তাঁহার হৃদয় দ্বার খুলিয়া প্রেমের উৎস আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতে লাগিল; তিনজনের অট্টহাস্যে অত বড় বাড়ি কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে নির্ঝরের সুস্নিগ্ধ বারির ন্যায় মহর্ষির বাক্যস্রোতে হাফেজ আসিলেন; নানক আসিলেন; ঋষিরা আসিলেন; উপনিষদ আসিলেন; আমরা সকলে সেই রসে মগ্ন হইয়া গেলাম। দেখিতেছি, মহর্ষির কান দুটা লাল হইয়া যাইতেছে; মহর্ষির মস্তকের কেশ মাঝে মাঝে খাড়া হইয়া উঠিতেছে। এমন সময় কথার একটু বিচ্ছেদ হইবামাত্র আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাদের অর্থ সাহায্যের দরখাস্তের হল কি?" মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদের দরখাস্ত নথির সামিল আছে।" আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "রায় বাহির হবে কবে?"

মহর্ষি। কিছুদিন পরে হবে।

ইহার পরে আবার সদালাপের তরঙ্গ, হাসির গররা ও ভাবোচ্ছ্বাসের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। অবশেষে আমি উঠিতে চাহিলে মহর্ষি উঠিয়া আমার হাত ধরিলেন; বলিলেন, "চল, কিছু না খেয়ে যেতে পাবে না।" এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া দক্ষিণের বারান্ডার কোণের এক ঘরে লইয়া গেলেন। গিয়া দেখি, টেবিলের উপরে নানাবিধ মিষ্টান্নপূর্ণ পাত্র আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মহর্ষি আমাকে এক চেয়ারে বসাইয়া, পার্শ্বের এক চেয়ারে নিজে বসিলেন, এবং নিজের হাতে তুলিয়া এক একটি খাদ্য দ্রব্য আমাকে দিতে লাগিলেন। মহর্ষির এই নিয়ম ছিল, যাহাদিগকে বড় ভালোবাসিতেন, তাহাদিগকে নিজের হাতে তুলিয়া দিয়া খাওয়াইয়া সুখী হইতেন; সেইরূপ আমাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে-খাইতে আমি বলিলাম, "ঢের হয়েছে, পেট ভরেছে।" তিনি আর একটি সুখাদ্য লইয়া হাসিয়া বলিলেন, "তা বললে চলবে না, বাপু! এ সব জিনিস বাড়ির মেয়েরা নিজের হাতে করেছেন, না খেলে নারীর সম্মান করা হবে না; তোমরা তো স্ত্রী-স্বাধীনতার দল!" এই বলিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। এমন সুন্দর, এমন পবিত্র, এমন অকপট হাস্য মানুষে কম দেখিয়াছি। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ও মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের মধ্যে অকপট অট্টহাস্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন; কিন্তু মহর্ষির হাস্য বড় কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। তবে তিনি সকলের কাছে হাসিতেন না, নিতান্ত অনুরক্ত লোকের ভাগ্যেই তাহা ঘটিত।

আহারান্তে আমরা আবার মহর্ষির বৈঠক গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি, রাজনারায়ণবাবু তখনো বসিয়া আছেন। চুপে-চুপে তাঁহার কানে আহারের ব্যাপারটা বর্ণন করিলাম, তিনি হাসিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দেখি, মহর্ষি তাঁহার ক্যাশ-বাক্স তলব করিয়াছেন, ও চেকবুক বাহির করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমি সেদিকে মনোযোগ দিবামাত্র, হাসিয়া আমাকে বলিলেন, "তোমাদের দরখাস্তের রায় লিখছি।"

আমি (রাজনারায়ণবাবুর প্রতি)। কেবল ব্রাহ্মণ-ভোজন নয়, হাতে হাতে বিদায়টা হয়ে যায় দেখছি।

রাজনারায়ণবাবু। তাইতো, সেইরূপ গতিক দেখছি।

মহর্ষি চেক স্বাক্ষর করিয়া আমার হাতে দিয়া ইংরাজীতে বলিলেন, দিস ইজ মাই আনকন্ডিশনাল গিফট্। আমি মনে ভাবিলাম, ট্রাস্টী নিয়োগ প্রভৃতি যে সকল বাঁধাবাঁধি অগ্রে ছিল, তাহা রাখিলেন না।

চেকখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, সাত হাজার টাকার চেক! অগ্রে

বন্ধুদের মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনি দুই হাজারের অধিক দিবেন না এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা দুই হাজার টাকারই প্রত্যাশা করিতেছিলাম। সাত হাজার টাকা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম।

মহর্ষি (আমার মুখের দিকে চাহিয়া)। কেমন, সন্তুষ্ট তো?

আমি। একটা বড় খারাপ হল। আর একটু বসব মনে করেছিলাম, কিন্তু ওটা পেয়ে আর বসতে ইচ্ছা করছে না। দৌড়ে গিয়ে দলে খবর দিতে ইচ্ছা করছে।

মহর্ষি (হাসিয়া)। তবে যাও।

আমি চলিয়া গেলাম। কিন্তু এমনি আনন্দের আবেগ যে, চেকখানি পকেটে না পুরিয়া মহর্ষির ঘরেই ফেলিয়া গেলাম! পথ হইতে আবার ফিরিয়া আসিলাম। ইহা লইয়া অনেক হাসাহাসি হইল।

তখন সন্ধ্যা সমাগত। আমি ছুটিয়া একেবারে আনন্দমোহনবাবুর মটস্ লেনস্থ ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি, তাঁহারা কয়েকজনে বসিয়া সমাজের নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছেন। আমি চেকখানি মিস্টার বোসের সমক্ষে রাখিবামাত্র তিনি দেখিয়া করতালি দিয়া উঠিলেন, এবং চেয়ার হইতে উঠিয়া সজোরে আমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। তৎপরে বন্ধু গোষ্ঠীর মধ্যে মহা আনন্দ ধ্বনি উঠিল। মিস্টার বোস তখনই প্রচুর মিষ্টান্ন আনাইলেন। সকলে মনের আনন্দে মিঠাই খাইলাম।

ইহার পরে গুরুচরণ মহলানবিশ ও আমার উপরে মন্দির-নির্মাণের ও অর্থ সংগ্রহের ভার প্রধানত পড়িয়াছিল। আমি বেহার, উত্তর-পশ্চিম, পাঞ্জাব, মধ্য ভারতবর্ষ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আরও অনেক হাজার টাকা তুলিয়াছিলাম।

ভারত ভ্রমণ

১৮৭৯ সালের মাঘোৎসবের সময় ভূমি ক্রয় করিয়া নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হইল। আমরা প্রাচীন ও প্রবীণ শিবচন্দ্র দেব মহাশয়কে অগ্রণী করিয়া এই মহা কার্য সমাধা করিলাম। যখন সমাজের অগ্রণী সভ্যগণ ও তাঁহাদের পত্নীগণ এক-এক মুষ্টি মৃত্তিকা ভিত্তিগহ্বর মধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন আমি চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না; এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

সিটি স্কুল। এই সময়েই আমি ও আনন্দমোহনবাবু আর একটি কার্যে ব্যস্ত হইয়াছি। আমরা দুজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে একটি উচ্চ শ্রেণীর স্কুল স্থাপন করিতে হইবে। তদ্দ্বারা দুই উপকার হইবে। প্রথম, অনেক উৎসাহী ও অনুরাগী ব্রাহ্ম যুবককে শিক্ষকতা কার্য দিয়া নিকটে রাখা যাইবে, তদ্দ্বারা সমাজের কার্যের অনেক সাহায্য হইবে; দ্বিতীয়, বহুসংখ্যক বালকের মনে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের ভাব দেওয়া যাইবে। তখন আনন্দমোহনবাবু, সুরেন্দ্রবাবু ও আমি বঙ্গীয় যুবকদলের প্রধান নেতা। আমরা সুরেনবাবুকে অনুরোধ করাতে তিনিও আমাদের সঙ্গে নাম দিতে স্বীকৃত হইলেন। আমাদের তিনজনের নামে স্কুলের প্রস্তাবনা পত্র প্রকাশ হইল। স্কুলের নাম হইল, সিটি স্কুল। আনন্দমোহনবাবু স্কুলের সরঞ্জামের টাকা দিলেন; সুরেনবাবু পড়াইতে লাগিলেন, এবং আমি সেক্রেটারির কাজ করিতে লাগিলাম। প্রথম দিনেই স্কুল বসিয়া গেল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রথম মাসেই ব্যয় বাদে টাকা উদ্বৃত্ত হইল। কয়েক মাসের মধ্যে আনন্দমোহনবাবুর প্রদত্ত টাকা শোধ হইল।

এই সিটি স্কুল স্থাপনের কথা ভুলিবার নহে। সে যেন রোম রাজ্যের পত্তন! অপরাপর স্কুলের তাড়ানো ছেলে, বদ ছেলে দলে-দলে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। আবার স্থাপনকর্তাদিগের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস থাকাতে অনেক ভালো ছেলেও আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ছেলে বাছাই করা এক মহা সঙ্কটের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। কি দুশ্চিন্তা, কি পরিশ্রম, কি সতর্কতার যে প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা এখন বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। দুই-একটি ঘটনা মাত্র উল্লেখ করিতে পারি।

ছেলে বাছাই করিবার জন্য আমি এক নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছিলাম। প্রত্যেক শিক্ষকের হাতে এক-একখানি খাতা দিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহারা দিনের পর দিন ক্লাসের দুষ্টু ছেলেদের, অর্থাৎ যাহারা কামাই করে, বা পড়া না করে, বা দুষ্টামি

করে, তাহাদের নাম লিখিয়া রাখিতেন। সপ্তাহান্তে বাছাই হইয়া বড় দুষ্টু ছেলেদের নাম আর এক খাতায় উঠিত। ঐ খাতার নাম ছিল 'ব্ল্যাক বুক'। ঐ খাতা ছেলেদের অগোচরে লাইব্রেরিতে ডেস্কের মধ্যে থাকিত; আমি তাহা মধ্যে মধ্যে দেখিতাম। তদ্দ্বারা সকল শ্রেণীর দুষ্টু ছেলেদের নাম আমার নখের আগায় থাকিত। আমি ক্লাস দেখিতে গেলেই ক্লাসের দুষ্টু ছেলেদের বিষয়ে সর্বাগ্রে অনুসন্ধান করিতাম।

একবার দেখিলাম, তৃতীয় শ্রেণীর একটি বালকের নাম বার-বার ব্ল্যাক বুকে উঠিতেছে। দেখিয়া সেই ক্লাসে গেলাম। গিয়া তাহার বিষয় অনুসন্ধান করিলাম। তৎপরে যে ব্যাপার ঘটিল তাহা এই—

ক্লাসের ছেলেরা। সার, সে আজ আসেনি।

আমি। কেন?

আর কেউ কোনো উত্তর করে না।

আমি। তার পাড়ার কি কোনো ছেলে আছে? বলতে কি পার সে কেন আসেনি? তার কি ব্যায়রাম হয়েছে?

একটি ছেলে। না সার, তার ব্যায়রাম হয়নি।

আমি। তবে কেন আসেনি?

আর একটি ছেলে। সার, সে গুণ্ডা ভাড়া করতে গিয়েছে, আজ ছুটির পর দাঙ্গা হবে।

আমি। কার সঙ্গে?

সে বালক। হিন্দু স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে।

আমি। কেন?

সে বালক। আজ্ঞে, আজ দশটার সময় হিন্দু স্কুলেব একটি ছেলে এসে শাসিয়ে গিয়েছে যে, ছুটির পর তাকে উবিয়ে নে যাবে, নরলোকে খবর পাবে না।

আমি। বটে! আর কোন কোন স্কুলের ছেলে এই দাঙ্গাতে আছে?

সে বালক। আজ্ঞে, এলবার্ট স্কুলের আর ট্রেনিং ইনষ্টিটিউশনের।

আমি তৎক্ষণাৎ আসিয়া হিন্দু স্কুলে ভোলানাথ পাল মহাশয়কে, এলবার্ট স্কুলে কৃষ্ণবিহারী সেনকে, ও ট্রেনিং ইনষ্টিটিউশনে কানাইবাবুকে পত্র লিখিলাম, "এ দাঙ্গা বন্ধ করিতে হইতেছে।" তাঁহারা স্বীয়-স্বীয় স্কুলে ক্লাসে সতর্ক করিয়া দিলেন; দাঙ্গা বীজেই বিনষ্ট হইল, অঙ্কুর হইতে পারিল না।

ভোলানাথবাবু এক দ্বারবান দিয়া তাঁহার স্কুলের সেই ছেলেকে আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। লিখিয়া পাঠাইলেন যে, সে দশটার সময় সিটি স্কুলে গিয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতেছে না। আমি সে ছোকরাকে সত্য কথা বলাইবার জন্য অনেক বুঝাইলাম, কিছুতেই স্বীকার করিল না। তৎপরে তৃতীয় শ্রেণী হইতে চারি পাঁচটি বালক ডাকাইয়া তাহাকে দেখাইলাম। তাহারা তাহার মুখের উপর বলিয়া গেল যে সে দশটার সময় আমাদের স্কুলে আসিয়াছিল। আমি তখন তাহার কান ধরিয়া ঘরের কোণে দাঁড় করাইয়া দিলাম, এবং তাহাকে এক ক্লাস নামাইয়া দিবার জন্য ভোলানাথবাবুকে এবং তাহার পিতার নাম জানিয়া লইয়া তাহার পিতাকে চিঠি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন সে ভ্যা করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, এবং আমার পায়ে ধরিয়া সমুদয় কথা স্বীকার করিল। ইহার পর সে সহজেই নিষ্কৃতি পাইল।

স্কুলের ছেলে গাঁজা খায়। ইহার পর চতুষ্পার্শ্বের স্কুল মহলে আমার প্রতি ছেলেদের

একটা ত্রাস জন্মিয়া গেল। এই ত্রাস হইতে একদিন এক কৌতুককর ঘটনা ঘটিল। একদিন আমি বাড়ি যাইবার জন্য সিটি স্কুল হইতে বাহির হইয়াছি, দেখিলাম কয়েকজন বালক আমাকে দেখিয়াই গোলদিঘীর ভিতরকার গাছের ঝোপের আড়ালে গিয়া লুকাইল। তাহারা ওরূপ না লুকাইলে বোধ হয় আমি লক্ষ্যই করিতাম না। কিন্তু লুকাইবার চেষ্টা করাতেই আমার চক্ষে পড়িয়া গেল। আমি দিঘীর ধারে গিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা তাহাদিগকে নিকটে ডাকিলাম। তাহারা ভয়ে জড়সড় হইয়া আমার নিকট আসিল।

আমি। তোমরা কোন স্কুলের ছেলে?

তাহারা। আজ্ঞে, এলবার্ট স্কুলের, হিন্দু স্কুলের, হেয়ার স্কুলের।

আমি। তোমরা এমন সময় স্কুলে না থেকে এখানে আছ কেন?

তাহারা। আজ্ঞে, পরের ঘণ্টাতে ক্লাসে যাব।

আমি। তোমাদের মধ্যে আমাদের সিটি স্কুলের কেউ আছে?

তাহারা। আজ্ঞে, আছে।

আমি। কে? ডাক দেখি।

তাহারা। তারা ঐ বাজারে গাঁজা খেতে গেছে; ধরে দেব, মশাই?

আমি। কই, চল দেখি।

তখন তাহারা যেন বাঁচিল, আমার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় পাইল। আমাকে সঙ্গে করিয়া মাধব দত্তের বাজারে গেল। আমি এক গেটে রহিলাম, দুই দুই ছেলে অন্য গেটে দাঁড়াইল। আর দুইজন বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই সিটি স্কুলের একজন ছেলেকে পাক্‌ড়িয়া আনিল।

গ্রেপ্তারকারীগণ। দেখুন সার, পকেটে গাঁজা ছিল, ফেলে দিয়েছে।।

আমি সত্য সত্যই দেখিলাম, পকেটের কাপড়টা উলটাইয়া রহিয়াছে।

আমি। সত্যি করে বল, গাঁজা ছিল কি না, এবং গাঁজা খেয়েছ কি না?

বালক। না সার, আমি গাঁজা খাই না।

আমি (অপর বালকগণের প্রতি)। চল তো গাঁজার দোকানে যাই, দেখি গাঁজা কিনেছে কি না।

তৎপরে দলে-বলে সেই বালককে বন্দী করিয়া গাঁজার দোকানের দিকে চলিলাম। আমাদিগকে এই ভাবে চলিতে দেখিয়া পাহারাওয়ালাও আমাদের সঙ্গে চলিল। ভালোই হইল, গাঁজার দোকানদারকে ভয় দেখাইবার একটা উপায় হইল।

আমরা গিয়া গাঁজার দোকানের সমক্ষে দাঁড়াইলাম। রাস্তা হইতে আরও লোক জুটিয়া গেল।

আমি (দোকানদারের প্রতি)। এই ছোকরাকে গাঁজা বেচেছ কি না?

দোকানদার (থতমত খাইয়া)। না মশাই, গাঁজা বেচি নাই।

আমি তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম যে সে মিথ্যা কথা বলিতেছে। একটু উগ্র ভাবে—

ঠিক বল। সঙ্গে পাহারাওয়ালা সাক্ষী আছে, স্কুলের ছেলেদের গাঁজা বেচ; আমি পুলিস-সাহেবকে লিখে তোমার লাইসেন্স কেড়ে নেব।

তখন সে ভয়ে সত্য কথা বলিল, তাহাকে গাঁজা বেচিয়াছে। আমি সেই বালককে ধরিয়া সিটি স্কুলে ফিরিয়া আসিলাম। আমি তাহার নাম কাটিয়া দিয়া, কারণ প্রদর্শন পূর্বক তাহার পিতাকে এক পত্র লিখিলাম।

তৎপর দিন তাহার পিতা আসিয়া উপস্থিত। আমার হাতে পায়ে ধরাধরি, "যদি ছেলে ভালো হয়, আপনাদের কাছেই হবে। আমার প্রতি দয়া করে একে রাখতেই হবে।" মীমাংসাটা কি হইয়াছিল, তাহা এখন স্মরণ নাই। তবে সে সময়ে আমি দুষ্ট ছেলে তাড়ানো বিষয়ে ক্ষিপ্রহস্ত ছিলাম।

যদি কোনো শিক্ষকের চক্ষে পূর্বোক্ত বিবরণগুলি পড়ে তবে তাঁহাকে বলি যে, এক শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয় সকলের শিক্ষকদের মধ্যে আত্মীয়তা ও যোগ না থাকিলে, এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রের অভিভাবক এই উভয়ের মধ্যে সাহচর্য না থাকিলে, বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষিত হইতে পারে না। বর্তমান সময়ের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এই দুইটিরই অভাব।

সিটি স্কুল স্থাপিত হইলে ইহার বাড়িটি আমাদিগের সর্ববিধ কার্যের কেন্দ্র-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। ইহার একটি ঘরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আপিস উঠিয়া আসিল। এতদ্ব্যতীত এই ভবনে আমরা কয়েকজন প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ঈশ্বরো-পাসনার জন্য মিলিত হইতে লাগিলাম। তদ্ভিন্ন এই ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশন হইতে লাগিল। সমাজের কাজ দিন-দিন জমিয়া যাইতে লাগিল।

ছাত্র সমাজ স্থাপন। সিটি স্কুলটি জমিয়া বসিলে কয়েক মাস পরেই (১৮৭৯ সালের ২৭শে এপ্রিল) আনন্দমোহনবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া আমার বহু দিনের সঙ্কল্পিত একটি কাজের সূত্রপাত করা গেল; তাহা ছাত্র সমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপন করা। প্রথমে এক সপ্তাহ অন্তর রবিবার প্রাতে সংক্ষিপ্ত উপাসনা পূর্বক নানা বিষয়ে উপদেশ দিবার রীতি প্রবর্তিত হইল। স্কুল কলেজে ধর্মবিহীন শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং আমরা সেই ভাবে বক্তৃতা করিতাম। ঐ সকল বক্তৃতার অধিকাংশ আনন্দমোহনবাবু ও আমি দিতাম। প্রথমে সিটি স্কুল গৃহে ছাত্র সমাজের অধিবেশন হইত। তৎপরে উপাসনা মন্দির নির্মিত হইলে সেখানে উঠিয়া যায়।

পাঁচ প্রকারে ছাত্র সমাজের কার্য চলিল। (১ম) প্রথমে পাক্ষিক, তৎপরে সাপ্তাহিক, উপাসনা ও বক্তৃতা। (২য়) ছাত্রাবাস পরিদর্শন। (৩য়) মধ্যে-মধ্যে সদলে শহরের সন্নিকটস্থ উদ্যানাদিতে গমন। (৪র্থ) মধ্যে-মধ্যে সান্ধ্য সমিতির ব্যবস্থা। (৫ম) পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কণ ও প্রচার।

এই পাঁচ প্রকার কার্য দ্বারা প্রভূত ফল লাভ করা গেল। ছাত্র সমাজের সভ্য সংখ্যা দিন-দিন বাড়িতে লাগিল। এক-একবার দুই শত, আড়াই শত যুবক লইয়া আমরা কোম্পানির বাগানে গিয়াছি। সেখানে উপাসনা ও প্রীতিভোজন প্রভৃতি হইয়াছে। তখন ছাত্র সমাজ ভিন্ন যুবকদিগের ধর্ম ও নীতি শিক্ষার উপযোগী অন্য সভা সমিতি ছিল না; সভ্য সংখ্যা অধিক হইবার সেও একটা কারণ।

যাহা হউক, এই ছাত্র সমাজ দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মহোপকার সাধিত হইয়াছে। ইহা অনেক উৎসাহী যুবককে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে, ইহার সভ্যগণের মনে নীতি ও ধর্মের ভাব দৃঢ় রূপে মুদ্রিত করিয়াছে, এবং হিন্দু ধর্মের নামে পশ্চাদ্গতিশীলতার পুনরুত্থানের তরঙ্গ উঠিলে তাহাকে বাধা দিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। এখানে 'ঈশ্বর অচেতন শক্তি কি সচেতন পুরুষ,' 'প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা,' 'জাতিভেদ,' 'পরকাল,' প্রভৃতি

বিষয়ে যে সকল বক্তৃতা হয়, তাহাতে তৎ তৎ কালে বিশেষ সুফল ফলিয়াছিল, এবং তাহার অনেকগুলি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

পরে একবার ইহার উৎসাহী সভ্যগণের মধ্য হইতে কতকগুলিকে লইয়া একটি ঘননিবিষ্ট মণ্ডলী (ইন্নার সার্কল) করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। আমি তাহাদের সঙ্গে সপ্তাহে একবার বসিতাম এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করিতাম; তদ্দ্বারা অনেক কাজও হইত, নিজেও বিশেষ উপকৃত মনে করিতাম। ছাত্র সমাজ এখনো আছে, কিন্তু আমি পূর্বের ন্যায় ইহার কার্যের প্রধান ভার আর আমার উপর রাখিতে পারি না।

গৃহে নিরাশ্রয়া বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি। এই সময় প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী পুত্র-কন্যাসহ মুঙ্গের হইতে কলিকাতাতে থাকিবার জন্য আসিলেন। ইঁহারা আসিবার পর হইতে ক্রমেই আমাদের গৃহে নিরাশ্রয়া বালিকার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তখন বালিকাদের জন্য বোর্ডিং ছিল না। আমার বন্ধুদের কাহারও-কাহারও কন্যাকে গৃহে স্থান দিতে হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন যে সকল বালিকার কোনো আশ্রয় ছিল না, এরূপ বালিকাও অনেকগুলি আসিয়া জুটিতে লাগিল। প্রসন্নময়ীর সন্তানের ক্ষুধা যেন মিটিত না। তাঁহার নিজের পুত্রকন্যা ছিল, তথাপি কোনো বালিকাকে নিরাশ্রয়া দেখিলে, তাহাকে নিজ ক্রোড়ে না লইয়া যেন স্থির থাকিতে পারিতেন না। এইরূপে অতঃপর আমাদের গৃহে সর্বদাই পাঁচ ছয়টি করিয়া উপরি বালিকা থাকিত। ইহাদিগকে লইয়া আমরা পরম সুখে বাস করিতাম। অনেক সময় আমাদের দুই তিনটির বেশি শয়নঘর থাকিত না। প্রসন্নময়ীর সন্তানদের সঙ্গে দুই একটি, আমার সঙ্গে আমার ঘরে দুই একটি, বিরাজমোহিনীর সঙ্গে তাঁহার ঘরে দুই-চারিটি বালিকা থাকিত, এইরূপে চলিত। প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী এই বৃহৎ পরিবারের জন্য রন্ধন করিতেন ও ইহাদিগকে পালন করিতেন। এই বালিকাদের অধিকাংশ পরে বিবাহিত হইয়া সুখে ঘরকন্না করিতেছেন, কেহ-কেহ বা শিক্ষা লাভ করিয়া নিজে অর্থোপার্জন করিয়া পরোপকার ধর্ম পালন করিতেছেন। সেজন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ।

পশ্চিমে প্রচার যাত্রা। তত্ত্বকৌমুদীর ও ছাত্র সমাজের কার্যের ব্যবস্থা করিয়া এবং প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনীকে কলিকাতায় স্থাপন করিয়া, আমি ১৮৭৯ সালের মে মাসে আবার প্রচারে বহির্গত হই। এবার কমিটি স্থির করিলেন যে, আমি উত্তর-পশ্চিম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, গুজরাট ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি সমগ্র ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিব। আমি তদনুরূপ প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কিন্তু ভারত প্রদক্ষিণের প্রধান আয়োজন যে অর্থ, সেদিকে আমারও দৃষ্টি নাই, সমাজের কর্মচারীগণেরও দৃষ্টি নাই। আমি ভাবিয়া রাখিয়াছি, সমাজ আপিস হইতে টাকা লইব, লইয়া যাত্রা করিব। মনে-মনে স্থির করিয়াছি যে, একেবারে আগ্রায় যাইব, যাইবার সময় বাঁকিপুর বা এলাহাবাদে নামিব না, কারণ পূর্ব বৎসর ঐ সকল স্থানে গিয়াছিলাম। বিশেষত অগ্রেই সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, আমার বন্ধুবর আগ্রা প্রবাসী নবীনচন্দ্র রায় শীঘ্র কর্ম হইতে ছুটি লইয়া সপরিবারে তাঁহার জমিদারী ব্রাহ্মগ্রামে গমন করিবেন। তাঁহারা যাত্রা করিবার পূর্বে তাঁহার সহিত দুইদিন যাপন করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলাম।

টাকা কোথায়! ঈশ্বরের প্রতি আমার কিরূপ নির্ভরের অভাব ছিল, এবং তিনি কিরূপে আমার অভাব পূরণ করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্য এই প্রচার যাত্রার বিশেষ বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আগ্রা যাইব মনে করিয়া যাত্রার দিন সমাজ আপিসে গিয়া টাকা চাহিলাম। আপিসের কর্মচারী একেবারে গাছ হইতে পড়িয়া গেলেন; আমি যে যাইব, আমার যে টাকার প্রয়োজন, সে চিন্তা কাহারও মনে ছিল না! আমি ধর্ম প্রচারার্থ সমুদয় ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিব বলিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে, আমি কবে যাত্রা করিব তাহারও সংবাদ অগ্রে দিয়াছি, অথচ আমার গাড়ি ভাড়ার টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখা হয় নাই, দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলাম। সমাজের কর্মচারী ভায়াকে বলিলাম, "বাক্স হাতড়ে দেখ, কিছু টাকা পাও কি না; আমি আজ রাত্রে যাত্রা করব বলে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক বন্ধুকে লিখেছি, আর দেরি করতে পারব না।" তিনি খুঁজিয়া পাতিয়া আট টাকা কয়েক আনা বাহির করিলেন। আমি রেলওয়ে টাইম টেবিল পরীক্ষা করিয়া দেখি যে, তাহাতে ডুমরাওন পর্যন্ত যাওয়া যায়। কর্মচারী বার-বার দুই দিন অপেক্ষা করিতে বলিলেন, কিন্তু কি জানি কেন আমার মন সেজন্য প্রস্তুত হইল না। আমি অনেকবার দেখিয়াছি, প্রচার যাত্রার জন্য একবার প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে দিন স্থির করিলে তাহা ভাঙা আমার পক্ষে সহজ হয় না, মহা বিঘ্ন ঘটিলেও যাত্রা করিয়া থাকি। এ যাত্রাও আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। বন্ধুদের অনুরোধ, পরিবার-পরিজনের অনুরোধ, কিছুতেই আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। আমি সেইদিনই রাত্রে যাত্রা করিলাম। মনে করিলাম, আমার বন্ধু প্রকাশচন্দ্র রায় বাঁকিপুরে আছেন, তাঁহার ভবনে দুই-একদিন যাপন করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে পাথেয় হিসাবে কিছু ভিক্ষা করিয়া লইব। এই ভাবিয়া বাঁকিপুরের টিকিট লইয়া যাত্রা করিলাম।

পরদিন প্রাতে বাঁকিপুর স্টেশনে অবতরণ করিয়া দেখি যে, প্রকাশচন্দ্র রাজকার্যে স্থানান্তরে যাইবার জন্য স্টেশনেই দণ্ডায়মান। তাড়াতাড়ি বেশি কথা হইল না।

প্রকাশ। সে কি? তুমি যে আসবে, সে সংবাদ তো দেও নাই!

আমি। ভাই, প্রথম আমার এখানে নামবার কথা ছিল না। কাল আসবার সময় স্থির হল, তাই খবর দিতে পারিনি।

প্রকাশ। যাও, আমার বাড়িতে যাও; সেখানে অঘোরকামিনী আছেন, আতিথ্যের ভাবনা নাই। চারদিন অপেক্ষা কোরো, আমি কাজ সেরে আসছি।

এই বলিয়া অপর দিকের ট্রেণে উঠিয়া যাত্রা করিলেন।

আমি গিয়া অঘোরকামিনীর গৃহে অবতীর্ণ হইলাম। অঘোরকামিনীর ভালোবাসা ও আতিথ্যের গুণে তাঁহার বাড়ি যেন আমার তীর্থ স্থানের মতো বোধ হইত। আমি পরম সুখে তাঁহার গৃহে বাস করিতে লাগিলাম। সেখানকার ভদ্রলোকদের সহিত আলাপ করিয়া, তাঁহাদের সাহায্যে একটা বক্তৃতা দেওয়া গেল, এবং অপরাপর কাজও কিছু করা গেল।

উপন্যাস রচনার অবকাশ। কিন্তু প্রকাশচন্দ্রের আর দেখা নাই! আমি এখানে মে মাসের শেষ ভাগ পর্যন্ত সপ্তাহের অধিক কাল যাপন করিলাম। এই কালের মধ্যে একটা কাজ সারা গেল। ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণের নিকট একখানি পারিবারিক উপন্যাস লিখিয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞাটা

এখানে প্রেরণ করিলাম। এই ৮।১০ দিনের মধ্যে 'মেজ বউ' নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়া কলিকাতাতে প্রেরণ করিলাম।

প্রকাশচন্দ্র আর আসিলেন না; আবার বিভ্রাট উপস্থিত, পাথেয়ের টাকা কোথায় পাই? ভাবিলাম, অঘোরকামিনীর হাতে প্রকাশ সংসার চলিবার মতো টাকা দিয়া গিয়াছেন; আমি চাহিলে তিনি না দিয়া থাকিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহার অসুবিধা ঘটিতে পারে। সুতরাং লজ্জাবশত তাঁহাকে নিজের অভাবের কথা জানাইতে পারিলাম না। হাতে যে পয়সা আছে, তাহাতে ডুমরাওন পর্যন্ত যাওয়া চলে। ভাবিলাম, ডুমরাওনে ব্রজেন্দ্রকুমার বসু নামে একজন ব্রাহ্ম বন্ধু আছেন, তাঁহার নিকট টাকা ভিক্ষা করিয়া লইব।

এই ভাবিয়া একদিন প্রাতে অঘোরকামিনীকে বলিলাম, "আজ আমাকে সকাল সকাল খাওয়াইয়া দেও, আমি ডুমরাওন যাইব।" তিনি রন্ধনে প্রবৃত্ত আছেন, আমি বিছানাপত্র বাঁধিতেছি, এমন সময় একটি বাঙালী বাবু আসিলেন। তাঁহার সহিত সেই আমার প্রথম পরিচয়। তাঁহার নাম তিনকড়ি ঘোষ, তাঁহারই নামে বাঁকিপুরে টি. কে. ঘোষেস একাডেমি হইয়াছে। তিনকড়িবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই নাকি এমনি বক্তৃতা করিতে করিতে সমুদয় ভারতবর্ষ বেড়াবেন?"

আমি। আজ্ঞে হাঁ, এইরূপ সংকল্প করেই তো বাহির হয়েছি।

তিনকড়ি বাবু। আমার একটা অনুরোধ আছে, কিন্তু বলতে লজ্জা করছে।

আমি। বলুন না, তার আর লজ্জা কি?

তিনকড়িবাবু। আমার ইচ্ছে, আপনার কাজের জন্য কিছু সাহায্য করি।

আমি। যা দেবেন মনে করেছেন দিন, ও তো ঈশ্বরের দান। এইরূপ দানেই তো আমাদের কাজ চলে।

তিনি তিনটি টাকা দিয়া গেলেন। আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম, এলাহাবাদ পর্যন্ত যাওয়া চলে। তখন ডুমরাওন যাওয়ার পরামর্শ রহিত করিয়া একেবারে এলাহাবাদ যাওয়া স্থির করিলাম। আহার করিতে গিয়া অঘোরকামিনীকে সেই পরামর্শ জানাইলাম।

আহার করিয়া আসিয়া দেখি, আমাকে স্টেশনে লইবার জন্য একাগাড়ি আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে, এবং আর একটি বাবু আমার জন্য বসিয়া আছেন। তিনি কলিকাতা সমাজের প্রাপ্য বলিয়া তিনটি টাকা দিয়া গেলেন। আমি কলিকাতার সমাজ আপিসে সংবাদ দিয়া সে টাকা নিজের পাথেয়ের জন্য ব্যয় করা স্থির করিলাম। আমি স্টেশনে গিয়া এলাহাবাদে নামিবার পরামর্শ ত্যাগ করিয়া একেবারে আগ্রার টিকিট লইলাম।

আগ্রা। আগ্রাতে বন্ধুবর নবীনচন্দ্র রায়ের বাটীতে পেঁছিয়া আমার পকেটে আট আনা পয়সা মাত্র রহিল। আমি গিয়া দেখি, নবীনবাবু ছুটি লইয়া তাঁহার জিনিসপত্রের অধিকাংশ ব্রাহ্মগ্রামে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং পরদিন সস্ত্রীক যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি তাড়াতাড়ি সেখানকার কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোকের সহিত আমার আলাপ পরিচয় করাইয়া দিয়া পরদিনই আগ্রা হইতে যাত্রা করিলেন। আমি সেই তাড়াতাড়ির ও ব্যয় বাহুল্যের মধ্যে আর তাঁহাকে আমার পাথেয়ের অভাবের কথা জানাইতে পারিলাম না।

আগ্রাতে পাঠ ব্যাখ্যা বক্তৃতা প্রভৃতি কিছু-কিছু কাজ হইল। কিন্তু আমার লাহোর

যাইবার উপায় কি? যাঁহাদের ভবনে আছি তাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন; যাঁহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছে, তাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন, নূতন পরিচিত মানুষ; কিরূপে তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা করি? ভিক্ষা করিতে পারিলাম না। অবশেষে মনে করিলাম, টুণ্ডলাতে একজন উপবীতত্যাগী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম আছেন শুনিয়াছি, তাঁহাকে গিয়া খুঁজিয়া বাহির করিব এবং তাঁহার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিব।

টুণ্ডলা। এই স্থির করিয়া সেই আটআনা পয়সা সম্বল করিয়া একদিন বৈকালে টুণ্ডলা স্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি, দুই দিক হইতে দুইখানি ট্রেন আসিয়াছে; লোক উঠা নামা করিতেছে, মহা গোলযোগ। জিনিসপত্র নামাইয়া প্লাটফরমে পাদচারণা করিতে লাগিলাম, এবং ভাবিতে লাগিলাম যে, ট্রেন দুখানা চলিয়া গেলে স্টেশনের বাবুদের নিকট সেই ব্রাহ্ম বন্ধুটির ঠিকানা জানিয়া লইব। এমন সময়ে এক কৃষ্ণকায় যুবা পুরুষ আসিয়া একেবারে আমার পায়ে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। "কে মশাই, কে মশাই, উঠুন, উঠুন" বলিয়া তুলিয়া দেখি, সে আমাদের সোমপ্রকাশ আপিসের এক পুরাতন বিল সরকার; তাহাকে কোনো অপরাধের জন্য আমি কর্মচ্যুত করিয়াছিলাম। জানিতাম না যে সে এখানে রেলওয়ে লোকো আপিসে কর্ম লইয়া আসিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে যেরূপ বিস্মিত হইল, আমিও তদ্রূপ তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

সে। মশাই এখানে যে?

আমি। আমি আগ্রা গিয়েছিলাম, অতঃপর লাহোরে যাব। এখানে অমুক বাবু আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা। তাঁর বাড়ি কোথায় বল তো?

সে ব্যক্তি (হাসিয়া)। মশাই, তিনি তো আর আপনাদের ব্রাহ্ম নাই, তিনি আর এক রকম হয়ে গেছেন।

আমি। বল কি? তা তো আমি জানতাম না!

সে ব্যক্তি। এখন আমার বাসাতে চলুন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হয় পরে করবেন। আমি আপনাদের খেয়ে মানুষ, আমার বাড়িতে পদার্পণ করতেই হবে। আপনি আমাকে তাড়িয়েছিলেন, সে জন্য আমার ক্ষোভ নাই; আমি তার উপযুক্ত কাজ করেছিলাম।

আমি তখন একটা আশ্রয় পাইলেই বাঁচি, সুতরাং তাহার আহ্বানে তাহার কুটীরে গিয়া প্রবেশ করিলাম। তাহার ভবনে আশ্রয় পাইয়া ভাবিতে লাগিলাম, লাহোরে যাইবার ব্যয় কোথা হইতে আসিবে? আমি কলিকাতা হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছিলাম যে, পাথেয়ের জন্য কলিকাতাতে লিখিব না, আপনার ব্যয় আপনি সঙ্কুলান করিয়া লইব; এইরূপে প্রচার কার্য চালাইয়া লইতে হইবে। সেই প্রতিজ্ঞানুসারে মহা অভাবের মধ্যে পড়িয়াও কলিকাতার বন্ধুদিগকে জানাইতেছি না। এইবার কিন্তু সঙ্কট উপস্থিত। সে ব্যক্তি একে ব্রাহ্ম নহে, তাহাতে আবার আমাদের চাকর ছিল এবং আমিই তাহাকে তাড়াইয়াছিলাম। সুতরাং তাহার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করা অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। অথচ আর কেহ নিকটে নাই যাহার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করি। অবশেষে স্থির করিলাম, লাহোরের রেল ভাড়া ঐ ব্যক্তির নিকট ঋণ করিয়া লইব এবং পরে লাহোর হইতে তাহাকে পাঠাইব। ইতস্তত করিতে করিতে দুই দিন কাটিয়া গেল। এই দুইদিন কিন্তু বৃথা যাপন করিলাম না। সে ব্যক্তির দ্বারা সেখানকার স্কুলের হেডমাস্টারের অনুমতি লইয়া

স্কুল ভবনের উঠানে এক বক্তৃতা করা গেল। সে বক্তৃতাতে স্থানীয় বাঙালী ও হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক অনেক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার পরদিন লাহোর যাত্রার কথা। সে সঙ্কল্প তাহাকে জানাইয়াছিলাম। সে ব্যক্তির নিকট টাকা কর্জ করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু লজ্জাতে রাত্রে আহারের পূর্বে চাহি-চাহি করিয়া মুখ ফুটিয়া চাহিতে পারিলাম না। প্রাতে উঠিয়া দেখি, সে আপিসে গিয়াছে, রাঁধুনীকে আমার জন্য রাঁধিতে বলিয়া গিয়াছে। আমি স্নান উপাসনা করিয়া আহারের জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময় সে আসিয়া উপস্থিত। বলিল, "আহার করে নিন, আহার করে নিন, গাড়ির সময় হল।"

এইবার কর্জের প্রস্তাব আসিতেছে।

আমি। হাঁ হে, লাহোরের ভাড়া কত?

সে ব্যক্তি। তা আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি পাছে আমার সাহায্য না নেন, তাই আমি একখানা টিকেট কিনে স্টেশনে রেখে এসেছি।

আমি। সে কি! তুমি এর মধ্যে টিকেট কিনে রেখে এসেছ!

তৎপরে আমি লাহোর যাত্রা করিলাম। পথে ভগবানের কৃপাতে বিশ্বাস ও নির্ভরের অভাবের জন্য আপনাকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এ কি! আমি প্রতিপদে নিজের উপর নির্ভর রাখিয়া ভাবিয়া মরিতেছি, আর প্রতিপদে বিধাতা কোথা হইতে অভাব পূরণ করিতেছেন। তাঁহার কাজ করিবার সময়ও কি তাঁহার উপর নির্ভর রাখিব না? এইরূপে আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে লাহোরে গিয়া পেঁাছিলাম।

লাহোর। শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী। সর্দার দয়াল সিং। ১১ই জুন আমি লাহোরে পেঁাছিয়া সেখানকার বিরাদর্-ই-হিন্দ্ নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক, গবর্ণমেণ্ট কলেজের সার্ভে টীচার, ব্রাহ্ম বন্ধু শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীর ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিলাম। সেখানে তাঁহার পত্নী লীলাবতীর বিমল বন্ধুতাগুণে আপনাকে বড়ই উপকৃত বোধ করিতে লাগিলাম। লাহোরে গিয়াই দেখি, কিছুদিন পূর্বে দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় সেখানে আর্যসমাজ স্থাপন করিয়াছেন, এবং তখনো বেদের অভ্রান্ততা লইয়া মহা তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। আমি অগ্নিহোত্রীর অনুরোধে এ বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিলাম। তদ্ভিন্ন অভ্রান্ত শাস্ত্র মানা যায় না কেন, তাহা প্রদর্শন করিয়া কতকগুলি যুক্তি লিখিয়া দিলাম। অগ্নিহোত্রী ভায়া সেগুলি অনুবাদ করিয়া বিরাদর্-ই-হিন্দে মুদ্রিত করিলেন, এবং হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলকে তাহার উত্তর দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। ইহা লইয়া কয়েক মাস ধরিয়া নানা কাগজে নানা তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল।

আমার লাহোর পরিত্যাগের পূর্বে লালসিং নামক একজন শিখ যুবক আমার সেবক ও সহায় হইয়া আমার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রার্থী হইল। তখন আমি নির্ভর বলে বলী হইয়াছি। আমি বিশেষ প্রার্থনার পর স্থির করিলাম যে লালসিংকে সঙ্গে লইব। সে আমাকে উর্দু শিখাইতে পারিবে, আমি তাহাকে ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষা দিব। যখন তাহাকে সঙ্গে লইব স্থির করিলাম এবং পরদিন প্রাতে সমুদয় বিষয় ঠিক করিব বলিয়া আশা দিলাম, তখন তাহার ব্যয় কোথা হইতে চলিবে মনে সেই চিন্তা হইল না।

মন বলিল, ঠাকুর তাহা দেখিবেন।

লালসিং-এর ঝুলি। কি আশ্চর্য, এই সঙ্কল্প জানাইবার রাত্রে সর্দার দয়াল সিংহের এক পত্র পাইলাম। দয়াল সিং সর্দার লেহনা সিংহের পুত্র। লেহনা সিং মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধীনে পার্বত্য প্রদেশের গবর্ণর ছিলেন, এবং অমৃতসরে আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সর্দার দয়াল সিং তাঁহার একমাত্র পুত্র। তিনি পিতার বিভবের অধিকারী হন এবং যৌবনের প্রারম্ভে ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া উদার ভাবাপন্ন হন। দেশে ফিরিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দেন ও সর্ববিধ দেশ-হিতকর কার্যে উৎসাহী হন। যত দূর স্মরণ হয়, ইহার পূর্বে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। ঐ পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, লালসিং আমার সঙ্গে যাইতেছে বলিয়া তিনি আনন্দিত, এবং তার ব্যয় নির্বাহার্থ তিনি ৫০৲ টাকা পাঠাইতেছেন। আমি লালসিংকে একটি ঝুলি প্রস্তুত করিয়া ঐ টাকা তাহার মধ্যে রাখিতে বলিলাম। বলিয়া দিলাম, "এ ৫০৲ হইতে আমার জন্য পাঁচ পয়সাও ব্যয় করিবে না; ঐ সমগ্র টাকা তোমার জন্য ব্যয় করিবে। তোমার খরচের প্রত্যেক পয়সার হিসাব রাখিবে। আমার ব্যয়ের জন্য যিনি যাহা দিবেন, তাহাও ঐ ঝুলিতে রাখিবে। কাহাকেও আমাদের অভাব জানিতে দিবে না; যিনি যাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দিবেন, ঐ ঝুলিতে দিতে বলিবে।" বেগ্ নট্, বরো নট্, রিফিউজ নট্, (অর্থাৎ ভিক্ষা করিবে না, ঋণ করিবে না, দিলে ফিরাইবে না,) এই তিনটি কথা একখান কাগজে লিখিয়া ঐ ঝুলিতে মারিয়া দিলাম; বলিয়া দিলাম, এই ভাবেই কাজ করিবে।

মুলতান। এই ভাবেই আমরা মুলতান হইয়া সিন্ধু দেশের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এই মুলতান বাস কালের একটি স্মরণীয় ঘটনা আছে। আমরা মুলতানে গিয়া দেখিলাম যে কয়েকটি বাঙালী পরিবার কর্মোপলক্ষে সেখানে বাস করিতেছেন। তদ্ভিন্ন পাঞ্জাবীদিগের মধ্যে কতকগুলি শিক্ষিত লোক একটি ব্রাহ্মসমাজ করিয়াছেন। ঐ সমাজে শিক্ষিত বাঙালীদিগের কেহ কেহ যোগ দিয়া থাকেন। আমরা সেখানে পৌঁছিলে বাঙালী ও পাঞ্জাবী সকলে মহা উৎসাহে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। যত দূর স্মরণ হয়, আমি একজন বাঙালী ভদ্রলোকের গৃহে রহিলাম, লালসিংও তৎসন্নিকটে এক পাঞ্জাবী বন্ধুর গৃহে রহিলেন। বাঙালী বন্ধুটির গৃহে আমার আদরের সীমা পরিসীমা রহিল না। তাঁহার পত্নীই যে কেবল ভগিনীর ন্যায় আমার পরিচর্যায় রত হইলেন তাহা নহে; আহার করিতে গেলেই দেখিতে পাইতাম, অপরাপর বাঙালী বাড়ি হইতেও নানা প্রকার তরকারী ও মিষ্টান্ন আসিয়াছে। সকল বাড়ির মেয়েরা কোমর বাঁধিয়া আমার সেবায় লাগিয়া গেলেন। মহোৎসাহে বক্তৃতা, উপাসনা, আলোচনা প্রভৃতি চলিল।

এদিকে পাঞ্জাবী ও বাঙালী বন্ধুরা লালসিংকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "তোমাদের খরচপত্র কিরূপে চলছে? যাবার খরচ আছে তো?" লালসিং আমার আদেশ অনুসারে বলিতে লাগিলেন, "আমাদের আর্থিক অবস্থা জানাতে নিষেধ। কেহ কিছু দিতে ইচ্ছা করেন, দিতে পারেন।"

পরে যেদিন যাবার দিন আসিল, আমরা স্টেশন অভিমুখে চলিলাম। বন্ধুরা দল বাঁধিয়া আমাদের সঙ্গে চলিলেন। পথে আরও মানুষ জুটিল, একটি মস্ত দল সহ যাইতেছি, এমন সময় পথে হঠাৎ কে আমার পকেটে হাত দিল। আমার প্রথমে মনে হইল, কে যেন আমার পকেট হইতে কি তুলিয়া লইতেছে। "কে পকেটে হাত দিল?" বলিয়া ফিরিয়া দেখি, তিনি একজন শিক্ষিত পাঞ্জাবী বন্ধু। তিনি হাসিয়া বলিলেন,

"ইট ইজ এ ট্রাইফ্‌ল্‌। ইউ নীড নট সী ইট্‌ হিয়ার, ইউ মে সী ইট্‌ ইন্‌ দি ট্রেন।" ট্রেন ছাড়িলে পকেটে হাত দিয়া দেখি, বন্ধুরা কুড়ি টাকার নোট দিয়াছেন। সে নোট দুখানি মাথায় রাখিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া লালসিংহের ঝুলির মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। আমাদের পথের খরচ এইরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা চলিল। আমরা এইরূপে মুলতান, সক্কর, হায়দরাবাদ, করাচি হইয়া স্টীমার যোগে বোম্বাই গেলাম।

হায়দরাবাদের নবলরায়। হায়দরাবাদ বাস কালের একটি স্মরণীয় বিষয় আছে। সেখানে আমি আমাদের ব্রাহ্ম বন্ধু নবলরায় শৌকিরাম আদবানি মহাশয়ের ভবনে অতিথি হইয়াছিলাম। তাঁহার সাধুতা, ধর্মনিষ্ঠা, ও পরোপকার প্রবৃত্তি দেখিয়া অতিশয় উপকৃত হইলাম। তিনি তখন গবর্ণমেণ্টের অধীনে একটি উচ্চকর্মে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা শৌকিরাম তখনো জীবিত আছেন। তিনি আমাকে পুত্রের ন্যায় সমাদরে গ্রহণ করিলেন। আমি তাঁহার ভবনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নবলরায় মহাশয়ের কাজ দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, প্রধানত তাঁহার উৎসাহ ও যত্নে একটি সুন্দর বাগানের মধ্যে একটি সমাজ মন্দির নির্মিত হইয়াছে। তাহাতে সপ্তাহে একদিন বিশেষ উপাসনা হয়। তদ্ভিন্ন সভ্যগণ প্রতিদিন সায়ংকালে সেখানে উপস্থিত হইয়া ভগবানের নাম করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদের সহিত সেই সভা স্থলে গিয়া দেখিতাম, পা টিপিয়া টিপিয়া নির্বাক মৌনী ভাবে সভ্যেরা আসিতেছেন; কেহ ঘরের কোণে, কেহ এক পার্শ্বে, কেহ মাটির উপর এক পার্শ্বে বসিতেছেন; একটি সংগীত ও একটি প্রার্থনার পর আবার সকলে নির্বাক ও মৌনী ভাবে ধীরে ধীরে বাহিরে যাইতেছেন; বাগানের মধ্যে গিয়া তবে পরস্পর কথাবার্তা হইতেছে। নবলরায়ের পরোপকার প্রবৃত্তির চিহ্ন স্বরূপ দেখিলাম, তিনি মধ্যবর্তী শ্রেণীর বালকদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার উৎসাহী ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া শহরের ব্রাহ্ম দল বৃদ্ধি করিতেছেন। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক রবিবার প্রাতে সমাজের উপাসনার পর স্থানীয় কারাগারে গিয়া কয়েদীদিগকে সমবেত করিয়া ধর্মোপদেশ দিবার নিয়ম করিয়াছেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই অধিকার চাহিয়া লইয়াছেন। আমি দুই রবিবার তাঁহার সহিত জেলের এই মিটিঙে গিয়াছিলাম। দেখিলাম কয়েদীগণ দলে দলে আসিয়া মাটিতে বসিল। তিনি দাঁড়াইয়া সিন্ধী ভাষায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেন। কি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু দেখিলাম যে কয়েদীদের অনেকের চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতেছে। অনেকে 'উঃ' 'আঃ' প্রভৃতি হৃদয়ের ভাবব্যঞ্জক শব্দ করিতেছে।

কয়েদীর মুক্তি। পরে শুনিলাম, তাঁহার এই সকল উপদেশের ফলস্বরূপ অনেক কয়েদীর হৃদয় পরিবর্তিত হইয়াছে। তাহার প্রমাণ স্বরূপ একদিনের একটি ঘটনার কথা তিনি বলিলেন। একবার তিনি রাজ কার্যোপলক্ষে মফঃসলে গিয়া একদিন বাড়িতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। পথে বনের মধ্যে সন্ধ্যা হইয়া গেল। কোথায় রাত্রি যাপন করেন, সেই ভাবনায় তিনি অস্থির হইলেন। এমন সময় অদূরে একখানি কুঁড়ে ঘর দেখিতে পাইলেন। তদভিমুখে অগ্রসর হইতে না হইতে একজন মানুষ তাহা হইতে বাহির হইয়া তাঁহার অভিমুখে আসিল এবং বলিল, "আপনার কি স্মরণ হয়, আপনি অমুক মাসে জেলে বক্তৃতা করিতে গিয়া একজন কয়েদীর সঙ্গে

অনেকক্ষণ কথা কহিয়াছিলেন? আমি সেই মানুষ। আপনার উপদেশ আমাকে পাপ পথ হইতে ফিরাইয়াছে। আমি আর কোনো খারাপ কাজ করি না। আমার ঘরে আসিয়া দেখুন, আমি স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিতেছি। তাহারা সকলেই আপনাকে ধন্যবাদ করে। আজ রাত্রে আপনাকে ঘরে স্থান দিয়া ও আপনার সেবা করিয়া আমরা কৃতার্থ হইব।" নবলরায় বলিলেন, সে রাত্রি তিনি যেরূপ সুখে বাস করিয়াছিলেন, জীবনে এরূপ অল্প রাত্রিই যাপন করিয়াছেন। বলিতে কি, নবলরায়ের গুণে হায়দরাবাদ আমার নিকট তীর্থ স্থানের ন্যায় হইয়া গেল।

বোম্বাই। ২৯শে আগষ্ট ১৮৭৯ আমরা স্টীমারে বোম্বাই পঁহুছিলাম। বোম্বাইয়ে বি. এম. ওয়াগ্‌লে, নারায়ণ পরমানন্দ, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, মিষ্টার কুণ্টে, তেলাঙ্গ, প্রভৃতি মহাত্মাগণের সহিত পরিচিত হইয়া আপনাকে বড়ই উপকৃত বোধ করিতে লাগিলাম। বিশেষত পরমানন্দ মহাশয়ের অকৃত্রিম বিনয় ও বিমল সাধুতা চিরদিন আমার স্মৃতিতে রহিয়াছে। নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকার তখন কলেজের ছাত্র, কিন্তু তখনই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি তখনই 'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজের সম্পাদকতা করিতেছেন। তিনি এ যাত্রা আমার কার্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

আহমদাবাদে কবি সারাভাই। আমি লালসিংকে বোম্বাই নগরে রাখিয়া গুজরাটে গমন করি। সুরাট হইয়া ১৪ই সেপ্টেম্বর আহমদাবাদে যাই। আহমদাবাদে গিয়া আমি সুপ্রসিদ্ধ ভোলানাথ সারাভাই মহাশয়ের ভবনে অতিথি হই। এমন নির্মল সাধুতা, এরূপ অকপট ঈশ্বরভক্তি, আমি অল্প মানুষেই দেখিয়াছি। তাঁহার সহবাসে কয়েক-দিন থাকিয়া বড়ই উপকৃত হইয়াছি। ভোলানাথ সারাভাই সুকবি ছিলেন, তিনি ভজন সঙ্গীত রচনা করিয়া গুজরাটী সঙ্গীতে অমৃত ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভজনাবলী এখনো ঘরে ঘরে গীত হইতেছে। আহমদাবাদ হইতে ২৬শে সেপ্টেম্বর বড়োদায় গমন করি। সার টি. মাধব রাও তখন বড়োদাতে প্রধান মন্ত্রী রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আমাকে রাজঅতিথি রূপে গ্রহণ করেন, এবং আমাকে বিধিমতে সম্মানিত করেন।

গুজরাট প্রদেশ হইতে ফিরিয়া বোম্বাই নগরে আসিয়া আমি কলিকাতার বন্ধুদের টেলিগ্রাম পাইলাম যে, অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিতে হইবে। আমি ও লালসিং জব্বলপুর হইয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম। এলাহাবাদ পোঁছিলে লালসিং টেলিগ্রাম পাইলেন যে, তাঁহার জননী গুরুতর পীড়িত, তাঁহাকে অবিলম্বে অমৃতসরে যাইতে হইবে। আমাদের বিচ্ছেদের দিন আসিল। এতদিনের পর আমাদের ঝুলি পরীক্ষা করিয়া দেখি, আমার কলিকাতা পোঁছিবার ও লালসিংহের অমৃতসর পোঁছিবার মতো টাকা হইয়া দুই টাকা বেশি আছে। সে দুই টাকা আমার সঙ্গেই রহিল। আশ্চর্যের বিষয় এই, কলিকাতা পোঁছিতে, কি-কি কারণে স্মরণ নাই, সে দুই টাকাও গেল। কি আশ্চর্য ভগবানের কৃপা! করুণাময় ঈশ্বর অনেকবার এইরূপে আমাকে দিয়া প্রচার কার্য করাইয়াছেন। ধন্য তাঁহার করুণা!

রাণাডে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ। বাঙালী ও মহারাষ্ট্রীয় পদস্থ লোকের প্রভেদ। এই প্রচার যাত্রা কালের কয়েকটি ঘটনা স্মরণ আছে। প্রথম, যেদিন স্বর্গীয় রাণাডে

মহাশয়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেদিন একটা স্মরণীয় দিন। সেইদিন প্রাতে চন্দাবরকার আসিয়া আমাকে বলিলেন, "আমাদের বোম্বাই প্রেসিডেন্সির শিক্ষিত দলের নেতা মিস্টার রাণাডে মহাশয় গত রাত্রে তাঁহার কর্মস্থান হইতে বোম্বাই আসিয়াছেন। অমুক স্থানে আছেন, চলুন তাঁহার সহিত দেখা করাইয়া দিই।" আমি তৎক্ষণাৎ বাহির হইলাম। পথে ভাবিতে-ভাবিতে চলিলাম যে, বোম্বাইয়ের শিক্ষিত দলের নেতা ও গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্মচারীর সহিত দেখা করিতেছি, না জানি গিয়া কিরূপ দেখিব! চন্দাবরকার পথে আমাকে তাঁহার গুণকীর্তি অনেক বলিতে লাগিলেন। আমি সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলাম। গিয়া দেখি, বাহিরের ঘরের মেজেতে জাজিমের উপর একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। তাঁহার গায়ে একটি সামান্য বেনিয়ান, মাথায় একটি নাইট ক্যাপ, যেরূপ ক্যাপ আমরা কলিকাতায় রাজপথের সামান্য লোককে পরিতে দেখিয়াছি। সম্মুখে একটি তাকিয়ার উপরে একখানি সংবাদপত্র, তাহাই তিনি পড়িতেছেন। চন্দাবরকার আমাকে লইয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। তিনি আমাকে নমস্কার করিয়া বসিতে বলিলেন। তাহার পর প্রত্যেক কথায় এমন কিছু শুনিতে লাগিলাম ও শিখিতে লাগিলাম, যাহা তৎপূর্বে শিক্ষিত মানুষদের মুখেও শুনি নাই। উঠিয়া আসিবার সময় তাঁহার সামান্য বেশ ও সবিনয় ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, শিক্ষিত বাঙালী পদস্থ লোক ও বোম্বাইয়ের পদস্থ লোকে কত প্রভেদ! বাঙালী পদস্থ লোকেরা হাব-ভাব পোশাক-পরিচ্ছদে বড়লোক হইয়া পড়েন এবং অনেক ব্যয় করেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ভদ্র ও পদস্থ লোকেরা পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি তত দৃষ্টি রাখেন না। ইহা একটি চিন্তা করিবার মতো কথা।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ হইতেছে যে, আমি পরে একবার প্রচারে গিয়া (১৮৮৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর হইতে কয়েক দিন) পুণা নগরে এই মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে মহাশয়ের ভবনে অতিথি হইয়াছিলাম। এখানেই তাহার বর্ণনা করিতেছি। সেবারেও রাণাডে মহাশয়ের দৈনিক জীবন দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি বোধ হয় তখন পুণার স্মল কজ কোর্টের জজ। এরূপ পদস্থ একজন বাঙালী ভদ্রলোক হইলে তাঁহার ভবনে কি বাহ্য বিলাসের প্রাদুর্ভাব দেখিতাম! জুড়ি, গাড়ি, পোশাক, পরিচ্ছদ, দাস-দাসীর ধুম দেখিতাম। কিন্তু রাণাডের ভবনে তাহার কিছুই দেখিলাম না। তিনি কোর্ট হইতে আসিয়াই রাজকীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার মারহাট্টি লালপেড়ে ধুতি, বেনিয়ান ও লালপেড়ে চাদর ও চটি পড়িয়া আমার সহিত বহির্ভ্রমণে বাহির হইতেন। ফিরিয়া আসিয়া একটি কাঠের দোলার উপরে বসিতেন। তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি সংবাদপত্র সকল লইয়া মাটিতেই বসিতেন, বসিয়া এক-একখানি কাগজ লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিতেন। এক-এক প্যারাগ্রাফের দুই পংক্তি পড়িলেই, রাণাডে মহাশয় আর পড়িতে হইবে কি না জানাইতেন; তৎপরে আবশ্যক হইলে আরও পড়া হইত, নতুবা সে প্যারা ত্যাগ করা হইত। পড়িতে পড়িতে কোন কাগজে কি টেলিগ্রাম করিতে বা পত্র লিখিতে হইবে, তাহা মুখে মুখে লেখাইয়া দেওয়া হইত। এইরূপে প্রায় দুইঘণ্টা আড়াইঘণ্টা যাইত, তৎপরে আহারার্থ যাওয়া হইত। প্রাতে রাণাডে গুরুতর বিষয় সকল পাঠ করিতেন ও সে বিষয়ে চিন্তা করিতেন। এইরূপে নিঃশব্দে চিন্তা ও কার্যের স্রোত প্রবাহিত থাকিত, দেখিয়া হৃদয় মনের বিশেষ উপকার হইত।

এইরূপে কয়েকবার আমি রাণাডে মহাশয়ের বাড়িতে অতিথি হইয়া থাকিয়া

দেখিয়াছি, তাঁহার আচার-ব্যবহার পোশাক-পরিচ্ছদ অতি সাধারণ ও আড়ম্বরশূন্য। কেবল তাঁহার নহে, বোম্বাইয়ের অনেক বন্ধুর ঐরূপ আড়ম্বরশূন্য ব্যবহার দেখিয়াছি। কেবল বোম্বাইয়ের নহে, পাঞ্জাব মান্দ্রাজ প্রভৃতি সকল স্থানেই শিক্ষিত ভদ্রলোকদের আচরণ আড়ম্বরহীন দেখা যায়। মান্দ্রাজে রেলে পৌঁছিয়া স্টেশনে অনেকবার দেখিয়াছি, শহরের পদস্থ হিন্দু ভদ্রলোকেরা একজন বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন, পায়ে জুতা নাই। সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোকদিগের পক্ষে চামড়ার জুতা পায়ে দেওয়া তখনকার রীতি ছিল না, এখন কি দাঁড়াইয়াছে জানি না। ফল কথা এই, বাঙালীরা ইংরাজদের সংশ্রবে আসিয়া যেরূপ বাবুগিরি শিখিয়াছেন, অপরাপর প্রদেশের ভদ্রলোকেরা তাহা শেখেন নাই।

ম্যাডাম ব্লাভাটস্কী ও কর্ণেল অল্‌কটের ব্যর্থ চেষ্টা। বোম্বাই বাস কালের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা, থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম ব্লাভাটস্কী ও তাঁহার সহকারী বন্ধু কর্ণেল অল্‌কটের সহিত সম্মিলন। ইঁহারা আমার যাইবার কিছুদিন পূর্বে আসিয়া বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের মত প্রচারের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন। একজন বন্ধু আমাকে ও লালসিংকে লইয়া গিয়া তাঁহাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমাদিগকে পাইয়া তাঁহারা আনন্দিত হইলেন, এবং আমাদিগকে তাঁহাদের দলস্থ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন তাঁহাদের সহিত মহা তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল। আমি তাঁহাদিগকে বলিতাম, "আপনাদের অনেক কথার সহিত আমার মিল আছে, কিন্তু আপনারা ঈশ্বরের যে ভাব ব্যক্ত করেন, তাহার সহিত আমার মিল নাই। আপনাদের ভাব অদ্বৈতবাদের ভাব; আমি ভক্তিধর্মাবলম্বী, আমার ঈশ্বর জীবন্ত শক্তিশালী জ্ঞানময় ও প্রেমময় পুরুষ, তাঁহার সঙ্গে প্রেমযোগেই মানবের পরিত্রাণ।" ইহা লইয়া ম্যাডাম ব্লাভাটস্কী আমাকে অনেক উপহাস বিদ্রূপ করিতেন, আমি তাহার প্রতি কর্ণপাত করিতাম না।

আমি লালসিংকে বোম্বাইয়ে রাখিয়া গুজরাটে গেলে, লালসিং প্রায়ই তাঁহাদের নিকট যাইতেন। আসিয়া শুনিলাম, তাঁহারা লালসিংকে পুত্রের ন্যায় বুকে ধরিয়া লইয়াছিলেন। দেখা করিতে গেলে ধরিয়া রাখিতেন, উঠিতে গেলে উঠিতে দিতেন না, এটা ওটা খাইতে দিতেন। সে শিখের ছেলে, তাহার মাথায় লম্বা চুল ছিল, ম্যাডাম ব্লাভাটস্কীর সঙ্গিনী একজন মেম তাহার চুল আঁচড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া বাঁধিয়া দিতেন। আমি গুজরাট হইতে ফিরিয়া যখন তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া বিদায় লইলাম, এবং লালসিংকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলাম, তখন ম্যাডাম ব্লাভাটস্কী হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদিগকে এত বোঝানো বৃথা হইল।"

সণ্ডে মিরার কাগজে ডিভোশনাল কলাম। বোম্বাই প্রেসিডেন্সি বাস কালের তৃতীয় স্মরণীয় ঘটনা গুজরাটের রাজধানী আহমদাবাদ নগরে ঘটে। তাহা এই। এই সময় কলিকাতায় রবিবাসরীয় মিরারের ডিভোশনাল কলমে ঈশ্বরের উক্তিরূপে নানা কথা প্রকাশিত হইত। উপাসকমণ্ডলী ঈশ্বর চরণে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের আচার্যকে তাঁহারা কি ভাবে দেখিবেন? ঈশ্বর তদুত্তরে, আচার্যকে কি ভাবে দেখিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিলেন, ইত্যাদি। ডিভোশনাল কলমটি কেশববাবুর নিজের বিশেষ উক্তি বলিয়া সকলে জানিত, এবং সেইভাবেই সকলে গ্রহণ করিত।

উক্তিগুলির মধ্যে ভালো বিষয় অনেক থাকিত, যাহা পড়িয়া উপকার বোধ হইত। আবার পড়িয়া হাসি পায়, এরূপ কথাও থাকিত। আমি যখন আহমদাবাদে, তখন ২১শে সেপ্টেম্বরের মিরারে ঈশ্বরের উক্তি রূপে বিরোধী দলের প্রতি এক অপূর্ব গালাগালি প্রকাশিত হইল। আমার স্মৃতিতে যত দূর আছে, তাহার ভাবটা এই প্রকার—দেন দি লর্ড গড রোলড্ ডাউন এ হিল, এ্যান্ড স এ নাম্বার অভ মেন্ সিক্রেটলি ওয়ার্কিং টু আনডারমাইন হিজ কিংডম। দেন দি লর্ড স্পোক : ঈ স্কেপটিকস্, মেটিরিয়ালিস্টস্, ইত্যাদি।

আমি তখন কলিকাতা হইতে দূরে আছি। কলিকাতায় কি ঘটনা ঘটিয়া এই অভিনব তপ্ত আরক-স্রোত বাহির হইয়াছে, তাহা জানিতাম না। সেখানকার একজন বন্ধু এটা আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। প্রথমত আমরা দুজনে খুব হাসিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই হাসির ভাব অন্তর্হিত হইয়া গভীর দুঃখের সঞ্চার হইল। ঈশ্বরের জবানিতে এরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ বড়ই শোচনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

পশ্চিমে সদলে কেশবচন্দ্র। ইহার পর বোম্বাই হইয়া কলিকাতায় যাত্রা করি। এলাহাবাদ হইতে যখন কলিকাতা আসিতেছি, তখন মধ্যের এক স্টেশনে দেখি, কেশববাবু সদলে দণ্ডায়মান। আমাদের সে ট্রেনে সিমলার কর্মচারীরা নামিয়া আসিতেছিল। গাড়িতে বড় ভিড়, ফিরিঙ্গী ছোঁড়াতে ইণ্টারমীডিয়েট গাড়ি পূর্ণ, তাহারা সারা পথ হাস্য পরিহাস করিতে করিতে আসিতেছে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা এক কামরাতে তিন-চারিজন মাত্র ছিলাম। কেশববাবুরা গাড়ি না পাইয়া প্লাটফরমে ছুটাছুটি করিতেছেন দেখিয়া, আমরা যে কামরাতে ছিলাম তাহাতে উঠিবার জন্য আমি তাঁহাদিগকে ডাকিলাম। কেশববাবু, বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতি আমাদের কামরাতে উঠিলেন; আর উমানাথ গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন পাশের কামরাতে উঠিলেন। উমানাথ-বাবুর হাতে খেরো কাপড়ের খোলের মধ্যে কি একটা ছিল। সেই কামরাতে এক ফিরিঙ্গী যুবক শুইয়া ছিল; উঁহারা প্রবেশ করিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল, হোয়টস্ দ্যাট?

উমানাথবাবু। এ বিউগ্‌ল্।

ফিরিঙ্গী। এ বিউগ্‌ল্! কামিং ফ্রম দি আফগান ওয়ার?

উমানাথবাবু। নো। ফ্রম এ ব্রাহ্মসমাজ এক্সপিডিশান।

তখন আমি বুঝিলাম, তাঁহারা গাজিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে স্যালভেশন আর্মির অনুকরণে যুদ্ধযাত্রা করিয়া আসিতেছেন, কারণ তাহার বিবরণ মিরারে অগ্রেই পড়িয়াছিলাম। আমি সেই ফিরিঙ্গী ছোকরার রসিকতা নিবারণের জন্য একখানা কাগজে লিখিলাম, কেশবচন্দ্র সেন উইথ হিজ ফ্রেণ্ডস; লিখিয়া তাহাকে দেখাইলাম, তাহাতে সে থামিল।

গাড়ি ছাড়িল, বেশ গল্পগাছা হইতে লাগিল, আমরা সুখেই চলিলাম। হঠাৎ বঙ্গচন্দ্র রায় কি আর কেহ ঠিক মনে নাই, রবিবাসরীয় মিরারের সেই গালাগালির উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাহা দেখিয়াছি কি না। আমি অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "কি আশ্চর্য! সেজন্য লজ্জিত না হয়ে আবার হেসে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন! আমাদের প্রতি ওঁর ক্রোধ হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়, এত ফাড়া-ছেঁড়া করা গেছে, ক্রোধ হওয়াই তো স্বাভাবিক। উনি কেন নিজের নামে আমাদিগকে গাল দিলেন না? বুঝতাম, মানুষ মানুষের সঙ্গে কারবার করছে। তা না করে

ঈশ্বরকে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ করা, ও ঈশ্বরের মুখে অপভাষা দেওয়া—এ কি-রকম ব্যবহার? ঈশ্বরে প্রীতি থাকলে মানুষ কি এ রকম পারে?”

এইরূপ বাদানুবাদ হইতে হইতে আমরা বাঁকিপুর পৌঁছিলাম। তাঁহারা সদলে সেখানে নামিয়া গেলেন।

তাঁহারা নামিয়া গেলে আমার দুঃখ হইল যে, সমাজ সম্বন্ধীয় বিবাদের এতদিন পরে কেশববাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, আবার আমি কেন এত উত্তপ্ত হইয়া কথা কহিলাম? যাহা হউক, আমার মনে এই একটা সান্ত্বনা আছে যে, তাঁহার বিরুদ্ধে যাহা বলিবার তাহার অধিকাংশ তাঁহার সম্মুখেই বলিয়াছি।

অক্টোবরের মধ্যভাগে আমি শহরে পৌঁছিয়া সন্ডে মিরারের ঐ গালাগালির মূল কারণ শুনিলাম। ঐ বৎসরের মধ্যভাগে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী সভ্যগণের মধ্যে এক ব্যক্তির নামে কেহ তাঁহাদের নিকট অতি জঘন্য দুশ্চরিত্রতার কুৎসা করে। তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিয়া লন। রবিবাসরীয় মিরারে ঐ ঈশ্বরীয় উক্তি তাহারই ফল।

যে কুৎসাটা ইঁহারা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে, আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম না, নিজে অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। কিন্তু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী আমাদের মধ্যে সত্যানুরাগী, ন্যায়পরায়ণ, ও তেজীয়ান পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন; তিনি কাহাকেও ছাড়িবার লোক ছিলেন না। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বহু অনুসন্ধান করিয়াও ঐ কুৎসার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পান নাই।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা

১৮৮০ সাল হইতেই বোধ হয় আমি ইউনিভার্সিটীর এনট্রান্স ও এল. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতের পরীক্ষক হইতে লাগিলাম। তদবধি বহু বৎসর ধরিয়া পরীক্ষকের কাজ করিয়াছি। প্রথম-প্রথম পরীক্ষকের পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রতি বৎসর ৫০০।৬০০ টাকা পাইতাম। ক্রমে কম হইয়া আসিয়াছে। গড়ে সাড়ে তিনশত টাকা করিয়া ধরিলে আমি এইরূপে আট দশ হাজার টাকা উপার্জন করিয়াছি। তদ্ভিন্ন আমার পুস্তকাদির আয় দ্বারাও কয়েক হাজার টাকা পাইয়াছি। ইহার কিছুই সঞ্চিত রাখি নাই।

অর্থ সঞ্চয় করি নাই। অর্থ সঞ্চয়ের কথা মনে হইলেই মনে হয় যে, যদি সেই পথেই যাইব, তবে বিষয়কর্ম ছাড়িলাম কেন? নাচিতে উঠিয়া ঘোমটা দেওয়া ভালো নয়। দুই পথ আছে—এক বিষয়ীর পথ, অপর ধর্ম প্রচারের পথ। বিষয়ীর পথে যদি যাও, তবে অর্থের উপার্জনের ও সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি রাখ; যদি ধর্ম প্রচারের পথে যাও, তবে অর্থোপার্জন ও সঞ্চয়ের দিকে প্রধান দৃষ্টি রাখিয়ো না, ধর্ম প্রচার ও ধর্মসমাজের সেবার প্রতি প্রধান দৃষ্টি রাখ, ঈশ্বরের কৃপার উপরে নির্ভর কর।

প্রশ্ন এই, এত হাজার টাকা কোথায় গেল? ভালো কাজেই গিয়াছে। সমাজের বন্ধুগণ আমাকে চিরদিন যাহা দিয়া আসিতেছেন, তাহা কোনো দিন আমার ব্যয় নির্বাহের উপযুক্ত হয় নাই। আমার জননীর পীড়ার জন্য অনেকবার কলিকাতায় স্বতন্ত্র বাসা করিয়া তাঁহাকে আনিয়া রাখিতে হইয়াছে। দেশে পর্ণ-কুটীরের পরিবর্তে জনক-জননীর মাথা রাখিবার জন্য পাকা ঘর করিয়া দিয়াছি। তদ্ভিন্ন আমার পূর্বকার দেনা শোধ করিয়াছি। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের যে যে কার্যের ভার প্রধান রূপে আমার উপরে পড়িয়াছে, তৎসংক্রান্ত ঋণশোধের জন্যও অনেক টাকা দিতে হইয়াছে; যথা, সাধনাশ্রম, প্রথম ব্রাহ্ম বালকনিবাস, বাঁকিপুরের রামমোহন রায় সেমিনারি, প্রভৃতি। ধন্য মঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপা! তিনি তাঁহার অনুপযুক্ত ভৃত্যকে চিরদিন পালন করিয়াছেন। আশ্চর্যরূপে আমার আর্থিক অভাব পূর্ণ করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। আমি যখন ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলের হেডমাস্টার ছিলাম, তখন আমার কিছু টাকা চুরি যায়, এবং অপরাপর প্রকারে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ি। তখন বন্ধুবর দুর্গামোহন দাস আমাকে চারি শত টাকা কর্জ দেন, এবং বন্ধুবর আনন্দমোহন বসু ২৫০৲ কি ৩০০৲ টাকা কর্জ দেন। পরে যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়া আমি ইহার প্রচারক দলে প্রবেশ করিতে উন্মুখ হই, তখন দুর্গামোহনবাবু ও আনন্দমোহনবাবুর কাছে প্রথমে গিয়া

বলি, "দেনার টাকার কি হবে? ঋণ থাকিতে আমি কিরূপে চাকুরী ছাড়িয়া প্রচার কার্যে ব্রতী হইব?" তাঁহারা তখন আমার এই চিন্তাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেন। বলেন, "সমাজের জন্য আমাদিগকে কত শত টাকা দিতে হবে, তুমি কি সামান্য ঋণের টাকার কথা বল! ও টাকা আমাদের সমাজে দান।" আমি বলি, "আচ্ছা, আমি যদি কখনো কোনো প্রকারে টাকা উপার্জন করি, এবং আপনাদের ঋণ শোধ করতে পারি, আপনাদের টাকা আপনাদের নিতেই হবে।" তাঁহারা বলেন, "আচ্ছা, তখন দেখা যাবে। এখন তো সমাজের কাজ কর।"

তখন এই কথা থাকে। তদনুসারে এবার পরীক্ষকের বৃত্তি পাইয়াই আমি দুর্গামোহনবাবুকে টাকা লইবার জন্য লোক পাঠাইতে লিখি। তিনি উত্তরে লিখিলেন, গুড্ বয়! কোয়াইট্ ওয়ার্দি অভ ইউ! মেক ওভার দি ফোর হাণ্ড্রেড রুপীজ টু জি. সি. মহলানবীশ এ্যাজ পার্ট অভ মাই কণ্ট্রিবিউশান টু দি মন্দির বিল্ডিং ফাণ্ড।

তিনি বন্ধুকে কর্তব্য করিতে দিলেন, অথচ সমাজের সাহায্য করিলেন।

আনন্দমোহনবাবুর দেনা শোধ দিবার অবসর প্রায় বিশ বৎসর পরে উপস্থিত হইয়াছিল। বিশ বৎসর পরে আমি যখন টাকা দিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিলাম, তখন তিনি লিখিলেন যে, তাঁহার পুরাতন কাগজপত্র নাই এবং ঐ টাকার কথা তাঁহার স্মৃতিতেও নাই। পরে যখন দেখিলেন যে ঋণটা শোধ না দিলে আমার মনটা শান্ত হয় না, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও টাকাটা লইলেন। কিন্তু পরে জানিয়াছি যে, সে-টাকা স্বতন্ত্র করিয়া বাড়ির মেয়েদের হাতে দিয়া এই আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাহা আমার সাহায্যার্থ ব্যয় করিবেন। তাঁহারা এইরূপে শত-শত টাকা আমার সাহায্যার্থ দিয়া আসিতেছেন। তাহা আর কি বলিব! তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধনীয়। আজিও বহু পরিবারের বন্ধুগণ আমার পশ্চাতে সহায় হইয়া রহিয়াছেন। আমি কোনো অভাবে পড়িয়াছি জানিলেই সাহায্যের জন্য তাঁহাদের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত হয়। বলিতে চক্ষে জল আসে, আমাকে কিছুদিন দেখিতে না পাইলেই তাঁহারা অস্থির হইয়া উঠেন, তবে বুঝি কোনো ক্লেশের মধ্যে বাস করিতেছি! অমনি চিঠির উপর চিঠি আসে, বা নিজেরা কেহ আসিয়া উপস্থিত হন।

১৮৮০ সালের মাঘোৎসব। ১৮৮০ সালের মাঘোৎসব অর্ধনির্মিত মন্দিরের উপর চাঁদোয়া দিয়া সমাধা করা হইল। এই উপলক্ষে গোঁসাইজী, বিদ্যারত্ন ভায়া, শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী ও আমি, এই চারিজনকে বিশেষ উপাসনান্তর প্রচারক রূপে বরণ করা হয়।

আনাড়ি অশ্বারোহীর দার্জিলিং যাত্রা। এই বৎসর ১লা বৈশাখ দিবসে, দার্জিলিং পাহাড়ের নব নির্মিত উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে এরূপ স্থির হয়; ও মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য আমি উক্ত স্থলে যাই। তখন উত্তর-বঙ্গে শিলিগুড়ি পর্যন্ত রেল ছিল। শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিং পর্যন্ত রেল পাতা হইয়াছিল, কিন্তু তখনো রেল খোলে নাই। আমি শিলিগুড়িতে গিয়া ডাক্তার আনন্দচন্দ্র রায়ের ভবনে আশ্রয় লইলাম। তখন শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিং পর্যন্ত টোঙ্গা নামক এক প্রকার গাড়ি চলিত। কিন্তু তাহার ভাড়া এত অধিক ছিল যে, আমার দরিদ্র ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের পক্ষে

আমার জন্য তত ব্যয় করা কষ্টকর হইবে বলিয়া অনুভব করিলাম; সে ভার তাঁহাদের উপর দিবার ইচ্ছা হইল না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে পাহাড়ে চড়িবার জন্য ঘোড়া পাওয়া যায়। জীবনে ঘোড়া কখনো চড়ি নাই। বালককালে সমবয়স্ক সঙ্গী বালকদের সঙ্গে জুটিয়া কখনো কখনো ষাঁড় চড়িতাম বটে, এবং একবার পড়িয়া গিয়া ব্যথা পাইয়াছিলাম, ইহা বোধ হয় অগ্রে বলিয়া থাকিব; কিন্তু ঘোড়া চড়া কখনো ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু কি করা যায়? ১লা বৈশাখের পূর্বে দার্জিলিং পঁহুছিতেই হইবে। দেখিলাম, ইউনিটেরিয়ান মিশনারী ড্যাল সাহেব টোঙ্গার জন্য ডাক বাঙ্গলাতে অপেক্ষা করিতেছেন, কারণ তখন টোঙ্গা আবার রোজ চলিত না। আমার পয়সাও ছিল না এবং অপেক্ষা করিবার সময়ও ছিল না, সুতরাং ঘোড়াতেই যাইতে প্রস্তুত হইলাম। একদিন প্রাতে আনন্দবাবু এক পাহাড়ে-ঘোড়া আনাইয়া আমাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া দিলেন। আমি তো হেলিয়া দুলিয়া অগ্রসর হইলাম। 'শুক্না' পার হইতে না হইতে পাহাড়ে উঠিবার সময় সহিস আমাকে বলিল, ঘোড়াটা মাদী ঘোড়া এবং গাভিন। শুনিয়া আমার মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল, আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া সহিসের হাতে লাগাম দিয়া পদব্রজেই পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। যাহাকে পাহাড়ে সর্ট কাট্ (সোজা পথ) বলে, সেই সকল সোজা রাস্তা দিয়া উঠিতে লাগিলাম। তাহাতে পথ সোজা হয় বটে, কিন্তু বড় চড়াই উঠিতে হয়, বুকে পিঠে বেদনা লাগে। কি করা যায়, উপায়ান্তর না দেখিয়া মরিয়া কুটিয়া উঠিতে লাগিলাম। এইরূপে, যে খার্সিয়াঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া আমাদের অপরাহ্ণ দুইটা কি তিনটার সময় পেঁাছিবার কথা, সেখানে রাত্রি ৮টার সময় গিয়া পেঁাছিলাম।

তখন বার্ড কোম্পানী নামে এই পাহাড়ে এক কোম্পানী ছিল। তাঁহারা মালপত্র বাহিয়া দিতেন। প্রিয়নাথ বসু নামে একটি বাবু খার্সিয়াঙ্গে তাঁহাদের কার্যকারক ছিলেন। পূর্বকৃত বন্দোবস্ত অনুসারে আমি গিয়া তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইলাম। তৎপরদিন আমার দার্জিলিং পেঁাছিতেই হইবে। নতুবা শরীর যেরূপ ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহাতে দুই দিন বিশ্রাম করিলে ভালো হইত। প্রিয়নাথবাবু বলিলেন, তিনি পরদিন প্রাতে অশ্বারোহণে দার্জিলিং যাইবেন, আমার জন্যও একটি ঘোড়া আনাইবেন। শুনিয়াই আমার ভয় হইল। তিনি অভয় দিয়া বলিলেন, ভয় নাই, তিনি সঙ্গে থাকিবেন। তৎপরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখি, আমার জন্য গোলগাল এক পাহাড়ে টাট্টু আসিয়াছে, এবং তাঁহার জন্য বার্ড কোম্পানীর আস্তাবলের এক দীর্ঘকায় সুন্দর শ্বেতবর্ণ ঘোড়া সাজিয়া অপেক্ষা করিতেছে। আমার ঘোড়া দেখিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, "প্রিয়বাবু, এ কি করেছেন? এ যে বেশ জোরাল ঘোড়া! আমার জন্য একটা এক পা খোঁড়া ঘোড়া আনিলে ভালো হইত।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "উঠুন, উঠুন, আমি সঙ্গেই আছি।" আমরা তো বাহির হইলাম। আমি আগে, প্রিয়-বাবু পশ্চাতে। ঘোড়াদের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে তাহা অগ্রে জানিতাম না। যেই প্রিয়বাবুর ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা, অমনি আমার ঘোড়া উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িল। আমি কখনো ঘোড়া চড়ি নাই, সুতরাং এরূপ অবস্থাতে কখনো পড়ি নাই। আমি দুই পা দিয়া ঘোড়ার পেট চাপিয়া ধরিয়া, দুই হাত দিয়া তাহার ঘাড়ের ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিলাম। ঘোড়াও বোধ হয় এরূপ অবস্থাতে কখনো পড়ে নাই। সে বোধ হয় মনে করিল, এ কি জন্তু আমার উপরে উঠিল! কারণ সে আরও উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল। প্রিয়নাথবাবু পশ্চাৎ হইতে চেঁচাইতে লাগিলেন, "মশাই, থামুন, থামুন! গেলেন, গেলেন! এখনি খাদের মধ্যে পড়ে যাবেন।" আমি

বলিলাম, "আপনি থামুন, আপনি না থামিলে আমার ঘোড়া থামবে না।" তিনি নিজ অশ্বের বেগ সংবরণ করিলেন, আমি এদিকে প্রাণপণে লাগাম টানিয়া ধরিলাম। ক্রমে আমার ঘোড়ার বেগ মন্দীভূত হইল। এই ভাবে গিয়া দার্জিলিঙে উপস্থিত হইলাম, এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পন্ন করিলাম। আসিবার সময় বোধ হয় টোঙ্গাতে নামিয়াছিলাম।

মতিহারীতে বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ে বিচার। ইহার কিছুকাল পরে, অর্থাৎ ১৮৮০ সালের জুলাই মাসে, আমি মতিহারী সমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করি। সেখানে সকল সম্প্রদায়ে মিলিয়া এক মহা বিচার হয়, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি। ব্যাপারখানা এই। আমি গিয়া এক বন্ধুর বাড়িতে অবস্থিত হইলাম। দুইদিন পরে সেখানকার আর্যসমাজের সম্পাদক আসিয়া আমার সঙ্গে বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ে তর্ক উপস্থিত করিলেন।

আমি। একটা অভ্রান্ত শাস্ত্র এত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন কেন?

সম্পাদক। মানবের ধর্মজীবনের ন্যায় গুরুতর বিষয়ে কি ভ্রান্তিশীল মানব বুদ্ধির উপর নির্ভর করা যায়?

আমি। বেদের অভ্রান্ততা মানিয়াও ভ্রান্তিশীল মানব বুদ্ধির হাত এড়াইতে পারিতেছেন না। বেদের অর্থ সায়ণ এক প্রকার করিয়াছেন, দয়ানন্দ সরস্বতী আর এক প্রকার করিয়াছেন। কে আমাকে বলিয়া দিবে কোন অর্থ ঈশ্বরের অভিপ্রেত অর্থ? এখানেও ভ্রান্তিশীল মানব বুদ্ধিকে বিচারক রূপে দুই ব্যাখ্যাকর্তার উপরে বসাইতে হইতেছে। অভ্রান্ত শাস্ত্র দিলে অভ্রান্ত টীকাকর্তাও দিতে হইবে, নতুবা ভ্রান্তিশীল মানব বুদ্ধির হাত এড়ানো যাইবে না। তৎপরে দেখিয়াছি, দয়ানন্দ এদেশে অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া পূজিত অনেক অংশ বর্জন করিয়াছেন, কতকগুলি শাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, কতকগুলি শাস্ত্র নয় বলিয়া বর্জন করিয়াছেন। ইহা কোন প্রমাণে? তাহাও তো ভ্রান্তিশীল বুদ্ধির বিচারেরই দ্বারা। তবেই, ভ্রান্তিশীল বুদ্ধির হাত হইতে নিস্তার নাই।

বিচারটা এই মূল ভিত্তির উপরেই চলিল। সেদিন সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পরদিন আবার বিচার হইবে এইরূপ কথা রহিল। ইতিমধ্যে শহরে জনরব প্রচার হইল যে, কলিকাতা হইতে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক আসিয়াছে, অভ্রান্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে বিচার চলিতেছে। তৎপরদিন যথাসময়ে পিপ্পীলিকা শ্রেণীর ন্যায় হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকল শ্রেণীর লোক আসিয়া উপস্থিত। বিচার স্থলে মানুষ ধরে না। আবার সেই পূর্ব দিনের তর্ক উঠিল। আমি ছিনা জোঁকের মতো আমার আসল কথাটা ধরিয়া আছি—অভ্রান্ত টীকাকার না দিলে অভ্রান্ত শাস্ত্র দেওয়া বৃথা; ইহা হইতে আর নড়ি না। তাঁহারাও আর ইহার জবাব দিয়া উঠিতে পারেন না, তর্কের ডালপালা বিস্তার করেন মাত্র। খুব তর্ক বাধিয়াছে, এমন সময় এক দল হিন্দু সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা তীর্থ দর্শন করিয়া হিমালয় হইতে বারাণসী অভিমুখে যাইতেছেন। শহরে আসিয়া শুনিয়াছেন, অমুক স্থানে পণ্ডিতে পণ্ডিতে মহা বিচার উপস্থিত; তাই কৌতূহলবশত আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছেন। এই সন্ন্যাসী দলের নেতার নাম ফণীন্দ্র যতি। দেখিলাম, মানুষটি বুদ্ধিমান ও সংস্কৃতজ্ঞ। আমি তাঁহাকে পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তখন তাঁহাতে ও আমাতে বিচার চলিল। এই স্থির হইল যে, আমাদের দলের অপর কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিবেন না; তাঁহাদের দলের

অপর কেহ প্রশ্ন করিলে আমি উত্তর দিব না; প্রশ্ন করিতে হইলে আমার বা তাঁহার দ্বারা করিতে হইবে; একজনের বক্তব্য শেষ না হইলে অপরে কথা কহিবেন না। অতঃপর বিচারটা ধীরে ধীরে চলিল। সেদিনও শেষ হইল না। স্থির হইল যে পরদিন স্কুলের মাঠে সন্ধ্যার সময় বিচার হইবে।

তৎপরদিন আবার সকল সম্প্রদায়ের লোক স্কুলের মাঠে সমবেত হইল। চন্দ্রালোকে ঘাসের উপর বসিয়া বিচার চলিল। এরূপ বিচারে কি কিছু স্থির হয়? উভয় পক্ষের কেহই ছাড়িবার নহে। অবশেষে রাত্রি ১১টার সময় অভ্রান্ত-শাস্ত্র পক্ষীয়েরা 'স্বামীজীকী জয়', 'স্বামীজীকী জয়', করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। তাহাতে আমার দলের কে একজন বলিয়া উঠিলেন, "কুত্তোঁকো ভোঁক্‌নে দেও।" এই কথা স্বামীর দলের লোকের কর্ণগোচর হইবামাত্র তাহারা লাঠি-সোটা লইয়া মারিতে উদ্যত। তখন ফণীন্দ্র যতি ও আমি মাঝখানে পড়িয়া থামাইয়া দিলাম। ইহার পর দুই-এক-দিনে ফণীন্দ্র যতির সহিত আমার আলাপ ও আত্মীয়তা জন্মিল। আমি কখনো কাশীতে গেলে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির সম্পূর্ণ করা। মতিহারী হইতে কলিকাতা ফিরিবার কয়েক মাসের মধ্যেই আমার প্রতি এক মহা কাজের ভার পড়িয়া গেল। সেটি অর্ধ-নির্মিত উপাসনা মন্দিরটিকে সম্পূর্ণ করিবার উপায় বিধান করা। ১৮৭৯ সালের প্রারম্ভে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তখন আনন্দমোহন বসুর শ্বশুর ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় ছুটিতে ছিলেন। তিনি দয়া করিয়া ঐ মন্দির নির্মাণ কার্যের ভার লইতে চাহিলেন। রুড়কি হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার নীলমণি মিত্র বিনা ব্যয়ে প্ল্যান প্রভৃতি করিয়া দিয়া বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। নির্মাণ কার্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

১৮৮০ সালের মাঘোৎসব অর্ধনির্মিত মন্দিরের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছিল। তখন আশা করা গিয়াছিল যে, ১৮৮১ সালের মাঘোৎসব সমাধাপ্রাপ্ত মন্দিরের মধ্যেই হইবে। কিন্তু ১৮৮০ সালের আগস্ট মাসে দেখা গেল যে অবশিষ্ট কয়েক মাসের মধ্যে অবশিষ্ট কার্য শেষ হওয়া কঠিন। ভগবানবাবুর উদ্ভাবনী শক্তি বড় প্রবল ছিল। তাঁহার মাথাতে অনেক পরামর্শ আসিত। এজন্য নানা কাজের সৃষ্টি করিয়া তিনি অনেকবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মন্দিরের নির্মাণ কার্য হাতে লইয়া তিনি ভাবিলেন যে, নেপাল তরাই হইতে শাল কাঠ আনাইলে সস্তা হইতে পারে। তদনুসারে নেপাল তরাইয়ে শাল কাঠের অর্ডার দিয়াছিলেন। সে কাঠ কয়েক মাস ধরিয়া নানা নদ নদী দিয়া ভাসিয়া আসিবে, কাজেই বিলম্ব হইতে লাগিল। অবশেষে কাঠ যখন আসিল, তখন তাহার অনেক কাঠ কম মজবুত বোধ হইল। কি করা যায়, কি করা যায়, করিতে করিতে দিন যাইতে লাগিল। ওদিকে ভগবানবাবু স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইলেন।

তখন কমিটি অনন্যোপায় হইয়া গুরুচরণ মহলানবিশ ও আমার প্রতি মাঘোৎ-সবের পূর্বে মন্দির নির্মাণ কার্য শেষ করিবার ভার দিলেন। আমি এরূপ কার্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কি করিতে হইবে বুদ্ধিতেই আসে না, মহা চিন্তায় পড়িয়া গেলাম। অবশেষে রাত্রে শয়ন করিয়া ভাবিতে ভাবিতে এক পরামর্শ মনে পড়িয়া গেল। আমি যখন ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলের হেডমাস্টার ছিলাম, তখন চব্বিশ পরগণার ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার সুপ্রসিদ্ধ রাধিকাপ্রসাদ মুখুয্যে মহাশয়ের

সহিত আমার বন্ধুতা হয়। এই বিপদে তাঁহার শরণাপন্ন হইব বলিয়া স্থির করিলাম। পরদিন প্রাতে স্নান উপাসনা সমাপন করিয়া রাধিকাবাবুর বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার মুখে সমুদয় বিবরণ শুনিয়া এ কাজের ভার লইতে স্বীকৃত হইলেন। তৎক্ষণাৎ টমটম যোতা হইল, আমরা দুইজনে মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তিনি অর্ধ দণ্ডের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া নেপাল-সমাগত কাঠ বাছিয়া, যেগুলি বর্জন করিতে হইবে সেগুলিতে খড়ির দাগ দিলেন। কি প্রণালীতে মন্দিরের অবশিষ্ট কার্য শেষ করিতে হইবে তাহা আমাদিগকে জানাইলেন, লোহার থাম ও কড়ি কোথায় পাওয়া যাইবে তাহা লিখিয়া দিলেন, এবং তৎপরে নিজেই কতকগুলি থামের মাথায় বসাইবার মতো লোহার বাক্সের অর্ডার দিবার জন্য সেই টমটমে চিৎপুরের লোহার কারখানাতে চলিয়া গেলেন। আমাকে তৎপরদিন প্রাতে তাঁহার বাড়িতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন। তৎপরদিন ভবানীপুরে তাঁহার ভবনে গিয়া দেখি, একজন কণ্ট্রাক্টর বসিয়া আছেন, তাঁহাকে তিনি ডাকাইয়া আনিয়াছেন। সেই কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট স্থির হইল। পরদিন লেখাপড়া হইল, অগ্রিম টাকা দেওয়া গেল। দুইদিনের মধ্যে মন্দিরের কাজ আরম্ভ হইল। আমার মাথার বোঝা যেন নামিয়া গেল। মহলানবিশ মহাশয় প্রতিদিন নির্মাণ কার্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। আমি সে দায় হইতে নির্মুক্ত হইয়া অন্য কার্যে মনোনিবেশ করিলাম, এবং মন্দিরের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১৮৮১ সালের ১০ই মাঘ ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেন হইতে নগর কীর্তন করিয়া আসিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করা গেল। সেই একদিন! আমরা গাহিতে গাহিতে আসিয়া দেখি, বৃদ্ধ শিবচন্দ্র দেব মন্দিরের চাবি হস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি ঈশ্বরের শুভাশীর্বাদ ভিক্ষা পূর্বক মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। মহোৎসাহে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য সমাধা করা গেল।

দক্ষিণভারতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা

স্টীমারে মান্দ্রাজ যাত্রা। ১৮৮১ সালের মাঘোৎসব ও মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরেই (ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্য ভাগে) আমি মান্দ্রাজ যাই। আমি স্টীমার যোগে মান্দ্রাজ যাত্রা করি। তখন মান্দ্রাজের অবস্থা কি ছিল, তাহা কতকটা লিখিয়া রাখা ভালো বলিয়া এই প্রচার যাত্রার বিশেষ বিবরণ একটু দিতেছি। জাহাজ মান্দ্রাজ উপকূলে পেঁাছিল। তখন মান্দ্রাজের কৃত্রিম বন্দর প্রস্তুত হয় নাই। জাহাজ তীর হইতে প্রায় ৩।৪ মাইল দূরে দাঁড়াইত। সেখান হইতে বোটে করিয়া তীরে উঠিতে হইত। সে বোটে যাওয়া নূতন মানুষদের পক্ষে বড় ভীতিজনক ব্যাপার ছিল। তরঙ্গের আঘাতে বোটে জলের ছাট লাগিয়া কাপড়-চোপড় ভিজিয়া যাইত। একবার বোট তরঙ্গের মাথায় দশ হাত উপরে উঠিতেছে, আবার তরঙ্গের সঙ্গে দশ হাত নিম্নে নামিয়া জাহাজের লোকের চক্ষের অদর্শন হইয়া যাইতেছে। এইরূপ বোট যাত্রার পর ত্রাহি-ত্রাহি করিতে-করিতে তীরে গিয়া নামিলাম।

ব্রাহ্মণের আহার শূদ্রে দেখিতে পায় না। মান্দ্রাজ সমাজের কতিপয় সভ্য আমাকে লইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাকে লইয়া এক বাড়িতে তুলিলেন। দেখিলাম, তাহার উপরতলা আমার জন্য ভাড়া করিয়া রাখিয়াছেন, এবং সমাজের ব্রাহ্মণ সভ্য বুচিয়া পান্টুলু মহাশয়ের বাড়ি হইতে আমার ভাত আনিয়া দিবার জন্য এক ব্রাহ্মণ বালক নিযুক্ত করিয়াছেন। যথাসময়ে স্নান করিয়া বসিয়া আমি সমাগত ব্রাহ্মগণের সহিত আলাপ করিতেছি, এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ বালক আসিয়া ইংরাজীতে আমাকে আহারের জন্য ডাকিল। আমি আহার করিতে যাইবার সময় সমবেত বন্ধুদিগকে বলিলাম, "চলুন, আমি আহার করিব, আপনারা সেখানে বসিয়া কথা কহিবেন।" তাঁহারা উত্তর করিলেন না, কিন্তু সঙ্গে আসিলেন না। আমি গিয়া আহারে বসিয়া সেই ব্রাহ্মণ বালককে ইংরাজীতে বলিলাম, "উঁহাদিগকে আসিতে বল, আর বসিবার জন্য চেয়ার দাও।" সে আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিভ কাটিয়া বলিল, "ওরা শূদ্র, ওরা কি আপনার খাওয়া দেখতে পারে?" পরে জানিলাম, এই কারণেই তাঁহারা আমার সঙ্গে আসেন নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম, সে দেশে ব্রাহ্মণের আহার শূদ্রের দেখিবার অধিকার নাই। এমন কি 'চেটী' প্রভৃতি কোনো-কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে পিতার আহার পুত্রে দেখিবার অধিকার নাই। ব্রাহ্মণ শূদ্র একসঙ্গে পথে পথিক হইলে ব্রাহ্মণকে কাপড়ের কাণ্ডার খাটাইয়া তন্মধ্যে আহার করিতে হয়।

মান্দ্রাজে বক্তৃতা। ইহার পর আমি মেম্বারদিগের সহিত জাতিভেদের অনিষ্টকারিতা

বিষয়ে কথা কহিতে লাগিলাম, এবং সে বিষয়ে একদিন বক্তৃতাও করিলাম। শহরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এই সময়ে আমি মান্দ্রাজ শহরে 'পাচিয়াপ্পা হল' নামক ভবনে ইংরাজীতে সাধারণভাবে একটি বক্তৃতা করি। তাহার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের বহুব্যয়সাধ্যতার উল্লেখ করিতে গিয়া বলি যে, তাহার এক ফল এই দেখ যে, দি পুওর ম্যানস্ সল্ট ইজ নট ফ্রী ফ্রম ডিউটি। তৎপর দিন ম্যাডরাজ মেইল নামক ইংরাজদের কাগজে দি পুওর ম্যানস্ সল্ট ইজ নট ফ্রী ফ্রম ডিউটি এই শিরোনামা দিয়া এক প্রবন্ধ বাহির হইল। তাহাতে বলা হইল যে, বঙ্গদেশ রাজস্বের সমুচিত অংশ দেয় না বলিয়া অপর প্রদেশের দরিদ্র প্রজাদিগকে করভারে ক্লিষ্ট হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত তাহাতে বাঙালীদিগকে নিন্দা করা হয়। আমি সেই নিন্দা-গুলির উত্তর দিয়া এক পত্র লিখি, এবং হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়কে অপর কথাগুলির উত্তর দিবার জন্য গোপনে পত্র লিখি। তিনি বেঙ্গল, দি মিলচ্ কাউ অভ দি বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট অভ ইণ্ডিয়া বলিয়া এক নজির-পরিপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। এই সকল কারণে সেখানকার শিক্ষিত ও ইংরাজ দলে আমার নাম বাহির হইয়া যায়। তৎপরে পরশুবাকম, মাইলাপুর, প্রভৃতি মান্দ্রাজের অনেক উপনগরে আমাকে বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে থাকে, এবং অনেক স্থলে প্রকাশ্য সভাতে পুষ্পমালার দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া অভিনন্দন করিতে আরম্ভ করে। এই যাত্রাতেই দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও প্রভৃতি বড়লোকদিগের সহিত আমার আলাপ ও আত্মীয়তা হয়।

আমি যখন মান্দ্রাজে কাজ করিতেছি, তখন উত্তর বিভাগে রাজমহেন্দ্রী প্রভৃতি স্থানে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে। রাজমহেন্দ্রীতে বীরেশলিঙ্গম পান্টুলু নামক একজন প্রতিভাশালী লেখক ও সমাজ সংস্কারক দেখা দিয়াছেন, যিনি তেলুগু সাহিত্যের অদ্ভুত পুষ্টিসাধন করিয়াছেন এবং স্বদেশ মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহার উপদেশে অনেকে বিধবাবিবাহ করিয়া সমাজচ্যুত হইয়াছে, তাহা লইয়া মহা আন্দোলন চলিয়াছে। সে সময় রাজ-মহেন্দ্রীর অদূরবর্তী কোকনদা নামক সমুদ্রকূলবর্তী নগরে রামকৃষ্ণিয়া নামক এক ধনী বাস করিতেন। তিনি জাতিতে 'কামটি', অর্থাৎ আমাদের দেশীয় বৈদ্যের ন্যায় ছিলেন। তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষাবলম্বন করিয়া সমাজ সংস্কারক দলের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তিনি বিধবাবিবাহের বৈধতা প্রমাণ করিবার জন্য মধ্যে-মধ্যে পণ্ডিত ও শাস্ত্রীদিগকে সমবেত করিয়া তর্ক উপস্থিত করিতেন। এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল, এমন সময় রামকৃষ্ণিয়া মান্দ্রাজের সংবাদপত্রে আমার সংবাদ পাইলেন। তৎপরে কোকনদাতে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম আসিতে লাগিল।

কোকনদা। অবশেষে আমি কোকনদা যাত্রা করিলাম। বন্দরে পৌঁছিয়া দেখি, আমাকে লইবার জন্য রামকৃষ্ণিয়ার গাড়ি আসিয়াছে। আমি গিয়া তাঁহার বাড়িতে উপনীত হইলাম। আমার সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ নাই দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। আমি বলিলাম, "আমি গরীব প্রচারক, আমি কি সঙ্গে রাঁধুনী লইয়া বেড়াইতে পারি? আমি যেখানেই যাই, তাঁদের সঙ্গে খাই। আমি জাতি মানি না।" শুনিয়া রামকৃষ্ণিয়ার মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি বোধ হয় মনে মনে ভাবিলেন, কি সর্বনেশে লোক এনে ফেললাম! যাহা হউক, তাঁহার সৌজন্য ও আতিথ্যের কিছুই ত্রুটি হইল না;

তিনি আমার থাকিবার জন্য তাঁহার বাস ভবনের অদ্‌রে একটি বাড়ি দিলেন, এবং আমার পরিচর্যা ও অন্নাদি বহনের জন্য একটি ভৃত্য নিয্‌ক্ত করিয়া দিলেন। দ্‌ইদিন যাইতে না যাইতে সেই ক্ষ্‌দ্র শহরে জনরব উঠিল যে, রামকৃষ্ণিয়া বঙ্গদেশ হইতে এক নাস্তিক পণ্ডিত আনিয়াছে, সে দেশের সম্‌দয় বিবাহোপয্‌ক্তা বিধবার বিবাহ দিয়া যাইবে। এই জনরব উঠাতে আমার ম্‌শকিল বোধ হইতে লাগিল; পথে ঘাটে বাহির হইবার যো নাই, বাহির হইলেই দলে দলে লোক পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়; রাস্তায় রাস্তায় জনতা হইয়া লোকে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করে; আমার দাড়ি ও খাট চুল দেখিয়া আমাকে খৃষ্টিয়ান বলিয়া নির্ধারণ করে, এবং তাহা লইয়া মহা তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হয়।

'কাম্‌টি'র ছোঁয়া জলে স্নান করার ফল। একদিন প্রাতঃকালে আমার সঙ্গে বিধবা-বিবাহের বৈধতা বিষয়ে বিচার করিবার জন্য একদল পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সংস্কৃতে কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সংস্কৃতের উচ্চারণ শ্‌নিয়া আমাদের বঙ্গদেশীয় উচ্চারণ প্রণালীর প্রতি ঘৃণা জন্মিতে লাগিল। তৎপ্‌র্বে আমার সংস্কৃতে কথা কহা অভ্যাস ছিল না, স্‌তরাং সংস্কৃতে কথা কহিতে আমার একট্‌ বাধ-বাধ করিতে লাগিল। যাহা হউক, এক প্রকার বিচার চলিল। ইতিমধ্যে এক ঘটনা উপস্থিত। রামকৃষ্ণিয়ার চাকর আমার স্নানের জল আনিতেছে। আমি দেখিলাম, তাহাকে দেখিয়াই সমাগত ব্রাহ্মণেরা পরস্পর ইশারা, গা টেপাটিপি, কানে কানে ফ্‌সফ্‌স করিতে লাগিলেন। তাহার অর্থ আমি কিছ্‌ই ব্‌ঝিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহারা বিচার বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আমি উঠিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখি, তাঁহারা রাজপথে স্থানে স্থানে জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছেন। ভীম রাও নামক একটি ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ও আমার প্রতি অন্‌রক্ত ব্রাহ্মণ য্‌বক তাহার ভিতর হইতে দৌড়িয়া উপরে আসিয়া আমাকে বলিল যে, আমি ব্রাহ্মণ হইয়া 'কাম্‌টি' চাকরের আনীত জলে স্নান করিতেছি দেখিয়া সমবেত ব্রাহ্মণেরা বিরক্ত হইয়াছেন, এবং আমাকে শহর হইতে তাড়াইবার জন্য সদলে রামকৃষ্ণিয়ার নিকট যাইতেছেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, "কাম্‌টির আনীত জলে স্নান করি বলে এত আন্দোলন, আমি তাঁহাদের অন্ন খাই তা ব্‌ঝি তাঁহারা জানেন না!"

ইহার পরে ব্রাহ্মণগণ সদলে রামকৃষ্ণিয়া বেচারার ঘাড়ে গিয়া পড়িলেন, রামকৃষ্ণিয়া আপনাকে বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া মান্দ্রাজ হইতে আনাইয়াছিলেন, স্‌তরাং আমাকে প্রকাশ্যভাবে কোকনদা পরিত্যাগ করিতে বলিতে পারেন না, অথচ ব্রাহ্মণদিগের কোপ শান্তির জন্যও ব্যগ্র হইলেন। তিনি আমার নিকট দেখা করিতে আসা ত্যাগ করিলেন।

আমি মহা ম্‌শকিলে পড়িলাম। তাঁহাকে বিপন্ন করিবার ভয়ে সেখানে আর থাকা উচিত বোধ হইল না। আমি নিরামিষাশী, ফিরিঙ্গীদিগের হোটেলেও যাইতে পারি না; আবার, খাট চুল ও দাড়ির জন্য দেশী হোটেলের লোকেও খৃষ্টিয়ান মনে করিয়া তাহাদের হোটেলে খাইতে দেয় না। কি করা যায়? অবশেষে স্থির করিলাম, রাজ-মহেন্দ্রীতে বিধবাবিবাহের দল কাজ করিতেছেন, তাঁহারাও আমাকে ডাকিয়াছেন, সেখানে যাওয়াই ভালো। কিন্তু সেখানে বোটে করিয়া কাটা খাল দিয়া যাইতে হয়; বোট সপ্তাহে দ্‌ই-একদিন আসে, কবে আসে তাহার স্থিরতা নাই, উন্ম্‌খ হইয়া

বসিয়া থাকিতে হয়। সেরূপেই বা কতদিন বসিয়া থাকি? অবশেষে রামকৃষ্ণিয়ার নিকট লোক পাঠাইলাম, আমাকে পালকি ও বেহারা দাও, আমি রাজমহেন্দ্রী যাই। ত্রিশ মাইল পথ পালকিতে যাওয়া বড় কম ব্যয়সাধ্য নয়; সেই জন্যই বোধ হয় রামকৃষ্ণিয়া তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে ব্রাহ্মণতনয় ভীম রাওকে বলিলাম, "ওহে, তুমি আমার মালপত্রগুলা লইয়া যাইবার জন্য দুইজন কুলি ঠিক কর, আমি হাঁটিয়া রাজমহেন্দ্রী যাই। বোটের জন্য তিন-চারিদিন বসিয়া থাকা ভালো লাগিতেছে না।"

এই প্রস্তাব শুনিয়া ভীম রাও বলিলেন, "কি! আপনি হাঁটিয়া রাজমহেন্দ্রী যাইবেন! তা হইতেই পারে না; আসুন, আমার বাড়িতে আসুন, এ কয়দিন আমার বাড়িতে থাকুন।" আমি বলিলাম, "না, ভীম রাও, তা হবে না; তুমি ব্রাহ্মণ, দেখলে তো, কাম্‌টির জলে স্নান করাতে কি আন্দোলন উপস্থিত! তোমাকে বিপদে পড়তে হবে। বিশেষত তুমি গরীব, সামান্য কেরানীগিরি কর, কোনো রূপে একটি ছোট বাড়ি ভাড়া করে আছ, তার ভিতর আমাকে কোথায় নে যাবে?" ভীম রাও কোনো রূপেই শুনিলেন না। বলিলেন, "আসুন না, সেই ঘরেই সকলে থাকব। আমাকে যা সাজা দিতে চায় দেবে, আমি তা গ্রাহ্য করি না।" এই বলিয়া আমার আপত্তির প্রতি কর্ণপাত না করিয়া মাল বহিবার জন্য কুলি ডাকিয়া আনিলেন; আমাকে লইয়া তাঁহার ভবনে উপস্থিত করিলেন, এবং তথায় লইয়া তাঁহার মাতা ভগিনী ও স্ত্রীর সহিত একঘরে স্থাপন করিলেন। আমি বাহিরের দাবাতে মাদুর পাতিয়া বৈঠক করিলাম।

তৎপরদিন প্রাতে ভীম রাও বলিলেন যে, সম্মুখের রাস্তার অপর পার্শ্বে একটা ছাপাখানা আছে, সন্ধ্যার পর তাহার আপিসে কেউ থাকে না; তাঁহাদিগকে বলিয়া সায়ংকালের জন্য আপিসটা চাহিয়া লইবেন, সেখানে লোকে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে; কারণ অনেকে দেখা করিবার জন্য ব্যগ্র। আমি বলিলাম, "আচ্ছা বেশ, ঠিক কর।" তদনুসারে ভীম রাও ছাপাখানার কর্তাদের নিকট গিয়া দুই-তিন দিন সন্ধ্যাকালের জন্য তাঁহাদের আপিস ঘরটা চাহিলেন। তাঁহারা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তদনুসারে শহরের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে সংবাদ দেওয়া হইল। কিন্তু আমরা সন্ধ্যার সময় বসিতে গিয়া দেখি, প্রেসওয়ালারা প্রেস বাড়িতে তালা দিয়া উধাও হইয়াছেন। পরে শুনিলাম, তাঁহারা প্রাতে স্বীকৃত হইবার পর শহরের ব্রাহ্মণেরা সদলে তাঁহাদের উপর পড়িয়া তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়াছেন। শুনিয়া অনেক হাসিলাম, "বাপ রে বাপ! বৈদ্যের জলে স্নান করার এত সাজা!"

কোকনদা স্কুল গৃহে বক্তৃতা। পরদিন প্রাতে ভীম রাওকে স্থানীয় ইংরাজী স্কুল কমিটির সভাপতি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলাম। বলিলাম, "জেনে এস, তিনি স্কুল গৃহে আমাকে বক্তৃতা করিতে দিবেন কি না, এবং তিনি নিজে সভাপতি হইবেন কি না।" বক্তৃতার বিষয় ছিল, দি ব্রাহ্মোসমাজ, ইটস হিস্ট্রি এ্যান্ড ইটস প্রিনসিপলস্।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অগ্রেই ম্যাডরাস মেইল-এ আমার নাম শুনিয়াছিলেন এবং আমার চিঠি পড়িয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিষয় শুনিতে ব্যগ্র ছিলেন, সুতরাং অনুরোধ করিবামাত্র তিনি স্কুল গৃহ দিতে এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। বক্তৃতার পরে ইংরাজেরা আমাকে ঘেরিয়া ফেলিলেন।

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আমি তাঁহাদের সঙ্গে চা খাইতে প্রস্তুত কি না? আমি বলিলাম, "প্রস্তুত।" তাঁহারা নিমন্ত্রণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু আমি পরদিন বোটে রাজমহেন্দ্রী যাইব বলিয়া নিমন্ত্রণ লইতে পারিলাম না। রামকৃষ্ণিয়া বক্তৃতা স্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, শহরের বড় বড় ইংরাজেরা আমাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছেন ও নিমন্ত্রণ করিতেছেন, তখন ভিড় একটু কমিলে আমার কাছে আসিয়া কানে কানে বলিলেন, "আমার একটা বাগানবাড়ি দিতেছি, সেখানে থাকিবেন চলুন। এরা তো দেখা করিতে আসিবে, ভীম রাওর বাড়িতে কি দেখা হতে পারে?" আমি হাসিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া বলিলাম, "আগামী কল্য বোটে রাজমহেন্দ্রী যাইতেছি।"

রাজমহেন্দ্রী। তৎপরদিন আমি বোটযোগে রাজমহেন্দ্রীতে গেলাম, এবং সেখানে গিয়া বীরেশলিঙ্গমের প্রেমালিঙ্গন পাইয়া ও তাঁহার পত্নীর আতিথ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। বীরেশলিঙ্গমের পত্নী একজন স্মরণীয় ব্যক্তি। একদিকে দৃঢ়চেতা তেজস্বিনী ও কর্তব্যপরায়ণা, অপর দিকে সদয়হৃদয়া ও পরোপকারিণী। তাঁহার মতো স্ত্রী পাইয়াছিলেন বলিয়াই বন্ধুবর বীরেশলিঙ্গম নানা সামাজিক নির্যাতনের মধ্যে কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। সেখানে খুব উৎসাহের সহিত কাজ আরম্ভ হইল।

রাজমহেন্দ্রী হইতে আমি পুনরায় মান্দ্রাজে যাই। সেখানকার ভদ্রলোকেরা এক প্রকাশ্য সভাতে সমবেত হইয়া তাঁহাদের প্রীতির চিহ্নস্বরূপ আমাকে একটি ঘড়ি উপহার দিলেন।

কোইম্বাটুর। এই বারেই আমি কোইম্বাটুর নগরে প্রথম ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে যাই। সে সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা স্মরণ আছে। মান্দ্রাজ সমাজের সম্পাদক রঙ্গনাথম মুদালিয়ার মহাশয় ও আমি একত্রে গমন করি। কোইম্বাটুর সমাজের সভ্যগণ পদনুর স্টেশন পর্যন্ত আগ বাড়াইয়া লইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা রেল গাড়িতে আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কোইম্বাটুরে অবস্থিতি কালে আমাকে জাতি মানিয়া চলিতে হইবে।

আমি। সে কি রকম হবে? আমি তো বহু কাল জাতি মেনে চলি নাই।

তাঁহারা। তা বললে কি হবে? তা না হলে এখানকার সব কাজ মাটি হবে।

আমি। আমরা বস্তুত যা করি ও মানি তা মানুষের জানাই ভালো। আমরা জেতের প্রশ্রয় দিতে পারব না।

তাঁহারা। এ বাঙলাদেশ নয়। এখানে জাত যে না মানে সে খৃষ্টান বলে পরিত্যক্ত হয়। এখানে অনেক খৃষ্টান সম্প্রদায়ও জাত রেখে চলতে বাধ্য হয়েছেন।

(বাস্তবিক তাই। পরে আমি পৈতাধারী খৃষ্টান দেখিয়াছি, এবং অনেক জাতমানা খৃষ্টানের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছে।)

এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে আমরা কোইম্বাটুরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি, তাঁহারা আমাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাড়ি রাখিয়াছেন। আহারের সময় এক ব্রাহ্মণ পাচক আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। খাইতে গিয়া দেখি, কেবল আমার আসন, আমার বন্ধু রঙ্গনাথমের আসন নাই। জিজ্ঞাসা করাতে পাচক বলিল, "তিনি অন্যত্র খাইতেছেন।" কি করি, একাই খাইলাম। আহারের পর তিনি আসিলে শুনিলাম, তাঁহাকে কোথায় একটা অন্ধকার গোয়াল ঘরে লইয়া খাওয়াইয়াছে;

তিনি শূদ্র, তাই তাঁহার এই শাস্তি। শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হইল সমাজের সভ্যেরা বৈকালে আসিলে তাঁহাদিগকে বলিলাম।

আমি। তোমরা কর কি? মান্দ্রাজে আমি ওঁর বাড়িতে আহার করি, ওঁর স্ত্রী আমাকে রাঁধিয়া খাওয়ান, উনি সমাজের সেক্রেটারি, আমার বন্ধু; এখানে ওঁকে খাবার সময় অন্যত্র নিয়ে যাও কেন?

তাঁহারা (হাসিয়া)। এখানে আমরা কর্তা, আমাদের বন্দোবস্ত; আপনি কিছু বলবেন না।

বন্ধু রঙ্গনাথমও বলিলেন, "যেমন চলছে চলতে দিন, গোল করবেন না।"

কাজেই আমি মৌনাবলম্বন করিলাম, কিন্তু মনটা বড় প্রসন্ন রহিল না।

ইহার পর প্রাতে ও সন্ধ্যাতে আমাদের ভবনে সমাজের লোকের ও স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের জনতা হইতে লাগিল। প্রত্যেক সময়েই দেখি, একটি লোক উপস্থিত থাকে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে বিছানাতে বসে না, মাটিতে বসিয়া থাকে। অনুসন্ধানে জানিলাম, সে একজন সমাজের সভ্য। এরূপে বসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সে ব্যক্তি একজন 'পঞ্চমা', অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ চারিবর্ণের বহির্ভূত অস্পৃশ্য লোক। সে সমাজের অনুরাগী সভ্য বটে, কিন্তু অপর সভ্যগণের সহিত একাসনে বসিতে সাহস পায় না। ক্রমে তাহার ইতিবৃত্তাদি তাহার মুখে শুনিলাম। সে পুলিসে কাজ করে, সামান্য বেতন পায়, কোইম্বাটুর শহরের সন্নিকটে এক ক্ষুদ্র কুটীরে সপরিবারে বাস করে।

একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমার বাড়ি কত দূর? আমি তোমার ঘর ও স্ত্রী-পুত্র দেখিতে চাই।"

সে। আপনি রোজ প্রাতে আমার বাড়ির নিকট রাস্তা দিয়া বেড়াইয়া থাকেন।

আমি। বটে? তবে কাল পথে দাঁড়িয়ে থেক, আমি আসবার সময় ডেকে নিয়ো।

সে। আপনি সকালে বেড়িয়ে এসে দুধ খান, আমার বাড়ি গেলে আপনার খাবার বিলম্ব হবে।

আমি। তুমি আমার জন্য একটু দুধ রেখ, আমি খেয়ে আসব, তাহলেই তো হবে।

এ প্রস্তাবে সে আশ্চর্যান্বিত হইল। আমি তখন তাহার কারণ তত অনুভব করিতে পারিলাম না।

এর পরদিন প্রাতে আমি বেড়াইয়া আসিবার সময় তাহার বাড়িতে গেলাম। তাহারা উঠানে একটি মোড়া দিল, তাহাতে বসিলাম। তাহার স্ত্রী-পুত্রকে দেখিলাম, অনেক প্রশ্ন করিলাম, বাঙলাদেশের ও ব্রাহ্মসমাজের কথা অনেক বলিলাম। তাহারা দুধ ও 'আপম্' দিল, আমি খাইলাম।

ফিরিয়া আসিয়া ঘরে বসিতে না বসিতে এই কথা শহরে ছড়াইয়া পড়িল যে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একজন পঞ্চমার ঘরে গিয়া দুধ ও 'আপম্' খাইয়াছেন। সমাজের সভ্যগণ পিল-পিল করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন, "হায় হায়! কি হল, কি হল!" আমি বলিলাম, "খাবার সময় এত কথা মনে হয়নি। আর, সে অনুরোধ করলেই বা কিরূপে অগ্রাহ্য করতাম?"

ইহার পর লোকে জানিল, আমি অন্য লোকের অন্ন খাই। তাহার পর শহরের শূদ্র ভদ্রলোকদের বাড়িতে সদলে আমাদের নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। কয়েকদিন মহা ভোজ চলিল। লোকে জানিয়া লইল যে আমি জাতি মানি না, ইহা জানিয়াও দলে দলে আমার বক্তৃতাদিতে আসিতে লাগিল। সভ্যগণের ভয় ভাবনা দূর হইয়া গেল।

বাঙ্গালোর। এই যাত্রাতে আমি মহীশূর রাজ্যান্তর্গত বাঙ্গালোর শহরেও যাই। সেখানে সেনা দলের মধ্যে এক 'রেজিমেণ্টাল ব্রাহ্মসমাজ' ছিল। এক সুবাদার সেই সমাজের প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন, এবং গোপালস্বামী আয়ার নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক ঐ সমাজের আচার্যের কার্য করিতেন। সমাজের কার্যের জন্য উক্ত সুবাদার একটি বাড়ি দিয়াছিলেন; তাহাতে একটি বালিকা বিদ্যালয় হইত, এবং সমাজের কাজও হইত। আমি গিয়া সেই বাড়িতে থাকিতাম, এবং গোপালস্বামী আয়ারের বাড়িতে আহার করিতাম।

আমার যাওয়াতে বাঙ্গালোরে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমার বক্তৃতা শুনিতে লোকারণ্য হইতে লাগিল। একটি বক্তৃতাতে মহীশূরের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান রঙ্গাচার্লু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

ব্রাহ্মণকন্যা কমলাম্মার প্রেম। বাঙ্গালোর অবস্থিতি কালে এক ঘটনা ঘটিল, যাহা চিরদিন স্মৃতিতে মুদ্রিত রহিয়াছে। একদিন এক স্থানীয় পরিবার তাঁহাদের বাড়িতে গিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে অনুরোধ করিলেন। গিয়া শুনি, গৃহস্বামিনী এক ব্রাহ্মণ কন্যা; তিনি বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে থাকিবার সময় এক শূদ্রের সহিত প্রণয় পাশে বদ্ধ হন, এবং পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তাহার অনুগামিনী হন। সেই অবস্থাতে একটি কন্যা জন্মিয়াছে। আমি যখন দেখিলাম, তখন কন্যাটির বয়স ১৬।১৭ বৎসর হইবে। পিতার মৃত্যু হইলে কন্যাটি স্বীয় মাতার সহিত ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রাচীন সভ্যের তত্ত্বাবধানে থাকে। সেই অবস্থাতে আশ্রয়দাতারা মেয়েটিকে ইংরাজী ও সংস্কৃত শিখাইয়াছেন। আমি মেয়েটিকে উভয় ভাষাতে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। তাহার জননী তাহাকে আমার সঙ্গে কলিকাতায় আনিয়া তাহার বিবাহ দিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তখনো আমাকে অনেক স্থানে যাইতে হইবে বলিয়া আমি তাহা করিতে পারিলাম না।

কয়েক বৎসর পরে বাঙ্গালোরে আবার গিয়া মেয়েটির বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে লোকে বলিল যে, তাহার মা'র মৃত্যু হইয়াছে, এবং মেয়েটি খারাপ হইয়া গিয়াছে। শুনিয়া বড় দুঃখ হইল। মনে করিলাম, কেন মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া আনি নাই, তাহা হইলে তো তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত রাখিতে পারিতাম।

এই সংবাদে তাহার অনুসন্ধান ত্যাগ করিয়া রহিয়াছি, এমন সময়ে একদিন সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত কথোপকথন করিতেছি, তখন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, "একটি ভদ্রলোকের মেয়ে আপনার সহিত দেখা করিতে চাহিতেছে।" পার্শ্বের ঘরে গিয়া দেখি কমলাম্মা অর্থাৎ কমলিনী উপস্থিত। তখন ২২।২৩ বছরের মেয়ে। আমাকে দেখিবামাত্র সে আমার পায়ে কতকগুলি ফুল রাখিয়া আমার পায়ে পড়িয়া প্রণিপাত করিল, এবং আপনার পতি বলিয়া একজন শূদ্র জাতীয় ভদ্রলোককে আমার সহিত পরিচয় করিয়া দিল।

ক্রমে শুনিলাম, তাহার জননীর শেষাবস্থাতে ঐ শূদ্র জাতীয় ভদ্রলোকের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। তাহার মাতার অভিভাবক সেই প্রাচীন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটি সে বিবাহ দিয়াছিলেন। ঐ বিবাহ অতি গোপনে হইয়াছিল বলিয়া লোকে জানে না। এই বিবাহের জন্য তাহার পতিকে স্বীয় সমাজে জাতিচ্যুত হইতে হইয়াছে, ইত্যাদি। শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। এই বিষয়টি নূতন ধরনের বলিয়া স্মরণ আছে। ইহার পরে আর তাহার সঙ্গে দেখা হয় নাই।

আবার মান্দ্রাজ। আমি যে মাসে মান্দ্রাজ ভ্রমণ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় মান্দ্রাজ হইতে ঘন-ঘন টেলিগ্রাম আসিতে লাগিল— আসুন, আসুন, আসিতেই হইবে। ব্যাপারখানা এই। নববিধানের প্রচারক অমৃতলাল বসু মহাশয় তখন মান্দ্রাজ প্রদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া মান্দ্রাজে আসিয়াছিলেন। অমনি আমাদের বুচিয়া পান্টুলু ভায়া ভয় পাইয়া ঘন-ঘন পত্র লিখিতে ও টেলিগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন, তিনি যে কাজ গড়িয়া তুলিতেছিলেন তাহা বুঝি ভাঙিয়া যায়। এরূপ স্থলে যাওয়া উচিত ছিল কি না সন্দেহ। যাহা হউক কমিটি আমাকে পাঠাইলেন। গিয়া কার্য আরম্ভ করিলাম। অমৃতবাবুর সঙ্গে আমার বহু দিনের আত্মীয়তা, সুতরাং বাড়িতে তাঁহার সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশিতাম; কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ চলিল। এই সময়ে আমি 'দি নিউ ডিস্পেনসেশান এ্যান্ড দি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামে ইংরাজী পুস্তক রচনা করি। তাহা মান্দ্রাজ হইতে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।

দ্বিতীয়বার মান্দ্রাজে গেলে মান্দ্রাজবাসী ব্রাহ্ম বন্ধুগণ তাঁহাদের সমাজের সম্পাদক মহাশয়ের বাড়ির সন্নিকটে একটি বাড়ি ভাড়া লইয়া তাহাতে আমাকে স্থাপন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার ভবনে দুই বেলা আহার করিতাম, তাঁহার পত্নী ভগিনীর ন্যায় রন্ধন করিয়া আমার নিকট বসিয়া খাওয়াইতেন। আমি সমস্ত দিন পাঠ চিন্তা ও গ্রন্থ রচনাদিতে যাপন করিতাম, বৈকালে সমুদ্র তীরে ভ্রমণ করিতে যাইতাম।

দুর্ভিক্ষের অনাথ শিশু। একদিন আমি একজন ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি; পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম, একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক একটি অল্পবয়স্ক শিশুকে ভয়ানক প্রহার করিতেছে। শিশুটি অসহায় হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। তাহার চীৎকার শুনিয়া আমি দাঁড়াইয়া গেলাম। মনে করিলাম সে ব্যক্তি শিশুটির পিতা, কোনো অপরাধের জন্য বুঝি শাসন করিতেছে। দাঁড়াইয়া সঙ্গের একজন ব্রাহ্ম বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও কি ওর পিতা? এত মারিতেছে কেন?" তিনি বলিলেন, "ও ব্যক্তি ওর পিতা নয়, ওর কেহই নয়; ওই ছেলেটি পিতৃমাতৃহীন। ওর মাথা রাখিবার স্থান নাই; রাত্রে ভদ্রলোকের বাড়ির দরজায় বারান্দায় পড়িয়া ঘুমায়। পেটের ভাত জোটে না; লোকের বাড়ি ভিক্ষা করিয়া খায়। ঐ মানুষটা ঐ ছেলেটার সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিয়াছিল যে, ছেলেটা শহরের গৃহস্থদের দরজা হইতে কয়লা কুড়াইয়া আনিয়া দিবে। মানুষটা দু-চার-দশ-দিন অন্তর হয়তো একটা পয়সা দিবে। মার খাবার ভয়ে ছেলেটা কয়লা আনে। আজ কয়লা আনে নাই বলিয়া মার খাইতেছে।" অনুসন্ধানে জানিলাম, কয়েক বৎসর পূর্বে মান্দ্রাজ প্রদেশে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তখন বহুসংখ্যক শিশু পিতৃমাতৃহীন হয়। ইহাদের অনেকগুলিকে খৃষ্টিয়ান মিশনারীগণ সংগ্রহ করিয়া আপনাদের অনাথাশ্রমে আশ্রয় দিয়াছেন, কিন্তু বহুসংখ্যক শিশু নিরাশ্রয় অবস্থাতে বাস করিতেছে। আমি অনেকদিন প্রাতে এইরূপ বালকবালিকাদিগকে ভদ্রলোকের দ্বারের সম্মুখস্থ বারান্দাতে পড়িয়া ঘুমাইতে দেখিয়াছি। এই দৃশ্য দেখিয়া ও এই বিবরণ শুনিয়া আমার মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। সেই খারাপ মন লইয়া বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন প্রাতে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ দেখা করিতে আসিলে তাঁহাদিগকে বলিলাম, "হয় এইরূপ পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকার রক্ষা ও শিক্ষার জন্য কিছু করুন, নতুবা সমাজ

মন্দিরে বড়-বড় কথা বলবার ফল কি?" আমার দুঃখ দেখিয়া একজন ব্রাহ্ম বন্ধু সেই প্রাতেই রাস্তা হইতে এইরূপ একটি বালক ডাকিয়া আমার নিকট আনিলেন। সে প্রথমে বাড়িতে প্রবেশ করিতে চায় না। ওরূপ জাতিভ্রষ্ট বালকদের ভদ্রলোকদের বাড়িতে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, এই সংস্কার থাকাতে সে ইতস্তত করিতে লাগিল। অনেক বলাতে বাড়িতে প্রবেশ করিয়া উঠানে আসিল। আমি উপরে আসিবার জন্য কত ডাকিলাম, কোনো মতেই আসিল না। অবশেষে খাইতে দিবার জন্য একখানি আপম্ লইয়া নিচে গেলাম। আমি বলিলাম, "হাত পাত।" হাত পাতিল, কিন্তু আমি যখন আপম্ দিতে গেলাম, তখন পাছে হাতে-হাতে ঠেকাঠেকি হয় এই ভয়ে হাত সরাইয়া লইল। তখন আমি তাহার হাত ধরিয়া হাতে আপম্খানা দিলাম, এবং তাহাকে টানিয়া উপরে লইয়া গেলাম। একটি ছোট ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিলাম, সে ঘরে সে রাত্রে থাকিবে; এবং যে বাড়িতে আমি খাই সে বাড়িতে খাইতে পাইবে। এই বলিয়া চাকরের হাতে তাহাকে দেখিবার ভার দিয়া, বন্ধুর বাড়িতে আহার করিতে গিয়া, তাঁহার পত্নীকে সমুদয় বিবরণ বলিয়া, তাহাকে খাইতে দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি স্বীকৃত হইলেন। ছেলেটি কিছুদিনের মতো আমার কাছে থাকিয়া গেল।

আমি নিশ্চিন্ত আছি যে সে যথা সময়ে আহার পাইতেছে। কিন্তু একদিন প্রাতে কোনো কাজে বাহির হইয়া বাড়িতে ফিরিতে ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইল। আমার আহারের নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আমি আহার করিতে গিয়া দেখি, বাহিরের দরজার সম্মুখে রাস্তার উপরে একখানা পাতে কুকুরের মতো ছেলেটাকে ভাত দেওয়া হইয়াছে, সে বসিয়া আহার করিতেছে। দেখিয়া ভিতরে গেলাম। আহারে বসিয়া বন্ধুর পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার ছেলেটাকে কুকুরের মতো রাস্তায় ভাত দেওয়া হয় কেন?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ওর যে জাত গেছে। ও শ্রেণীর লোক ভদ্রলোকের বাড়িতে প্রবেশ করতে পায় না। ওরা সকলেই তো রাস্তায় খায়।"

তাহার পর তাঁহার সঙ্গে যে কথোপকথন হইল, তাহা এই—

আমি। তুমি কি মনে কর, আমার জাত গেছে কি আছে? তুমি তো জানো, আমি সকল জাতির বাড়িতে খাই। কতদিন তোমাকে বলে গিয়েছি, অমুক ফিরিঙ্গীর বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ আছে, আমার ভাত কোরো না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হয়ে পৈতা ত্যাগ করে এবং যার তার বাড়ি খায়, তার কি জাত থাকে? তবে আমাকে তোমার নিজের ঘরের ভিতর খেতে দাও কেন?

বন্ধুপত্নী (হাসিয়া)। আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনি যা করেন তাই শোভা পায়। আপনি ব্রাহ্মণই আছেন।

আমি। ওটা তোমার ভালোবাসার কথা।

আমার বন্ধুপত্নীর আমার প্রতি এই অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পরিচয় অল্প দিনের মধ্যেই পাইলাম। কয়েকদিন পরে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে আমার নিকট আনিয়া বলিলেন, তাহার গর্ভে সন্তান রক্ষা হয় না, দুইবার নষ্ট হইয়াছে; তাহাকে এমন কিছু ঔষধ দিতে হইবে, যাহাতে সন্তান রক্ষা পায়। আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি তো চিকিৎসক নই! ঔষধ আবার কি দিব?" তিনি বলিলেন, "আপনি ওর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করুন, এবং পদধূলি দিন, তাহলেই ওর সন্তান রক্ষা হবে।" যিনি জাতিভ্রষ্ট ছেলেকে রাস্তায় কুকুরের মতো ভাত দিতেছিলেন, অপর-দিকে তাঁহার এই নিষ্ঠা দেখিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত হইলাম।

এই স্থানে ইহা বক্তব্য যে, সেই ছেলেটা আমাদের এত যত্ন সত্ত্বেও এক সামাজিক উৎসব দিনে আমাদের বাড়ি হইতে পলাইয়া গেল। অনেক খুঁজিয়াও আর পাওয়া গেল না। পরে শুনিলাম, আবার রাস্তায় ঘুরিতেছে। শুনিয়া ভাবিলাম, এই শ্রেণীর বালকবালিকাদের সর্বপ্রধান বিপদ এই যে, নিরাপদে বাস করা ও নিয়মাধীন থাকা তাহাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া যায়। যাহা হউক, এই অনাথ বালকবালিকাদের জন্য উৎকণ্ঠা বৃথা গেল না। মান্দ্রাজের ব্রাহ্ম বন্ধুগণ ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহাদের মন্দিরসংলগ্ন গৃহে শ্রী রাজা রামমোহন রায় র‍্যাগেড্ স্কুল নামে অনাথ শিশুদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করিলেন। তাহা ক্রমে একটি মিডল্ ইংলিশ স্কুল হইয়া দাঁড়াইল।

মান্দ্রাজের দেবদাসী। আর একটি ঘটনাও বোধ হয় সেইবারে কি তৎপর বারে ঘটিয়াছিল, সেটি এই সঙ্গে উল্লেখ করিতেছি। আমি মান্দ্রাজ বাস কালে অনেক ভদ্রলোকের মুখে তাঞ্জোর হইতে সমাগত গায়কদিগের গান বাদ্যের বড় প্রশংসা শুনিতে পাইতাম। ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে বলিয়াছিলাম, তাঞ্জোরের গায়কগণ কোথাও গাহিতে আসিয়াছে শুনিলে আমায় বলিবেন, আমি গিয়া গান শুনিব। তাঁহারা এই কথা লইয়া নিশ্চয় লোকের সঙ্গে বলাবলি করিয়া থাকিবেন; কারণ একদিন একজন মান্দ্রাজী ভদ্রলোক (যিনি সমাজের সভ্য নহেন) আসিয়া আমাকে তাঁহার ভবনে তাঞ্জোরের গায়কদিগের গান শুনিতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

আমি তৎপূর্বে অনেক স্থলে দেখিয়াছিলাম যে ডান্সিং গার্লস নামে এক শ্রেণীর কুলটা স্ত্রীলোক আছে, দেব মন্দিরে পরিচর্যা করা তাহাদের প্রধান কার্য এবং অনেক স্থলে দেবদাসী বলিয়া তাহারা পরিচিত। তাহাদের অবস্থা সাধারণ বেশ্যাদিগের অবস্থা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত। তাহারা অবাধে ভদ্রলোকদের বাড়িতে যাতায়াত করে, বিবাহাদি উৎসবে নৃত্য গীত করে, ভদ্রলোকেরা তাহাদের সঙ্গে মিশিতে লজ্জা বোধ করেন না। এমন পারিবারিক উৎসব হয়ই না, যেখানে এই স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত থাকে না। আমি মান্দ্রাজ প্রদেশে তাহাদের সর্বত্র গতি ও মেশামেশি দেখিয়া লজ্জিত ও দুঃখিত ছিলাম। সুতরাং ভদ্রলোকটি যখন আমায় নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন মনে ভয় হইল পাছে এইরূপ স্ত্রীলোকের ভিতরে গিয়া পড়ি। তাই উপস্থিত একটি ব্রাহ্ম বন্ধুকে গোপনে ডাকিয়া কানে-কানে সেই আশঙ্কা জানাইলাম। তিনি গিয়া ভদ্রলোকটির সহিত কি কথা কহিলেন জানি না, আমাকে আসিয়া বলিলেন যে, ভদ্রলোকটি বলিয়াছেন, আমাকে ডান্সিং গার্লসদের মধ্যে ফেলা হইবে না। তখন আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম, ও সেই দিন অপরাহ্ণে গান শুনিতে গেলাম।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়া দেখি, একটা পাশের ঘরে স্ত্রীলোকদের বসিবার স্থান। সেখানে অনেক ভদ্র স্ত্রীলোক বসিয়া গান শুনিতেছেন। আমি নির্ভয়ে গিয়া আসরের মধ্যে বসিলাম, এবং গীত বাদ্য শুনিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তিন-চারিটি সুসজ্জিত নানা অলঙ্কারে ভূষিত যুবতী মেয়ে সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। গৃহ-স্বামী উঠিয়া সমাদর পূর্বক তাহাদিগকে সেই আসরে আমার পার্শ্বে বসাইলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, তাহারা বুঝি কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে হবে, তাই তাহাদিগকে মেয়েদের সাধারণ ঘরে না বসাইয়া আসরের মধ্যে বসাইল। ভদ্রলোকটি আমাকে কথা দিয়াছিলেন যে ডান্সিং গার্লসদের মাঝে আমায় ফেলিবেন না, সুতরাং আমার মনে সে চিন্তাও আসিল না। কিন্তু আমি চাহিয়া দেখি যে, যে-দুই ব্রাহ্ম

বন্ধু আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাঁহারা পরস্পর চোখোচোখি করিয়া হাসিতেছেন। তখন আমি তাঁহাদিগকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলাম, হু আর দে? তাঁহারা উত্তর করিলেন, দে আর ডান্সিং গার্লস। আমি তখনই সে আসর হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তখন গৃহস্বামী আমার সম্মুখে মাটিতে মাথা দিয়া পড়িয়া গেলেন, এবং আমাকে আসর ত্যাগ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। এই বিষয় লইয়া আসরের মধ্যে একটা আন্দোলন ও কানাকানি হইতে লাগিল। ডান্সিং গার্লস আসিয়াছে বলিয়া চলিয়া যাইতেছি শুনিয়া সমাগত ব্যক্তিগণ হাঁ করিয়া পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকগুলির তো কথাই নাই। তাহারা এরূপ ব্যবহার কখনো কোথাও পায় নাই, সুতরাং হাঁ করিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। আমি অনুনয় বিনয় করিয়া গৃহস্বামীর হাত ছাড়াইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম।

সেই রাত্রেই সেই কথা শহরে ছড়াইয়া পড়িল, "ওরে ভাই, শুনেছিস, ডান্সিং গার্লস এসেছিল বলে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সে স্থান পরিত্যাগ করে গিয়েছেন!" তৎপরদিন আমি বেড়াইতে বাহির হইলেই লোকে গা টেপাটেপি করে, ও আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয়। কোনো কোনো ভদ্রলোক সাক্ষাতে আমার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; বলিতে লাগিলেন, "আপনি একটা সামাজিক ব্যাধির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ভালোই করিয়াছেন। ভদ্রলোকেরা দেখুক সমাজের অবস্থা কি।"

মান্দ্রাজ হইতে আমি বোম্বাই গমন করিলাম, এবং কিছুদিন পরে কলিকাতায় ফিরিলাম।

যদুমণি ঘোষের চিত্তবিকার। মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতা ফিরিবার পর, বোধ হয় ইহার কিছু পরে, একটি ঘটনা ঘটে যাহা উল্লেখযোগ্য। একদিন প্রাতে ৯৩ নম্বর কলেজ ষ্ট্রীটে বসিয়া ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নের বা তত্ত্বকৌমুদীর কপি লিখিতেছি, এমন সময় যদুমণি ঘোষ নামে একজন ব্রাহ্ম বন্ধু আসিয়া উপস্থিত। ইনি উড়িষ্যাজাত বাঙালী ছিলেন, এবং ইঁহাকে আমরা কেশববাবুর বিশেষ অনুগত প্রচারক দলে প্রবেশার্থী শিষ্য বলিয়া জানিতাম।

আমি উঠিয়া অভ্যর্থনা করিতে না করিতে যদুমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই, বিনা স্ট্যাম্পে হ্যাণ্ডনোটে নালিশ চলে কি না?"

আমি। বসুন বসুন, সে কথা পরে হবে।

যদুমণি। পরে বসছি, বলুন না, নালিশ চলে কি না?

আমি। যত দূর জানি, চলে না।

যদুমণি। যাঃ, তবে তো আমার অনেক হাজার টাকা গেল।

আমি। সে কি? কার নামে নালিশ করবেন?

যদুমণি। কেশবচন্দ্র সেনের নামে।

আমি। সে কি! কেশববাবুর নামে নালিশ!

তৎপরে যদুবাবু বলিলেন যে, কেশববাবু কমল কুটীর কিনিবার সময় তাঁহার নিকট কয়েক সহস্র টাকা কর্জ লইয়া একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে স্ট্যাম্প দেন নাই। পরে কথা হইয়াছে যে, কমল কুটীরের উত্তরে মঙ্গলবাড়ি পাড়ায় যদুমণির জন্য একটি বাড়ি নির্মিত হইবে; সেই জমির দাম ও গৃহ নির্মাণের ব্যয়

বাদে যে টাকা প্রাপ্য থাকিবে তাহা যদুমণিকে প্রদত্ত হইবে। এই প্রস্তাবে যদুমণি স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়াছে।

আমি বলিলাম, "বিনা স্ট্যাম্পে হ্যান্ডনোটখানা দেওয়া ভালো হয় নাই। যদি হ্যান্ডনোট দিলেন, তবে স্ট্যাম্প দিয়ে দেওয়াই ভালো ছিল। কিন্তু আপনি এজন্য কেশববাবুর প্রতি সন্দেহ করলেন কেন? হ্যান্ডনোটেরই বা কি প্রয়োজন? তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির অংশ কি নাই? তিনি কি মনে করলে আপনার টাকা দিতে পারেন না? আর আপনি তাঁকে না বলেই বা ছুটে বাহির হলেন কেন?"

দেখিলাম, তাঁহাকে বুঝাইয়া শান্ত করাই দায়। তাঁহার চক্ষু দুটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই মনে হইল, উন্মাদের লক্ষণ। তৎপরে যে ভয়ানক কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আর আমার সন্দেহ রহিল না। তিনি বলিলেন, "গত কল্য বৈকালে ঝি আমার দুধ জ্বাল দিতেছিল, কেশববাবুর গৃহিণী ঝিকে বলিলেন, 'ঝি তুই কাজে যা, আমি দুধ জ্বাল দিচ্ছি।' বলিয়া দুধ জ্বাল দিতে বসিলেন। বলুন, আমার দুধ জ্বাল দিবার জন্য কেশববাবুর স্ত্রীর এত গরজ কেন?"

আমি। এ তো খুব ভালো কথা; এজন্য তো তাঁর প্রতি আপনার কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। আপনি তাঁদের বাড়িতে থাকেন, তাঁরা সন্তানের ন্যায় দেখেন; ঝির অন্য কাজ আছে, তাকে সরিয়ে ঠাকরুণ আপনার দুধ জ্বাল দিতে বসলেন, এ তো মায়ের কাজ করলেন। এর ভিতরে আবার কি আছে? তাঁর ভালোবাসার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ করা উচিত।

যদুমণি। না, আপনি বুঝলেন না! আমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা, তা হলে আর টাকাগুলো দিতে হবে না।

আমি (দুই কানে হাত দিয়া)। ছি, ছি, এমন কথা শুনলেও পাপ হয়। আপনি ঐ সাধ্বী সতী সরলহৃদয়া নারীকে আজও চেনেন নাই।

যদুমণি। আচ্ছা, আমি ভুবনমোহন দাস এটর্নির নিকট চললাম। আইনানুসারে কি করা যায় আমাকে দেখতে হবে।

আমি উঠিয়া হাতে ধরিলাম, "বসুন বসুন, যা করবার আমরা করে দেব, ব্যস্ত হবেন না। স্নান করুন, আহার করুন, শান্ত হোন।"

তিনি আমার অনুরোধ-উপরোধের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া আমার হাত ছাড়াইয়া ভবানীপুর যাত্রা করিলেন।

আমার লেখা পড়িয়া রহিল; আমি তখনই ভুবনমোহন দাসকে লোকের হস্তে এক পত্র পাঠাইলাম, যেন এই উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির কথায় তিনি কর্ণপাত না করেন। ভুবনবাবুকে পত্র লিখিয়াই কমল কুটীরে কেশববাবুর নিকট ছুটিলাম। তাঁহাকে গিয়া সমুদয় বিবরণ বলিলাম।

কেশববাবু। কি আশ্চর্য! ওর মনে মনে এত সন্দেহ হচ্ছে, তার কিছুই তো আমাকে জানতে দেয়নি।

আমি। এই তো আমারই আশ্চর্য মনে হচ্ছে। আপনি হ্যান্ডনোট যদি দিলেন, তাতে স্ট্যাম্প দেওয়া উচিত ছিল। ঐটে তার সন্দেহের কারণ হয়েছে।

কেশববাবু। আরে, ঐ হ্যান্ডনোট কি সে নেয়? কোনো মতে নিতে চায় না; অবশেষে কতটা টাকা নেওয়া গেল তার একটা লিখিত নিদর্শন তার কাছে রাখবার জন্য আমি জোর করে এটা লিখে দিলাম।

তিনি বলিলেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে তাহার টাকা ফেলিয়া দিবেন, এবং পরে

তাহাই দিয়াছিলেন। যদ্মণির জন্য যে বাড়ি নির্মিত হইয়াছিল, তাহা অপরকে দেওয়া হইল।

যদ্মণি টাকা লইয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন। পরিশেষে ইউরোপে গিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ভুবনমোহন দাস মহাশয়ও এটর্নির পত্র না দিয়া, টাকাটা ফেলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া কেশববাবুকে বন্ধুভাবে গোপনে পত্র লিখিয়াছিলেন।

কিন্তু হায়, বলিতে লজ্জা হইতেছে! দলাদলিকে শত ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করিতেছে! ইহা মানব প্রকৃতিকে কিরূপ বিকৃত করে ভাবিয়া দুঃখ হইতেছে! ইহার পরেও কেশববাবুর অনুগত প্রচারকগণ তাঁহাদের সংবাদপত্রাদিতে শ্লেষ করিয়া লিখিলেন যে, বিরোধী দল কি কম করিয়াছেন, আচার্যের নামে নালিশ পর্যন্ত করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এবং ঐ শ্লেষের ভঙ্গীতে বুঝিতে পারা গেল যে, তাঁহাদের অভিপ্রায় যে আমি প্রধানত ঐ কার্যে উদ্যোগী ছিলাম। ঐ শ্লেষোক্তি পাঠ করিয়া আমার চক্ষে জলধারা বহিল, এবং দলাদলির অনিষ্ট ফল মনে বড়ই জাগিয়া উঠিল।

কর্মজীবন

ইহার পরে পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে যে যে বিশেষ কাজ হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিতেছি।

প্রমদাচরণ সেনের নীতিবিদ্যালয়। প্রথম, এই সময়ের মধ্যে বালকবালিকাদিগের জন্য দুইটি রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথমটির প্রধান উদ্যোগকর্তা ছিলেন, 'সখা' সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন। প্রমদা হেয়ার স্কুলে আমার নিকট পড়িত, এবং সে সময় আমি ছাত্রদিগকে লইয়া যে সকল সভা-সমিতি করিতাম তাহাতে উপস্থিত থাকিত। সেই সময় হইতে সে আমাকে পিতার ন্যায় ভালোবাসিত এবং সর্ব বিষয়ে আমার অনুসরণ করিত। ধর্মপুত্র কথাটি যদি কাহারও প্রতি খাটা উচিত হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে প্রমদা আমার ধর্মপুত্র ছিল। ইহার পরে সে ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবিষ্ট হয় এবং আমার বাড়ির ছেলের মতো হয়। সিটি স্কুল স্থাপিত হইলে সে তাহার একজন শিক্ষক হইয়াছিল। সে উদ্যোগী হইয়া অপর কয়েকজন যুবক বন্ধুকে লইয়া সিটি স্কুল ভবনে বালকদিগের জন্য একটি নীতিবিদ্যালয় স্থাপন করে।

সাক্ষাৎভাবে আমার সহিত ঐ নীতিবিদ্যালয়ের যোগ ছিল না, কিন্তু আমি তাহার উৎসাহদাতা ও পরামর্শদাতা ছিলাম। মধ্যে-মধ্যে তাহাতে উপস্থিত থাকিতাম ও উপদেশ দিতাম।

যে নীতিবিদ্যালয়টির সহিত আমার সাক্ষাৎ যোগ ছিল, তাহা ১৮৮৪ সাল হইতে আমাদের উপাসনা মন্দিরে বসিল। ইহার প্রধান উদ্যোগকারিণী ও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, আমাদের কয়েকটি কন্যা। গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের কন্যা সরলা, ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যা লাবণ্যপ্রভা, চন্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী, এবং আমার কন্যা হেমলতা। হেম ইঁহাদের মধ্যে বয়সে সর্বকনিষ্ঠা ছিল। আমি এই নীতি-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকর্তা ও উৎসাহদাতা ছিলাম। এই কন্যাদের সঙ্গে বসিয়া ধর্ম-গ্রন্থাদি পাঠ করিতাম, নীতিবিদ্যালয়ের কার্যাদি বিষয়ে পরামর্শ করিতাম, ইঁহাদের সকল কাজে সঙ্গে থাকিতাম।

শিশু মাসিক পত্রিকা 'মুকুল'-এর জন্ম। কয়েক বৎসর পরে (১৮৯৫ সালে) ইঁহারা বালকবালিকাদিগের জন্য একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তখন আমি তাহার সম্পাদক হইয়া 'মুকুল' নাম দিয়া এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলাম এবং কিছুদিন তাহার সম্পাদকতা করিলাম। ঈশ্বর কৃপায় ঐ নীতিবিদ্যালয়

এখনও আছে, এবং প্রতি রবিবার প্রাতে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে তাহার অধিবেশন হইয়া থাকে।

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার সম্পাদনা। ১৮৮৩ সালে আমাকে আর একটি কাজে হস্তার্পণ করিতে হয়। আমাদের সমাজের ইংরাজী সংবাদপত্র ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নের যে ভাবে জন্ম হইয়াছিল, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। এই কালের মধ্যে তাহাতে দুইটি পরিবর্তন ঘটে। প্রথম, ভুবনমোহন দাস মহাশয় ইহার রাজনীতিক ভাগের সম্পাদকতা ত্যাগ করেন; দ্বিতীয়ত, যে দুই বন্ধু ইহার স্বত্বাধিকারী হইয়া ইহার পরিচালন ভার লইয়াছিলেন, তাঁহারা সে ভার ত্যাগ করেন। তখন সমাজের উহার স্বত্বাধিকারী হওয়া আবশ্যক হয়, এবং আমি প্রস্তাব করি যে, কাগজের নাম পরিবর্তন করিয়া, তাহাকে ধর্মভাবপ্রধান করিয়া, রাজনীতিকে দ্বিতীয় স্থানে রাখিয়া, একখানি কাগজ বাহির করা হউক। তদনুসারে 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' নামে কাগজ বাহির করা হয়, এবং আমি তাহার সম্পাদক হই।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস স্থাপন। ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার প্রথমে অন্যের ছাপাখানাতে ছাপা হইত, তাহাতে অধিক ব্যয় লাগিত এবং প্রেসের সহিত আমার সর্বদা ঝগড়াঝাটি হইত। সেজন্য সমাজের স্বতন্ত্র প্রেস করা আবশ্যক বোধ হইল। কিন্তু সমাজের সভ্যগণ অগ্রে একটি প্রেস করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া আর প্রেস স্থাপন করিতে নারাজ হইলেন। স্বর্গীয় বন্ধু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয় কমিটিতে বার-বার আমার প্রস্তাবে বাধা দিতে লাগিলেন। কিন্তু এই কয় বৎসরে আমার মনের ভাব এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, যেটি আমি সমাজের জন্য অত্যাবশ্যক মনে করিতাম সেটি আমাকে করিতেই হইত। বন্ধুরা যদি বাধা দিতেন তাহা হইলে নিজের শক্তিতে কুলাইলে নিজেই সে কাজ করিতাম, পরে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া সে কাজে লইবার চেষ্টা করিতাম। তদনুসারে নিজে টাকা কর্জ করিয়া 'ব্রাহ্মমিশন প্রেস' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিলাম। ঐ ঋণ পরে প্রেসের টাকা হইতে শোধ করা হইয়াছে।

এই প্রেস স্থাপন বিষয়ে আমাকে অতি কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অক্ষরওয়ালার সহিত অক্ষরের বন্দোবস্ত করা, বাজারে গিয়া প্রেস প্রভৃতি ক্রয় করা, প্রিণ্টার প্রভৃতি নিযুক্ত করা, কাজ চালাইবার উপযুক্ত লোক প্রভৃতি স্থির করা, প্রতিদিন তাহাদের কার্য পরিদর্শন করা, প্রভৃতি সমুদয় কাজ করিতে হইত। ওদিকে এই মুদ্রাযন্ত্র সমাজের সম্পত্তি করাইবার জন্য সমাজের কমিটিতে গাঙ্গুলীপ্রমুখ বন্ধুগণের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতে হইত।

বন্ধুরা কেহ কেহ বলিতেন, "নিজে টাকা ধার করিয়া প্রেস করিয়াছেন, নিজের সম্পত্তি করিয়া রাখুন না? এত ঝগড়া কেন?" আমার মনের ভাব সেরূপ ছিল না। আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সমাজের নিজের একটি মুদ্রাযন্ত্র চাই, যাহা হইতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারোপযোগী পুস্তক পুস্তিকাদি প্রকাশিত হইবে। এই জন্যই ইহার নাম 'ব্রাহ্মমিশন প্রেস' রাখিয়াছিলাম, এবং সমাজের হস্তে ইহাকে অর্পণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম।

কমিটির সভ্যগণকে আমার ভাবাপন্ন করিতে না পারিয়া কয়েক বৎসর প্রেসটি নিজের হাতে রাখিতে হয়, এবং চিন্তার ভার গ্রহণ করিতে হয়। অবশেষ ১৮৮৭ সালে সমাজ ইহা গ্রহণ করেন।

বর্ধমানের গ্রামে দুর্ভোগ। ১৮৮৩ সালের একটি স্মরণীয় বিষয়, বর্ধমানের অন্তর্গত বড়বেলুন নামক গ্রামে প্রচার যাত্রা। এই গ্রামে পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার নামে একজন অনুরাগী ব্রাহ্ম বাস করিতেন। তিনি কয়েকজন বন্ধুকে তাঁহার গ্রামে গিয়া ২৪শে মে তারিখে ব্রহ্মোৎসব করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া যথাসময়ে বড়বেলুনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমরা গিয়া পুণ্যদাপ্রসাদের নির্মিত একটি খড়ের ঘরে আশ্রয় লইলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া আমি একটি যুবককে কি একটা জিনিস ক্রয় করিবার জন্য বাজারে পাঠাইলাম। সে আসিয়া সংবাদ দিল যে দোকানদার আমাদিগকে জিনিসপত্র বিক্রয় করিবে না। আমার কিছু আশ্চর্য বোধ হইল। কারণ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য অনেক বার অনেক নগরে ও গ্রামে গিয়াছি, কিন্তু মানুষের এরূপ ভাব কোথাও দেখি নাই। পুণ্যদাপ্রসাদ আসিয়া বলিলেন, গ্রামের জমিদারবাবু দোকানদারদিগকে কলিকাতা হইতে সমাগত বাবুদের জিনিসপত্র যোগাইতে বারণ করিয়াছেন। পুণ্যদাপ্রসাদ নিজে দরিদ্র, তথাপি তিনি আমাদিগকে প্রয়োজনীয় যাহা কিছু যোগাইতেন; কিন্তু তাঁহার বাড়ির লোক বিরূপ, এবং দোকানীরা তাঁহাকেও কিছু দিবে না।

শুনিয়া আমার বড় হাসি পাইল। বলিলাম, "এস, উপাসনা তো করি, তারপর দেখা যাক কি দাঁড়ায়।" এই বলিয়া স্নানান্তে আমরা উপাসনাতে বসিলাম। উপাসনান্তে উঠিয়া দেখি যে, পাশের ঘরেতে কে আমাদের জন্য জলখাবার, ও রাঁধিবার জন্য চাউল ডাল তরকারি প্রভৃতি, ও ভোজন পাত্রের জন্য বড় বড় পদ্মপাত রাখিয়া গিয়াছে। দেখিয়া তো আমাদের বড় আশ্চর্য বোধ হইল। উত্তমরূপে জলযোগ করিলাম। আমাদের একজন সেই পাশের ঘরেই উনুন কাটিয়া রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। যথাসময়ে উত্তম আহার করা গেল।

বৈকালে আমরা ধর্মালোচনাতে নিযুক্ত আছি, এমন সময় কে আসিয়া সেই পাশের ঘরে আমাদের বৈকালে খাইবার সমুদয় আয়োজন রাখিয়া গিয়াছে। পুণ্যদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে এইরূপে প্রয়োজনীয় বস্তু যোগাইতেছে। তিনি কিছু সন্ধান বলিতে পারিলেন না।

[illegible] করুণা।। পরদিনও এইরূপ চলিল। আমরা ব্রহ্মোৎসব করিলাম; উপাসনা, পাঠ, ধর্মালোচনাদি সকলি চলিল; কিন্তু গ্রামের এক প্রাণী একবার উঁকি মারিল না। তৃতীয় দিবস প্রাতে আমি বলিলাম, "গ্রামের এক প্রাণী তো এল না, চল আজ নগর কীর্তনে বাহির হই।" আমরা ৭টার সময় কীর্তনে বাহির হইলাম; দেখি, মধ্যরাত্রে গ্রাম যেমন নিস্তব্ধ থাকে, তেমনি নিস্তব্ধ। যে পথ দিয়া যাই, সে পথের সকল বাড়ির দ্বার বন্ধ, জন মানবের দেখা নাই। আমি বলিলাম, "আচ্ছা করিয়া কীর্তন কর তো; লোকে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া আছে তাই থাক, ঈশ্বরের দয়ার কথা কানে ঢালিয়া দাও।" খুব উৎসাহে কীর্তন চলিল। পথিমধ্যে এক বীভৎস ব্যাপার উপস্থিত। দেখি, একজন লোক নগ্নদেহ হইয়া তাহার পরিধানের ধুতিখানি মাথায় বাঁধিয়াছে, এবং তাহার হুঁকাটি বাঁশির মতো করিয়া নাচিতে নাচিতে আমাদের দিকে আসিতেছে! আমি বন্ধুদিগকে বলিলাম, "ওদিকে চাহিও না, গেয়ে চলে যাও।" কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি, সে লোকটি লজ্জা পাইয়া কাপড় পরিয়াছে এবং অধোবদনে

একদিকে চলিয়া যাইতেছে। তাহার পর কিয়দ্দূরে অগ্রসর হইলে আর এক বিঘ্ন উপস্থিত হইল। দেখি, এক দল নিম্ন শ্রেণীর লোক মদ খাইয়া, ঢোল প্রভৃতি বাজাইতে বাজাইতে ও চীৎকার করিতে করিতে হুড়মুড় করিয়া আমাদের উপরে আসিয়া পড়িল। আমি সঙ্গীদিগকে বলিলাম, "ওদের যাবার পথ ছেড়ে দাও, তোমাদের গান চলুক, ওদিকে চেয়ে দেখ না।" তাহারা পথ পাইয়া চলিয়া গেল। আমরা আবার অগ্রসর হইলাম। শেষে আমরা একটা চৌরাস্তায় গিয়া উপস্থিত। আমি বলিলাম, "দাঁড়িয়ে খুব কীর্তন কর, দেখি ওরা কত ক্ষণ দ্বার বন্ধ করে থাকে।" কীর্তন খুব জমিয়া গেল। অন্যে না শুনুক, আমাদের কঠিন হৃদয় আর্দ্র হইতে লাগিল। শেষে দেখি, খট করিয়া একটা বাড়ির দরজা খুলিল ও কয়েকজন লোক আসিয়া আমাদের নিকট দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি, আর একটা বাড়ির দরজা খুলিল, আবার কয়েকজন লোক আসিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে দেখিতে দেখিতে বহুসংখ্যক লোক আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন আমি বলিলাম, "আমাকে একটা উঁচু কিছু এনে দেও তো, আমি কিছু বলব।" পূণ্যদা ছুটিয়া গিয়া নিকটস্থ কোনো এক বাড়ি হইতে একটা খালি কেরোসিনের বাক্স আনিয়া দিলেন, আমি তাহার উপরে উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম—তোমরা দ্বার দিয়ে ছিলে কেন? ভগবানের নাম শুনবে না? ভগবানের সঙ্গে কি তোমাদের বিবাদ আছে? তিনি তো সকলের প্রভু, সকলের পরিত্রাতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন জোরে ও সুযুক্তিপূর্ণ ভাষাতে বক্তৃতা অল্পই করিয়াছি। দেখিলাম, তাহাদের অনেকের চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। আমরা মহোৎসাহে কীর্তন করিতে করিতে সমাজ ঘরে আসিলাম। গ্রামবাসীদের অনেকে আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজ মন্দিরে আসিল। তৎপরে জমিদারবাবুদের ভাব বদলাইয়া গেল। তাঁহারা আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। আমরা ঈশ্বরের করুণার জয় গান করিতে করিতে কলিকাতায় ফিরিলাম। পরে শুনিয়াছি যে, জমিদারগণ আমাদের খাওয়া বন্ধ করিতেছেন শুনিয়া গ্রামের নারীগণ দয়া করিয়া গোপনে গোপনে আমাদের খাবার পাঠাইতেছিলেন। সাধে আমি নারীকুলের এত গোঁড়া!

কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ। ১৮৮৪ সালের প্রথম ভাগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন। ইহার কিছুদিন পূর্বে তাঁহার বহুমূত্র রোগ ধরা পড়ে। আমরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মমন্দির হইতে তাড়িত হওয়ার পর তাঁহার কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ভগ্নপ্রায় সমাজকে দণ্ডায়মান করিবার জন্য তাঁহাকে ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হয়। তৎপরে আমাদের শ্লেষ কটূক্তি প্রভৃতিতে তাঁহার মানসিক দুঃখ অতিমাত্রায় বর্ধিত করে। আমরা চলিয়া আসিবার অল্পদিন পরেই তাঁহার ব্রেন ফীভার হইয়া তিনি বহুদিন শয্যাস্থ থাকেন। তৎপরে যদিও অসাধারণ মানসিক বল ও উৎসাহের প্রভাবে উঠিয়া কার্যারম্ভ করেন, তথাপি বার-বার পীড়িত হইতে থাকেন। এই সকল শারীরিক ও মানসিক পীড়ার মধ্যে আবার নববিধানের অভ্যুদয় করিয়া তাহার প্রচার ও পুষ্টি সাধনে দেহমনের সমুদয় শক্তি নিয়োগ করেন। অনুভব করি, এই সকল কারণে তাঁহার বহুমূত্র রোগের সঞ্চার হয়।

প্রথমে তাঁহার নিকটস্থ বন্ধুগণ ঐ রোগের সঞ্চার অনুভব করিতে পারেন নাই। অবশেষে রোগ যখন ধরা পড়িল, তখন সকল সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। নববিধানী বন্ধুগণ স্বীকার করুন আর নাই করুন, আমরাও তাঁহার রোগ

মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। ১৮৮৩ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি বায়ু পরিবর্তনের জন্য সিমলা শৈলে গমন করিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার স্বাস্থ্যের স্থায়ী উপকার হইল না। ঐ সালের অক্টোবর মাসে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। আমরা সংবাদ পাইলাম, তিনি অসুস্থ অবস্থাতেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। সংবাদ পাইবামাত্র আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। তাঁহার রোগের বিবরণ সব বলিলেন। পায়ের কাপড় সরাইয়া পা দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ, আমার পায়ের গুলি কখনও এত সরু হয় নাই, এইটাই কুলক্ষণ।" আমি বলিলাম, "ঈশ্বর করুন, এ যাত্রা আপনি সারিয়া উঠুন।" তাহার পর তিনি যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, আমি মধ্যে-মধ্যে গিয়া দেখিয়া আসিতাম। তাঁহার পত্নীর মুখ যখন দেখিতাম, তখন চক্ষের জল রাখিতে পারিতাম না। কি সুখেই ভারত আশ্রমে ছিলাম, আর কি দুঃখই পরে ঘটিল, তাহাই মনে হইত। আমরা পরোক্ষভাবে তাঁহার মৃত্যুর অন্যতম কারণ, এই মনে হইয়া সেই দুঃখ ঘনীভূত হইত।

পরে শুনিলাম যে, চিকিৎসকগণ তাঁহাকে মাংসের যূষ খাওয়াইতেছেন; তাহাতে তাঁহার মূত্রে আলবুমেন হইয়া, যকৃতে গ্রাভেল দেখা দিয়াছে। শুনিয়া ছুটিয়া দেখিতে গেলাম। গিয়া কমল কুটীরে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার আর্তনাদ শুনিলাম। রোগীর এরূপ আর্তনাদ অল্পই শুনিয়াছি। নিকটে গিয়া দেখি, তিনি যন্ত্রণাতে ছটফট করিতেছেন। শয্যাতে এক পার্শ্বে স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। সে যন্ত্রণা, সে আর্তনাদ, সে কাতরানি দেখিয়া চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না।

৮ই জানুয়ারি প্রাতে তাঁহার আত্মা নশ্বর ধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করিল। সে প্রাতে আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলাম। বৈকালে তাঁহার মৃতদেহ লইয়া পাদুকাহীন পদে সকলের সঙ্গে আমরা অনেকে শ্মশান ঘাটে গেলাম, এবং অশ্রুজলে ভাসিয়া এ জীবনের অন্যতম গুরুকে চিতানলে অর্পণ করিয়া আসিলাম।

এতদিন ঝগড়া করিতেছিলাম, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ যখন চলিয়া গেলেন, তখন মনটা কিছুদিন নিস্তব্ধ গম্ভীর ভাবে কি যেন ভাবিতে লাগিল। কেশবচন্দ্রের সহিত ব্রাহ্মসমাজ লোক চক্ষে উঠিয়াছিল; তাঁহাতে নিরাশ হইয়া তাঁহার অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে সেই যে পশ্চাতে পড়িল, আর সম্মুখে আসিতেছে না। কোথায় তাঁহার জীবনের মহা শক্তি, আর কোথায় আমাদের মতো দুর্বল অসার মানুষের চেষ্টা!

১৮৮৪ সালে কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ হইল। ১৮৮৮ সালে আমার বিলাত গমন পর্যন্ত এই কালের মধ্যে যে-যে ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল, তাহার সকলগুলি স্মরণ নাই। দুই-একটি যাহা স্মরণ হইতেছে, তাহা লিখিয়া রাখিতেছি।

খার্সিয়াঙ্গে নির্জন বাস। ১৮৮৬ সালের গ্রীষ্মকালে আমরা সমাজের চারিজন প্রচারক, অর্থাৎ নবদ্বীপচন্দ্র দাস, রামকুমার বিদ্যারত্ন, শশিভূষণ বসু ও আমি, এই সঙ্কল্প করিলাম যে, আমরা হিমালয় পাহাড়ে কিছুদিন নির্জনে বাস করিব। তৎসঙ্গে এই সঙ্কল্প করা হইল যে কাহারও নিকটে সাহায্য ভিক্ষা করা হইবে না। আলোচনার পর স্থির হইল যে আমরা খার্সিয়াঙ্গে গিয়া থাকিব। দার্জিলিং বহু কোলাহলময়, তত দূর যাওয়া হইবে না। তদনুসারে আমরা খার্সিয়াঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। একটি ঝুলি করিয়া তাহাতে যাহার যাহা দিবার মতো ছিল ফেলিয়া দিলাম। সেই ঝুলিটি বন্ধুবর নবদ্বীপচন্দ্র দাসের হস্তে রহিল। তিনি আমাদের

কোষাধ্যক্ষ হইলেন। আমরা পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের নিকট ফ্রী পাশ পাইয়া খার্সিয়াঙ্গে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া সাধন ভজনে বসিলাম। একটি চাকর রাখিলাম; সে বাসন মাজিত, ঘর ঝাঁট দিত, ও অপরাপর কাজ করিত। নবদ্বীপবাবু বাজার করিবার ভার লইলেন, শশী বিছানা তোলা ও ডাকঘরে যাওয়ার ভার লইলেন, বিদ্যারত্ন ভায়া খাওয়া ও লোকের সঙ্গে দেখা করার ভার লইলেন; আমি রন্ধনের ভার লইলাম। আমরা প্রত্যুষে উঠিয়া সমবেত উপাসনা করিতাম, তৎপরে কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ ও উপাসনা করিয়া যে যে-দিকে ইচ্ছা চলিয়া যাইতাম। এইরূপে দুই ঘণ্টা কাল প্রত্যেকে একান্তে যাপন করিতাম। সেই সময়টা প্রত্যেকে নিজ-নিজ অভীষ্ট প্রণালীতে চিন্তা ধ্যান উপাসনাদি করিতাম। আমাকে রন্ধনের জন্য সকলের অগ্রে ফিরিতে হইত।

আমি বাড়ির অনতিদূরে পাহাড়ের উপরে নির্ঝরের পার্শ্বে একখানি প্রস্তরের উপরে আসন নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে প্রতিদিন বসিয়া চিন্তা ধ্যান ও উপাসনা করিতাম। এক মাস এইরূপ সাধন করিয়া প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছিলাম। এমন কি, এখনো দার্জিলিং যাইবার সময় সেই পাথর খানির উপর যখনি দৃষ্টি পড়ে, তখনি মনে উপাসনার ভাব উপস্থিত হয়। সেই সাধনের ফল চিরদিন রহিয়াছে। এখানে বাস কালে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ অনেকে দার্জিলিং যাইতে আসিতে আমাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য অর্থাদি দিয়া যাইতেন।

এইরূপে প্রায় একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর, আমরা একদিন উপাসনান্তে স্থির করিলাম যে নামিয়া যাইব। তখন কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের অর্থের ঝুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, স্ব-স্ব গন্তব্য স্থানে ফিরিতে যে ব্যয় হইবে তাহার এগারোটি টাকার অপ্রতুল; ভৃত্যকে বেতন দিতে হইবে, এবং বাড়ি ভাড়া দিতে হইবে, ইত্যাদি। আমি প্রস্তাব করিলাম, ভিক্ষা করা হইবে না; ভৃত্যকে আমার গায়ের মোটা কম্বল দেওয়া হইবে, ল্যাম্পটি বিক্রয় করা যাইবে, ইত্যাদি। তদনুসারে ল্যাম্পটি বিক্রয় করা গেল। আমি ভৃত্যের নিকট বেতনের প্রাপ্য অংশ স্বরূপ কম্বল দিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম, সে শুনিয়া হাসিতে লাগিল। আমরা যে এত দরিদ্র যে গাত্রের কম্বল দিয়া ভৃত্যের বেতন দিতে হয়, এ কথা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

অবশেষে কি করা যায়? আমাদের ভিক্ষা বৃত্তির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ভিক্ষা করাই স্থির হইল। আমি একজন ব্রাহ্ম বন্ধুর নিকট ভিক্ষা করিবার জন্য চিঠি লিখিতে বসিলাম, এবং আমার দেখাদেখি বিদ্যারত্ন ভায়া দার্জিলিঙ্গের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু পার্বতীচরণ রায়কে পত্র লিখিতে বসিলেন। দুই-চারি পংক্তি লিখিয়াই আমার মনটা কেমন করিতে লাগিল; নিয়মটা ভাঙিতে ইচ্ছা হইল না। সুতরাং যে কয় পংক্তি লিখিয়াছিলাম, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। আমি পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলাম দেখিয়া বিদ্যারত্ন ভায়াও অর্ধলিখিত পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

সেই দিনেই দার্জিলিং হইতে আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান মিশনারী সি. এইচ. এ. ড্যাল সাহেবের এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি পরশু নামিয়া যাইতেছি, তুমি কবে নামিবে? তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে, যদি সেই দিন যাও, একসঙ্গে যাইতে পারি এবং সে কথাটা বলি।" আমি উত্তরে লিখিলাম, "আমাদের হাতে শিলিগুড়ি পর্যন্ত গাড়ি ভাড়া দিবার পয়সা নাই, আমরা বোধ হয় হাঁটিয়া শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাইব।"

তৎপর দিন এক আশ্চর্য ঘটনা! ডাকযোগে কলিকাতা হইতে এক পত্র আসিল।

খুলিয়া দেখি, তাহার মধ্যে দশ টাকার করেন্সি নোট; প্রেরকের নাম নাই, কেবল এইমাত্র লেখা—"আপনাদের খরচের জন্য।" কি আশ্চর্য! তখন আমরা দশ টাকার জন্য ভাবিয়া আকুল হইতেছিলাম, ঠিক সেই দশটা টাকাই আসিয়া উপস্থিত! আমরা তখনই দেনাপত্র শোধ করিয়া দার্জিলিং মেইলে শিড়িগুড়ি নামা স্থির করিলাম।

তদনুসারে পর দিন থার্ডক্লাসের টিকিট লইয়া স্টেশনে দাঁড়াইয়া আছি, দেখি ড্যাল সাহেব আসিয়া উপস্থিত। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "বাঃ, এই তুমি লিখিলে, পয়সা নাই, হাঁটিয়া শিলিগুড়ি নামিবে, আবার এ কি?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে।" তিনি আমাকে টানিয়া সেকেন্ডক্লাসে তুলিয়া লইলেন, আমার সেকেন্ডক্লাসের অতিরিক্ত ভাড়া দিলেন, এবং শিলিগুড়ি পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা তাঁহার মনে উদ্ভাবিত একটা নূতন কাজের পরামর্শ বিবৃত করিতে করিতে আসিলেন। প্রস্তাবিত কাজটার বিষয়ে যত দূর স্মরণ আছে, তাহা এই। তিনি প্রস্তাব করিলেন, "এস আমরা একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি সভা গঠন করি। তাহারা খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম হউক আর না হউক, কেবল নাস্তিক না হইলেই হইল। এই দলকে লইয়া এক সার্বভৌমিক ধর্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করি, ইত্যাদি।" এই মূল ভাবের অনেক শাখা প্রশাখা ছিল, সকল মনে নাই। কলিকাতায় ফিরিয়াই এই কার্যের সূচনার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু হায়, ড্যাল সাহেব কলিকাতায় পোঁছিবার অল্পদিন পরেই গুরুতর কুক্ষি রোগে আক্রান্ত হইয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই হিমালয় বাস কালে আমি 'হিমাদ্রি কুসুম' নামক এক পদ্য গ্রন্থের কিয়দংশ লিখি, তাহা পরে বর্ধিত আকারে মুদ্রিত হয়।

আসাম যাত্রা। খার্সিয়াং হইতে ফিরিবার কয়েকদিন পরে, অর্থাৎ ১৮৮৬ সালের জুলাই মাসে, আমি ধর্ম প্রচারার্থ আসাম প্রদেশে গিয়া ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, তেজপুর, নওগাঁ, শিবসাগর, ডিব্রুগড় ও শিলং, এই সমুদয় স্থানে গমন করি। যে কারণে এই প্রচার যাত্রার বিবরণ মনে আছে, তাহা এই। আমি ধুবড়ী হইতে ডিব্রুগড় অভিমুখে যাত্রা করিলে পথিমধ্যে এক স্থানে আমার স্বর্গীয় বন্ধু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী আসিয়া আমার সঙ্গে জুটিলেন। তিনি সঞ্জীবনীর এজেন্ট রূপে আসিয়াছিলেন, এবং ভারত সভার সহকারী সম্পাদকরূপে আসামের কুলি আইনের কার্য বিষয়ে ও অপরাপর কোনো কোনো বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে জোটাতে এক নূতন ব্যাপার ঘটিল। যেখানে যাই এবং বক্তৃতার নোটিস বাহির করি, সেইখানেই ইংরাজ কর্মচারীগণ সেখানকার উকিল ও অপরাপর ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "এ শিবনাথ শাস্ত্রী কে? এ কি কুলি আইন প্রভৃতি রাজনীতিমূলক বিষয়ে অনুসন্ধানার্থ আসিয়াছে?" তাঁহারা বলেন, "না, ইনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক।" প্রশ্ন, "তবে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী সঙ্গে কেন?" উত্তর, "দুজনে বন্ধুতা আছে, সেজন্য একসঙ্গে বেড়াইতেছেন, এই মাত্র।" কর্মচারীগণের সতর্কতার প্রমাণ কোনো কোনো নগরে পাইলাম। সেই-সেই স্থানের ডেপুটি কমিশনার প্রভৃতি ইংরাজ কর্মচারীরা কেহ-কেহ আমার বক্তৃতাতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এমন কি, ডিব্রুগড়ে যেদিন আমার বক্তৃতা হয় সেদিন ভয়ানক দুর্যোগ; বক্তৃতা স্থলে গিয়া দেখি, স্থানীয় ভদ্রলোকেরা অনেকে আসিতে পারেন নাই, কিন্তু ডেপুটি কমিশনার উপস্থিত।

আমরা ডিব্রুগড় হইতে ফিরিবার পথে শিবসাগর যাই। এখানে যাতায়াতে দুই বিভিন্ন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইল। যাইবার সময় স্টীমার ঘাটে দেখিলাম, শিবসাগরের বন্ধুগণ আমার জন্য হাতি প্রেরণ করিয়াছেন। দুই বীরপুরুষে হাতিতে আরোহণ করিলাম। হাতির যে মেজাজ আছে, তাহা ইতিপূর্বে দেখিবার ভালো সুযোগ হয় নাই। এবারে তাহা দেখিলাম। মাহুতের দুর্ব্যবহারেই হউক, আর অন্য কোনো কারণেই হউক, হাতি পথের মধ্যে বড় রাগ করিল; এবং আমাদিগকে লইয়া পথ ছাড়িয়া এক পুষ্করিণীর মধ্যে নামিল। আমাদের পা জলে ডোবে আর কি! হাসিব, কি ত্রস্ত হইব ও লাফাইয়া পড়িব, স্থির করিতে পারি না। শেষে মাহুত অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া মিষ্ট কথা বলিয়া হাতিকে রাস্তাতে তুলিয়া আনিল। আমরা যথাসময়ে গন্তব্য স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

আসিবার সময় আর এক বিপদ উপস্থিত। মধ্যে কয়েকদিন প্রবল বৃষ্টি হইয়া চারিদিক ভাসিয়া গেল। সংবাদ পাওয়া গেল যে ব্রহ্মপুত্র ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু কি করা যায়, আমাদের শীঘ্র আসা আবশ্যক। আমরা আমাদের যাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য সেখানকার বন্ধুদিগকে অস্থির করিয়া তুলিলাম। তাঁহারা সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। যাত্রার দিন প্রাতে দেখিলাম, একটি হাতি আসিল। মনে মনে ভাবিলাম, এটা বোধ হয় শান্তশিষ্ট, পুষ্করিণীতে নামিবে না। কিন্তু আমরা আহারাদি করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলে দেখা গেল যে, হাতি সেখানে নাই। বনের ভিতর কোথায় প্রবেশ করিয়াছে, খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। অবশেষে সেখানকার উকিল বন্ধুদিগের মধ্যে একজন আমাদিগকে তাঁহার গাড়িখানা দিলেন। যথাসময়ে গাড়িতে উঠিয়া কিয়দ্দূর গিয়া দেখি যে কাদা ঠেলিয়া যাওয়া ভার। কাদাতে গাড়ির চাকা বসিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে দ্বারিবাবু নামিয়া গাড়ি ঠেলিতে ও টানিতে লাগিলেন, ক্রমে গাড়িও ছাড়িয়া দিতে হইল। তখন আমরা মুটের মাথায় জিনিসপত্র দিয়া ৮ মাইল হাঁটিয়া স্টীমার ঘাট পর্যন্ত যাওয়া স্থির করিলাম। কিন্তু নগরের বাহিরে মাঠের ধারে গিয়া দেখিলাম, একখানা শালতি অর্থাৎ শাল কাঠের ডোঙ্গা আছে। চারিদিক জলপ্লাবিত হওয়াতে সেখানা নগরের পার্শ্বে আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে ভাড়া স্থির করিয়া দুই তিনজনে তাহাতে উঠিলাম। দুই-দশ হাত যাইতে না যাইতে দেখা গেল যে শালতিখানার স্থানে স্থানে গর্ত আছে, কাদা দিয়া তাহা বুজাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের ভারে কাদাগুলি ঠেলিয়া শালতির মধ্যে জল উঠিতে লাগিল। তখন আমরা নামিয়া পড়িলাম, এবং একহাঁটু জল ঠেলিয়া পদব্রজেই স্টীমারঘাটের অভিমুখে চলিলাম।

গাঙ্গুলীভায়া ডুবিলেন। সে এক কৌতুকের ব্যাপার। গাঙ্গুলীভায়া আমার আগে-আগে বিশ পঁচিশ হাত দূরে চলিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ দেখে কে! আমি অত চলিয়া উঠিতে পারিতেছি না, কাজেই একটু পিছাইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে দুইজনে চলিয়াছি, হঠাৎ দ্বারিবাবু ডুবিয়া গেলেন! তখন ভারবাহক মুটের মুখে শুনিলাম, সেখানে একটা খাল ও তদুপরি এক পুল ছিল, ব্রহ্মপুত্রের জল বৃদ্ধি হইয়া খাল ভাসিয়া পুল বোধ হয় ভাঙিয়া গিয়াছে। আমি ব্যস্তসমস্ত হইয়া অগ্রসর হইয়া দেখি, দ্বারিবাবু কিছু দূরে মাথা জাগাইয়া একবার উঠিয়া, আবার "আমি গেলাম" বলিয়া ডুবিলেন। সেবার আমি নিরাশ হইলাম, ভাবিলাম খালের স্রোতে তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। সৌভাগ্য ক্রমে দেখি কিয়দ্দূরে তিনি আবার মাথা জাগাইয়া হাত দিয়া যেন কি

একটা ধরিলেন। পরে জানিলাম, খালের পার্শ্বস্থ কোনো গুল্মের শাখা ধরিয়াছেন। খালের অপর পার্শ্বে কিয়দ্দূরে একখানা শালতি দাঁড়াইয়া ছিল, আমি তখন উচ্চস্বরে তাহাকে ডাকিতে লাগিলাম, "বাবুকে বাঁচা, বাবুকে বাঁচা, বকসিস করব।" আমার চেঁচামেচিতে তাহারা শালতিখানা লইয়া দ্বারিবাবুকে গিয়া তুলিল। তাঁহার সামলাইতে অনেকক্ষণ গেল। তৎপরে আমরা দুইজনে চলিতে লাগিলাম।

বেলা অবসান হইয়া আসিতে লাগিল, তৃষ্ণায় দুইজনের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, কাদা-জল পান করিতে পারি না। কি করি, কি করি, ভাবিতে-ভাবিতে দেখিতে পাইলাম, কিয়দ্দূরে একটা উচ্চ ভূমির উপরে একটা বাঙলা ঘর দাঁড়াইয়া আছে। মনে ভাবিলাম, সেখানে নিশ্চয়ই মানুষ আছে, তাহারা জল দিতে পারিবে। উঠিয়া দেখি, সেটা গবর্ণমেণ্টের ইন্‌স্পেক্‌শন বাঙলা, সেখানে একজন আসামী চাকর আছে। তাহার একটি পানীয় জলের কলস দেখিলাম, তাহার মুখে একটি বাটি চাপা। তাহার নিকট জল চাহিলাম। তাহার পর যে কথাবার্তা হইল, তাহা এই।

ভৃত্য। কিসে করে খাবে?

উত্তর। কেন? তোমার ঐ বাটিতে করে দাও।

ভৃত্য। তা হবে না, তোমাদিগকে বাটি ছুঁতে দেব না। তোমরা 'কলা বঙ্গাল', আমাদের জলপাত্র তোমাদের ছুঁতে দি না।

উত্তর। আচ্ছা, আমরা হাতে অঞ্জলি করে হাত পাতছি, তাতে জল ঢেলে দাও।

ভৃত্য। হাতে ও বাটিতে যদি ঠেকাঠেকি হয়ে যায়?

ইতিমধ্যে দ্বারিবাবু গাছের পাতা ছিঁড়িয়া আনিতে গেলেন। বলিয়া গেলেন, "আচ্ছা, আমি গাছের পাতা আনছি, তার বাটি করে তাতে জল দিবে।"

তাঁহার ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে আমি সেই ব্যক্তির কাছে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বলিলাম, "তোমার কি লজ্জা হচ্ছে না? যে ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদিগকেও সৃষ্টি করেছেন। বলতে গেলে তুমি আমাদের ভাই। আজ এই বিপদের দিন, জলাভাবে প্রাণ যায়, তোমার জল আছে অথচ তুমি দিতে পারছ না। ভগবান যে জল সকলের জন্য দিয়াছেন, তাই একটু তুমি আমাদের জন্য দিতে পারলে না, কি লজ্জার কথা!"

কেন জানি না, আমার কথা শেষ হইলে সে ব্যক্তি ধীরভাবে বলিল, "আচ্ছা, আমার বাটিতে জল খাও।" তখন আমি দ্বারিবাবুকে চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, "আসুন, আসুন! আমি একে ব্রাহ্ম করেছি, বাটিতে জল দিতে রাজি হয়েছে।" দুজনে কত হাসিলাম, তাহার বাটিতে পেট ভরিয়া জল পান করিলাম।

আবার পদব্রজে জল ভাঙিয়া অগ্রসর হইলাম। সন্ধ্যাকালে স্টীমারঘাটের স্টেশনে উপস্থিত। সেখানকার বাবুরা আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি আশ্চর্য! এই জলপ্লাবনে আপনারা এলেন কিরূপে?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "হস্তী দর্শন, গাড়ি কর্ষণ, নৌকা স্পর্শন, ও শেষে সন্তরণ।" ইহার অর্থ যখন ব্যাখ্যা করিলাম, তখন একটা হাসাহাসি পড়িয়া গেল। তৎপরদিন আমরা উভয়ে গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম।

পিতা-পুত্রে মিলন। ১৮৮৮ সালের একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা, কাশীতে আমার পিতাঠাকুরমহাশয়ের গুরুতর পীড়া। আমি উপবীত পরিত্যাগ করার দিন হইতে পিতাঠাকুরমহাশয় আমাকে এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তদবধি এই দীর্ঘ

কাল আমার মুখ দেখেন নাই, আমার জীবন সংশয় কালেও দেখেন নাই। প্রথম-প্রথম আমার উপার্জিত সিকি পয়সা লইতে চাহিতেন না। আমি আমার পিসতুতো বড় ভাইয়ের হাত দিয়া শীতকালে কম্বল প্রভৃতি দিতাম। তিনি কৌশলে তাহা বাবার হাতে দিয়া দাম লইতেন, এবং সেই মূল্য গোপনে আমার মায়ের হাতে দিতেন। আমি যখন ভবানীপুরে সাউথ সুবার্বন স্কুলে কর্ম করি, তখন আমার মধ্যম ভগিনীর বিবাহ হয়। সে সময়ে আমি বিবাহ ব্যয়ের সাহায্যার্থ গোপনে মায়ের হাতে কিছু টাকা দিয়াছিলাম। পরে শুনিলাম যে, বাবা তাহা জানিতে পারিয়া এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে ঘরের চালে আগুন দিয়াছিলেন, পাড়ার লোকে আসিয়া নিবাইয়াছিল। তৎপরে এই ক্রুদ্ধ ভাব ক্রমে চলিয়া গিয়াছিল। তখন আমি মায়ের হাতে প্রত্যেক মাসে দশটাকা করিয়া দিতেছি জানিয়া ক্রুদ্ধ হইতেন না; কিন্তু সে অর্থ তিনি স্পর্শ করিতেন না, তাহা মায়েরই থাকিত।

এইরূপ চলিতেছিল, মধ্যে বাবা কর্ম হইতে অবসৃত হইয়া সঙ্কল্প করিলেন, দেশভূমি পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইবেন, যেন আর অধম পুত্রের মুখ দর্শন করিতে না হয়। বাবা-মা কাশীতে বসিবার পূর্বে গয়া বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিতে বাহির হইলেন। তখন আমি তাঁহাদের তীর্থ ভ্রমণের ব্যয়ের জন্য অর্থ সাহায্য করিলাম, বাবা দয়া করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন; আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলাম। ক্রমে তাঁহারা কাশীধামে আসিয়া বাস করিলেন। সেখানে বাবার মান সম্ভ্রম হইল। তাঁহার পেনসনের টাকাতে ও আমার সামান্য সাহায্যে তাঁহারা সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

আমি আমার ভগিনী ঠাকুরদাসীকে পৈতৃক ভিটাতে স্থাপন করিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে লাগিলাম।

দিন এই প্রকার চলিতেছে, এমন সময়ে ১৮৮৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি রবিবার আমি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে নামিয়াছি, এমন সময় কাশী হইতে আমার একজন ডাক্তার বন্ধুর নিকট হইতে তারে সংবাদ পাইলাম যে, পিতাঠাকুরমহাশয় গুরুতর পীড়িত, আমাকে অবিলম্বে যাত্রা করিতে হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে সঙ্গে লইয়া তৎপরবর্তী ট্রেনে কাশী যাত্রা করিলাম। পরদিন দুপুরবেলা কাশীতে পৌঁছিয়া পথে সেই ডাক্তার বন্ধুর বাড়িতে গিয়া শুনি, বাবা ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত, নাড়ী নাই। আমি ডাক্তার সঙ্গে করিয়া বাবার বাসাতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহার নাড়ী নাই, তাহার উপর হিক্কা হইয়াছে, সকলে মহা উদ্বিগ্ন। এই অবস্থাতে আমি গিয়া যখন নিকটে দাঁড়াইলাম, তখন বাবা আঠারো বৎসরের পর প্রথম আমার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু আমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইলেন। বিরাজমোহিনীকে তিনি বড় ভালোবাসিতেন, বিরাজ-মোহিনী যখন তাঁহার পদধূলি লইয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিলেন, তখন বাবা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি ডাক্তার বন্ধুকে বাবাকে দেখিয়া পার্শ্বের ঘরে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া সেই ঘরে গেলাম। তিনি আসিয়া বলিলেন যে, নাড়ী আবার পাওয়া যাইতেছে। আমি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিলাম। ইহার পরে আমি আমার জননীর দ্বারা বাবাকে আমার সঙ্গে কথা কহিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলাম। বলিলাম, "আমাকে রোগের বিষয়ে বিশেষ বিবরণ না বলিলে আমি কিরূপে ডাক্তারকে বুঝাইয়া দিব?" তাই বুঝিলেন বলিয়াই হউক, বা তাঁহার যেদিন পীড়া হইয়াছে তৎপরদিনেই কিরূপে আসিলাম এই ভাবিয়াই

হউক, আমার উপবীত পরিত্যাগের আঠারো উনিশ বছরের পরে বাবা আমার মুখ দেখিলেন ও আমার সঙ্গে কথা কহিলেন।

এত যে গুরুতর পীড়া, তাহাতে বাবাকে কিছুমাত্র ম্লান বা বিষণ্ণ মনে হইত না। ডাক্তার হাত দেখিয়া বলিতেছেন, "নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে"; বাবা হাসিয়া বলিতেছেন, "আনাড়ীর আবার নাড়ী!" মা কাঁদিতেছেন, বাবা তাঁহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমাকে বলিতেছেন, "কেমন অজ্ঞ, দেখেছ? যার জন্য কাশীতে আসা, তাই ঘটবার উপক্রম; কোথায় আমোদ করবে, না, কান্না! কাশীতে কিছু বিষয় বাণিজ্য করতে আসিনি, মরতে এসেছি, সেই মরণ এসে উপস্থিত, তাতে আবার শোক কেন?" আমি বলিলাম, "বাবা! আপনি তো সহজ কথাগুলো বললেন, মা'র প্রাণ তা শুনবে কেন?" বাবা বলিলেন, "তবে ওঁর এখানে আসা উচিত হয়নি।" তারপর শোনা গেল যে কচি তালের জল দিলে হিক্কা থামিতে পারে। কচি তাল কোথায় পাওয়া যায় আমি সেই চেষ্টায় বড় ব্যস্ত হইলাম। পরদিন প্রাতে আমার একজন বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। বাবা হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ হে, তাল না পেলে এ তাল সামলাচ্ছে না।" তিনি যাইবার সময় হাসিয়া বলিয়া গেলেন, "এঁকে মারে কে? এমন মানসিক বল তো সচরাচর দেখা যায় না।"

যাহা হউক, বাবা কয়েকদিনের মধ্যে সারিয়া উঠিলেন। তিনি অন্ন পথ্য করিলে, আমরা তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। আমাদের যাত্রা করিবার সময় তিনি বলিলেন, "আমি বৌমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসব।" আমি বলিলাম, "না বাবা, তা হবে না। আপনার বৌমাকে তো আমি এনেছি, আমিই নিয়ে যাব; আপনার যাওয়া হবে না।" তিনি কোনো মতেই সে কথা শুনিলেন না; মহা চেষ্টাতে উঠিতে চাহিলেন। কি করা যায়, দুইজন লোক তাঁহার কাঁধে হাত দিয়া তাঁহাকে শয্যা হইতে তুলিলেন, এবং ধরিয়া আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া নিচে নামাইলেন; তাহার পরে বাবা কোনো মতে লাঠিতে ভর দিয়া ও মানুষের হাত ধরিয়া ধীরে-ধীরে গলির মোড়ে বড় রাস্তার ধারে আমাদের গাড়ির নিকট পর্যন্ত আসিলেন। যেই আমি ও বিরাজমোহিনী তাঁহার পদধূলি লইয়া গাড়িতে উঠিলাম, অমনি বাবা কাঁদিয়া মাথা ঘুরিয়া রাস্তায় বসিয়া পড়িলেন। সেখান হইতে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাসায় লইয়া যাওয়া হইল।

ইহার কিছু কাল পরে (১৮৮৮ সালের ১৩ই এপ্রিল) বাঘআঁচড়া নিবাসী শ্রীমান যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটি যুবার সহিত আমার দ্বিতীয়া কন্যা তরঙ্গিণীর বিবাহ হয়।

ইংলণ্ড যাত্রা

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমে বন্ধুবর দুর্গামোহন দাস ও তৎসঙ্গে ডেপুটি কলেক্টর বাবু পার্বতীচরণ রায় ইংলণ্ড গমনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দুর্গামোহনবাবু তাঁহাদের সঙ্গে আমাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া আমার জাহাজ ভাড়া দিবার ইচ্ছা জানাইলেন। আমি আসিয়া বন্ধুগণের মধ্যে সেই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেই অপর কেহ-কেহ অর্থ সাহায্য করিতে চাহিলেন। তাঁহাদের সকলের প্ররোচনাতে আমি দুর্গামোহনবাবু ও পার্বতীবাবুর সহিত ১৮৮৮ সালের ১৫ই এপ্রিল রবিবার ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম।

আমি সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট লইয়াছিলাম। দুর্গামোহনবাবু ও পার্বতীবাবু ফার্স্ট ক্লাসে থাকিতেন। বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াই পার্বতীবাবুর সামুদ্রিক বমন আরম্ভ হইল, তিনি নিজ ক্যাবিনে পড়িয়া রহিলেন। দুর্গামোহনবাবু একটু ভালো ছিলেন, কিন্তু দেশ হইতেই তিনি কাহিল হইয়া বাহির হইয়াছিলেন। আমি এক প্রকার পালাজ্বর লইয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে আমার জ্বর হইত; আমি জ্বরে ক্যাবিনে একা পড়িয়া থাকিতাম। পড়িয়া পড়িয়া সে সময়কার ভাবে এই গানটি বাঁধিয়াছিলাম, তাহা পরে কলিকাতায় প্রেরণ করি, এবং তাহা বোধ হয় তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হয়; পরে ব্রহ্মসঙ্গীত গ্রন্থে উঠিয়াছে।

আমি এক মুখে মায়ের গুণ বলি কেমনে?
আর কোন মা আছে এমন করে পালিতে জানে?
কি স্বদেশে কি বিদেশে, মা আমার সর্বদা পাশে,
প্রাণে বসে কহেন কথা মধুর বচনে।
আমি তো ঘোর অবিশ্বাসী, (মাকে) ভুলে থাকি দিবানিশি,
মা আমার সকল বোঝা বহেন যতনে।
এ অনন্ত সিন্ধু জলে, মা আমায় রেখেছেন কোলে,
কত শান্তি কত আশা দিতেছেন প্রাণে।
হায় আমি কি করিলাম, এমন মায়ে না চিনিলাম,
না সঁপিলাম প্রাণ মন এমন চরণে!

জাহাজে থাকিতে থাকিতে দুইটি ঘটনা দ্বারা আমি ইংরাজ চরিত্র ও ফরাসী চরিত্র উভয়ের মধ্যে এক বিষয়ে প্রভেদ লক্ষ্য করিতে পারিলাম। প্রথম ঘটনাটি এই। আমাদের সঙ্গে একজন ইংরাজ যাইতেছিলেন। তিনি ছয় মাস পূর্বে এদেশে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, বেড়াইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি একদিন আহারে

বসিয়া অপরাপর ইংরাজের নিকট এদেশীয়দিগকে খুব গালাগালি দিতে লাগিলেন। ভারতবাসী ইংরাজদের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন ও নিজে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া এদেশীয়দিগের প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি তখন কিছু বলিলাম না। পরে আহারান্তে উপরকার ডেকে তিনি যখন বেড়াইতেছেন আমিও বেড়াইতেছি, তখন আমি তাঁহার নিকট গিয়া ভদ্রভাবে বলিলাম, "আপনি টেবিলে যে সকল কথা বলিতেছিলেন, সে বিষয়ে আমি আপনার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করি। আপনি ছয়মাস বৈ এদেশে আসেন নাই, বেশি দেখেন নাই, যা শুনেছেন তার অনেক ঠিক নয়।" এই কথা শুনিয়াই মানুষটা মুখ ফিরাইয়া লইল, বলিল, "দরকার নেই, আমি কিছু শুনতে চাই না।" সেইদিন অবধি আমি তাহাকে ত্যাগ করিলাম, সে আমাকে ত্যাগ করিল। এক স্টীমারে এক ক্লাসে আছি, এক সঙ্গে খাই, তবু যেন কত দূরে আছি; আলাপ পরিচয় সম্ভাষণ নাই।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এই। জাহাজ যখন গিয়া ফ্রান্সের মার্সেলস বন্দরে দাঁড়াইল, তখন আমরা স্থির করিলাম যে একবার শহরটা দেখিতে যাইব। বড়-বড় নৌকা আসিয়া জাহাজের মাল তুলিতেছে, আমি এক পাশে দাঁড়াইয়া আছি; অপেক্ষা করিতেছি, একটু ভিড় কমিলে নামিব। দেখিলাম, ফরাসী ভদ্রলোক দুই-একজন আসিতেছেন, তাঁহারা সেখান হইতে আরোহী হইবেন। তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের বন্ধুরা তাঁহাদিগকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন। একজন ভদ্রলোক বন্ধুকে তুলিয়া দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন আমি এক পাশে দাঁড়াইয়া আছি। নিকটে আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনি বোধ হয় ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছেন?"

আমি। হাঁ।

প্রশ্ন। আপনাদের পথে ক্লেশ হয় নাই তো?

আমি। না, আমরা বেশ আসিয়াছি।

তিনি আমাকে চুরুট দিতে চাহিলেন, আমি তামাক খাই না শুনিয়া সেটি লুকাইলেন। শেষে বলিলেন, "আপনি কি তীরে যাইবেন? সাবধান, ভালো ইণ্টার-প্রেটার লইবেন, নতুবা লোকে ঠকাইবে।" এই বলিয়া যাইবার সময় একজন চেনা ইণ্টারপ্রেটারকে ডাকিয়া আমার কাছে দিয়া গেলেন। ইংরাজদের ব্যবহারের সহিত কি প্রভেদ!

সেই সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা আছে। জাহাজে আরোহীগণ আপনাদের বিনোদনের জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে; সাহেব ও মেমদিগের নাচ গান ও খেলা, সকলি চলিতে থাকে। আমরা 'মির্জাপুর' নামক জাহাজে যাইতেছিলাম। তাহার ফার্স্ট ক্লাসের আরোহীগণ এইরূপ নাচ গান খেলা আরম্ভ করিলেন। সেকেণ্ড ক্লাসে চীন দেশ হইতে কতকগুলি ইংরাজ মিশনারী কলম্বো বন্দরে আসিয়া আমাদের সঙ্গে জুটিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আমি বলিলাম, "আসুন, আমরা সপ্তাহে একদিন করিয়া সেকেণ্ড ক্লাসে বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করি, ও প্রথমশ্রেণীর আরোহীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া শুনাই।" ক্রমে আমাদের সাপ্তাহিক বক্তৃতা আরম্ভ হইল। তাহার এক বক্তৃতা আমাকে দিতে হইল। যদিও অনেকে আসিলেন না, যাঁহারা আসিলেন তাঁহারা সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এই উপলক্ষে নরওয়ে দেশের একজন ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় ও বন্ধুতা হইয়া গেল। তিনি ফার্স্টক্লাস ত্যাগ করিয়া অনেক সময় দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসিয়া আমার সহিত কথাবার্তা কহিতেন।

লণ্ডনের বাসা। ১৯শে মে শনিবার আমরা লণ্ডনে উপস্থিত হইলাম। দুইদিনের মধ্যেই আমি ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষিণী মিস কলেটের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি তখন উত্তর লণ্ডনে হাইবরির সন্নিকটে এক বাড়িতে একলা থাকিতেন। একটি চাকরানী তাঁহার পরিচর্যা করিত। তদ্ভিন্ন বোধ হয় একটি ভ্রাতুষ্পুত্রীও তাঁহার সঙ্গে থাকিত। মিস কলেট বলিলেন, "তুমি এই উত্তর লণ্ডনে একটা থাকবার জায়গা দেখে লও, দুজনে সর্বদা দেখা সাক্ষাৎ হবে।" আমি তাঁহার কথা অনুসারে উত্তর লণ্ডনে ক্যামডেন স্ট্রীটের পার্শ্বে, হিল-ড্রপ রোড নামক গলিতে এক পরিবারে থাকিবার স্থান করিয়া লইলাম।

বাড়ি দেখিয়া বসিলাম বটে, কিন্তু বহুদিন মনটা দেশের দিকে পড়িয়া রহিল। পথে ঘাটে কেবল শাদা মানুষ, বাহির হইলে সকলেই আশ্চর্য হইয়া তাকায়, আমার ভাষা কেহ বোঝে না, আমি থাকি কি মরি কেহ দেখে না; এসব যেন আমার কেমন কেমন লাগিতে লাগিল। তাহার উপরে দেশ হইতে যে জ্বর লইয়া গিয়াছিলাম, তাহা ইংলণ্ডে পোঁছিয়া কয়েক মাস ছিল। জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ঘরে পড়িয়া থাকিতাম, একবার উঁকি মারিবার একজন লোক ছিল না। বাড়ির মেয়েরা কেহ পুরুষের ঘরে প্রবেশ করিতেন না; চাকর একবার চা দিয়া যাইত, এই মাত্র।

ইহার উপরে আবার প্রাণে শুষ্কতা অনুভব করিতে লাগিলাম। কোলাহলপূর্ণ রাজনগরে ঈশ্বর যেন আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। এই অবস্থাতে কয়েকদিন বড় কষ্টে কাটাইলাম। এই সময়ে বা কিছুদিন পরে, বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া একটি সঙ্গীত বাঁধি, তাহা এই—

জানলাম না মা, বুঝলাম না মা, এ তোর রীতি কেমনধারা,
থাক থাক লুকাও কোথায়, করে আমায় দিশেহারা?
আমি আঁচল-ধরা ছেলে, যেতে হয় কি একলা ফেলে?
মায়ের মুখ না দেখতে পেলে, ভয়ে ছাওয়াল হয় যে সারা।
যদি বল কি গুণ আছে, বাঁধা রবে আমার কাছে,
(তুমি) আপনার গুণে আপনি বাঁধা, ও আমার মা চমৎকারা!

যে পরিবারে আমি থাকিবার স্থান পাইলাম, তাঁহারা ইংলণ্ডের মধ্য শ্রেণীর নিম্নস্তরের লোক। তাঁহাদের মেয়েরা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া দরজা জানালা প্রভৃতির পরদা প্রস্তুত করিতেন, আর ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ গৃহস্বামী পিতা সেগুলি ভৃত্যের মস্তকে দিয়া ভদ্রলোকের বাড়িতে ও দোকানে বিক্রয় করিয়া আসিতেন। সে পরিবারে বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও তিন কন্যা মাত্র ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা আপনাদের বাড়িতে আমার ন্যায় আগন্তুক লোকও রাখিতেন। আমি যে সময়ে ছিলাম, সে সময়ে সে ভবনে আমি ছাড়া একজন জাপানী (তৎপরে তৎস্থানে একজন রাশিয়ান), একজন আইরিশম্যান, ও দুজন ইংরাজ যুবক থাকিতেন।

বাড়িওয়ালী দুইদিনেই আমাকে চিনিয়া লইয়াছিলেন, এবং আমার কাপড়-চোপড়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন, এবং সর্বদা লণ্ডন পরিদর্শন বিষয়ে জ্ঞাতব্য অত্যাবশ্যক সংবাদ সকল আমাকে দিতেন। তিনি আমাকে এমনি চিনিয়াছিলেন যে, আমি চা খাইতে গেলেই হাসিয়া বলিতেন, "মিস্টার শাস্ত্রী! রসো, রসো, তোমার গলায় আগে বিব্‌ বেঁধে দিই।" আমি তাঁহাদের ভবনে নিরুপদ্রবে ও সুখে বাস করিতে লাগিলাম, এবং ক্রমে ইংরাজ সমাজের ভালো মন্দ দেখিতে লাগিলাম।

ইংলন্ডের সাধারণ প্রজাবর্গের দোষ গুণ। মন্দটাই আগে বলিয়া ফেলি। পৌঁছিবার পরদিনই বাড়ি দেখিতে বাহির হইয়াছি। একজন বাঙালী যুবক (কে ভালো মনে নাই) আমার সঙ্গে আছে। আমি আগে আগে যাইতেছি, সে ব্যক্তি পশ্চাতে আছে। সে পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "মশাই, মশাই, সরে দাঁড়ান, আপনাকে ধরল!" আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি যে, একটা মাতাল স্ত্রীলোক আমার গলার কাপড় ধরিতে আসিতেছে; বলিতেছে, "হিয়ার ইজ মাই ম্যান।" অপর একটি স্ত্রীলোক তাহাকে টানিয়া অপরদিকে লইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা সরিয়া গেলেই আমি বাঙালী যুবকটিকে বলিলাম, "এ কোথায় এলাম হে? এ কি দৃশ্য!" সে বলিল, "কিছুদিন থাকুন, আরও অনেক দৃশ্য দেখিবেন।" বাস্তবিক তাহাই হইল। পানাসক্তির আরও অনেক দৃশ্য চক্ষে পড়িতে লাগিল। স্ত্রীলোক মাতাল হইয়া অসামাল হইয়াছে, পুলিস ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, এরূপ দৃশ্যও দেখিলাম।

দেখিতাম, সেখানকার খারাপ মেয়েরা বড় সাহসী, রাস্তা হইতে পুরুষদিগকে ধরিয়া পাকড়িয়া লইয়া যায়। আমরা ইংলন্ডে পৌঁছিবার কিছুদিন পূর্বে নাকি এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল যে, যে-মেয়ে রাস্তা ঘাটে অপরিচিত পুরুষকে বিরক্ত করিবে, সে পুরুষ সে কথা পুলিসের গোচর করিলেই সে মেয়েকে গ্রেপ্তার করিবে ও আইনানুসারে তাহার দণ্ড হইবে। কিন্তু বিদেশের কালা মানুষ দেখিলে বোধ হয় তাহারা মনে করিত যে ইহারা আমাদের এ আইন জানে না; কারণ, দেখিতাম কালা মানুষকে বিরক্ত করিতে ভয় পাইত না। একদিন আমি একটু অধিক রাত্রিতে বাড়িতে আসিতেছি। পাড়ার নিকটে গলির মোড়ে একটি মেয়ে আমাকে গুড ইভনিং করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছি। আমি যথারীতি বলিলাম, 'কোয়াইট ওয়েল, থ্যাঙ্ক ইউ।' মনে করিলাম, দোকানে পোস্ট আপীসে কত মেয়ের সঙ্গে কথা হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ হইবে। তাহার পর দেখি তাহা নহে। মেয়েটা বলিল, 'ডু ইউ ওয়ান্ট এ সুইটহার্ট?' বলিয়াই একেবারে আমার বাহু তাহার কুক্ষিতলে পুরিয়া লইয়া আমার সঙ্গে-সঙ্গে আসিতে লাগিল। আমি ঘৃণায় হাত বাহির করিয়া লইয়া বলিলাম, "তুমি থাক কোথায়? রাত্রে এখানে বেড়াইতেছ কেন?" তাহার উত্তরে সে যাহা বলিল ও করিল, তাহা স্মরণ করিতে লজ্জা হয়। আমি ত্বরায় তাহার হাতে ছাড়াইয়া চলিয়া আসিলাম, কিন্তু তথাপি সে ক্ষণকাল সঙ্গে-সঙ্গে আসিল। অপরিচিত পুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের এত দূর সাহস কখনো দেখি নাই। ভাবিতে লাগিলাম, আমাদের দেশের যুবকেরা এখানে আসিয়া কি বিপদের মধ্যেই বাস করে!

অধিক রাত্রে লন্ডনের রাস্তা যে কি এক মূর্তি ধরে! যাকে দেখি সেই নেশাতে টং। রাত্রি ১১টার পর যদি কোনো দূর স্থান হইতে রেলগাড়িতে বাড়িতে আসিতে হইত, দেখিতে পাইতাম, স্টেশনে যে টিকিট বিক্রয় করিতেছে সে নেশাতে চুর; স্টেশনের যে লোক (পোর্টার) গাড়ির দরজা খুলিতে আসিল সে মাতাল, ভালো করিয়া যেন দাঁড়াইতে পারিতেছে না; যারা একসঙ্গে এক কামরাতে আসিয়া বসিল, তাহারা পুরুষ মেয়ে নেশাতে চুর। নামিয়া ট্রামে বসিলাম, আরোহীদের মধ্যে কে কাহার গায়ে ঢলিয়া পড়ে। যাহার সঙ্গে কথা কহি, তাহার মুখেই মদের গন্ধ। দেখিতাম, আর মনে ভাবিতাম, এত বড় জাতিটার যদি এই পান দোষটা না থাকিত, তাহা হইলে আরও কত কাজ করিতে পারিত!

চারিদিকেই ইংরাজ জাতির পানাসক্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হইতাম। কোথাও পথের পার্শ্বে দেখি, পর্বতাকার আমাদের দেশের ধান্যের স্তূপ রহিয়াছে। দাঁড়াইয়া কারণ

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ঐ ধান্যরাশি হইতে মদ প্রস্তুত হইয়া পচা ধান্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। দেখিয়া মনে ভাবিলাম, "ও মা! অন্নাভাবে আমাদের দেশের শত সহস্র দরিদ্র লোক মরিতেছে, আর তাদের মুখের অন্ন আনিয়া এই ব্যবহারে লাগাইতেছে!"

যে বাড়িতে আমি থাকিতাম, সে বাড়ির বাড়িওয়ালা একজন বৃদ্ধ। তিনি, তাঁহার পত্নী, ও তিনটি অবিবাহিতা মেয়ে, এই তাঁহাদের পরিবার। আহারের সময় মেয়েদিগকে সুরাপান করিতে দেখি নাই। কিন্তু বৃদ্ধ পিতা প্রতিদিন বৈকালে আহারান্তে ঐ ভোজন স্থানেই বসিয়া প্রায় রাত্রি বারোটা পর্যন্ত পড়িতেন। পড়া চলিয়াছে এবং ঘন ঘন সুরাপান চলিয়াছে। এই জন্য তাঁহার হাতের নিকট এক জগ্ (ক্ষুদ্র কলস)) ধেনো মদ (এয়েল) রাখা হইত। পড়া শেষ হইতে-হইতে প্রায় কলসটি খালি হইত। শুইতে যাইবার সময় যদি কোনো দিন তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতাম, দেখিতাম নেশাতে বৃদ্ধের গলার স্বর বদলিয়া গিয়াছে।

অথচ এই পরিবারের মধ্যে ধর্মভাব বিলক্ষণ ছিল। প্রতিদিন প্রাতে তাঁহারা সপরিবারে উপাসনা করিতেন এবং রবিবারে নিয়মিত রূপে উপাসনা মন্দিরে যাইতেন। বিশেষভাবে বৃদ্ধ কর্তার ধর্মভাব দেখিতাম। তিনি আমাকে রবিবারে ধর্মোপদেশ শুনিবার জন্য ভালো ভালো উপাসনা মন্দিরে লইয়া যাইতেন। আমি দেশে ফিরিবার সময় তিনি আমাকে একখানি পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন। স্টীমারে আসিয়া দেখি, সেখানি একখানি দৈনিক উপাসনা পুস্তক, তাহাতে অনেক সাধুজনের উক্তি উদ্ধৃত আছে। গ্রন্থখানির প্রথম পৃষ্ঠায় বৃদ্ধ নিজে একটি প্রার্থনা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার মর্ম এই, "হে প্রভো! যেমন একবার ডামস্কসগামী পলের কাছে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলে, তেমনি স্বদেশে না পৌঁছিতে-পৌঁছিতে এই ধর্মানুরাগী ব্যক্তির কাছে আপনাকে প্রকাশ করিও।" এই সাধু সদাশয় মানুষের ঐ সুরাপান!

একদিন আহারে বসিয়া বৃদ্ধ গৃহস্থটিকে বলিলাম, "আচ্ছা আপনারা তো বাইবেলের প্রত্যেক কথা অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন?"

উত্তর। তাই করি বই কি!

আমি। আচ্ছা, আদম বলিয়া একজন মানবের আদি পিতামহ ছিলেন, এবং তাঁহার অবস্থা নিষ্পাপ পূর্ণাবস্থা ছিল, তাহা কি বিশ্বাস করেন?

উত্তর। হাঁ, তা করি বই কি!

আমি। আচ্ছা, সেই নিষ্পাপ পূর্ণাবস্থাতে আদম সুরাপান করিতেন কি না?

উত্তর। না, তখন তো সুরা আবিষ্কার হয় নাই।

আমি। তবে তো দেখিতেছেন, সুরাটা মানুষের পতিত অবস্থার পানীয়।

এই কথা বলিতেই বৃদ্ধ আমার উপর রাগিয়া উঠিলেন, কত কি বলিতে লাগিলেন। আমি ও তাঁহার পত্নী ও কন্যাগণ হাসিতে লাগিলাম।

লণ্ডনে মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন। ফল কথা এই, কোনো ইংরাজের সহিত আলাপ হইলেই আমি সুরাপানের বিরুদ্ধে ভজাইবার চেষ্টা করিতাম। একবার কতিপয় ভদ্র পুরুষ ও মহিলার প্রতিষ্ঠিত একটি শ্রমজীবীদের সভাতে গেলাম। সেদিন আলোচ্য বিষয় ছিল, "পানাসক্তির অবৈধতা।" আমি সুরাপান বিরোধী বলিয়া আমাকে তাঁহারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। জাতীয় পানাসক্তির অনিষ্ট ফলের বিষয় বক্তাগণ যখন বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন আমার মন বিস্ময় ও ঘৃণাতে অভিভূত হইতে

লাগিল। অবশেষে তাঁহারা আমাকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম, "তোমরা মুখে 'সুরাপান নিবারণ' 'সুরাপান নিবারণ' বলিতেছ; আমি তো দেখি, তোমরা সুরা সাগরে নিমগ্ন আছ। তোমাদের রাস্তায় মধ্যে শুঁড়ীর বাড়ি সর্বশ্রেষ্ঠ বাড়ি। সেটা যেন সাধারণ মানুষের বৈঠকখানা, ভদ্রলোক সেখানে প্রবেশ করিতে লজ্জা পায় না। কিন্তু আমাদের দেশে ভদ্রলোক কখনও শুঁড়ীর দোকানে প্রবেশ করে না, ছোটলোকেরাই প্রবেশ করে। আমি সেই দেশ হইতে আসিয়াছি, যে দেশের পূর্বপুরুষগণ সুরাপানকে মহাপাতকের মধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন।" এই বলিয়া মনুর "ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং" প্রভৃতি বচন উদ্ধৃত করিলাম। আর একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম যে, সেই পূর্বপুরুষগণ আদেশ করিয়াছেন যে, মত্ত হস্তীতে তাড়া করিলে বরং হস্তীর পদতলে পড়িয়া মরিবে, তথাপি শুণ্ডিকালয়ে আশ্রয় লইবে না। এই সমস্ত বচন শুনিয়া উপস্থিত পুরুষ ও মহিলা-গণ হাঁ করিয়া রহিলেন, ও পরস্পর মুখ দেখাদেখি করিতে লাগিলেন। যখন আমি বলিলাম যে, "আমাদের দেশে এরূপ লক্ষ-লক্ষ পরিবার আছে, যথা আমার নিজের পরিবার, যাহারা চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কোনো প্রকার মদ্য দেখে নাই; এরূপ দেশে তোমাদের গবর্ণমেণ্টের অধীনে প্রকারান্তরে সুরাপানের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে, এবং হাজার হাজার সুরার দোকান স্থাপিত হইতেছে," তখন চারিদিকে সেম! সেম! (কি লজ্জা! কি লজ্জা!) শব্দ উঠিতে লাগিল।

দুষ্ট লোকের খপ্পরে। একদিন উত্তর লণ্ডনে আমার বাসা হইতে কুমারী কলেটের বাড়ি যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছি, পথে একটা লোক একখানা মুদ্রিত কাগজ লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল, "অমুক জাহাজ সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছে, ইহাতে তাহার বিবরণ আছে; আপনি নেবেন?" আমি বলিলাম, "আমি সংবাদপত্রে ঐ জাহাজ ডোবার বিবরণ পড়েছি।" তখন সে আপনার দারিদ্র্যের বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইল; বলিল, "আমরা স্ত্রী পুরুষে বড় কষ্টে আছি, আমাদের দিন চলে না, অনেক দিন অনাহারে যায়; আপনি যদি কিছু সাহায্য করেন, বড় ভালো হয়।" তাহার কথা শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হইল, কিছু দান করিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু তাহার মুখে মদের গন্ধ পাইলাম। তখন তাহাকে বলিলাম, "তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছা হইতেছে, করিতেও পারি; কিন্তু তোমাদের জাত বড় মাতাল, তোমাকে যে পয়সা দিব, তাহা হয়তো তোমার স্ত্রীর হাতে না গিয়া শুঁড়ীর হাতে যাবে। এই জন্য দিতে ইচ্ছা করে না।" সে ব্যক্তি বলিল, "এই রাস্তার অদূরে এক গলিতে আমি থাকি, আপনি আমার বাড়িতে আমার স্ত্রীর কাছে চলুন, তাকে জিজ্ঞাসা করিলে সব কথা জানিতে পারিবেন।" আমি পূর্বেই সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, লণ্ডনের ঐ উত্তর-পূর্ব ভাগে অনেক দুষ্ট লোকের বাস, সর্বদাই চুরি ডাকাতি হত্যা মারামারি প্রভৃতি হইয়া থাকে, সময় সময় পথিকদিগকে ভুলাইয়া গলির ভিতর লইয়া সর্বস্ব কাড়িয়া লয়, এবং চোখে কাপড় বাঁধিয়া নানা গলি ঘুরাইয়া আর এক পথে ছাড়িয়া দেয়। তখন দয়ার আবির্ভাবে সে কথা আমার স্মরণ হইল না। আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। সে আমাকে গলি হইতে গলির ভিতর লইয়া চলিল। অবশেষে আমাকে একটা বাড়িতে এক ঘরের ভিতর পুরিয়া বলিল, "আমার স্ত্রী ঘরে নাই; এখানে বসুন, আমি তাকে ডেকে আনছি।" এই বলিয়া বাহির হইয়া গেল। আমার তখনো খেয়াল নাই যে বিপৎসঙ্কুল স্থানে আসিয়াছি। তখনো তাহার স্ত্রীর সহিত কথা

কহিব ও কিছু দান করিব, এই ভাবটা প্রবল আছে। আমি বসিয়া আছি, কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি, তিন-চারিজন সবলকায় পুরুষ আসিয়া দ্বারে উঁকি মারিতেছে ও পরস্পর কি পরামর্শ করিতেছে। তখন আমার সেই সংবাদপত্রের কথাটা স্মরণ হইল। আমি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলাম ও দ্রুতগতিতে বাহিরের রাস্তায় যাইবার জন্য অগ্রসর হইলাম। তাহারা দ্বারে আমার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল। তাহারা আমার হাত ধরিতে না ধরিতে আমি দৌড়িয়া রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইলাম। তখন দেখি সেই লোকটা রাস্তার অপর পার্শ্ব হইতে আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আমার দিকে আসিতেছে। সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমার স্ত্রী আসছে।" আমি বলিলাম, "না, তোমার স্ত্রীর জন্য আর দাঁড়াইব না, আমি চলিলাম।" সে আমার সঙ্গ লইল। আমি বলিলাম, "তোমাকে যখন কিছু দিব বলেছি, তখন দিচ্ছি; তুমি আমার সঙ্গ ছেড়ে দাও।" এই বলিয়া তাহাকে কিছু পয়সা দিয়া কুমারী কলেটের বাড়ি গেলাম। গিয়া তাঁহার বকুনি খাইয়া মরি। তিনি বলিলেন, "তুমি কাগজে পড়েছ, লোক মুখে শুনেছ, এই দিকে খারাপ লোকের বাস, তবু তোমার চেতনা হয় নাই, এ বড় আশ্চর্য কথা! আর যদি প্রাণভয়ে পালিয়ে এলে, তবে পয়সা দিলে কেন? দয়ার কি স্থান অস্থান নাই?" আমি আর কি বলিব! মাথা পাতিয়া তাঁহার বকুনি খাইলাম।

ইংরাজের চোখে। যাহা হউক, ভালো বিষয়ও অনেক দেখিতে লাগিলাম। তাহার কতকগুলি মনে আছে এবং উল্লেখ করিতেছি। একদিন কোথায় যাইব বলিয়া ট্রামে বসিয়াছি। গাড়িটা প্রায় যাত্রীতে পরিপূর্ণ। আরোহীদিগের মধ্যে একজন এমনই মাতাল যে ঠিক হইয়া বসিতে পারিতেছে না। এমন সময় দেখা গেল, দুইজন ভদ্র স্ত্রীলোক গাড়িতে উঠিতে আসিতেছেন। সে দেশের নিয়ম এই যে গাড়িতে জায়গা না থাকিলে পুরুষেরা দাঁড়াইয়া স্ত্রীলোকদিগকে বসিবার স্থান করিয়া দিবে। তদনুসারে আমি ও আর একটি পুরুষ উঠিয়া দাঁড়াইতে যাইতেছি, কিন্তু আমরা উঠিতে না উঠিতে সেই মাতাল পুরুষটি হেলিয়া দুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। গাড়ির লোকেরা বলিল, "তুমি বসিয়া থাক, এঁরা উঠিতেছেন।" কিন্তু সে তাহা শুনিল না, তাহার মাতালে সুরে বলিল, "নো! লেডিজ!" অর্থাৎ তা হবে না, ভদ্রমহিলা যে! আমি দেখিলাম, যে বেহুঁস তাহারও এতটুকু হুঁস আছে যে নিজে উঠিয়া ভদ্রমহিলার স্থান করিয়া দিতে হইবে।

নারীজাতির প্রতি এই সম্ভ্রম ইংরাজ জাতির চরিত্রের এক প্রধান লক্ষণ। সেখানে থাকিতে-থাকিতে একদিন শুনিলাম যে এক ছুটির দিন কৃস্টাল প্যালেস-এ শতাধিক শ্রমজীবী পুরুষ কি বিবাদ বাধাইয়া মহা দাঙ্গায় প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটি রোগা টিঙটিঙে মেয়ে আসিয়া তাহাদের মধ্যে পড়িয়া সেই দাঙ্গা থামাইয়া দিলেন। তিনি নাকি ঐ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ইংরাজ চরিত্রে সত্যে প্রীতি ও প্রবঞ্চনায় ঘৃণা। অগ্রে সাধারণ প্রজাদের চরিত্রের কথাই বলি। তাহাদের মধ্যে এক প্রকার মোটামুটি সত্যপরায়ণতা আছে। তাহারা অসত্যকে ঘৃণা করে, প্রবঞ্চনাতে প্রবৃত্ত হয় না। যে কাজটা করিবে বলিয়া ভার লয়, তাহা সুচারুরূপেই করিবার চেষ্টা করে। অপরের কথা সোজাসুজি বিশ্বাস করে, সে

প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে বলিলেও তাহা বুঝিতে পারে না; পরে প্রবঞ্চনা প্রকাশ পাইলে ভয়ানক রাগে, এবং উত্তমরূপে প্রহার করে।

আমি সেনাপতি গর্ডনের জীবনচরিত পড়িবার সময় একটি ঘটনার কথা পড়িয়াছিলাম। সেটি এই। গর্ডন বড় দয়ালু মানুষ ছিলেন। একবার একজন প্রবঞ্চক লোক দরিদ্র সাজিয়া এক গল্প সাজাইয়া আসিয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিল। তাহাকে দেখিয়া ও তাহার দুঃখের বিবরণ শুনিয়া গর্ডনের দয়া হইল। তিনি তাহাকে প্রচুর রূপে দান করিলেন, যেন সে ত্বরায় তাহার বর্ণিত কষ্ট হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। দুইদিন পরে গর্ডন শুনিলেন যে, সেই ব্যক্তি পাঁচ ছয় মাইল দূরবর্তী অপর কোনো স্থানে আর এক গল্প বলিয়া ভিক্ষা করিতেছে। ইহাতে তাঁহার এত ক্রোধ হইল যে তিনি চাবুক হাতে পাঁচ ছয় মাইল হাঁটিয়া তাহাকে মারিতে গেলেন। সেখানে গিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রহার করিলেন, অথচ নিজে যে টাকা-গুলি দিয়াছিলেন, তাহা ফেরত লইতে মনে থাকিল না। এই ব্যাপারে গর্ডন ব্রিটিশ জাতীয় চরিত্রের লক্ষণই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইংরাজের কর্তব্যজ্ঞান। সাধারণ প্রজাদের মোটামুটি সত্যপ্রিয়তার ও কর্তব্যপরায়ণতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্মরণ আছে। একবার মিস ম্যানিং আমাকে ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এক পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি যাইব বলিয়া প্রস্তুত হইতেছি, আমার বাড়িওয়ালী বলিলেন, "তোমার প্যাণ্টালুন পার্টিতে যাইবার উপযুক্ত নয়, তুমি একটা নূতন কোট ও নূতন প্যাণ্টালুন করাইয়া লও।"

আমি। আর সাতদিন পরে পার্টি, এর মধ্যে কি প্যাণ্টালুন ও কোট করা যাইবে?

বাড়িওয়ালী। রসো, আমি একটা দরজীকে ডাকছি, সে বোধ হয় করে দিতে পারবে।

যথাসময়ে একজন দরজী আসিল, সে আমার মাপ লইয়া গেল, এবং যথাসময়ে জিনিস দুটো দিবে বলিয়া গেল। দুদিন পরে তাহার স্ত্রী কাটা কাপড়গুলো লইয়া উপস্থিত; বলিল, "আপনার কাজের ভার লওয়ার পর, আমার স্বামীর স্কটল্যাণ্ড হতে একটা বড় কাজের ডাক এসেছে। অনেক দিন হতে এই ডাকের কথা বলছিল, এখন তাকে যেতেই হবে। আমরা কাপড় কেটেছি, কিছু সেলাই করেছি; আপনি আর কোনো দরজীকে ডাকিয়ে অবশিষ্ট করে নিন।" তাহারা যে কাপড় কাটিয়াছিল ও কিছু সেলাই করিয়াছিল, তাহার দাম লইতে চাহিল না। আমি মনে মনে ভাবিলাম, পাছে আমার অসুবিধা হয়, সেদিকে এদের এত দৃষ্টি! আমাদের দেশে শ্রমজীবীদের মধ্যে এটা দেখা যায় না।

আর একটি ঘটনা এই। আমি দেশে ফিরিবার সময় বাড়িওয়ালী একদিন একজন লোককে ডাকিলেন, সে আমার পুস্তক প্রভৃতি আনিবার জন্য একটি প্যাকিং কেস করিয়া দিবে। প্যাকিং বাক্সটি টিন দিয়া এমন করিয়া মুড়িতে হইবে যেন জাহাজে তাহাতে জল প্রবিষ্ট হইতে না পারে। মানুষটাকে ঠিক আমার মনের কথাগুলো বুঝাইতে দেরি হইতে লাগিল। হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, কিছু বলে না। আমি তাহার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারি যে, ঠিক আমার মনের ভাবটা ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। যখন বুঝিল, তখন ঠিক সেইরূপ করিয়া দিবে বলিয়া ভার লইয়া গেল। কথা রহিল যে, তৎপর দিন ১২টার মধ্যে বাক্সটি আনিবে, আমরা আহারান্তে প্যাকিং আরম্ভ করিব। তৎপর দিন প্রাতে আহার করিতেছি, ঘড়িতে

১১টা বাজিয়া কয়েক মিনিট হইয়াছে, এমন সময়ে প্যাকিং বাক্সের শব্দ শোনা গেল। আমরা উঠিয়া গিয়া দেখি, সুন্দর বাক্সটি করিয়াছে, দোষ দেখাইবার কিছু নাই। বস্তুত ইংরাজ কারিকরগণ যে কার্যটির ভার লয়, সেটি ভালো করিয়া করিবার চেষ্টা করে; সেটি লইয়া বসিয়া যায়, তাহার মধ্যে যত ভালো হইতে পারে তাহা করিয়া তোলে।

সেখানকার প্রজা সাধারণের এই সত্যপরায়ণতার ও সততার জন্য দেশে এমন সকল কাজ চলিতেছে, যাহা এ দেশ হইলে দুদিন চলিত না। তাহার একটির উল্লেখ করিতেছি।

ইংলন্ডের সার্কুলেটিং লাইব্রেরি। আমি গিয়া দেখিলাম, শিক্ষিত দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের মনে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উৎসাহ অতিশয় প্রবল। তাহার ফলস্বরূপ ঐ শ্রেণীর মানুষের মনে জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বাড়িতেছে, এবং তাহাদের ব্যবহারের জন্য চারিদিকে অসংখ্য ছোট-ছোট পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক রাজপথে দুই-দশখানি বাড়ির পরেই একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয়। নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা সেখানে নামমাত্র কিছু পয়সা জমা দিয়া সপ্তাহে-সপ্তাহে বই লইয়া যাইতেছে ও ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িয়া সে পুস্তক আবার ফিরাইয়া দিতেছে। ইহার অনেক পুস্তকালয় দোকানঘরের মধ্যে। দোকানদার অপরাপর জিনিসের ব্যবস্থা করিতেছে, সেই সঙ্গে এক পাশে একটি পুস্তকালয় রাখিয়াও কিছু উপার্জন করিতেছে। ইহা ভিন্ন স্বল্প মূল্যে বিক্রেয় ব্যবহৃত পুস্তকের দোকান অগণ্য।

এইরূপ একটি পুস্তকালয়-বিশিষ্ট দোকানে গিয়া একদিন যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহা মনে রহিয়াছে। আমি দোকানে অন্য কাজে গিয়া দেখি, এক পার্শ্বে দুইটি আলমারিতে কতকগুলি পুস্তক রহিয়াছে। মনে করিলাম, পুস্তকগুলি স্বল্প মূল্যের ব্যবহৃত পুস্তক।

জিজ্ঞাসা করিলাম, এ সব পুস্তক কি বিক্রয়ের জন্য?

উত্তর। না, এটা সার্কুলেটিং লাইব্রেরি।

আমি। এ সব পুস্তক কারা লয়?

উত্তর। এই পাড়ার নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা।

আমি। আমি কি বই লইতে পারি?

উত্তর। হাঁ পারেন, এ তো সাধারণের জন্য।

তাহার পর আমি একখানি ৬।৭ টাকা দামের বই লইয়া, দুই আনা পয়সা জমা দিয়া ও আমার নাম ও বাড়ির ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়া আসিলাম। আবার সপ্তাহান্তে বইখানি ফেরৎ দিয়া, আবার দুই আনা দিয়া আর একখানি বই লইয়া আসিলাম। এইরূপ তিন-চারি সপ্তাহের পর একদিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ ব্যবসা তোমরা কত দিন চালাইতেছ?"

উত্তর। গত ৮।৯ বৎসর।

আমি। মধ্যে মধ্যে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হও না?

উত্তর। কিরূপে?

আমি। লন্ডনের মতো প্রকাণ্ড শহরে মানুষ এক পাড়া হতে আর এক পাড়ায় উঠে গেলে খুঁজে পাওয়া ভার। মনে কর, যদি বই ফিরিয়ে না দিয়ে এ পাড়া হতে উঠে যায়, তা হলে বই কি করে পাবে?

এই প্রশ্নে আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাহারা বলিল, "তা কি করে হতে পারে? এ যে আমাদের বই। তাকে উঠে যাবার সময় ফিরে দিতেই হবে।"

আমি। মনে কর, যদি না দেয়।

তাহারা হাসিয়া কহিল, "সে হতেই পারে না।"

বই না দিয়া যে কেহ চলিয়া যাইতে পারে, ইহা যেন তাহাদের ধারণাই হয় না।

ইংলণ্ডে অন্যায়ের প্রকাশ্য প্রতিবাদ। অনেক নিম্ন শ্রেণীর লোক কোনো উপাসনা স্থানে যায় না, এই অভাব দূর করিবার জন্য আমি যাইবার কিছুদিন পূর্ব হইতে সেখানে একটা কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। কোনো-কোনো খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রচারক ও উপদেষ্টাগণ রবিবার প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে ও উদ্যান প্রভৃতির বৃক্ষতলে, উপাসনা ও উপদেশ আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমি অনেক সময় এই সকল উপাসনা ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতাম। দেখিতাম, নিম্ন শ্রেণীর নর-নারী অনেকে দাঁড়াইয়া শুনিতেছে। কোনো কোনো স্থলে দেখিতাম যে, ধর্মপ্রচারকদের দেখাদেখি রাজনীতির পক্ষীয়গণ এবং ব্রাড্‌ল'র দলের নাস্তিকগণও তাঁহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে আসিতেন। সে বড় কৌতুকের ব্যাপার। এক বৃক্ষতলে একজন খৃষ্টীয় উপদেষ্টা বাইবেল গ্রন্থখানা ঊর্ধ্বে ধরিয়া বলিতেছেন, "দেখ, এই গ্রন্থ ঈশ্বরদত্ত। ইহাতে তোমরা দুর্বলতার অবস্থাতে বল, নিরাশায় আশা, শোকে সান্ত্বনা, ও বিপদে আশ্রয় লাভ করিবে।" অপরদিকে কিয়দ্দূরে ব্রাডল'র একজন শিষ্য হয় তো চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "বাইবেল মানুষের গ্রন্থ, ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ; ঈশ্বর বলিয়া যে কেহ কোথাও আছেন, তার প্রমাণ কি? তোমরা বুদ্ধিজীবী জীব, ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়া শুনিয়া কাজ কর।" আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন রাজকার্যের ভার 'টোরী'-দিগের হস্তে ছিল। একজন বক্তা সেই 'টোরী' গবর্ণমেণ্টের কার্যকলাপের প্রতিবাদ করিতেছেন; তাঁহারা যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতেছেন। এদিকে দেখি, একজন সামান্য ছুতার বা কামার—যাহার পরিধানে মলিন ছিন্ন বস্ত্র, পদদ্বয় পাদুকাহীন, অঙ্গুলিগুলি বড় বড় চাটিম কলার ন্যায়, মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ—বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্তের মুষ্টির আঘাত করিয়া, ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া বলিতেছেন, 'দি টোরীস আর রাস্কেলস' অর্থাৎ 'টোরী'রা বদমায়েস। যাহাকে তাহারা অন্যায় বা অসত্য বা অধর্ম মনে করে, তাহার প্রতি তাহাদের এতই ক্রোধ! নিম্ন শ্রেণীর লোকের অনেক সভাতে উপস্থিত থাকিয়া দেখিতাম, তাহারা যাহাকে অন্যায় মনে করে, হৃদয়মনের সহিত তাহার প্রতিবাদ করিতেছে; এবং যাহাকে সৎ মনে করে, তাহাতে মন প্রাণ ঢালিয়া দিতেছে। গড়ের উপরে এই কথা বলি যে, এই হীন শ্রেণীর লোকদের কথা শুনিয়া অনুভব করিতাম, ধর্মবিশ্বাস ইহাদের মনে স্বাভাবিক।

কোনো দরজীর দোকানে গিয়া যদি কোনো কাপড়-চোপড়ের ফরমাস দিয়া আসিতাম, এক প্রকার নিশ্চয় জানিতাম যে তাহা সময়ে পাইবই পাইব। কথা ভাঙা, কাজ করিতে বসিয়া কাজ না করা, সামান্য প্রবঞ্চনা করা, এ সকল কাজকে সে দেশের সাধারণ লোক বড় ঘৃণার চক্ষে দেখে।

নরহিতৈষণা। তৎপরে দেখিতাম, যেমন একদিকে দারিদ্র্য আছে, দুর্নীতি আছে, বিবিধ সামাজিক পাপ আছে, তেমনি আর এক দিকে সে সকল দূর করিবার জন্য শত-শত ব্যক্তির হস্ত প্রসারিত আছে। পাশ্চাত্য জগতের অন্য খৃষ্টীয় দেশে যাই নাই,

সুতরাং সে সকল দেশের নরহিতৈষী পুরুষ ও মহিলাগণের কার্যের কথা জানি না; কিন্তু ইংলণ্ডে নরহিতৈষণার যে ব্যাপার দেখিলাম, তাহা অতীব বিস্ময়জনক। মানব বুদ্ধিতে যে জনহিতকর এত প্রকার কার্য উদ্ভাবিত হইতে পারে, ইহাই আশ্চর্য! তাহার কতগুলির উল্লেখ করিব? অসংখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লণ্ডনে ডাক্তার বার্ণার্ডোর অনাথাশ্রম বাটিকা ও ব্রিষ্টলে সাধু ভক্ত জর্জ মুলার মহাশয়ের অনাথাশ্রম বাটিকা যখন দেখিলাম, তখন বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ঈশ্বরভক্তি নরহিতৈষণা বা কার্যদক্ষতা, কোন গুণের অধিক প্রশংসা করিব! তৎপরে শ্রমজীবীদিগের ইনষ্টিটিউট, 'পীপলস প্যালেস', শ্রমজীবীদিগের রবিবাসরীয় বিদ্যালয়, 'পুওর হাউস' বা দরিদ্রদিগের আশ্রয় বাটিকা প্রভৃতি যাদা দেখিতে লাগিলাম, তাহাতেই বিস্ময় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বলিতে কি, ইংলণ্ড বাস কালে আমি ঐ সকল দেখাকেই আমার একটি প্রধান কার্য মনে করিয়াছিলাম।

শিশুরক্ষিণী সভা। ইংরাজ জাতির কিরূপ নরহিতৈষণা তাহার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। আমি যখন সেখানে, তখন তিন প্রকার কাজের বিষয় আমার শ্রুতিগোচর হইল। প্রথম, মিস্টার বেনজামিন ওয়া নামে একজন পাদরী একদিন কোনো নগরের রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, একটি শিশু পথে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মুখে নানা আঘাতের দাগ, মুখ ফুলিয়া রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, তাহার পিতা বা মাতা মাতাল হইয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছে। তখন মিস্টার ওয়ার মনে-মনে প্রশ্ন উঠিল, তবে তো পিতামাতার হস্ত হইতেও অসহায় বালক-বালিকাকে রক্ষা করা চাই! এই চিন্তা লইয়া তিনি ঘরে গেলেন, এই চিন্তা তাঁহার মনকে ঘিরিয়া লইতে লাগিল, এবং তিনি বন্ধু-বান্ধবের সহিত ঐ বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহার ফলস্বরূপ 'শিশুরক্ষিণী সভা' নামে একটি সভা স্থাপিত হইল, শত-শত ব্যক্তি তাহার সভ্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন। দেখিতে-দেখিতে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। তৎপরে এই কয়েক বৎসরে সেই সভার সভ্যগণ মহাকার্য সমাধা করিয়াছেন, শিশু রক্ষার জন্য পার্লেমেন্টের দ্বারা নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। সে আইন অনুসারে শিশুদের প্রতি নির্দয়তার জন্য পিতামাতাকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। ইংলণ্ডের ন্যায় মাতাল দেশে এইরূপ আইন নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

কর্মী মেয়েদের অবসর বিনোদন। আর একটি কার্যের সূচনাও এইরূপ কারণে হইয়াছিল। একদিন এক ভদ্রমহিলা লণ্ডনের রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, বৈকাল বেলা সন্ধ্যার পূর্বে রাজপথে হাজার হাজার প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা, অর্থাৎ ১৬ হইতে ২৫ বৎসর পর্যন্ত বয়স্কা যুবতী স্ত্রীলোক বেড়াইতেছে। এরূপ দৃশ্য সেখানে নূতন দৃশ্য নহে, কিন্তু সেদিন ঐ দৃশ্য উক্ত মহিলার অন্তরে এক নূতন ভাবের উদয় করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই সকল মেয়ে মফঃসল হইতে আসিয়াছে, কাজকর্ম লইয়া এখানে বাস করে। কেহ দোকানে কাজ করে, কেহ পোস্ট আপিসে কাজ করে, কেহ হোটেলে কাজ করে। সন্ধ্যা হইলে ছুটি পায়, রাস্তাতে বেড়ায়; দশজনে 'মেস্' করিয়া থাকে, পিতামাতা নিকটে থাকে না। ইহাদিগকে দেখে কে? এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি বাড়িতে আসিলেন। স্বীয় পতির সহিত এই কথাতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং বন্ধু-বান্ধবের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিতে

লাগিলেন। ক্রমে এই চিন্তা তাঁহাকে ঘিরিয়া লইল। অবশেষে তাঁহারা কতিপয় মহিলা একত্র হইয়া একটি ছোট সভা করিলেন। প্রথমে লণ্ডনের যে বিভাগে এই শ্রেণীর বালিকা অধিক পরিমাণে বাস করে ও বেড়ায়, সেই বিভাগে একটি বড় ঘর ভাড়া করিলেন। ঘরটি উত্তম রূপে সাজাইলেন, বসিবার উত্তম আসনের ব্যবস্থা করিলেন, একটা পিয়ানো লইয়া গেলেন, গান-বাদ্যের সমুচিত ব্যবস্থা করিলেন, এবং কতিপয় মহিলা বন্ধুতে মিলিয়া কে কে সপ্তাহের কোন কোন দিন সন্ধ্যার সময় এই গৃহে গিয়া মেয়েদিগকে গান-বাদ্য শুনাইবেন ও মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা কহিবেন তাহা স্থির করিলেন। তৎপরে একদিন ছোট-ছোট কাগজে একটি ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিয়া রাজপথে ভ্রমণকারিণী বালিকাদিগের মধ্যে বিতরণ করা হইল। "তোমরা যদি অমুক নম্বর বাড়িতে নিম্ন তলের ঘরে এস, তবে তোমাদিগকে গান-বাজনা শুনানো হইবে," ইত্যাদি। প্রথমদিনে দুই একটি বালিকা আসিল। মহিলারা গান-বাজনা শুনাইলেন, তাহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন, এবং তাহারা কোথায় থাকে, কিরূপ সঙ্গে বেড়ায়, কিরূপে দিন কাটায়, এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিলেন। তাহারা সেদিন আপ্যায়িত হইয়া ফিরিয়া গেল। পরদিন সন্ধ্যার সময় বহুসংখ্যক বালিকা উপস্থিত হইল। ক্রমে আর সে ঘরে লোক ধরে না। একটির পর আর একটি এইরূপ করিয়া লণ্ডনের সেই বিভাগে ক্রমে ক্রমে সাত আটটি ঘর লইতে হইল। শত-শত যুবতী স্ত্রীলোক প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ঐ সকল গৃহে আসিয়া গান-বাজনা উপদেশাদি শুনিতে লাগিল। এদিকে উদ্যোগকারিণী মহিলাদের সভা বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। কি আশ্চর্য পরোপকার প্রবৃত্তি!

কারামুক্তের সাহায্য সভা। আর একটি কার্যের কথা তখন শুনিলাম, ইহার আয়োজন বোধ হয় পূর্ব হইতেই হইয়া থাকিবে। সে কাজটি এই। একবার কয়েকজন ভদ্রলোক এই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে, "যাহারা একবার কোনো অপরাধে লিপ্ত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহারা যখন কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, তখন বাহিরে আসিলে তো আর পূর্বের ন্যায় সমাজে মিশিতে পায় না, লোকে তাহাদিগকে কাজ দিতে ভয় পায়, ঘরে রাখিতে ভয় পায়, সমাজে তাহাদের সঙ্গে মিশিতে লজ্জা বোধ করে। তখন তাহাদের কি অবস্থা দাঁড়ায়! এই কারণেই বোধ হয় অনেক কারামুক্ত লোক আবার অপরাধে লিপ্ত হইয়া কারাগারে ফিরিয়া যায়। কারামুক্ত মানুষদিগকে সুপথে রাখিবার জন্য ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কিছু করা যায় কি না?" এই চিন্তা করিতে করিতে কতিপয় ভদ্রলোক 'কারামুক্তের সাহায্য সভা' নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ইংলণ্ডের অনেকগুলি কারাগার কয়েদীহীন হইয়াছে।

সেখানকার সহৃদয় মধ্যবর্তী শ্রেণীর পুরুষ ও নারীগণের পরোপকার স্পৃহার কথা অধিক কি বলিব! সেখানে অনেক ভদ্রমহিলা হাসপাতালে রোগীগণের নিকট ফুলের তোড়া পাঠাইবার জন্য স্থানে স্থানে সভা করিয়াছেন, নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র শিশুদিগকে বড়দিনের সময় পুতুল উপহার দিবার জন্য বড় বড় সভা করিয়াছেন, বড় বড় শহরে নিম্ন শ্রেণীর বালক-বালিকাদিগকে মধ্যে মধ্যে শহরের বাহিরে লইয়া গিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করাইবার ও প্রকৃতির শোভা দেখাইবার জন্য সভা করিয়াছেন। বস্তুত মানবের পরহিতৈষণা প্রবৃত্তি হইতে কত প্রকার সদনুষ্ঠান উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়।

আমি সে দেশে পেঁাছিবার কিছুদিন পূর্ব হইতে সে দেশের প্রজা সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা চলিতেছিল। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অশিক্ষিত শ্রমজীবীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস পাইতেছিলেন।

শ্রমজীবীদের জন্য 'টয়নবী হল' ও 'পীপলস প্যালেস'। ইহার একটু ইতিবৃত্ত আছে। মিস্টার আর্নোল্ড টয়নবী নামে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি যুবকের মনে হইল যে, তাঁহার যখন অবস্থা ভালো, উদরান্নের জন্য চিন্তা নাই, তখন তিনি তাঁহার জীবন কোনো ভালো কার্যে দিবেন; তিনি নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার প্রয়াসে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবেন। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি লণ্ডন শহরের পূর্বভাগে আসিয়া একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, কারণ ঐ বিভাগেই অধিকাংশ নিম্ন শ্রেণীর শ্রমজীবী লোকের বাস। টয়নবী প্রথম প্রথম ঐ শ্রেণীর লোকদিগকে নিজ ভবনে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের সঙ্গে পাঠ ও মৌখিক উপাসনাদি দ্বারা কার্যারম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার কার্যের আশ্চর্য ফল দেখা গেল, এবং অপর কয়েকজন শিক্ষিত যুবক আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। তাঁহারা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শ্রমজীবীদিগকে রীতিমতো শিক্ষা দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তের ফল ত্বরায় ফলিল। নৈশ বিদ্যালয় করিয়া শ্রমজীবী-দিগকে শিক্ষা দান করিবার জন্য চারিদিকে আয়োজন হইতে লাগিল। নানা স্থানে 'ওয়ার্কিং মেনস ইনষ্টিটিউট' নামে পাঠাগার সকল নির্মিত হইতে লাগিল। ক্রমে টয়নবীর মৃত্যু হইল। তখন তাঁহার স্বদেশবাসীগণ তাঁহার প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শনার্থ লণ্ডনের ঐ পূর্ব বিভাগে তাঁহার কার্য ক্ষেত্রের সন্নিধানে 'টয়নবী হল' নামে শিক্ষা-মন্দির নির্মাণ করিলেন। তাহা অদ্যাপিও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন লণ্ডনের ঐ পূর্বভাগেই 'দি পীপলস প্যালেস' অর্থাৎ 'প্রজাকুলের প্রাসাদ' নামে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মিত হইল, তাহা এক্ষণে নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষালয় রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। আমি সে প্রাসাদ দেখিয়াছি। তাহাতে নিম্ন শ্রেণীর জন্য পাঠাগার, পুস্তকালয়, রঙ্গালয়, ভোজনাগার প্রভৃতি সকলই আছে। ঐ প্রাসাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হইলে ইংরাজদের পরহিতৈষণার নিদর্শন দেখিয়া শরীর কণ্টকিত হইতে থাকে।

ইংলণ্ডে শ্রমজীবীদিগের শিক্ষালয়। আমি একদিন ওয়ার্কিং মেনস ইনষ্টিটিউটের একটি পাঠাগার দেখিতে গেলাম। একটি ১৭।১৮ বৎসর বয়স্ক শ্রমজীবী যুবক আমাকে লইতে আসিয়াছিল। সে ব্যক্তি তখন একজন সেকরার সহকারীর কাজ করিত। সে আমাকে সঙ্গে করিয়া উত্তর লণ্ডনে এক ইনষ্টিটিউটে লইয়া গেল। সে এক প্রকাণ্ড বাড়ি। প্রবেশ করিয়া দেখি, তাহাতে নানা প্রকার আলোচনা ও উপদেশাদির জন্য নানা ঘর। কোনো ঘরের দ্বারে লেখা রহিয়াছে 'কেমিষ্ট্রি'; শুনিলাম, সে ঘরে সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন সন্ধ্যার সময় কিমিতি বিদ্যা বিষয়ে উপদেশ হয়; ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, একটি ছোটখাট ল্যাবরেটারি প্রস্তুত। কোনো ঘরের দ্বারে লেখা 'ফিজিক্‌স্‌' অর্থাৎ পদার্থ বিদ্যা; ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, পদার্থ বিদ্যা বিষয়ে উপদেশের আয়োজন। এইরূপ নানা ঘরে নানা আয়োজন দেখিলাম। সম্পাদক মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম, তিনি তৎপূর্বে চৌদ্দ বৎসর কাল ঐ কাজ করিতেছেন, বেতন লন না। প্রতিদিন বৈকালে নিজের আপিস হইতে আসিয়া

আহারান্তে সন্ধ্যার সময় ইনস্টিটিউটে আসেন, এবং রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত কাজ করেন। এই পরিশ্রম চৌদ্দ বৎসর চলিয়াছে! ভাবিলাম, কি স্বদেশহিতৈষিতা ও পরহিতৈষণা!

ইনস্টিটিউটের মধ্যে দুইটি বড় ঘরে এক প্রকাণ্ড লাইব্রেরি দেখিলাম। শুনিলাম, শ্রমজীবীগণ সেই লাইব্রেরি হইতে বই লইয়া পাঠ করে। তৎপরে বাহির হইয়া উঠানে গিয়া দেখি, ছাত্র ও ছাত্রীগণের শারীরিক ব্যায়াম ও খেলার জন্য সমুদয় বন্দোবস্ত আছে। ছাত্র ও ছাত্রীগণের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র প্রাঙ্গন। বক্তৃতাদি শোনার পর সেই সকল প্রাঙ্গনে একটু খেলাও হইয়া থাকে।

শুনিলাম, এই প্রকাণ্ড ভবন দেশহিতৈষীগণের স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা নির্মিত হইয়াছে, এবং এখানে যে সকল বক্তৃতাদি দেওয়া হয়, তাহা লণ্ডন ইউনিভার্সিটির প্রফেসরগণের ও অপরাপর বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে বিনা বৃত্তিতে দিয়া থাকেন।

ইংরাজ জাতির সৎকার্যে দান। ইংরাজদিগের এইরূপ সদনুষ্ঠানে দান প্রবৃত্তি যে কিরূপ, তাহা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতে লাগিলাম। একবার শুনিলাম, ঐরূপ একটি ইনস্টিটিউটের জন্য একজন ভদ্রলোক ১০।১২ লক্ষ টাকা দান করিলেন, কিন্তু কে দিলেন জানিতে পারা গেল না। ধনী মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র, সকলেরই মধ্যে আশ্চর্য দান প্রবৃত্তির নিদর্শন দেখিতাম। যে বাড়িতে আমি থাকিতাম, সে বাড়িতে অনেক বার এইরূপ ঘটনা হইয়াছে যে, মেয়েরা সায়ংকালীন আহারের পর বৈঠকঘরে বসিয়া পড়িতেছেন ও কাজ করিতেছেন, এমন সময় একটি মেয়ে খবরের কাগজ পড়িতে-পড়িতে বলিয়া উঠিলেন, "মা, দেখ! দেখ! একটা নূতন কাজের আয়োজন হচ্ছে। আমরা কি কিছু সাহায্য করতে পারি না?" এই বলিয়া কাগজ হইতে কাজটির বিবরণ পড়িয়া শুনাইলেন। মা বলিলেন, "রোস, দেখি, দিবার মতো কি আছে।" এই বলিয়া তাঁহার হিসাবের খাতা আনিয়া হিসাব দেখিতে বসিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "আমরা পাঁচ শিলিং দিতে পারি।" তখনি মনিঅর্ডার যোগে পাঁচ শিলিং ঐ কাজের সেক্রেটারির নামে পাঠানো হইল। দেখিয়া আমি ভাবিলাম, অপরাপর অভ্যাসের ন্যায় হ্যাবিট অভ পাবলিক চ্যারিটি-ও অর্থাৎ জনহিতকর কার্যে অর্থ দান প্রবৃত্তিও সঙ্গ ও অবস্থাগুণে ফুটিয়া থাকে। যে দেশের লোকের মনে এই অভ্যাস হ্যাবিট অভ পাবলিক চ্যারিটি ফোটে নাই, সে দেশের মানুষকে ভালো কাজের জন্য দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয়। লোকে মুঠা করিয়া পয়সা ধরিয়া বসিয়া থাকে, যে জোরে মুঠা খুলিয়া লইতে পারে সেই পায়, অন্যে পায় না। আমাদের দেশের যেন এই অবস্থা।

ইংলণ্ডে অভিজ্ঞতা

ডাক্তার বার্নার্ডোর অনাথাশ্রম। সে দেশের ধার্মিক ব্যক্তিগণ পরোপকারের জন্য যে সকল কার্যের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহারও অনেকগুলি দেখিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে ডাক্তার বার্নার্ডোর প্রতিষ্ঠিত পিতৃমাতৃহীন বালকদিগের আশ্রয় বাটিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার বার্নার্ডো একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী লোক ছিলেন, চিকিৎসা কার্যে বসিয়া এই শ্রেণীর বালকদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি ইহাদের জন্য কিছু করা আবশ্যক বোধ করিলেন। কতকগুলি পিতৃমাতৃহীন বালক সংগ্রহ করিয়া লণ্ডন শহরে এক আশ্রয় বাটিকা স্থাপন করিলেন। আমার যাইবার পূর্বে কয়েক বৎসর হইতে এই কাজ চলিতেছিল। তৎপূর্বে তাঁহার আশ্রয় বাটিকা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অনেকগুলি যুবক ক্যানেডা দেশে কর্ম কাজ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। আমরা যখন তাঁহার আশ্রয় বাটিকা দেখিবার জন্য গেলাম, তখন গিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কিসের অধিক প্রশংসা করিব, ইংরাজের কার্যের ব্যবস্থা করিবার অদ্ভুত শক্তির, অথবা পরহিতৈষণার। কাজের এরূপ সুব্যবস্থা জীবনে কখনো দেখি নাই, এরূপ পরোপকার প্রবৃত্তিও দেখি নাই।

জর্জ মুলারের অনাথাশ্রম। এইরূপ আর একটি আশ্রয় বাটিকা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। সেটি ব্রিষ্টল নগরের সুপ্রসিদ্ধ জর্জ মুলারের প্রতিষ্ঠিত অনাথাশ্রয় বাটিকা। ইহার ইতিবৃত্ত অতি অদ্ভুত। কিরূপে জর্জ মুলার এক পয়সা ভিক্ষা না করিয়া, চাঁদা না তুলিয়া, কেবলমাত্র ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা করিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা ৬৩ বৎসর এই সকল আশ্রয় বাটিকাতে এক কালে সহস্রাধিক পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকাকে রাখিয়া প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন, তাহার ইতিহাস অতীব বিস্ময়কর, ও ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেরই পাঠের যোগ্য। আমি গিয়া দেখিলাম, পাঁচটি আশ্রয় বাটিকাতে প্রায় দুই সহস্র বালক-বালিকা প্রতিপালিত হইতেছে। তাহাদের জন্য পাঁচটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি নির্মিত হইয়াছে, যাহার জানালার সংখ্যাই এগারো শত। ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা ও মানুষের স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা এই সকল ভবন নির্মিত হইয়াছে। ভবনে প্রবেশ করিয়া প্রথমে শিশুদের ঘরে গেলাম। গিয়া দেখি, দুইজন স্ত্রীলোক ২০।২৫টি শিশুকে লইয়া খেলা দিতেছেন ও রক্ষা করিতেছেন। তৎপরে অপরাপর গৃহও দেখিলাম। কি সুব্যবস্থা, কি রক্ষা ও শিক্ষার রীতি; দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

কোয়েকারদের সমাজসেবা। কোয়েকার সম্প্রদায় ভুক্ত কয়েক ব্যক্তি নিয়ম করিয়াছিলেন

যে, প্রতি রবিবার প্রাতে একটি ভবনে তাঁহারা শ্রমজীবীদিগকে একত্র করিয়া ধর্মোপদেশ দিবেন। আমাকে একদিন দেখিবার জন্য ডাকিয়াছিলেন। আমি গিয়া তাঁহাদের যে কার্যপ্রণালী দেখিলাম, তাহা এই। প্রায় শতাধিক শ্রমজীবী একত্র হইয়াছে। প্রথমে একটি বড় ঘরে তাহাদিগকে লইয়া আধঘণ্টা কাল উপাসনা করা হইল। তাহার পর তাহাদিগকে আর একটি ঘরে আনিয়া আধঘণ্টা কাল দুই প্রকার কাজ চলিল। প্রথম, ব্যাঙ্কের কাজ আরম্ভ হইল। শ্রমজীবীগণ সপ্তাহের মধ্যে যে যাহা সঞ্চয় করিয়াছে তাহা জমা দিতে লাগিল। দ্বিতীয়ত, অপর দিকে অনেকে লিখিবার খাতা খুলিয়া এ বি সি ডি লিখিতে বসিয়া গেল, এবং যাহা লিখিয়া আনিয়াছে তাহা শিক্ষকদিগকে দেখাইতে লাগিল। আমি দেখিলাম, ৩০।৩৫ বৎসর বয়সের বুড়ো মন্দেরাও এ বি সি ডি লিখিয়া দেখাইতেছে। তৎপরে ধর্মোপদেশের জন্য চারি-পাঁচ ঘরে ক্লাস বসিল। এক-এক ক্লাসে এক-একজন ভদ্রলোক শিক্ষকের আসন অধিকার করিয়া উচ্চ আসনে বসিলেন। আমাকে তাহার এক ঘরে উচ্চ আসনে শিক্ষকের পাশে বসাইয়া দিলেন। তৎপরে যেভাবে কার্য আরম্ভ হইল, তাহা এই। শিক্ষক বলিলেন, "গত রবিবার অমুক ব্যক্তিকে বাইবেলের অমুক-অমুক স্থান পড়িয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি যদি উপস্থিত থাকেন, উঠে দাঁড়ান, এবং সেই স্থান পড়ে কি উপদেশ পেয়েছেন বলুন।" অতঃপর সমবেত শ্রমজীবীদের মধ্যে একজন উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বাইবেলের কোন কোন স্থান পড়িয়া কি উপদেশ পাইয়াছে বলিতে প্রবৃত্ত হইল। বক্তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও ভাবগ্রাহিতা দেখিয়া আমার আশ্চর্য বোধ হইতে লাগিল। শিক্ষক আমাকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন, আমি কিছু বলিলাম না; কিন্তু অপর কয়েকজনে কিছু কিছু বলিলেন। অবশেষে শিক্ষক তাঁহার উপদেশ দিয়া উপসংহার করিলেন। এইরূপে একঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল। যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহাতে আপনাকে উপকৃত বোধ করিলাম।

ইংলণ্ডের মুক্তি ফৌজ। আমি ইংলণ্ড বাস কালে মুক্তি ফৌজের (স্যালভেশন আর্মি) কাজ-কর্ম বিশেষ ভাবে দেখিতাম, তাঁহাদের সভা-সমিতির সংবাদ পাইলেই উপস্থিত থাকিবার চেষ্টা করিতাম। একবার 'আলেগ্জাণ্ড্রা প্যালেস' নামক কাচ মন্দিরে তাঁহারা এক বিরাট সভা করিলেন। তখন সভ্যগণের, বিশেষত জেনারেল বুথের পুত্র-কন্যা-গণের, যে উৎসাহ দেখিয়াছিলাম, তাহার বর্ণনা হয় না। আমি উক্ত প্রাসাদে পদার্পণ করিবামাত্র মেয়ের পর মেয়ে আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। "আপনি কি স্যাল্ভেশনিষ্ট? আপনি কি খৃষ্টান?" যেই বলি "না," আর কোথায় যায়! অমনি চীৎকার, তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হয়। একটি মেয়ের হাত ছাড়াইলে আর একটির হাতে পড়ি। মুক্তি ফৌজের কার্যে স্ত্রীলোকদিগেরই বিশেষ উৎসাহ দেখিলাম। শুনিলাম, জেনারেল বুথের পুত্রবধূ, ব্রামওয়েল বুথের পত্নী, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর লণ্ডনের রাস্তায় ঘোরেন, এবং বারাঙ্গনাদিগের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিয়া তাহা-দিগকে বিপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন।

একদিন আমি ইঁহাদের প্রধান কর্মস্থান দেখিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া জেনারেল বুথের বাস ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন মিসেস বুথ বোধ হয় অসুস্থ ছিলেন। জেনারেল বুথ আসিতে পারিলেন না। তাঁহার পুত্র ব্রামওয়েল বুথ আমাকে লইয়া তাঁহাদের সাধন গৃহ দেখাইতে লাগিলেন। আমি যেদিকেই চাই, সেইদিকেই দেখি, প্রাচীরের গায়ে লেখা আছে, "যীশু তোমাদিগকে ডাকিতেছেন," "যীশুর চরণে

মতি রাখ," "যীশুর চরণে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাদিগকে বল দিবেন," ইত্যাদি, ইত্যাদি। সমুদয় প্রাচীর যীশুর গুণগানে পরিপূর্ণ, ঈশ্বরের নাম কোথাও নাই। দেখিয়া আমি কিছু বিষণ্ণ হইয়া গেলাম। আমার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া ব্রামওয়েল বুথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?" আমি বলিলাম, "কেবল যীশু-যীশু দেখিতেছি, ঈশ্বরের নাম কোথাও নাই, সেই জন্য আমার দুঃখ হইতেছে; আপনারা যীশুরূপ পর্দা দিয়া একেবারে ঈশ্বরকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন।" ব্রামওয়েল বুথ হাসিয়া বলিলেন, "আপনি কি জানেন না, যীশুই আমাদের ঈশ্বর? যীশু ঈশ্বরের অপর নাম মাত্র।" আমি ভাবিতে লাগিলাম, অবতারবাদে ভক্তবৎসল ভগবানের স্বরূপকে কি চাপা দিয়াই ফেলিয়াছে! এই ভাবিতে ভাবিতে ঘরে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম।

ইংলণ্ডে শিক্ষার ব্যবস্থা। কিণ্ডারগার্টেন স্কুল। ইংলণ্ডের শিক্ষাপ্রণালী দেখিবার জন্য কিণ্ডারগার্টেন স্কুল, বোর্ড স্কুল, 'আপার মিড্‌ল্‌ ক্লাস' স্কুল প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়াছিলাম। কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলাম। শিশুদিগকে হাতে কলমে শিক্ষা দিবার যে এত প্রকার উপায় উদ্ভাবন হইতে পারে, তাহা অগ্রে জানিতাম না। তাহাদিগকে খেলার ভিতর দিয়া নানা প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তাহারা মাটি দিয়া ছোটখাট বাড়ি গড়িতেছে, নানা রঙের কাগজ দিয়া অন্য প্রকার পদার্থ নির্মাণ করিতেছে। শিক্ষয়িত্রীরা আমাকে লইয়া সকল বিভাগ দেখাইলেন। অবশেষে একজন শিক্ষয়িত্রী যখন শিশুদিগের সহিত করতালি দিয়া নাচিতে-নাচিতে ঘরে ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া দেখিতে লাগিলাম। শিশুদের এই শিক্ষাপ্রণালী আমার এত ভালো লাগিয়াছিল যে, আমি আসিবার সময় কিণ্ডারগার্টেনের প্রতিষ্ঠাতা ফ্রোবেলের জীবনচরিত ও উক্ত শিক্ষাপ্রণালীর কয়েকখানি গ্রন্থ কিনিয়া আনিলাম। তাহা আমি পরে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের পুস্তকালয়ে উপহার দিয়াছি।

বোর্ড স্কুল। বোর্ড স্কুলের শিক্ষাপ্রণালীও বড় চমৎকার বোধ হইল। বিশেষত বালকগণ মানসাঙ্কে যেরূপ অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখাইল, তাহা কখনো ভুলিবার নয়। শিক্ষক দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এততে এত যোগ কর, তাহা হইতে এত বিয়োগ কর, তাহার ফলকে এত দিয়া গুণ কর, তাহার ফলকে এত দিয়া ভাগ কর, ইত্যাদি, ইত্যাদি।—কি ফল দাঁড়াইল, বল। যে ছেলে ঠিক করেছে সে হাত তুলুক।" যেই বলা, অমনি একটি ছেলে হাত তুলিল, এবং ফলটি বলিয়া দিল।

'আপার মিডল ক্লাস' স্কুল। আপার মিডল ক্লাস স্কুলে গিয়া দেখি, ভূগোল ও ভূতত্ত্ব বিদ্যাতে বালকদের অদ্ভুত পারদর্শিতা। সমগ্র পৃথিবীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ যেন তাহাদের নখের আগায় রহিয়াছে। তাহার পর সেখানে আর এক ব্যাপার দেখিলাম। এক এক শ্রেণীতে ২৫। ৩০ জন ছাত্রের বেশি হইবে না, কিন্তু একই সময়ে দুইজন শিক্ষক কার্য করিতেছেন।

বালিকাদিগের বোর্ডিং স্কুল। কেবলমাত্র বালকদিগের স্কুল দেখিয়া ক্ষান্ত হই নাই। একটি বালিকাদিগের বোর্ডিং স্কুলও দেখিতে গিয়াছিলাম। কি শৃঙ্খলা, কি পরিষ্কার

পরিচ্ছন্নতা! কি পাঠ ক্রীড়া প্রভৃতির সুনিয়ম! যাহা দেখি, তাহাতেই চমৎকৃত হইতে হয়! অবশেষে তত্ত্বাবধায়িকা যে গৃহে বালিকারা শয়ন করে তাহা দেখাইতে লইয়া গেলেন। দেখিলাম সেটি একটি হাসপাতালের ঘরের ন্যায় বড় হল, তাহাতে অনেক-গুলি বালিকার শয়নের শয্যা আছে। হলের এক পার্শ্বে একটি উচ্চ কাঠের মঞ্চ। একজন শিক্ষয়িত্রী বালিকাদের সঙ্গে একঘরে শয়ন করেন, তাঁহার শয্যাটি ঐ মঞ্চের উপর রহিয়াছে। আমি তত্ত্বাবধায়িকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শিক্ষয়িত্রী কাঠের মঞ্চের উপর শয়ন করেন কেন?" তিনি বলিলেন, "ওখানে শুইয়া শুইয়া বালিকাদের গতিবিধি দেখা যায়।"

লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরি। লণ্ডন বাস কালে আমি অনেকদিন ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে গিয়া পড়িয়াছি। শুনিয়াছি, সেখানে এত বইয়ের আলমারি আছে যে, একটির পাশে আর একটি দাঁড় করাইলে ছয় মাইল পূর্ণ হইতে পারে, অথচ কাজের কি সুব্যবস্থা! পাঠক একখানি নূতন বই চাহিবামাত্র ৫ মিনিটের মধ্যে বইখানি আসিয়া উপস্থিত। এই লাইব্রেরির বাতিক ইংরাজগণের এক প্রধান বাতিক। ভদ্রলোকদের বাড়িতে গিয়া দেখিতাম যে, তাঁহাদের পাঠাগারে মেজে হইতে ছাদ পর্যন্ত পুস্তকের আলমারিতে পরিপূর্ণ। পথ ঘাট গলি ঘুচি সর্বত্রই পুস্তকালয়। সামান্য ব্যয়ে সকল শ্রেণীর মানুষ পড়িবার সুবিধা পায়। ইহাতেই প্রমাণ ইংরাজদের জ্ঞান স্পৃহা কত প্রবল।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষালয়ের মধ্যে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কলেজ সকল দেখিতে গিয়াছিলাম। অক্সফোর্ডে গিয়া মনে হইল, হায়! একদিনের জন্য এই সকল বিদ্যা মন্দির দেখিতে না আসিয়া যদি ছয়মাস কাল বা একবৎসর কাল এখানে থাকিতে পারিতাম, নিশ্চয় বিশেষ উপকৃত হইতাম! কলেজ-গুলি দেখিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন হিন্দু শিক্ষা প্রণালীর কথা মনে হইতে লাগিল। আমাদের প্রাচীন নিয়ম এই ছিল যে, ছাত্রগণ পঠদ্দশায় ব্রহ্মচর্য ধারণ করিবে এবং গুরুকুলে বাস করিবে। সেখানে দেখিলাম, ছাত্রগণ সকলেই অবিবাহিত ও ব্রহ্মচর্যে আছে, এবং কলেজ ভবনগুলিতে গুরুগণের সহিত একত্রে বাস করিতেছে। সেই সকল ভবনের হাওয়াতেও যেন জ্ঞান ও সদালোচনা রহিয়াছে। অক্সফোর্ডের বড্‌লিয়ান লাইব্রেরি যখন দেখিতে গেলাম, তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইলাম। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের লাইব্রেরি দেখিয়া যেরূপ বিস্মিত হইয়াছিলাম, ইহাও তদ্রূপ।

কেম্ব্রিজ। অক্সফোর্ড হইতে আসিয়া কেম্ব্রিজে গমন করি। ঘটনা ক্রমে সেদিন বড় দুর্যোগ হইল। ঘুরিয়া সকল কলেজ দেখিতে পাইলাম না। কেবল মিলটন ও ডারুইনের কলেজ দেখিয়া আসিলাম। তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়া হৃদয়ে অপূর্ব ভাবের উদয় হইল।

কেম্ব্রিজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ই. বি. কাউয়েল। এই কেম্ব্রিজ পরিদর্শন কালের আর একটি ঘটনা স্মরণ আছে। ঋষিপ্রতিম ই. বি. কাউয়েল, যিনি এক সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর ও সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, যাঁহার সাধু চরিত্রের সংশ্রবে আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের কতিপয় ছাত্র খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়, তিনি তখন

সংস্কৃতের অধ্যাপক রূপে কেম্ব্রিজে বাস করিতেছিলেন। অধ্যাপকতা করিবার জন্য তাঁহাকে কলেজে যাইতে হইত না, কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষার্থী ছাত্রগণ তাঁহার ভবনে আসিয়া পড়িয়া যাইত। সেই প্রবীণ মানুষ যখন শুনিলেন যে, ভারতবর্ষের একজন নেতৃস্থানীয় লোক কেম্ব্রিজের কলেজ সকল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন, তখন সেই দুর্যোগের ভিতরেও, আমি যে বন্ধুর বাড়িতে উঠিয়াছিলাম, তাঁহার ভবনে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমি বাল্যকালে সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সময় তাঁহাকে আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ রূপে দেখিয়াছিলাম, এবং কিরূপে তাঁহার সাধুতার দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। এখন দেখিলাম সেই সাধু পুরুষ পলিতকেশ, স্থবির; তাঁহার শুভ্র শ্মশ্রুজাল নাভিকে অতিক্রম করিয়া নামিয়াছে; চক্ষুদ্বয়ে ও মুখের আকৃতিতে গভীর জ্ঞানানুরাগ ও সাধুতার দেদীপ্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলাম। তাঁহাকে বালককালে কি দেখিয়াছিলাম, এবং তিনি আমার জীবনে সত্যানুরাগ কিরূপে উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা যখন বলিলাম, এবং মিউটিনির হাঙ্গামা থামিলে নববর্ষে পারিতোষিক বিতরণের সময় তিনি যে সংস্কৃত কবিতাটি রচনা করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন তাহা যখন আবৃত্তি করিলাম, তখন তিনি বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন, এবং কেবলমাত্র আমাকে বুকে জড়াইয়া কোলে লইতে বাকি রাখিলেন। তাঁহার রচিত সেই কবিতাটি এই—

বিদ্যালয়ঃ স্বালয়মেত্য সাম্প্রতম্
সমৃদ্ধ-কীর্তির্ভুবনে ভবিষ্যতি।
তথাহি সানৌ মলয়স্য নান্যতঃ
ধ্রুবং সমারোহতি চন্দনদ্রুমঃ॥

অর্থাৎ কলেজ আপনার বাড়িতে আসিয়া উন্নতি লাভ করিয়া জগতে বিখ্যাত হইবে। তাহা তো হইবেই, কারণ মলয় পর্বতের সানুদেশেই চন্দন বৃক্ষ বাড়িয়া থাকে।

এই কবিতাটি আবৃত্তির পর আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ যেন আবার জাগিয়া উঠিল। তিনি আমার কাছে বসিয়া সংস্কৃত কলেজ, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রভৃতির কথা বলিতে লাগিলেন, এবং কেম্ব্রিজে দেখিবার উপযুক্ত কি আছে তাহাও জানাইলেন। দুঃখের বিষয় এই দুর্যোগের জন্য সমুদয় দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু বহুদিন পরে সাধু কাউয়েলের সহিত সম্মিলনে যেন সকল অভাব পূর্ণ করিল। সেই সম্মিলন আমার নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

আচার্য জেমস মার্টিনোর সহিত সাক্ষাৎ। অপর যে যে স্মরণীয় মানুষ সেখানে দেখিয়াছিলাম, এবং যাঁহাদিগের সহিত পরিচিত হইয়া আপনাকে উপকৃত বোধ করিয়াছিলাম, তাঁহাদের বিষয় কিছু কিছু উল্লেখ করিতেছি। প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি, ইউনিটেরিয়ানদিগের নেতা ও গুরু আচার্য জেমস মার্টিনো। তিনি নিজের ধর্মজ্ঞান, চিন্তাশক্তি ও সাধুতার দ্বারা জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বিষয়ে আমি আর অধিক কি বলিব? তাঁহার সঙ্গে একদিন মাত্র দেখা হইয়াছিল, কিন্তু সেই একদিন এ জীবনে চিরস্মরণীয় দিন হইয়া রহিয়াছে। আমি যখন লণ্ডনে, তখন ডাক্তার মার্টিনো সকল কার্য হইতে অবসৃত হইয়া স্কটলণ্ডের কোনো নিভৃত প্রদেশে বাস করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে অক্সফোর্ড হইতে ডিগ্রী দিবার জন্য তাঁহার প্রতি এক

নিমন্ত্রণ গেল। তিনি ডিগ্রী লইয়া স্কটলণ্ডে ফিরিবার সময় দুই দিন লণ্ডনে বাস করিয়া গেলেন। এই সংবাদ পাইয়া আমি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। অর্ধঘণ্টা তাঁহার সঙ্গে ছিলাম কি না সন্দেহ। সেই অর্ধ ঘণ্টার মধ্যেই ধর্মজীবনের অনেক গুরুতর তত্ত্ব ব্যক্ত করিলেন। তন্মধ্যে একটি এই: "কেবলমাত্র ভ্রম ও কুসংস্কারের প্রতিবাদ ও চিন্তার স্বাধীনতার উপরে ধর্মসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পথে এই এক বিপদ আছে যে, ধর্মভাবসম্পন্ন ভক্তিপ্রধান ব্যক্তিদিগকে সেইরূপ সমাজে তৃপ্ত করিয়া রাখা যায় না। দেখ, আমারই স্বসম্পর্কীয় কতকগুলি লোক আমাদের অবলম্বিত ইউনিটেরিয়ান ধর্মে অতৃপ্ত হইয়া ত্রিত্ববাদী খৃষ্টীয় দলে প্রবেশ করিয়াছে, এবং এরূপ লোকও দেখা গিয়াছে, যাহারা একেবারে নিরীশ্বরবাদে উপনীত হইয়াছে।" তাঁহার প্রধান কথাগুলি যেন আমার কানে লাগিয়া রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, সামহাও মেন ডু নট স্টে উইথ আস, অর্থাৎ যে কারণেই হউক, আমাদের সম্প্রদায়ে মানুষ আসিয়া অধিক দিন থাকে না। তৎপরে ইউনিটেরিয়ান পরিবারে সন্তানদিগের ধর্মশিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না বলিয়া দুঃখ করিলেন। ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণের ধর্মভাব ও ভক্তিপ্রবণতার বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন। আমি যখন উঠিয়া আসিতেছি, তখন সিঁড়ী পর্যন্ত আমার সঙ্গে আসিয়া, আমি যখন নামিতেছি তখন সিঁড়ীর উপর হইতে আমাকে বলিলেন, গিভ আস এ লিটল অভ ইয়োর মিস্টিসিজম অ্যাণ্ড টেক ফ্রম আস এ লিটল অভ আওয়ার প্রাকটিকাল জীনিয়স। আমি ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম, দুই কথায় দুই জাতির বিশেষ ভাবটি কি সুন্দর রূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন! প্রাচ্য ভক্তিপ্রবণতা ও প্রতীচ্য কর্মশীলতা মিলিত হইলে যে আদর্শ ধর্মজীবন গঠিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ওয়েলসবাসিনী মিস কব্‌। দ্বিতীয় স্মরণীয় ব্যক্তি কুমারী কব্‌। ইংলণ্ড যাত্রার পূর্ব হইতেই আমি তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম। তাঁহার বিমল ভক্তি ও প্রগাঢ় ধর্মভাব আমার মনকে প্লাবিত করিয়াছিল। আমি যখন লণ্ডনে, তখন তিনি ওয়েলস প্রদেশে এক নিভৃত স্থানে বাস করিতেছিলেন। কিরূপে তাঁহার সঙ্গে দেখা হয়, এই চিন্তাতে যখন মগ্ন আছি তখন একদিন শুনিলাম, তিনি লণ্ডনে আসিয়াছেন, আসিয়া এক বন্ধুর ভবনে স্থিতি করিতেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দেখিবার জন্য ধাবিত হইলাম। গিয়া যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহা কখনো ভুলিবার নয়। মানুষের মুখ যে এত প্রসন্ন প্রফুল্ল ও পবিত্র হইতে পারে, এই আশ্চর্য! কুমারী কবের মুখ যেন প্রেমে ও আনন্দে মাখা! তিনি হাসিয়া প্রাণ খুলিয়া আমার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, এবং প্রেমে যেন আমার মনকে মাখাইয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মসমাজ এদেশে কি কাজ করিতেছেন, সে বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; এবং তিনি কি ভাবে ওয়েলসে বাস করিতেছেন, ও নিরীহ পশুদিগের রক্ষার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগের এক সভাতে আমাকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধ ক্রমে আমি একদিন কিছু বলিয়াছিলাম।

ফ্রান্সিস নিউম্যানের ভবনে কয়েকদিন। তৃতীয় স্মরণীয় ব্যক্তি ফ্রান্সিস নিউম্যান। ইনি তখন সকল কার্য হইতে অবসৃত হইয়া সমুদ্রকূলবর্তী ওয়েস্টনসুপার-মেয়ার নামক

স্থানে বাস করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য সেখানে গমন করি, এবং দুইদিন তাঁহার ভবনে থাকি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অশীতি বৎসরের অধিক হইবে। সেই শীতপ্রধান দেশে হাত পা ঠিক রাখিতে পারেন না; তাঁহার স্ত্রী কাপড় পরাইয়া দেন, হাত ধরিয়া আনেন, তবে নিচে আসেন। যে দুইদিন সে ভবনে ছিলাম, সে দুইদিন দেখিলাম যে, প্রাতে নিচে আসিয়া তাঁহার প্রথম কর্ম ভগবানের নাম করা। সে উপাসনাতে তাঁহার পত্নী, বাড়ির রাঁধুনী, চাকরানী, প্রভৃতি সকলে উপস্থিত থাকিতেন। তিনি প্রথমে কোনো ধর্মগ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পাঠ করিতেন, তৎপরে তাঁহার নিজের প্রণীত প্রার্থনা পুস্তক হইতে একটি প্রার্থনা পাড়িতেন। আহার করিতে গিয়া দেখি, তিনি ভোজনের টেবিলের নিকট আসিলেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ সাধু অগ্রে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া তবে আহার করিতে বসিলেন। দ্বিতীয় দিনে আহার করিতে বসিয়া আমাকে বলিলেন, "তুমি যেখানে যেখানে যাইবে, একেশ্বরবাদীদিগকে বলিও, তাহারা যেন নাস্তিকের মতো পৃথিবীতে বাস না করে। স্বীয়-স্বীয় গৃহ ও পরিবারে ঈশ্বরের নাম ও উপাসনাকে যেন সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে।" আমি তাঁহার পাঠাগারে গিয়া দেখি, তাঁহার প্রণীত যে সকল গ্রন্থের কথা জানিতাম না, সেই সকল গ্রন্থে পাঠাগার পূর্ণ। তিনি যে এত ভাষা জানিতেন ও এত বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা আমার ন্যায় তাঁহার অনুগত ভক্তদিগেরও অবিদিত ছিল। দুই-দিন তিনি আমাকে সমুদ্রতীরে লইয়া গিয়া অনেক উপদেশ দিলেন।

রেভারেন্ড চার্লস ভয়সীর পরিবারে একদিন। চতুর্থ স্মরণীয় ব্যক্তি, থিইস্টিক চার্চের আচার্য রেভারেন্ড চার্লস ভয়সী। আমি লন্ডনে থাকিবার সময় মধ্যে-মধ্যে ইঁহার উপাসনা মন্দিরে যাইতাম। তিনি যেমন সময়ে অসময়ে খৃষ্টীয় ধর্মের ও যীশুর দোষ কীর্তন করিতেন, তাহা আমার ভালো লাগিত না; কিন্তু যে ভাবে উদার আধ্যাত্মিক সার্বভৌমিক ধর্মের সত্য সকল ব্যক্ত করিতেন, তাহাতে আমার মন মুগ্ধ হইত। তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইলে, তিনি তাঁহার বাড়িতে আহারের জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন ভয়সী গৃহিণী ও তাঁহার পুত্র-কন্যাগণের সঙ্গে আমার আলাপ হইল। তাঁহারা একেবারে আমাকে নিজের লোকের মতো করিয়া লইলেন। তাহার পর একদিন ভয়সী সাহেবের অনুরোধে তাঁহার উপাসনা মন্দিরে উপদেশ দিলাম। সেই উপদেশে ব্রাহ্মসমাজ কি কি কাজে হাত দিয়াছে ও কি করিতেছে, তাহার বর্ণনা করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মগণ এদেশে কিরূপ সামাজিক নিগ্রহ সহ্য করিতেছেন, তাহারও কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছিলাম। যত দূর স্মরণ হয়, সেই বিবরণ উপস্থিত ব্যক্তিদিগের অনেকের ভালো লাগিয়াছিল। একটা কথা বিশেষভাবে মনে আছে। উপাসনা মণ্ডপ হইতে নামিয়া পার্শ্বের ঘরে আসিয়া ভয়সী সাহেব ও ভয়সী গৃহিণীর সহিত কথা কহিতেছি, তখন মিস্টার ভয়সীর কনিষ্ঠা কন্যা, যাহার বয়স তখন ২৭।২৮ বৎসর হইবে, আমাকে আর কথা কহিতে দেয় না; আমাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া বার-বার বলিতে লাগিল, "মিস্টার শাস্ত্রী, ব্রাহ্মসমাজ আমার সমাজ, ভারতবর্ষ আমার দেশ, আমি তোমার সঙ্গে যাব; আমাকে নেবে কি না, বল না?" আমি ২।১বার বলিলাম, "রোস, কথা কহিতে দাও।" সে দেরি তার সয় না, আবার ঠেলিয়া বলে, "আমাকে সঙ্গে নেবে কি না, বল না?" তখন আমি ভয়সী গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলাম, "আপনার মেয়ে তো আমার সঙ্গে চলিল!" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "যাওয়ার অর্থ কি, তা ও এখনও বোঝে না। তা মন্দ কি!

ওকে নিয়ে যাও।" ভয়সী সাহেবের একটি মেয়ে সিন্ধু দেশের একটি ব্রাহ্ম যুবককে বিবাহ করিয়া এ দেশে আসিয়াছে, সে সেই মেয়েটি কি না জানি না।

ইহার পরে আমি দেশে ফিরিলে, ভয়সী সাহেব তাঁহার মুদ্রিত উপদেশ সপ্তাহে-সপ্তাহে আমার নিকট পাঠাইতেন, সর্বদা চিঠি পত্র লিখিতেন, এবং মধ্যে-মধ্যে আমার কাজের জন্য অর্থ সাহায্য করিতেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই আত্মীয়তা রক্ষা করিয়াছিলেন।

পেলমেল গেজেট সম্পাদক উইলিয়াম স্টেডের বাড়িতে। পঞ্চম স্মরণীয় ব্যক্তি উইলিয়ম স্টেড সাহেব। ইনি তখন পেলমেল গেজেটের সম্পাদকতা করিতেন। কুমারী কলেট পত্রের দ্বারা তাঁহার সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। আমি প্রথমে পেলমেল গেজেটের আপিসে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি, এবং আসামের কুলিদের অবস্থা ও কুলি আইনের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া, সে বিষয়ে ইংলণ্ডের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য অনুরোধ করি। তিনি বিশেষভাবে আরও কিছু শুনিবার জন্য একদিন আমাকে তাঁহার বাড়িতে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করেন। আমি গিয়া দেখিলাম, তিনি আহারের পূর্বে আপনার শিশু সন্তানদিগকে লইয়া পাশের এক-ঘরে একান্তে বসিয়াছেন এবং নানা রূপ গল্পগাছা করিয়া উপদেশ দিতেছেন। আমি আসিয়াছি জানিবামাত্র আমাকে সেই ঘরে ডাকিয়া লইলেন। আমি গিয়া বসিলে বলিলেন, "আমি বড় কাজে ব্যস্ত মানুষ, দিনের অধিকাংশ সময় কাজে ব্যস্ত থাকি; দৃঢ়তার সহিত সন্তানদের সঙ্গে কিছু সময় যাপন করবার নিয়ম না রাখলে, উহাদের শিক্ষা ও উন্নতির প্রতি দৃষ্টি থাকবে না। এই জন্য নিয়ম করেছি যে, সায়ংকালীন আহারের পূর্বে একঘণ্টা কাল উহাদের সঙ্গে বসবই বসব।" আমি বলিলাম, "এটা বড় ভালো।" তাহার পর তিনি আমার সমক্ষেই তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। দেখিলাম, অতি সহজ ভাষায় এমন সকল জ্ঞাতব্য বিষয় তাহাদের গোচর করিতেছেন, যদ্দ্বারা তাহাদের বিশেষ উপকৃত হইবার সম্ভাবনা।

আহারের পর আমি আসামের কুলিদের অবস্থা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি চেয়ারে বসিয়া বলিতেছি, স্টেড ঘরের এধার হইতে ওধারে বেড়াইতেছেন, এবং "তারপর," "তারপর" করিতেছেন। ইহা লইয়া একটা হাসাহাসি উপস্থিত হইল। আমি হাসিয়া বলিলাম, "তুমি যে আমাকে জুঅলজিক্যাল গার্ডেনের বাঘের কথা স্মরণ করাইতেছ, একটু বসো না।" স্টেড বলিলেন, আই ক্যানট মেক মাই মাইণ্ড সিট ডাউন (আমি আমার মনকে বসাইতে পারি না)। আমি হাসিয়া বলিলাম, "আধ ঘণ্টা বসিবে, তাও প্পার না? আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে চল, আমি দেখাইয়া দিব, আমাদের দেশের সাধুরা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধ্যানে বসিয়া আছেন।" স্টেড করতালি দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ, বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি। আমি ভাবিতাম, এত কোটি মানুষকে আমরা কি করিয়া জিনিয়া লইলাম? এতদিনের পর বুঝিলাম। তোমরা চোখ মুদিয়া থাকিয়াছ, আমরা পশ্চাৎ হইতে মারিয়া লইয়াছি!" ইহা লইয়া খুব হাসাহাসি চলিতে লাগিল।

আর একদিনের কথা মনে আছে, সেদিনও তিনি আমাকে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেদিন আহারের পর আমি তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নীকে প্রেততত্ত্ব ও মানসিক প্রেরণার (টেলিপ্যাথি) বিষয়ে কিছু বলিলাম। তৎপূর্বে লণ্ডনের কোনো পরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়া যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা বর্ণন করিলাম। সে বিষয়টি এই।

একদিন আহারের পর সে বাড়ির মেয়েরা আমাকে এক খেলা দেখাইলেন। একটি মেয়ে আমাকে পাশের একঘরে লইয়া গিয়া রুমাল দিয়া আমার দুই চক্ষু বাঁধিলেন। বাঁধিয়া বলিলেন, "তোমাকে বৈঠকঘরে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে দাঁড় করিয়ে দেব। নিজে একটা কিছু ইচ্ছা রাখবে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে; তার পর চলতে ইচ্ছা হলে চলবে, কিছু করতে ইচ্ছা হলে করবে, তাতে বাধা দিবে না। আমি তোমার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত দিয়ে থাকব মাত্র। এই বলিয়া মেয়েটি আমার চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া আমাকে বৈঠকঘরে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল, এবং নিজে আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কাঁধে হাত দিয়া রহিল। আমি যথাসাধ্য মনটা নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিলাম। ক্রমে চলিতে ইচ্ছা হইল, সেই চোখবাঁধা অবস্থাতেই অগ্রসর হইলাম; হাত বাড়াইতে ইচ্ছা হইল, হাত বাড়াইলাম; একটা চেয়ারের উপর হইতে একখানা কাপড় তুলিতে ইচ্ছা হইল, তুলিলাম; অমনি চারিদিকে করতালি ধ্বনি উঠিল। তাড়াতাড়ি চক্ষের বাঁধন খুলিয়া শুনি, সেই গৃহস্থিত পুরুষ ও নারীগণ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে চোখ-বাঁধা মানুষটি আসিলে তাহা দ্বারা ঐ কাপড়টি তুলাইতে হইবে, এবং আমি ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইলে সেই প্রকার ইচ্ছা করিতেছিলেন। অবশ্য যে মেয়েটি আমার পশ্চাতে ছিল, সেও ঐ বিষয় জানিত এবং সেও সেই প্রকার ইচ্ছা করিতেছিল। আমি যে বিষয়ে কিছুই জানিতাম না সেরূপ কাজ আমা দ্বারা হইল, ইহা দেখিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলাম।

স্টেড ও তাঁহার পত্নীর নিকট যখন এই কথা ব্যক্ত করিলাম, তখন স্টেড হাসিয়া বলিলেন, "তাও নাকি হয়! আমাকে কিছু জানতে দেবে না, আর আমার দ্বারা কাজ করিয়ে নেবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।" আমি বলিলাম, "এসো, আমি করে দেখাই।" তৎপরে পাশের ঘর হইতে স্টেড সাহেবের চোখ বাঁধিয়া আনা হইল। আমি কাঁধে হাত দিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইলাম, কিন্তু তাঁহার দ্বারা যে কাজ করাইব স্থির ছিল, তাহাতে কৃতকার্য হওয়া গেল না। আমি বলিলাম, "তুমি মনটা নিগেটিভ্ করিয়া রাখিতে পার নাই, আমার ইচ্ছাকে বাধা দিয়াছ।" তাহার পর তাঁহার ঘরের এক কোণে একটা টুপিতে একটা পয়সা রাখিয়া, মিসেস স্টেডের চোখ বাঁধিয়া আনিলেন। আমি তাঁহার পিঠে হাত দিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইলাম। তিনি বরাবর ঘরের কোণে গেলেন, অবনত হইয়া টুপির মধ্যে হাত দিলেন, কিন্তু পয়সাটি তুলিলেন না। এতটা দেখিয়া স্টেড কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। তাহার পর তাঁহার এক কন্যার চোখ বাঁধিয়া আনা হইল। এবার স্থির হইল, সে নির্দিষ্ট একটি জিনিস লইয়া তাহার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিবে। সে আসিয়া দাঁড়াইলে আমি তাহার কাঁধে হাত দিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই সে চলিতে আরম্ভ করিল এবং সেই জিনিসটি তুলিয়া লইয়া চোখ-বাঁধা অবস্থাতেই নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতার দিকে চলিল। তখন পিতা মাতা ভাই বোন, সকলে মিলিয়া ছোট ছেলেটির হাতের পাশে হাত পাতিলেন। চোখ-বাঁধা মেয়েটি একে-একে সকলের হাত ছুঁইয়া পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে ছোট ভাইটির হাতেই জিনিসটি দিল। তখন স্টেড আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তবে তো ইহার ভিতর কিছু আছে। এক মনের শক্তির দ্বারা যদি আর এক মনের ও শরীরের উপরে এরূপ কাজ করা যায়, তবে কেন পরলোকগত আত্মারা এ জগতের মানুষের উপর কাজ করবে না?" আমি বলিলাম, "তাই তো বটে, আমিও তো তাই বলি।" ইহার পর আমি এদেশে চলিয়া আসিলাম। কিছুদিন পরে শুনি, স্টেড প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা ব্যক্ত করিতেছেন। তাঁহার প্রকাশিত

পত্রিকা ও পুস্তকে তাহার অনেক প্রমাণ পাইতে লাগিলাম। কিন্তু আমি যে ঘটনার কথা বলিতেছি, সে সময়ে তাঁহার সে প্রকার ভাব কিছুই দেখি নাই। তাহাতে অনুমান করি, অপরাপর ঘটনার মধ্যে এটিও তাঁহার চিত্তকে ঐ দিকে প্রেরণ করিয়া থাকিবে।

যে-যে ব্যক্তির নাম বিশেষ রূপে উল্লেখ করিলাম, তদ্ব্যতীত আরও কয়েকজন অগ্রগণ্য পুরুষ ও নারীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। যথা, অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্‌, অধ্যাপক জন এষ্টলিন কার্পেণ্টার, রেভারেণ্ড ষ্টপফোর্ড ব্রুক, মিসেস ফসেট, মিসেস জোসেফাইন বাটলার।

মিসেস বাটলারের নারী আন্দোলন। ইঁহাদের মধ্যে মিসেস বাটলারকে দেখিয়া মনে যেন নব শক্তি পাইয়াছিলাম। তিনি তখন যেভাবে কার্য করিতেছিলেন, তাহাতে নারীকুলের মধ্যে এক আশ্চর্য শক্তি সঞ্চার হইতেছিল। যে সময়ে তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তখন তিনি আইরিশ নেতা পার্নেলের পক্ষে ছিলেন; কিন্তু অচিরকালের মধ্যে পার্নেলের দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ পাইলে মিসেস বাটলারের দল তাঁহার বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করিলেন, এবং নারীগণের খড়্গাঘাতে পার্নেল দাঁড়াইতে না পারিয়া অকালে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। ইংলণ্ডের নারীশক্তি কিরূপে সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করিতেছে, তাহা এদেশের লোক জানে না। এদেশের প্রাচীন ভাবাপন্ন অনেক মানুষের মত এই যে নারীগণকে সামাজিক স্বাধীনতা দিলে সামাজিক পবিত্রতা থাকিবে না। ঠিক ইহার বিপরীত কথা সত্য, নারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতার উপরেই সামাজিক শক্তি ও পবিত্রতা নির্ভর করে।

ইংলণ্ডের নারীসমাজ

ইংলণ্ডে নারী জাতির উন্নত অবস্থা। ইংলণ্ডে গিয়া যাহা প্রধান রূপে আমার চক্ষে পড়িল এবং যাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম, তাহা নারীজাতির উন্নত অবস্থা। আমি প্রায় প্রতিদিন দেখা হইলেই দুর্গামোহনবাবুকে বলিতাম, "দুর্গা-মোহন বাবু এ তো মেয়েরাজার দেশ, মেয়েদের গুণেই এ দেশ এত বড়।" তিনি বলিতেন, "তাই তো! এখন বুঝিতেছি, কেন নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের মেয়েদের মতন মেয়ে দাও, আমি ফ্রান্সকে সামাজিক ভাবে বড় করিয়া তুলিতেছি।" বস্তুত ইংলণ্ডে গিয়া আমার এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ইংলণ্ডের মহত্ত্বের পশ্চাতে ইংলণ্ডের নারীগণ।

আমি ধনী-রমণীগণের সহিত মিশিবার অবসর পাইতাম না, সুতরাং তাঁহাদের স্বভাব চরিত্রের কথা কিছু বলিতে পারি না; মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে মিশিতাম, সুতরাং তাঁহাদের বিষয়ই জানি। এ দেশের লোক অবরোধ প্রথার মধ্যেই বর্ধিত, সুতরাং তাঁহাদের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল যে নারীগণ স্বাধীন ভাবে সর্বত্র গতায়াত করিলে তাহারা আপনাদের চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিবে না। এ যে কি ভ্রান্ত ধারণা, তাহা একবার ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণের সহিত মিশিলেই বুঝিতে পারা যায়।

আমি যখন সেখানে গিয়াছিলাম, তখন নারীকুলের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য, নারীকুলের রাজনৈতিক অধিকার স্থাপনের জন্য, নারীকুলের সর্ববিধ উন্নতি বিধানের জন্য, নানা চেষ্টা চলিতেছিল। তাহার ফলস্বরূপ নারীগণের মধ্যে এক নূতন ভাব ও উন্নতি স্পৃহা দেখা দিয়াছিল। সকল ভালো কাজে, সকল উন্নতির চর্চাতে, সকল আলোচনাতে, সকল সদনুষ্ঠানে নারীদিগকে দেখিতাম। কোনো সদনুষ্ঠানের সভাতে গিয়া দেখি, অর্ধেকের অধিক নারী; কোনো প্রসিদ্ধ ধর্মাচার্যের উপদেশ শুনিতে গিয়া দেখি, নারীদের ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে হয়; কোনো বন্ধুর ভবনে কোনো সদালোচনার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া দেখি, অর্ধেকের অধিক নারী।

নিম্ন শ্রেণীর মধ্যবিত্ত পরিবারে নারীদিগের পড়ার অভ্যাস। দুই-একটি বিষয় উল্লেখ করিলেই সেখানে নারীগণের কি অবস্থা দেখিয়াছিলাম, তাহা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমি যাঁহাদের ভবনে থাকিতাম তাঁহাদের বর্ণনা অগ্রেই করিয়াছি। তাঁহাদিগকে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যবিত্ত পরিবার বলিলেও হয়। তাঁহারা দ্বার-জানালার পরদা সেলাই করিয়া বিক্রয় করিয়া খাইতেন। অথচ বৃদ্ধ পিতাকে প্রতি সোমবার

গৃহের নারীগণের পাঠের জন্য মুডীর সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকালয় হইতে এক তাড়া বই আনিতে হইত। সপ্তাহকাল গৃহের তিন কন্যা ও তাহাদের মাতা ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিতেন। সেগুলি ফিরাইয়া দিয়া আবার সোমবার নূতন পুস্তক আসিত। কোনো দিন সায়ংকালীন আহারের পর মহিলাদের বসিবার ঘরে যদি উঁকি মারিতাম, দেখিতাম যে তাঁহারা সকলেই পাঠে গভীর নিমগ্ন আছেন। এই পাঠ রাত্রি ১১টা ১২টা পর্যন্ত চলিত। গৃহস্বামীর বড় মেয়েটি ভোজনের সময় আমার পার্শ্বে ভোজনে বসিতেন। আমি ইংরাজ কবি শেলি ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভক্ত, ইহা দেখিয়া তিনি আমাকে শেলির অনেক কবিতা মুখে-মুখে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন; এবং শেলির প্রতিভার প্রশংসা করিতেন। আমি একদিন এডুইন আর্নল্ডের লিখিত 'ইন্ডিয়ান আইডিলস' নামক কবিতা পুস্তক কিনিয়া আনিয়া মেয়েটিকে উপহার দিলাম। বলিলাম, "এই কবিতাগুলি তুমি পড়; পরে তোমার মুখে শুনিব, আমাদের দেশের প্রাচীন কবিতা তোমার কেমন লাগিল।" ঐ গ্রন্থে রামায়ণ মহাভারত হইতে সাবিত্রী চরিত প্রভৃতি অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। মেয়েটি পুস্তকখানি পাইয়াই সেই রাত্রে প্রায় ১টা ২টা পর্যন্ত পড়িল। তৎপর দিন প্রাতে আহারে বসিয়া আমাকে বলিল, "ও মিস্টার শাস্ত্রী, তোমাদের সাবিত্রীর ছবি কি সুন্দর! কি সুন্দর! কত দিন পূর্বে এ ছবি আঁকা হয়েছে?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "যীশু জন্মাবার দুই-চারিশত বৎসর পূর্বে কি পরে, ঠিক বলিতে পারি না।" তখন মেয়েটি বলিল, "যে জাতি এতদিন পূর্বে এই সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে, সে জাতি তো সামান্য জাতি নয়।"

ইংলণ্ডে বাসকালে আমি ব্রাহ্মসমাজের একখানি ইতিবৃত্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি যাহা লিখিতাম, তাহা কুমারী কলেটকে পড়িয়া শুনাইতাম। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত বিষয়ে তাঁহার মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তি অতি অল্পই ছিল। তিনি যাহা সংশোধন করিবার উপযুক্ত মনে করিতেন, তাহা সংশোধন করিয়া লওয়া হইত। তৎপরে আমার পুস্তক কপি করে কে, এই প্রশ্ন উঠিলে, কুমারী কলেট বলিলেন, "আমি তোমাকে একটি মেয়ে দিচ্ছি, সে তোমার লেখা কপি করে দেবে, তাকে প্রত্যেক একশত শব্দের জন্য এক পেনি করে দিও।" এই বলিয়া সেই মেয়েটির ইতিবৃত্ত আমাকে কিছু বলিলেন। তাহার মাতার মৃত্যুর পর তাহার পিতার মতিগতি বদলাইয়া গিয়াছে। পানাসক্তি ও অপরাপর চরিত্রদোষ দেখা দিয়াছে। সে বেচারি বাধ্য হইয়া পিতার ভবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাসা লইয়াছে। নিজে উপার্জন করিয়া খায়, এবং প্রতিদিন দুপুরবেলায় কয়েকঘণ্টা গিয়া পিতার সঙ্গে বাস করে, ঘর পরিষ্কার করে, জিনিসপত্র গুছায়, পিতার সেবা করে এবং তাঁহাকে ভালো পথে আনিবার চেষ্টা করে। রাত্রে সে বাড়িতে থাকিতে পারে না।

এই যুবতীর বিষয়ে একটি ঘটনা স্মরণ আছে, তাহা এই। একদিন সন্ধ্যার সময় মেয়েটি কপি লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। তখন আমি বেড়াইতে বাহির হইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছি। কপিগুলি লইয়া মেয়েটিকে পয়সা দিয়া বলিলাম, "দাঁড়াও, আমি বাহিরে যাইতেছি, দুজনে এক সঙ্গে বাহির হইব।" দুইজনে বাহির হইলাম। রাস্তাতে আসিয়া বলিলাম, "চল, তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত বেড়াইতে বেড়াইতে যাই।" এই বলিয়া তাহার বাড়ির দিকে চলিলাম। সে প্রায় দেড় মাইল পথ। কিন্তু আমরা পথের কথা ভুলিয়া গেলাম। কথা প্রসঙ্গে প্রাচীন য়িহুদী জাতির ইতিবৃত্তের বিষয়ে কথা পড়িল। আমি ওল্ড টেসটামেন্ট ও কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত

একখানি প্রাচীন য়িহুদী ইতিবৃত্ত পড়িয়া যাহা জানিয়াছিলাম, তাহা বলিতে লাগিলাম। কথায় কথায় দেখিলাম, মেয়েটি সে বিষয়ে এত দূর অভিজ্ঞ এবং এত কথা বলিতে লাগিল, যাহা আমি অগ্রে স্বপ্নেও ভাবি নাই। এই আলাপে মগ্ন হইয়া আমরা তাহার বাড়ির দ্বারে গিয়া পেঁাছিলাম। কোথা দিয়া সময় যাইতেছে, তাহা মনে নাই। তাহার বাড়ির দ্বার হইতে দুইজনে ফিরিয়া আবার আমার বাসার অভিমুখে চলিলাম। অবশেষে আমাদের বাসার সন্নিকটে আসিয়া ঘড়ি খুলিয়া দেখি, আহারের সময় সন্নিকট, তাহারও কার্যান্তরে যাওয়া প্রয়োজন। তখন সে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। মেয়েটি চলিয়া গেলে ভাবিতে লাগিলাম, যে মেয়ে একশোটা শব্দ লিখিয়া এক পেনি করিয়া পায়, সে মেয়ে আমা অপেক্ষা জ্ঞানে এত অগ্রসর যে, তাহার সহিত কথা কহিয়া আমি আপনাকে উপকৃত বোধ করিতেছি; এ দেশে জ্ঞান চর্চা কি প্রবল! ইহাও মনে হইল, প্রজা সাধারণের মধ্যে জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানস্পৃহা প্রবল থাকা নর-নারীর সম্মিলনের মধ্যে পবিত্রতা রক্ষা হওয়ার একটি প্রধান উপায়। এই যে দুই ঘণ্টা কাল দুইজনে কথাবার্তাতে মগ্ন ছিলাম—আমি যে পুরুষ এবং ও যে মেয়ে, তাহা মনেই ছিল না। কোথা দিয়া সময় গেল তাহা জানিতেই পারিলাম না।

বাঙালী যুবকের চিত্তবিক্ষেপ কাহিনী। ইংরাজ সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, একটি বিষয়ের উল্লেখ করিলেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। আমার সেখানে অবস্থান কালে একটি বাঙালী যুবকের মুখে যে ঘটনার কথা শুনিয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ করিতেছি। ঐ যুবকটি মফঃসলে কোনো স্থানে বাস করিতেন। সেখানে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক যুবকদম্পতীর গৃহে বাসা লইয়াছিলেন। তাহাদের বাড়ির বাহির দিকে একটি দোকান ছিল, তাহাতে কিছু আয় হইত; এবং তদ্ভিন্ন তাহারা বাড়ির মধ্যে একটি ঘরে একটি ভাড়াটিয়া লইত, তাহার ঘরভাড়া ও খাই-খরচ হিসাবে কিছু পাইত। বাড়িতে চাকর-বাকর ছিল না, মেয়েটিই সব কাজ করিত। মেয়েটির বয়স তখন ২২।২৩এর অধিক হইবে না। আমাদের বাঙালী যুবকটির বয়স বোধ হয় ২৬।২৭ হইবে। মেয়েটির পতিরও ঐ বয়স। আমাদের বাঙালী যুবক বড় সৎলোক, তাঁহাকে পাইয়া যুবকদম্পতী আনন্দিত ছিল। কিন্তু এদিকে এক বিপদ উপস্থিত। মেয়েটি সরল ভাবে যখন যুবকটির কাছে আসে, চা আনিয়া দেয়, ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া আনে, এটা ওটা করিতে বলে, নির্জন গৃহে কাছে আসিয়া "কেমন আছ, তোমার মুখ কেন শুকনো" প্রভৃতি প্রশ্ন যখন জিজ্ঞাসা করে, তখন আমাদের বাঙালী যুবকটির চিত্ত বড় বিচলিত হয়। কিন্তু ছেলেটি ভালো বলিয়া সে মনে-মনে এই সংগ্রাম নিবারণ করে, মেয়েটিকে কিছুই জানিতে দেয় না। এই অবস্থাতে সে অবশেষে স্থির করিল যে, সে-বাড়িতে আর তার থাকা উচিত নয়; কখন কি বলিয়া ফেলিবে, কখন কি করিয়া বসিবে, তার ঠিক কি! একটা মহা ক্লেশকর ব্যাপার ঘটিবে। সে অন্যত্র বাসা লইবে, এইরূপ স্থির করিয়া, একদিন সায়ংকালীন আহারের সময় কারণ নির্দেশ না করিয়া যুবকদম্পতীকে ঐ সঙ্কল্প জানাইল। তাহারা উভয়েই মহা দুঃখিত হইয়া তাহাকে থাকিবার জন্য ব্যগ্রতা সহকারে অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন আর সে অধিক কিছু বলিতে পারিল না; সে যে ঘোর প্রলোভন ও সংগ্রামের মধ্যে বাস করিতেছে, তাহা জানিতে দিল না। দুশ্চিন্তাতে রাত্রে তাহার

ভালো নিদ্রা হইল না। পরদিন দুপুরবেলা মাথা ধরিয়া সে অসময়ে কলেজ হইতে বাড়িতে আসিল। তখন একাকিনী সেই মেয়ে ঘরে আছে, পতি দোকানে। সে আসিয়া মেয়েটিকে বলিল, "দেখ, আজ মাথাটা বড় ধরেছে, আমাকে এক পেয়ালা চা করে দিতে পার?" মেয়েটি বলিল, "পারি বৈ কি!" এই বলিয়া চা প্রস্তুত করিতে গেল। চা লইয়া আমাদের যুবকের নির্জন বৈঠকগৃহে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হয়েছে? কেন মাথা ধরেছে? তোমার মুখ বড় খারাপ দেখাচ্ছে, রাত্রে কি ঘুমাও নাই? তোমার মনে কোনো অসুখ নিশ্চয় আছে; কি, তা বল না। আমাদের দ্বারা যদি দূর হয়, আমরা তা করতে রাজি আছি।" ইত্যাদি।

এই সন্ধিক্ষণে আমাদের যুবকটি মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। মনের আবেগে তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিল, "তুমি বসো, আমি বলিতেছি।" এই হাত ধরিবার ভাবে ও মুখের ভাবেই মেয়েটিও আসল কথা বুঝিতে পারিল। এতদিন তাহার কাছে যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিল, "এ কি, মিস্টার অমুক! তুমি না বিবাহিত লোক? তোমার না দেশে স্ত্রী আছে? ভারতবর্ষের বিবাহিত মানুষেরা কি এরূপ ব্যবহার করতে পারে?"

তাহার পর আমাদের সেই যুবকটির মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহা এই : মেয়েটির এই কথাতে আমার যেন মনে হইল যে আমার বুকে একখানা শাণিত ছোরা বসাইয়া দিল! আমার মাথা ভোঁ-ভোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, আমি তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলাম। মেয়েটি কিয়ৎক্ষণ নির্বাক দাঁড়াইয়া থাকিয়া চায়ের পেয়ালাটা আমার টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। আমি আর চা কি খাইব, চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পর উঠিয়া তাহার পতিকে এক পত্র লিখিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই। "আমি যে তোমাদের বাড়ি ছাড়িয়া যাইতেছিলাম তাহার কারণ এই যে, তোমার স্ত্রীকে দেখিয়া প্রলুব্ধ হইতেছিলাম, যদিও সে বেচারি কিছু জানিত না। আজ আমি তাহাকে নির্জন ঘরে পাইয়া মনের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া অপমান করিয়াছি। কিরূপ অপমান করিয়াছি, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে। এখন তুমি আমার নিকট কি প্রতিশোধ চাও, জানাইবে। যদি তুমি পদাঘাত করিয়া আমাকে তাড়াও, তাহাতে দুঃখিত হইব না; যদি অর্থদণ্ড কর, কত অর্থ দিতে হইবে তাহা জানাইবে; আর আমার নিকট যাহা প্রাপ্য হইয়াছে, তাহার একটি বিল দিবে। কল্য প্রাতেই আমি তোমাদের ভবন পরিত্যাগ করিব। তোমার স্ত্রীকে আমায় মাপ করিতে বলিবে। আর আমি আজ সন্ধ্যার সময় তোমাদের সহিত আহার করিব না; আমার খাদ্যদ্রব্য আমার ঘরের টেবিলে রাখিতে বলিবে, আমি বেড়াইয়া আসিয়া রাত্রে আহার করিব।"

সন্ধ্যার সময় এই পত্র তাহার পত্নীর হাতে দিয়া আমি বেড়াইতে গেলাম। তাহার পর রাত্রে আসিয়া দেখি, আমার টেবিলের উপর আমার খানা রহিয়াছে। আহার করিয়া শয়ন করিলাম। প্রাতে উঠিয়া আমার জিনিসপত্র বাঁধিতেছি, এমন সময়ে দেখি মেয়েটি চা লইয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়াই আমি লজ্জাতে মুখ অবনত করিলাম। মেয়েটি বলিল, "তুমি আমার স্বামীকে যে পত্র লিখেছ, তা আমি পড়েছি। তুমি বড় ভালো লোক। দেখ, এরূপ প্রলোভন আমাদের অনেকের পথে আসতে পারে; ঈশ্বরের নাম করে তাকে দূরে ফেলে দিলেই হল। তোমার ও-প্রলোভন থাকবে না। তুমি আমাকে বোনের মতো দেখ না? আমাকে

বোন ভেবে আমার মুখের দিকে চাও না? আমিই তোমাকে বল দেব। আমি ও আমার স্বামী দুজনেই পরামর্শ করেছি, তোমাকে কখনো যেতে দেওয়া হবে না। তুমি আমাদের বন্ধু, এমন বন্ধু সহজে পাওয়া যায় না।" তাহার পর আমি সেই গৃহেই রহিলাম। তদবধি আমি তাহাদের বন্ধুই আছি।

নিম্ন শ্রেণীর মধ্যবিত্ত মেয়েদের স্বভাব চরিত্র যখন এই, তখন সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, উচ্চ শ্রেণীর মধ্যবিত্ত নারীদের স্বভাব চরিত্র কিরূপ।

ইংলণ্ডে নারীস্বাধীনতার স্বরূপ। পূর্বে যে বলিয়াছি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণ স্বাধীনভাবে সকল স্থানে সকল আলোচনাতে সকল কাজে যোগ দেন, তাহাতে যেন কাহারও মনে না হয় যে তাঁহাদের মধ্যে সামাজিক শাসন নাই। এমন কঠিন সামাজিক শাসন অল্পই দেখা যায়। আমি যাঁহাদের বাড়িতে থাকিতাম, সে বাড়িতে যদি কোনো দিন বাহিরের দরজার চাবি সঙ্গে লইয়া যাইতে ভুলিতাম, এবং ফিরিতে অনেক রাত্রি হইত, তাহা হইলে দেখিতাম, দ্বারে আসিয়া আঘাত করিলেই সিঁড়ীতে উপর হইতে নামিবার খটখট শব্দ শোনা গেল। একটি মেয়ে আসিয়া দ্বারের চাবি খুলিয়া দিলেন, কিন্তু আমি খট করিয়া দ্বার খুলিতে না খুলিতেই তিনি অন্তর্ধান। আমি উপরের দিকে চাহিয়া সিঁড়ীর উপরে নাইট-গাউন-পরা নারীমূর্তির পৃষ্ঠদেশ মাত্র দেখিতে পাইলাম। ছয়-সাত মাস তাঁহাদের বাড়িতে ছিলাম, মেয়েরা যে কোন ঘরে ঘুমাইত তাহা জানিতাম না। সে দেশে মেয়েদের শয়ন ঘরে পুরুষের প্রবেশের ন্যায় নিন্দনীয় কাজ আর কিছুই নাই। মেয়ে-পুরুষে বৈঠকঘরে বসা, মেশা, রাস্তাঘাটে একত্রে বেড়ানো নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু আদব কায়দার এত বাঁধাবাঁধি যে, তাহার একটু লঙ্ঘন করিলে বন্ধুতার বিচ্ছেদ ঘটে। মনে কর, একটি মেয়ের সঙ্গে দুইদিন হইল আলাপ পরিচয় হইয়াছে; এরূপ অবস্থাতে হঠাৎ যদি পত্রে একটু ভালোবাসার ভাষা ব্যবহার করিলাম, অমনি তাহাদের বাড়িতে কথা উঠিল, "এ তো লক্ষণ ভালো নয়! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!" অমনি আর তাহার নিকট হইতে উত্তর আসিল না, হয়তো তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী গম্ভীর ভাবে জ্ঞাতব্য কথাটা জানাইল। আমি বুঝিলাম, আমাকে দশ হাত দূরে ফেলাই উদ্দেশ্য, আর বন্ধু ভাবে লইবে না। এইরূপ আদব কায়দার অনেক বাঁধন আছে, স্বাধীনতার সঙ্গে শাসনও আছে।

একটি কোয়েকার পরিবার। ইংলণ্ডের নারীগণের উন্নত অবস্থার প্রমাণ স্বরূপ আর একটি বিষয় স্মরণ আছে। সমার্সেটশিয়ারে 'স্ট্রীট' নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে ইম্পী নামক কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত একটি পরিবার বাস করেন। সে পরিবারে পুরুষ কেহ নাই, বিধবা মাতা ও দুইটি অবিবাহিতা কন্যা। তাঁহাদের পিতা কৃষি কার্যের উপযুক্ত বীজ বিক্রয়ের কাজ করিতেন। সেই কাজে তিনি বেশ উপার্জন করিতেন, এবং মৃত্যুকালে যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে বড়কন্যাটি পিতার কাজে গিয়া বসিলেন, এবং পূর্বোক্ত ব্যবসায়ে আরও কোনো কোনো ব্যবসায় যোগ করিয়া কারবার ফাঁপাইয়া তুলিলেন। অপরাপর ব্যবসায়ের মধ্যে তাঁহারা যে একটা মহা ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, তাহার কথা বলি। সে জেলাতে অনেক আপেল ফল উৎপন্ন হয়। সে দেশে লোকে আপেল ফলে মদ প্রস্তুত করে, সুতরাং আপেলের ব্যবসা খুব চলে। আমি যে পরিবারটির কথা বলিতেছি, তাঁহারা সকলেই সুরাপানবিদ্বেষী, সুতরাং তাঁহারা মায়ে-ঝিয়ে এই পরামর্শ করিলেন যে,

আপেল হইতে যদি জেলি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা যায়, তবে হাজার হাজার আপেল সুরার ব্যবসা হইতে তুলিয়া লইয়া আহারের কাজে লাগানো যাইতে পারে। এই পরিবারের জননী স্বীয় ভ্রাতার সহিত এই পরামর্শ করিয়া উভয়ের অর্থ সাহায্যে একটি জেলি প্রস্তুত করিবার কল খাড়া করিলেন। ভাই হইলেন স্লীপিং পার্টনার, অর্থাৎ অর্থ দিলেন মাত্র, কাজে বসিলেন না; ভগিনী হইলেন ম্যানেজিং পার্টনার, অর্থাৎ কার্যাধ্যক্ষ।

এই পরিবারের ছোটকন্যা পূর্ব হইতে ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগিণী ছিলেন, এবং আমাদের অনেকের নাম শুনিয়াছিলেন। তিনি আমাকে লণ্ডনে বার-বার পত্র লিখিতে লাগিলেন যে, আমাকে একবার তাঁহাদের গ্রামে ও তাঁহাদের বাড়িতে যাইতেই হইবে। তাঁহার পত্রে বার-বার দেখিতে লাগিলাম, "একবার আসিয়া দেখ, তিনজন মেয়ে জীবনকে কিরূপে চালাইতেছে।"

একবার সেই ছোটকন্যা ক্যাথারিন লণ্ডনে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিলেন এবং আমাকে ষ্ট্রীটে লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমি, ইঁহাদের ভবনে কিছুদিন যাপন করিবার পরে প্রফেসর এফ. ডবলিউ. নিউম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব, এই মানসে লণ্ডন হইতে যাত্রা করিলাম। ইঁহাদের ভবন হইতে ফিরিবার সময় প্রফেসর নিউম্যানের ভবনে দুইদিন অতিথি রূপে ছিলাম, তাহার বর্ণনা পূর্বেই করিয়াছি।

ষ্ট্রীটের রেলওয়ে স্টেশনে গিয়া দেখি, ক্যাথারিন গাড়ি লইয়া উপস্থিত। অর্ধ দণ্ডের মধ্যে আমার জিনিসপত্র গাড়িতে উঠিল, ক্যাথারিন আমাকে পাশে বসাইয়া গাড়ি হাঁকাইয়া চলিলেন। দুপুরবেলা বাড়িতে পৌঁছিয়া তাঁহার মাতাকে দেখিলাম; তাঁহার দিদিকে দেখিলাম না, তিনি তখন তাঁহার আপিসে আছেন। আমাকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইয়াই ক্যাথারিন বলিলেন, "চল, বেড়াইয়া আসি।" এই বলিয়া আমাকে এক নির্জন পাহাড়ের উপর বনের ভিতর লইয়া গেলেন। গিয়া বলিলেন, "আমার ধর্মজীবনের অবস্থার বিষয় তোমাকে বলিবার জন্য এই নির্জনে আনিয়াছি। আমি প্রাতঃকাল হইতে হাঁটিয়া বড় ক্লান্ত আছি. আমি এই ঘাসের উপর শুইয়া কথা কহিব, তুমি কিছু মনে করিও না।" এই বলিয়া আমার সম্মুখে ঘাসের উপরে শুইয়া পড়িলেন, এবং নিজের ধর্মজীবনে কিরূপে কি কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বলিতে লাগিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। তিনি পঠদ্দশাতে একজন সহাধ্যায়িনী বালিকার ভ্রাতার সংশ্রবে আসিয়া ব্রাডল'র দলের নাস্তিকদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্যাথারিনের মাতা ও ভগিনী কিন্তু গোঁড়া খৃষ্টান। তাঁহার ভাব পরিবর্তনের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া জননী ও ভগিনী বড়ই দুঃখিত হন। কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহাকে ত্বরায় এই নাস্তিকতা হইতে উদ্ধার করেন। তখন তাঁহার মত সার্বভৌমিক একেশ্বরবাদে দাঁড়ায়। এই সময়ে ঘটনাক্রমে ব্রাহ্মসমাজের কথা জানিতে পারিয়া তিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। শেষে মনে-মনে সঙ্কল্প করেন যে, অবিবাহিতা থাকিয়া ঈশ্বর ও মানবের সেবাতে আপনার দেহ মনের সমুদয় শক্তি অর্পণ করিবেন। তাহাই তখন করিতেছেন।

আমি দুইদিন ইঁহাদের ভবনে থাকিয়া অপূর্ব ব্যাপার দেখিলাম। অগ্রেই বলিয়াছি, তাহা স্ত্রীলোকের বাড়ি, পুরুষের নাম গন্ধ নাই; চব্বিশঘণ্টার মধ্যে একটি পুরুষের মুখ দেখা যায় না। যেরূপে তাঁহাদের দিন যাইত, তাহা এই। বড়-কন্যাটির ধর্মভাব বড় প্রবল। তিনি ভোরে উঠিয়া নানা প্রকার ধর্মগ্রন্থ বা ভালো

ভালো উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিতে থাকেন, এবং নিজে উপাসনা করেন। প্রাতঃকাল হইবামাত্র যে যে অংশ বড় ভালো লাগিয়াছে তাহা দাগ দিয়া, ছোট ভগিনী ক্যাথারিনের মাথার বালিশের নিচে রাখিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে আপিসের জন্য প্রস্তুত হন। ৭টার সময় প্রাতরাশের ঘণ্টা পড়ে। তখন গিয়া দেখি মা, জ্যেষ্ঠাকন্যা, কনিষ্ঠাকন্যা, অপর দুই চারিটি ভদ্রমহিলা, ও চাকরানীরা উপাসনা স্থলে উপস্থিত। সে উপাসনা নূতন ধরনের। গান হইল না, কেহ মুখে প্রার্থনা করিলেন না; জ্যেষ্ঠাকন্যা কোনো ধর্মগ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পড়িয়া শুনাইলেন, তৎপরে সকলে মুদ্রিত নেত্রে দশ পনরো মিনিট ঈশ্বর ধ্যানে নিযুক্ত থাকিলেন। তৎপরে প্রাতরাশ সমাপন হইল। দেখিলাম, ইঁহারা নিরামিষাশী পরিবার, টেবিলে মাছ-মাংসের গন্ধও নাই।

এই যে দুই-একটি অপর স্ত্রীলোক দেখিলাম, তাঁহাদের বিবরণ এই। মা ও জ্যেষ্ঠাকন্যা নিজ-নিজ পরিশ্রমের গুণে যখন বিষয়ের উন্নতি করিতে লাগিলেন, তখন তিন মায়ে-ঝিয়ে বসিয়া এই পরামর্শ করিলেন যে, জগদীশ্বর যখন সম্পদ দিতেছেন, তখন তাঁহার কাজে তাহা লাগাইতে হইবে। তাঁহাদের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে একটি বাড়ি নির্মাণ করিয়া তাহাতে হাসপাতালের মতো রাখিতে হইবে। তাহাতে ডাক্তার, দাসদাসী, সকলি থাকিবে। তাঁহাদের মহিলা বন্ধুদিগের মধ্যে যে কেহ পীড়িত হইয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য তাঁহাদের নিকট আসিয়া থাকিতে চাহিবেন, তাঁহারা ঐ হাসপাতালে আসিয়া থাকিবেন। এই পরিবারের ব্যয়ে তাঁহাদের পরিচর্যা হইবে। গিয়া শুনিলাম, এইরূপ দুই চারিটি মেয়ে সর্বদাই ঐ ভবনে আছেন।

এতদ্ভিন্ন তাঁহারা আর একটি পরামর্শ এই করিলেন যে, তাঁহারা ক্যাথারিনকে একখানি গাড়ি ও দুইটি ঘোড়া দিবেন; ক্যাথারিন তাহাতে চড়িয়া ষ্ট্রীট গ্রামের চারিদিকে চারি পাঁচ মাইলের মধ্যে কৃষক ও শ্রমজীবীদের ভবনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদিগকে সুরাপান ছাড়াইবার চেষ্টা করিবেন, এবং তাহাদের শিশুদিগের শিক্ষাদির ব্যবস্থা করিবেন। ক্যাথারিন তখন সেই কাজে নিযুক্ত। তিনি একদিন বৈকালে আমাকে দেখাইবার জন্য এক গ্রামে কৃষকদের সভা আহ্বান করিলেন। গিয়া দেখি, ৫০।৬০ জন কৃষক চা খাইবার জন্য এক প্রকাণ্ড টিনের ঘরে উপস্থিত। ক্যাথারিন আমাকে তাহাদের অনেকের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। তাহাদের মধ্যে কে-কে তাঁহার চেষ্টাতে সুরাপান ছাড়িয়াছে, তাহা আমার কানে-কানে বলিতে লাগিলেন।

একদিন তিনি আমাকে তাঁহাদের নিজ গ্রামের টাউনহলে লইয়া গেলেন। গিয়া শুনি, প্রসিদ্ধ জন ব্রাইটের জামাতা এই গ্রামে বাস করেন, এবং তাঁহার একটি জুতার কল ও কারবার আছে। তিনি এ টাউনহলটি নির্মাণ করিয়া তথাকার কৃষক ও শ্রম-জীবীদের ব্যবহারার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। সেই হলে পাঠাগার, নাট্যাগার, পুস্তকালয়, ভোজনাগার, প্রভৃতি সকলি দেখিলাম। ঐ হলে ব্রাহ্মসমাজের মত, বিশ্বাস ও কার্য-কলাপের বিষয়ে আমি কিছু বলিলাম। জন ব্রাইটের কন্যা তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতান্তে উঠিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতেছি না; কিন্তু ভারতবর্ষের নারীকুলের জন্য ইঁহারা যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, সে জন্য ইঁহাদের মস্তকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ-পুষ্পের বৃষ্টি হউক।" সে কথাগুলি আমি কখনো ভুলিব না। কেবল তাহা নহে, তাঁহার মুখখানি আমার মনে দৃঢ় মুদ্রিত রহিয়াছে। আমি এমন পবিত্র নারীমূর্তি অল্পই

দেখিয়াছি। এরূপ সৌজন্য, এরূপ হ্রীশীলতা, এরূপ পবিত্রতা যে নারীমূর্তিতে থাকে, তাহা একবার দেখাও জীবনের একটা পরম লাভ।

তৎপরে ফিরিবার সময় ক্যাথারিন বলিলেন, "এই সকল শিক্ষার উপায় বিধানের আয়োজনের ফল কি হইয়াছে, চল তোমাকে এক কৃষকের ঘরে লইয়া দেখাই।" এই বলিয়া এক কৃষকের ঘরে আমাকে লইয়া গেলেন। সে ব্যক্তি তখন ঘরে ছিল না। প্রবেশ করিয়া দেখি, সেটি যেন একটি ল্যাবরেটরি; এত প্রকার কল, আরক, শিশি বোতল প্রভৃতি রহিয়াছে! একপার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড পুস্তকের আলমারি। ক্যাথারিন বলিলেন, "মানুষটা বিজ্ঞানের পরীক্ষা লইয়া এবং উদ্ভিদ বিদ্যা লইয়া পাগল।" আমি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। তৎপরে আমি ষ্ট্রীট ছাড়িয়া লণ্ডনে ফিরিলাম।

ইংরাজদের জাতীয় চরিত্রে শক্তির উৎস কোথায়?

আমি ইংলণ্ডে আসিয়াই এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম যে ইংরাজ জাতি এত অল্পসংখ্যক হইয়াও কিরূপে এত বড় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের উপরে রাজত্ব করিতেছে? এই শক্তির মূল নিশ্চয় ইহাদের জাতীয় চরিত্রে আছে। সে মূল কি, তাহা একবার দেখিতে হইবে।

স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি সত্ত্বেও নিয়মানুগত্য। তাহাদের জাতীয় চরিত্রের যে যে গুণ আমার প্রশংসনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, তাহা এই। প্রথম, তাহাদের জাতীয় চরিত্রে যেমন একদিকে স্বাতন্ত্র্য প্রবৃত্তি ও স্বাবলম্বন শক্তি আছে, তেমনি অপরদিকে সাধুভক্তি ও বাধ্যতা আছে। এই উভয়ের সমাবেশ অতীব আশ্চর্য। প্রতিদিন সংবাদ-পত্র পড়িতাম, আর এ দেশের সহিত একটা বিষয়ে পার্থক্য মনে হইত। এ দেশে থাকিতে সকল বিষয়ে মানুষকে গবর্ণমেণ্টের দোহাই দিতে দেখিতাম। দুর্ভিক্ষ আসিতেছে, গবর্ণমেণ্ট দেখিবেন; জল প্লাবন হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট দেখিবেন; নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা হইতেছে না, গবর্ণমেণ্ট দেখিবেন; সুরাপান বাড়িতেছে, গবর্ণমেণ্ট দেখিবেন; ইত্যাদি। সেখানে গিয়া দেখিলাম, গবর্ণমেণ্ট কোণ-ঠাসা। গবর্ণমেণ্টের খোঁজ খবর বড় পাওয়া যায় না; সব কাজ প্রজারাই করিতেছে, গবর্ণমেণ্ট কোনো কোনো বিষয়ে সহায় মাত্র। প্রজারা প্রকাশ্য সভাদিতে গবর্ণমেণ্টকে অবাক্য কুবাক্য বলিতেছে; পার্লেমেণ্ট সভাকে তাহাদের নাকের সম্মুখে ঘুষি ঘুরাইতেছে। এক-দিকে এই স্বাতন্ত্র্য প্রবৃত্তি ও স্বাবলম্বন, অপর দিকে যে কোনো কাজ দশজনে মিলিয়া করিতেছে, সেই কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যাহার প্রতি যে কাজের প্রধান ভার প্রদত্ত হইতেছে, অপরেরা সেই উচ্চতম কর্মচারীর অজ্ঞাবহ থাকিয়া সুন্দর রূপে কার্য নির্বাহ করিতেছে। এই জাতীয় চরিত্রগত বাধ্যতার গুণে বড়-বড় কাজ কলের মতো চলিতেছে। ইংরাজগণ মহা স্বাতন্ত্র্য প্রবৃত্তি সত্ত্বেও রাজবিধির বাধ্য, পুলিশের বাধ্য, আইন আদালতের বাধ্য, সামাজিক ও গার্হস্থ্য নিয়মাবলীর বাধ্য। জাতীয় চরিত্রে বিরুদ্ধ গুণের এই এক অদ্ভুত মিলন।

রক্ষণশীলতার সঙ্গে উন্নতিশীলতার সমাবেশ। দ্বিতীয় মিলন, রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার। এমন রক্ষণশীল, প্রাচীনের প্রতি এরূপ আস্থাবান জাতি অল্পই দেখিয়াছি। কোনো ভদ্র গৃহস্থের গৃহে যাও, অপরাপর দ্রষ্টব্য বিষয়ের মধ্যে সেই পরিবারের পূর্বপুরুষগণের স্মৃতিচিহ্ন ভক্তি সহকারে প্রদর্শিত হইবে। হয়তো গৃহস্বামী তোমার হস্তে একখানি বাইবেল দিয়া বলিবেন, "এখানি আমার অত্যাতি-

বৃদ্ধ-প্রপিতামহের ব্যবহৃত গ্রন্থ।" গুণীগণের ও দেশের অতীত মহাশয়গণের প্রতি সর্বশ্রেণীর লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা অতিশয় প্রবল।

উইণ্ডসর কাসল রাজবাড়ি দেখিতে গিয়া দেখিলাম, যে মাস্তুলটির নিম্নে নেলসন আহত হইয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে প্রোথিত রহিয়াছে, এবং জেনারেল গর্ডনের ব্যবহৃত বাইবেলখানি একটি কাষ্ঠনির্মিত বাক্সের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। জাতীয় চরিত্রে সাধুভক্তি এতই প্রবল, প্রাচীনের প্রতি আস্থা এতই প্রবল যে, রাজ্যেশ্বরী মহারাণী পর্যন্ত একজন প্রজার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করা আবশ্যক মনে করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের যে কোনো বড় নগরে যাওয়া যায়, সকল স্থানেই রাজপথ সকল তৎতৎ প্রদেশের বড়লোকদিগের পাষাণ নির্মিত মূর্তিতে পরিপূর্ণ। ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবী নামক প্রসিদ্ধ সমাধি ক্ষেত্রে পদার্পণ করিলে, দেশের বড়-বড় কবি, বড়-বড় পণ্ডিত, বড়-বড় সাধু সদাশয় মানুষের স্মৃতিচিহ্নে সে স্থান পূর্ণ দেখা যায়। তাঁহাদের সুখ্যাতিপূর্ণ যে সকল উক্তি তাঁহাদের স্মৃতিস্তম্ভে লিখিত রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া শরীর কণ্টকিত হইতে থাকে। একদিন সেখানকার সেণ্ট পলস নামক গির্জাতে পদার্পণ করিয়া দেখি যে, ভারত-প্রসিদ্ধ সার উইলিয়ম জোন্স সাহেবের এক প্রস্তর নির্মিত মূর্তি রহিয়াছে, তাহার এক পার্শ্বে এক ব্রাহ্মণ শিক্ষকের মূর্তি, অপর পার্শ্বে এক মুসলমান মৌলবীর মূর্তি। সে দেশের নানা স্থানে বড়লোকদিগের স্মৃতি আর এক প্রকারে রক্ষিত হইতেছে। তাঁহারা জীবনের অধিকাংশ দিন যে-যে গৃহে বাস করিয়াছিলেন, সেই গৃহগুলি পূর্বাবস্থাতে রাখা হইয়াছে, এবং গৃহগুলি গৃহস্বামীর স্মৃতিচিহ্নে পরিপূর্ণ। এইরূপে দেখা যায়, সে দেশের রাজা প্রজা সকলের মনে সাধুভক্তি প্রবল।

আবার অপরদিকে, বিজ্ঞানের চর্চার দিকে সর্বশ্রেণীর মনোযোগ; ধর্ম সমাজ-নীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক নূতন তত্ত্ব সকলের আলোচনার জন্য নানা প্রকার আয়োজন। সাধুভক্তিতে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্থিতিশীল করিতেছে না। সভা, সমিতি, পাঠাগার প্রভৃতির অন্ত নাই।

প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও সহিষ্ণুতা। জাতীয় চরিত্রে তৃতীয় পরস্পর বিরোধী গুণের সমাবেশ অতীব আশ্চর্য। তাহা একদিকে জ্ঞান ও বিশ্বাসের ঐকান্তিকতা ও তন্নিবন্ধন উন্নতিস্পৃহার উৎকটতা, আবার অপর দিকে তাহার লাভ বিষয়ে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। সুরাপান নিবারিণী সভাতে বা ফিমেল সাফরেজ সভাতে যাইয়া বক্তাদিগের কথা শুনিলে মনে হয় যে, তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন না করিলে দেশের পরিত্রাণ নাই; অথচ কাগজে পড়ি যে তাঁহাদের প্রার্থনা পার্লে-মেণ্টের গোচর করিয়া তাঁহারা স্বীয় অভীপ্সিত লাভ করিবার জন্য দশ বৎসর, বিশ বৎসর, ত্রিশ বৎসর অপেক্ষা করিতেছেন; প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও ধৈর্য ধারণ করিতেছেন।

কর্মময় জীবনেও কোলাহল বর্জনের অভ্যাস। চতুর্থ বিরুদ্ধ গুণদ্বয়ের সমাবেশ, তুষ্ণীম্ভাব নির্জনবাস আত্মচিন্তা এবং সজনবাস ও কার্যদক্ষতা। মানুষ এ জীবনে স্বল্পভাষী হইয়া কিরূপে কাজ করিয়া যাইতে পারে, এ বিষয়ে মানব বুদ্ধিতে যত প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে ইংরাজগণ তাহা করিয়াছেন। ভদ্র গৃহস্থের গৃহে

শিশু সন্তান যদি না থাকে, তবে সে গৃহে থাকাও যাহা, আর হিমালয়ের শৃঙ্গে কোনো গিরিকন্দরে থাকাও তাহা। চাকরানী আসিতেছে যাইতেছে, আদেশ শুনিতেছে ও তাহা পালন করিতেছে, ফিরিওয়ালা জিনিসপত্র দিয়া যাইতেছে, জল স্রোতের ন্যায় কার্যের স্রোত চলিতেছে, অথচ গৃহে সাড়া নাই শব্দ নাই। চাকর-চাকরানী যে ঘরে থাকে, সে ঘরে প্রত্যেক ঘরের নম্বর অনুসারে নম্বরওয়ালা ঘণ্টা আছে, তাহার সঙ্গে প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে তার যোগে যোগ আছে। যদি চাকরানীকে চাও, তবে তোমার ঘরে বসিয়া কল নাড়া দেও, এক মিনিটের মধ্যে চাকরানী আসিয়া উপস্থিত, তোমার দ্বারে টোকা দিতেছে; তাহাকে ঘরে আসিতে বল, তবে তোমার ঘরে প্রবেশ করিবে; তুমি আদেশ কর, অবিলম্বে তদনুসারে কার্য করিবে। এমন স্বরে তোমাকে কথা কহিতে হইবে, যেন অপর ঘরের লোক শুনিতে না পায়। তুমি একটি রাস্তার ধারের বাড়িতে আছ, নিজের ঘরে বসিয়া লিখিতেছ; রাস্তা হইতে সাড়া নাই শব্দ নাই, কেবল মস-মস জুতার শব্দ শোনা যাইতেছে। কিন্তু একবার যদি উঠিয়া জানালার কাছে দাঁড়াও, বোধ হইবে যেন রাস্তাতে টুপীর বন্যা আসিয়াছে, এত লোক যাইতেছে! দোকানে কাপড় কিনিতে যাও, যেই দ্বারটি ঠেলিবে অমনি কোথা হইতে টং করিয়া একটি ঘণ্টা বাজিবে; প্রবেশ করিবামাত্র একজন লোক উপস্থিত। আস্তে-আস্তে ধীরে-ধীরে যাহা প্রয়োজন তাহাকে বল, অবিলম্বে তাহা পাইবে; দর নাই, দস্তুর নাই, পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাজ সমাধা। যেমন নিস্তব্ধ ভাবে কাজ করিবার রীতি, তেমনি সময় বাঁচানো। এই গুণেই ইংরাজগণ কাজ করিবার এত সময় পান। বলিতে কি, ছয়মাস ইংলণ্ডে বাস করিয়া আমার চুপে-চুপে কথা কহার এরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, স্বদেশে ফিরিয়া বঙ্গ দেশের স্বরের মাত্রাতে উঠিতে অনেক দিন গেল। ঐ সময়ের মধ্যে যাঁহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাঁহাদের অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেন, আমার অসুখ করিয়াছে কি না, নতুবা এত চুপে-চুপে কথা কহিতেছি কেন?

আমি ইংরাজ জাতির এই নির্জনবাস ও নিস্তব্ধতার বিশেষ ইষ্টফল দেখিয়াছি। প্রত্যেক ভদ্র ইংরাজের গৃহে একটি ঘর থাকে, যাহাকে ড্রয়িংরুম বা বৈঠকখানা বলে। সে ঘরে কেহ শয়ন করে না, তাহা কেবল বন্ধু-বান্ধব অতিথি-অভ্যাগতগণের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিবার ঘর। বাড়ির লোকে সায়াহ্নিক আহারের পর সেখানে বসিয়াই বিশ্রাম ও গল্পগাছা করেন, লোকে দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে সেই ঘরেই দেখা সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। কিন্তু গৃহস্বামীর যে একটি স্বতন্ত্র ঘর থাকে, সেখানে তিনি যখন বাস করেন, তখন সে ঘরে কেহ যায় না। সে ঘরটিকে তাঁহার স্টাডি বা পাঠাগার বলা হয়। তিনি সেখানে বসিয়া পাঠ ও চিন্তা করিয়া থাকেন। ইহাতেই ইংরাজগণ বড়-বড় কাজ করিতে পারিতেছেন। তাঁহাদের অধিকাংশ কাজ নির্জন বাস ও আত্মচিন্তার ফল।

একদিকে নির্জনে পাঠ ও চিন্তা, অপর দিকে সজনে কার্যদক্ষতা ও আবশ্যক হইলে বক্তৃতা। ইংরাজগণ সজনে কাজ কর্মে কিরূপ গুরুতর শ্রম করেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। তখন এরূপ মন প্রাণ দিয়া কার্য করেন যে, দেখিলে মনে হয় যে তাঁহাদের অন্য কর্ম বুঝি নাই।

সুখভোগের স্পৃহা অথচ ধর্ম এবং সত্যানুরাগ। পঞ্চম বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ, সামাজিকতা ও ধর্মভাব। আমি যখন সেখানে ছিলাম, দেখিতাম পর্বাহ বা ছুটির

দিনে হাজার-হাজার লোক লণ্ডন শহর হইতে রেল যোগে বাহির হইয়া যাইত। শহরের বাহিরে কোনো মাঠে বা বনে আমোদ আহ্লাদে দিনটা অতিবাহিত করাই উদ্দেশ্য। ফিরিবার সময় রেলগাড়ি হইতে নামিয়া একজন লোক যদি একটা ছোট পিয়ানোতে নাচের বাদ্য বাজাইল, অমনি দলে-দলে পুরুষ ও নারী কোমরে কোমরে বাঁধাবাঁধি করিয়া রেলওয়ে প্লাটফরমে নাচিতে আরম্ভ করিল! যেন আমোদ প্রাণে ধরিয়া রাখিতে পারে না। ইটালিয়ান ব্যাণ্ড নামে এক প্রকার বাদ্য যন্ত্র লইয়া লোকে দ্বারে-দ্বারে বাজাইয়া পয়সা উপার্জন করে। কোনো স্থানে সেই বাদ্য বাজিতেছে, দুইটি নিম্ন শ্রেণীর ১৭।১৮ বৎসরের বালিকা কিছু কিনিতে বাজারে যাইতেছে; যেই বাদ্য শোনা, অমনি কোমরে জড়াজড়ি করিয়া রাস্তার উপরে নাচ! ইংরাজ জাতিতে সামাজিক সুখ ভোগের প্রবৃত্তি এইরূপ প্রবল, কিন্তু তাহা বলিয়া লঘু-চিত্ততা নাই। ন্যায়ান্যায়ের বিচার যখন আসে, রাজনীতি বা সামাজিক নীতির উৎকর্ষ বিধানের প্রস্তাব যখন উপস্থিত হয়, তখন ইংরাজ আপাদমস্তক ঐকান্তিকতায় পরিপূর্ণ! সত্যের জয় হইবেই হইবে, অধর্ম হেয় ও ধর্ম শ্রেয়, ইহা তাহাদের অস্থি-মজ্জা-মাংস-মস্তিষ্কে যেন বসিয়া আছে। আমি ব্রাডল'র দলের নাস্তিকদের সভাতেও উপস্থিত থাকিয়া দেখিয়াছি; তাঁহাদের কথার ভাবভঙ্গী ও মত প্রকাশের ঐকান্তিকতা দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁহাদের মতে তাঁহাদের পথাবলম্বী না হইলে ইংলণ্ডের রক্ষা নাই এবং সেই পথাবলম্বী হইতেই হইবে। এই সব দেখিতাম, আর মনে মনে এই কথা জাগিত যে ইংরাজ জাতি সত্যানুরাগী ও ধর্মানুরাগী জাতি।

আমি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার প্রাক্কালে এক দিন স্টেড সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ইংলণ্ড হইতে কি লইয়া যাইতেছ?"

আমি। কি জিনিসপত্র লইয়া যাইতেছি তাই জিজ্ঞাসা করিতেছ?

স্টেড। না, তা কেন? কি দেখিয়া, কি শিখিয়া গেলে?

আমি। দেখিয়া যাইতেছি যে তোমরা ধর্মপ্রবণ বিশ্বাসী জাতি। তোমাদের নাস্তিকেরাও আস্তিক, তারাও বিশ্বাস করে যে ব্রহ্মাণ্ড ধর্ম নিয়ম দ্বারা শাসিত, এখানে সত্যের জয় হবেই হবে।

স্টেড। তুমি ঠিক বলিয়াছ, আমরা ধর্মপ্রবণ জাতি।

ফলত এই ধর্মপ্রবণতা ইংরাজ জাতির চরিত্রের মূলে মহাশক্তি রূপে বিরাজ করিতেছে।

*

মধ্যবিত্ত ভদ্র ইংরাজের গৃহ। ইংরাজ জাতির উন্নতির ও মহত্ত্বের আর একটি মূল কারণ লক্ষ্য করিলাম। তাহা ইংরাজের গার্হস্থ্য-নীতি। মধ্যবিত্ত ভদ্র ইংরাজের গৃহ একটি দেখিবার জিনিস। দশদিন তাহার মধ্যে বাস করিলে মনে এক অভূতপূর্ব শান্তি আনন্দ ও পবিত্রতা অনুভব করা যায়। ইংরাজের গৃহের সৌন্দর্যের অনেকগুলি কারণ আছে। যে-যে কারণ আমার মনে লাগিয়াছে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

ইংরাজ গৃহে নারীর অধিকার। প্রথম কারণ, মধ্যবিত্ত ভদ্র ইংরাজ গৃহস্থের ভবনে নারীর অধিকার। ইংরাজের গৃহে গৃহিণী সত্য-সত্যই গৃহস্বামিনী, রাণী। পুরুষ উপার্জক, সুতরাং বিচারের দিক দিয়া দেখিলে তাঁহারই কর্তা হইবার কথা। কিন্তু ইংরাজ জাতির সামাজিক ব্যবস্থা অনুসারে গৃহিনীই রানী। পুরুষ গৃহে তাঁহার প্রজা বা প্রধান-মন্ত্রী। পুরুষ যাহা উপার্জন করেন তাহা গৃহিণীর হস্তে দিয়া,

তাঁহারই কর্তৃত্বাধীন হইতে ভালোবাসেন। গৃহের ব্যবস্থা বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিয়া তিনি পাঠ-চিন্তাদি দ্বারা আত্মোন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইতে পারেন।

গৃহিণীর সর্বময় কর্তৃত্বের সঙ্গে-সঙ্গে নারী জাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা থাকাতে অতি চমৎকার ফল ফলিতেছে। নারীগণ সর্ববিধ জ্ঞান চর্চার অংশী ও সর্ববিধ শুভ চেষ্টার সহায় হইতেছেন। আমি কোনো বক্তৃতাদি শুনিতে গেলে সভায় অর্ধেক নারী দেখিতে পাইতাম। অনেক সময়ে কোনো বিখ্যাত আচার্যের উপদেশ শুনিবার জন্য স্ত্রীলোক ঠেলিয়া উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইত। কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণাদিতে গেলে, বাড়ির স্ত্রীলোকদিগের সহিত কোনো জ্ঞানের বা সামাজিক উন্নতির প্রসঙ্গে কোথা দিয়া সময় যাইত জানিতে পারিতাম না।

অথচ প্রত্যেক ভদ্র গৃহস্থের গৃহে নারীগণের স্বাধীনতার সঙ্গে-সঙ্গে এরূপ সকল সামাজিক শাসন ও সুনিয়ম দেখিতে পাইতাম যে, দেখিয়া মন মুগ্ধ হইত। এদেশের লোক নারীর অবরোধ দেখিয়া অভ্যস্ত; তাহাদের স্বভাবত মনে হইতে পারে যে, যে-সমাজে নারীগণ সম্পূর্ণ সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করেন, তাঁহারা বোধ হয় নীতি অংশে হীন। অন্য দেশের কথা জানি না, ইংরাজ মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের নারীগণ পবিত্রতার আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইঁহারাই ইংরাজ জাতির গৌরব ও শক্তির মূলে।

গৃহে সুশৃঙ্খলা। নারী জাতির শিক্ষা ও সামাজিক অধিকারের পরে ইংরাজ গৃহস্থের গৃহের দ্বিতীয় প্রধান আকর্ষণ, পারিবারিক সকল কার্যের সুব্যবস্থা। যে কাজটি যে সময়ে করিবার নিয়ম আছে, সে সময়ে সেটি হইবেই হইবে। উঠিবার ঘণ্টা, চা খাইবার ঘণ্টা, পারিবারিক উপাসনার ঘণ্টা, প্রাতরাশের ঘণ্টা, মাধ্যাহ্নিক আহারের ঘণ্টা, বৈকালের চা খাইবার ঘণ্টা, ডিনারের ঘণ্টা, এইরূপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়াছে। ঠিক সময়ে আসা চাই, ঠিক সময়ে খাওয়া চাই, ঠিক সময়ে ওঠা চাই। এইরূপ সময়ের সুব্যবস্থা থাকাতে হাতে অনেক সময় থাকে, এবং পরিবারের লোকেরা অনেক কাজে মন দিতে পারে। তৎপরে অগ্রে যে নিস্তব্ধতার বর্ণনা করিয়াছি তাহা পরিবার মধ্যেও বিদ্যমান। গৃহ মধ্যে জলস্রোতের ন্যায় কার্যস্রোত চলিতেছে, অথচ গৃহের মধ্যে থাকিয়াও জানিতে পারা যায় না। যে পড়িতেছে, সে নিস্তব্ধ গৃহে নির্জনে একান্ত মনে পড়িতেছে; যে চিন্তা করিতেছে, সে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে চিন্তা করিতেছে; যে কাজ করিতেছে, সে অপর পার্শ্বে দুরন্ত শ্রম করিতেছে; যার কাজ তার কাজ, তাহাতে অপরের সংশ্রব নাই। এই চিন্তা ও কার্যের ব্যবস্থা অতীব মনোরম।

তাহার পর আর একটি গুণ, যাহাকে ইংরাজীতে অর্ডার বলে, অর্থাৎ যেখানকার যেটা সেইখানে সেইটি থাকা। দোয়াতটির জায়গায় দোয়াতটি, বইগুলির জায়গায় বইগুলি। আবশ্যক হইলেই পাওয়া যায়, কোনো জিনিসের প্রয়োজন হইলে পাইতে দুই মিনিট বিলম্ব হয় না। এ দেশে কতবার দেখিয়াছি, গৃহস্বামী একস্থানে দোয়াত কলম রাখিয়া গিয়াছিলেন, বাড়ির কোনো ছেলে আসিয়া কলমটি কোথায় লইয়া গিয়াছে; গৃহস্বামী একটা বিল স্বাক্ষর করিয়া দিবেন, কলমটির প্রয়োজন; চীৎকার করিতেছেন, "ওরে রামা! কলম নে গেল কে? কলমটা দেখে নিয়ে আয়।" কলম আসিতে বিলম্ব হইতেছে, তাঁহার মেজাজ খারাপ হইয়া যাইতেছে; যে বিল স্বাক্ষর করাইতে আসিয়াছে, সে দ্বারে দণ্ডায়মান, তাহার সময় যাইতেছে; বাবুর ক্রোধ বাড়িতেছে, মহা হুলস্থূল। ইংরাজ ভদ্রলোকের গৃহে এরূপ ঘটনা বড় নিন্দার বিষয়।

এরূপ ঘটিতে থাকিলে সে বাড়ির গৃহিণীর ভদ্র সমাজে মুখ দেখানো কঠিন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহে এই গার্হস্থ্য ব্যবস্থার পরে পারিবারিক প্রধান গুণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। প্রতি দিন গৃহের সকল অংশ সুমার্জিত হয়। কেবল তাহা নহে, প্রত্যেক চেয়ারের পায়াগুলি, প্রত্যেক খাটের পায়া ও বাড়গুলি, প্রত্যেক আলমারির ধারগুলি, কাপড়ের দ্বারা উত্তম রূপে মার্জিত হইয়া থাকে। অনেক গৃহস্থের গৃহসামগ্রীগুলি দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা যেন অল্পদিন সে বাড়িতে আসিয়া বসিয়াছেন।

ধর্মের ছায়া। সর্বোপরি, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ ভদ্র গৃহস্থের গৃহে ধর্মের একটা ছায়া আছে। প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনা হইয়া থাকে, রবিবার গির্জাতে যাওয়া ও ধর্মগ্রন্থ পাঠে অতিবাহিত হয়। সৎকার্যের জন্য দান অধিকাংশ স্থানে অযাচিত রূপে করা হইয়া থাকে। এইরূপে ধর্মভাব ও নীতির ভাব পারিবারিক হাওয়ার মধ্যেই বিদ্যমান। দুইদিন সেই হাওয়াতে বাস করিলেই তাহা অনুভব করা যায়।

আমি লণ্ডনে ও মফঃসলে যে-যে পরিবারে গিয়া বাস করিতাম, সেইখানেই পারিবারিক জীবনের এই সকল সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম।

ইংলণ্ড হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

আমার ইংলণ্ড যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা করা। নানা অনুষ্ঠান ও ইংরাজ জাতির স্বভাব চরিত্র রীতি নীতি পরিদর্শন করিতে, এবং নানা শ্রেণীর লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেই আমার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইত। এতদ্ব্যতীত লণ্ডনে ও মফঃসলের নানা স্থানে ব্রাহ্মসমাজের বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলাম, এবং ইউনিটেরিয়ানদিগের দ্বারা ও ব্রাহ্ম (থিইস্টিক) আচার্য ভয়সী সাহেবের দ্বারা আহূত হইয়া তাঁহাদের উপাসনা মন্দিরে কয়েকবার উপদেশ দিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন সুরাপানের বিরুদ্ধে এবং ভারতবর্ষের ধর্ম সমাজ ও শিক্ষার অবস্থা বিষয়েও নানা সভাসমিতিতে কয়েক বার বক্তৃতা করিয়াছিলাম।

ব্রিস্টলে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভা। ১৮৮৮ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর দিবসে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিনে ব্রিস্টল নগরে তাঁহার স্মৃতিতে এক সভা করিবার জন্য ঐ নগরে যাই। তৎপূর্বে আমি ও আমার বন্ধু দুর্গামোহন দাস উদ্যোগী হইয়া আর্নোস ভেল নামক সমাধি ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুর বিনির্মিত রাজার সমাধি মন্দিরের মেরামতের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। কিরূপ মেরামত হইল, তাহা দেখিবারও ইচ্ছা ছিল। ঐ দিন আমি সমস্ত দুপুরবেলা রাজার সমাধি মন্দিরে যাপন করি, এবং সন্ধ্যার সময় এক প্রকাশ্য হলে রাজার বিষয়ে বক্তৃতা করি।

রাজার স্মৃতি যে এখনও ব্রিস্টলবাসীর মনে আছে তাহা জানিতাম না। আমি দুপুরবেলা সমাধি মন্দিরে বসিয়া আছি, দেখিলাম সেই সময়ের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি আসিয়া সমাধি মন্দিরের সমক্ষে ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া সমাধিতে লিখিত বাক্যগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সন্ধ্যার সময় আমার বক্তৃতা শেষ হইলে দেখি যে, একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে লোকে ধরিয়া সভামধ্য হইতে আমার দিকে আনিতেছে। আমি তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া আমার হস্ত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন "এই হাতে রামমোহন রায়ের হাত ধরিয়াছিলাম। এস, আজ তোমার হাত ধরি।" বলিয়া মহোৎসাহে আমার হাত ধরিলেন। তাহার পর তাঁহার মুখে, কোথায় কিরূপে রামমোহন রায়কে দেখিয়াছিলেন, তাহা শুনিলাম।

ইংরাজ রমণীর দ্বারা রাজা রামমোহনের স্মৃতি রক্ষা। পরে আর একটি ঘটনা ঘটিল, তাহাও চিরস্মরণীয়। মৃত্যুকালে রাজা রামমোহন রায়কে যে ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যা তখনো জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁহার যৌবনকালে নিজ

পিতার সঙ্গে রামমোহন রায়কে অনেক বার দেখিয়াছেন, রাজার সঙ্গে মিশিয়াছেন, ও তাঁহার আতিথ্য করিয়াছেন। রাজা ও তাঁহার পিতা গত হইলে, তিনি নিজ পিতার নিকটে প্রাপ্ত মৃন্নির্মিত রাজার মস্তক ও তাঁহার মাথার শালের পাগড়ি প্রভৃতি স্মৃতিচিহ্নগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। বার্ধক্যে কবে চলিয়া যান, ইহা ভাবিয়া সেগুলি আমার হাতে অর্পণ করিবার জন্য আমাকে ডাকিলেন ও সেগুলি আমার হাতে অর্পণ করিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া সেগুলি গ্রহণ করিলাম, এবং দেশে লইয়া আসিলাম। দুঃখের বিষয়, আমি নানা স্থানে বাসা নাড়িয়া বেড়াইবার সময় অপরাপর ছোট ছোট স্মৃতিচিহ্নগুলি হারাইয়া ফেলিলাম। অবশেষে তাঁহার মৃন্নির্মিত মূর্তিটি ও শালের পাগড়িটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হস্তে দিয়াছি, তাঁহারা রক্ষা করিতেছেন। রাজা রামমোহন রায় বঙ্গসাহিত্যের জন্মদাতা-দিগের মধ্যে একজন ছিলেন, সুতরাং তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে রাখা অতীব কর্তব্য, এই ভাব মনে আসাতে স্মৃতিচিহ্নগুলি তাঁহাদের হাতে দিয়াছি।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লিখিবার সূচনা। আমি ছয়মাস কাল মাত্র ইংলণ্ডে ছিলাম। যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, তদ্ব্যতীত দেখিবার আরও অনেক স্থান ও বিষয় ছিল। কিন্তু আমার স্কন্ধে গুরুতর এক কার্যের ভার পড়াতে শেষ কয়েক মাস আমার দেখাশোনার কিছু ব্যাঘাত ঘটিল। সে বিষয়টা এই। ট্রুবনার নামক মুদ্রাকর কোম্পানীর ম্যানেজার একদিন কুমারী কলেটের নিকট হস্তলিখিত একখানি পুস্তক পাঠাইয়া লিখিলেন যে, সেখানি একজন ভদ্রলোকের লিখিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত; তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া দেখিয়া সংশোধন করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা ছাপিতে পারেন। কুমারী কলেট পড়িয়া দেখিলেন তাহাতে অনেক স্থলে ভুল আছে; তাহা না ছাপাই ভালো। এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে লিখিলেন, "ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতা এখন এখানে আছেন; তোমরা যদি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত ছাপিতে চাও, তাঁহার দ্বারা লিখাইয়া দিতে পারি।" এই বলিয়া আমাকে ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লিখিবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। আমি তাঁহার অনুরোধে তাঁহারই সংগৃহীত কাগজপত্র লইয়া ইতিহাস লিখিতে বসিলাম। শেষ দুই মাস এই কাজে আবদ্ধ ছিলাম।

আমি মে মাসে লণ্ডনে পৌঁছিয়াছিলাম, নভেম্বর মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করি। আসিবার সময় দুর্গামোহনবাবুর সঙ্গ পাইলাম না। তিনি পীড়িত হইয়া তৎপূর্বেই পার্বতীবাবুর সঙ্গে দেশে ফিরিয়াছিলেন। আমি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লইয়া ব্যস্ত থাকাতে তাঁহাদের সঙ্গে আসিতে পারি নাই।

প্রত্যাবর্তন। যে ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লিখিবার জন্য বন্ধুবর দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইল, অচিরকালের মধ্যে সেই ইতিবৃত্ত লেখাই বন্ধ করিতে হইল। লিখিতে লিখিতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, ট্রুবনার কোম্পানী ঐ ইতিবৃত্ত ছাপিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা কি শুনিলেন, কি ভাবিলেন, আমরা জানিতে পারিলাম না; কেবলমাত্র কুমারী কলেটকে জানাইলেন যে তাঁহারা সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদেরই আদেশক্রমে আমার লিখিত অংশ ইণ্ডিয়া লাইব্রেরির পুস্তকাধ্যক্ষ একজন জর্মান পণ্ডিতকে দেখাইয়াছিলাম। যতদূর স্মরণ

হয়, তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিয়দংশ রেভারেন্ড স্টপফোর্ড ব্রুককেও পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি ভারি খুশি হইয়াছিলেন। ট্রুবনার কোম্পানী পিছাইয়া পড়িতেছে শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া গেলেন, এবং বলিলেন, "তুমি থাক, আমি ম্যাকমিলান কোম্পানী দ্বারা তোমার বই ছাপাইব।" কিন্তু আমি থাকি কিরূপে? আমার কতিপয় বন্ধু আমার ইংলণ্ডে থাকিবার ব্যয় দিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে ভারাক্রান্ত করিতে লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। আমি কোনো কোনো সংবাদপত্রে লিখিয়া কিছু-কিছু উপার্জন করিতেছিলাম। তাহাতেও সমুদয় ব্যয় নির্বাহ হওয়া কঠিন বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে মনে হইল, যাহা লিখিবার আছে দেশে গিয়া লেখাই ভালো। তাই স্বদেশে প্রস্থান করিলাম।

জাহাজে পাদরী সাহেবদের সঙ্গে তর্ক। ফিরিবার সময়কার সমুদ্র পথের একটা ঘটনা মনে আছে। আমি 'টালমুডিক মিসলেনিস', 'লাইফ এ্যান্ড টিচিংস অভ কনফুশিয়াস', প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক কিনিয়া আনিয়াছিলাম; জাহাজে সেইগুলি সর্বদা পাঠ করিতাম, এবং অধিকাংশ সময় ধর্ম চিন্তাতে যাপন করিতাম। আমাদের সঙ্গে একজন ইংরাজ খৃষ্টীয় মিশনারী আসিতেছিলেন। তিনি প্রথম-প্রথম আমার সঙ্গে কথা কহিতেন না; কিন্তু যখন দেখিলেন আমি কখনো টালমুড পড়িতেছি, কখনো কনফুশিয়াস পড়িতেছি, কখনো বাইবেল পড়িতেছি, তখন আমি কি, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল জন্মিল। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কোন ধর্মাবলম্বী।

আমি। আমি একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক।

মিশনারী। তোমাকে কখনো দেখি টালমুড পড়িতেছ, কখনো দেখি কনফুশিয়াস পড়িতেছ; এ সকল পড় কেন?

আমি। পড়িয়া জ্ঞানোপদেশ পাই বলিয়া; ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অনেক উচ্চ কথা পাই বলিয়া।

মিশনারী। তোমাকে বাইবেলও পড়িতে দেখি। তুমি বাইবেলের বিষয়ে কি মনে কর?

আমি। বাইবেলেও অনেক ভালো কথা আছে, বাইবেল পড়িয়াও সুখ পাই।

মিশনারী। তুমি এই সকল গ্রন্থের সঙ্গে বাইবেলকেও এক জায়গায় দাঁড় করাইলে, এটা ভালো নয়। বাইবেল অভ্রান্ত ঈশ্বরদত্ত গ্রন্থ, ইহাতে যে সকল উপদেশ আছে, তাহা অপর কোনো গ্রন্থে নাই।

আমি। আচ্ছা, আপনি বাইবেলের এমন কোনো উপদেশ উল্লেখ করুন, যার সদৃশ উপদেশ আপনার বিবেচনায় অন্য কোনো গ্রন্থে নাই।

মিশনারী। ডু আনটু আদার্স এ্যাজ ইউ উড দ্যাট দে শুড ডু আনটু ইউ।

সৌভাগ্য ক্রমে এই উপদেশের অনুরূপ দুইটি উপদেশ আমি কিছু দিন পূর্বে টালমুড ও কনফুশিয়াস উভয় গ্রন্থেই পড়িয়াছিলাম। আমি গ্রন্থ দুইখানি আনিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। বলিলাম, "দেখুন, কংফুচের অনুবাদক ডাক্তার লেগ আপনাদেরই একজন মিশনারী। তাঁহারই উক্তিতে প্রমাণ, কংফুচ যীশু জন্মিবার প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্বে জন্মিয়াছিলেন। একজন শিষ্য কংফুচকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'গুরো, সকল উপদেশের সার কি?' তদুত্তরে কংফুচ বলিতেছেন, 'সকল উপদেশের শ্রেষ্ঠ উপদেশ এই—তোমার প্রতি অপরের যে ব্যবহার তুমি পছন্দ কর না, তাহা

অপরের প্রতি করিও না।' ইহা তো প্রকারান্তরে ঐ একই কথা! বলুন তবে বাইবেলের অলৌকিকতা কোথায় রহিল? আপনি কি বলেন? সত্যের প্রবর্তক কে? ঈশ্বরই তো সত্যের প্রবর্তক। তবেই তো প্রমাণ হইতেছে যে, তিনি দেশ ও জাতি নির্বিশেষে আধ্যাত্মিক সত্য সকল অভিব্যক্ত করিয়াছেন।"

আমার যত দূর স্মরণ হয়, তিনি মৌনী হইয়া থাকিলেন। কিন্তু আর একটি মিশনারী ভদ্রলোক বলিলেন, "কথাটা কি জানো? দুষ্ট শয়তান অনেক সময় ধর্মের মুখস পরিয়া মানুষকে বিপথে লইয়া যায়। অনেক উচ্চ কথা মানুষের গোচর করিয়া তাহাকে পথভ্রান্ত করে। সুতরাং শয়তানও সত্য অভিব্যক্ত করে। সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই যীশুর অভ্যুদয়।"

শুনিয়া আমি বলিলাম, "আমি আপনার কাছে হার মানিলাম!" ভাবিলাম ইহাদের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা।

তখন দেশ হইতে আসিবার সময়কার সমুদ্র পথের একটি ঘটনা স্মরণ হইল, তাহা যথাস্থানে লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। ইংলণ্ডে যাইবার সময় সিংহল হইতে কয়েকজন খৃষ্টীয় মিশনারী আমাদের সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাহা সেই বিবরণের সম্পর্কে লিখিয়াছি। ইঁহারা পথিমধ্যে প্রতি রবিবার আরোহীদিগকে লইয়া জাহাজের এক পার্শ্বে গির্জা করিতেন। আমি তাঁহাদের উপাসনাতে যাইতাম। দুই-তিনবার যাওয়ার পর একজন মিশনারী একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের উপাসনাদি তোমার কেমন লাগিতেছে?"

আমি। ভালোই লাগিতেছে। কেবল একটা চিন্তা বার-বার আমার মনে উদয় হয়।

মিশনারী। সেটা কি?

আমি। আপনারা উপদেশে প্রায় প্রতি বার বলেন যে, মনুষ্যের পাপে জন্ম, মনুষ্যের প্রকৃতি পাপপ্রবণ, সভ্যতার যতই উন্নতি হইতেছে ততই মানুষ ঘন হইতে ঘনতর পাপে নিমগ্ন হইতেছে। অথচ ইহাও বলেন যে, অবশেষে মানুষ ঈশ্বর চরণে আসিবে। ইহা কিরূপ? যদি মানুষ দিন-দিন অধিক হইতে অধিকতর পাপেই ডুবিল, তবে আবার পূর্ণ উন্নতি পূর্ণ সুখ পাইবে কিরূপে?

মিশনারী। তা বুঝি জানো না? প্রভু যীশু যখন আবার আসিবেন, তখন শয়তানকে ধরিয়া এক অন্ধকার গহ্বরে বন্ধ করিয়া ফেলিবেন। মানুষকে প্রলুব্ধ করিবার কেহ থাকিবে না, সুতরাং মানুষ নিষ্পাপ হইবে।

এই উত্তর শুনিয়াও আমি হাঁ করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম। পরে ইংলণ্ডে বাস কালে একদিন সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড স্টপফোর্ড ব্রুকের নিকট এই কথার উল্লেখ করাতে তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহা তোমাদের পুরাণের মতো এক প্রকার পুরাণ।"

সিংহলে জর্জ মুলারের দর্শনলাভ। এই সমুদ্রযাত্রা কালের আর একটি বিষয় স্মরণ আছে। আমরা যখন সিংহলের রাজধানী কলম্বো শহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন শুনিলাম ব্রিস্টল অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ মুলার দেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিবার সময়ে সেখানে আসিয়া এক হোটেলে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহা শুনিয়াই তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমি সেই হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি দয়া করিয়া আমাকে দেখা দিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে কয়েক মিনিটমাত্র যাপন

করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই কয়েক মিনিট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে তৎপূর্বে তাঁহার প্রণীত 'দি লর্ডস ডীলিংস উইথ জর্জ মুলার' নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, এবং তদ্দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। তিনি শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি সকল বিষয়েই প্রার্থনা করেন?" তিনি বলিলেন, "আমার একটা চাবি হারাইয়া গেলেও আমি তাহা পাইবার জন্য ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি। জীবনের এমন কোনো বিভাগ নাই, কার্য নাই, যাহার জন্য সেই মুক্তিদাতা বিধাতার শরণাপন্ন হই না।"

আমি আর একজন সাধুপুরুষের এই চাবি হারাইলে প্রার্থনার কথা শুনিয়াছি। তিনি ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় কালীনারায়ণ গুপ্ত। এই সাধুপুরুষের পরিবার-পরিজনের মুখে শুনিয়াছি, জীবনের এমন কোনো কার্য ঘটিত না যাহাতে তাঁহাকে 'ওঁ ব্রহ্ম', 'ওঁ ব্রহ্ম' শব্দ উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বর স্মরণ করিতে ও তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতে দেখা যাইত না। সন্তানগণ এমনও দেখিয়াছেন যে, পিতার চাবি হারাইয়া গিয়াছে, তিনি চাবি খুঁজিতেছেন, কিন্তু মুখে 'ওঁ ব্রহ্ম', 'ওঁ ব্রহ্ম'; ঈশ্বর স্মরণ করিতেছেন। ভক্ত মানুষের কার্যই স্বতন্ত্র। প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততার বিষয়ে বিচার তাঁহাদের নাই। সকল বিষয়ে সর্বাবস্থাতে প্রার্থনা তাঁহাদের প্রাণে লাগিয়াই আছে। সাধু জর্জ মুলারের মুখে সেই অকৃত্রিম ভক্তির লক্ষণ সুস্পষ্ট দেখিলাম। ঐরূপ মানুষকে জীবনে একবার দেখাও পরম লাভ।

আবার দক্ষিণ ভারতে

কলিকাতায় ইংরাজ ও ফিরিঙ্গী একেশ্বরবাদীগণের জন্য উপাসনা প্রবর্ত্তন। আমি ক্রমে আসিয়া দেশে পৌঁছিলাম। আসার কিছুদিন পরে ইংলণ্ডের মিস্টার ভয়সীর চার্চের সভ্য, মিস্টার ব্লেকার নামে একজন ইংরাজ ভদ্রলোক (যিনি কেলনার কোম্পানীর অধীনে কোনো কর্ম করিতেন) আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া স্থির হইল যে, কলিকাতাতে ইংরাজ ও ফিরিঙ্গী একেশ্বরবাদীদিগের জন্য একটি উপাসকমণ্ডলী স্থাপন করা হইবে; তাহাতে ইংরাজী ভাষায় উপাসনা হইবে, এবং উপাসনার ভার আমার উপর থাকিবে। তদনুসারে মিস্টার ব্লেকার টাকা তুলিয়া লালদিঘীর দক্ষিণবর্তী ড্যালহৌসী ইনষ্টিটিউট রবিবার প্রাতের জন্য ভাড়া লইয়া উপাসনার বন্দোবস্ত করিলেন। আমি আচার্যের কার্য করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি মিস্টার ভয়সীর প্রকাশিত ও তাঁহার লণ্ডনস্থ উপাসনা মন্দিরে ব্যবহৃত প্রার্থনা পুস্তক হইতে আরাধনা প্রার্থনা প্রভৃতি পাঠ করিতাম এবং একটি উপদেশ লিখিয়া পড়িতাম। এ উপদেশের অনেকগুলি ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। মিস্টার ব্লেকারের উপাসকমণ্ডলী ক্রমে ড্যালহৌসী ইনষ্টিটিউট হইতে নানা স্থানে ভদ্রলোকের বাড়িতে বাড়িতে উঠিয়া যায়, এবং কয়েক বৎসর নিয়ম মতো তাহার কার্য চলে। অবশেষে মিস্টার ব্লেকার কার্যগতিকে স্থানান্তরিত হওয়াতে তাহা উঠিয়া যায়। উপাসকমণ্ডলী চালাইয়া দেখিতে পাইলাম যে, প্রধানত যাঁহাদের জন্য তাহা স্থাপন করা হইয়াছিল, তাঁহারা বড় আসিতেন না। ইংরাজ বা ফিরিঙ্গী অল্পই আসিতেন, প্রধানত এ দেশীয় বিলাত ফেরত লোকেরাই যোগ দিতেন। যাহা হউক, তাহাও রহিল না।

ইন্দোরে প্রচার যাত্রা। ইংলণ্ড হইতে দেশে পৌঁছিয়াই আমি আবার ধর্ম প্রচার কার্যে নিযুক্ত হইলাম। অপরাপর কার্যের মধ্যে ইন্দোরে প্রথম প্রচার যাত্রা স্মরণ আছে। আমার বন্ধু নবীনচন্দ্র রায় তখন কর্ম হইতে অবসৃত হইয়া খাণ্ডোয়াতে বাস করিতেছিলেন, সেখান হইতে তিনি রট্‌লামে এক কর্ম পান। আমি ১৮৮৯ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত লছমনপ্রসাদকে সঙ্গে লইয়া খাণ্ডোয়া ও রট্‌লাম হইয়া ইন্দোরে গমন করি। সেখানে কতকগুলি উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। ইন্দোরে আমি রাজ-অতিথি রূপে রাজার অতিথিশালাতে আশ্রয় পাই। আমার পরিচর্যার জন্য চাকর-বাকর এবং যাতায়াতের জন্য গাড়ি নিযুক্ত হয়।

ক্রমে আমি কার্য আরম্ভ করি। ইন্দোরে যেখানে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজ-প্রতিনিধি (রেসিডেণ্ট) থাকেন, তাহা রেসিডেন্সি বিভাগ বলিয়া খ্যাত। এই

রেসিডেন্সি বিভাগে অনেক ভদ্রলোকের বাস। আমার ব্রাহ্ম বন্ধুগণ আমাকে রেসিডেন্সি বিভাগে একটি বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অনুরোধে আমি বক্তৃতা করিতে রাজি হই। তাঁহারা রেসিডেন্সি বিভাগে একটি হল স্থির করিয়া আমার বক্তৃতার বিজ্ঞাপন বাহির করেন। ঐ মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের একখণ্ড রেসিডেণ্ট সাহেবের হস্তে পতিত হয়। কে তখন রেসিডেণ্ট ছিলেন, ভালো মনে নাই; বোধ হয় সার লেপেল গ্রিফিন। তিনি বিজ্ঞাপন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ শিবনাথ শাস্ত্রী কে?" উত্তরে শুনিলেন যে একজন বাঙালী ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বাঙালীরা কেন এখানে আসে? এ বক্তৃতা এখানে হইতে পারিবে না।" অগত্যা তাড়াতাড়ি রাজার অধিকার মধ্যে একটি স্কুলগৃহ স্থির করিয়া সেখানে বক্তৃতা করা হইল।

হোলকারের মতিপরিবর্তন। তৎপরে আমি ও আমার বন্ধু লছমনপ্রসাদ ২৮শে নভেম্বর মহারাজা হোলকারের সহিত সাক্ষাৎ করি। যতদূর স্মরণ হয়, তিনি দিন ক্ষণ দেখিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং কালো পোশাক পরিয়া গেলে পছন্দ করিতেন না বলিয়া আমাদিগকে শাদা কোট পরিয়া যাইতে হইয়াছিল। তিনি আমাদের প্রতি যথেষ্ট সদ্ভাব প্রকাশ করিলেন। আমাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের ঋণ শোধের সাহায্যার্থে ৪০০ শত টাকা এবং আমার ও লছমনের যাতায়াতের ব্যয় নির্বাহার্থ কিছু-কিছু টাকা দিলেন। মহারাজা ব্রাহ্মসমাজের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "জব্ মৈঁনে সুনা আপলোগোঁকে বীচমে ঝগড়া হুয়া, তব মেরা দিল টুট গয়া," অর্থাৎ যখন আমি শুনলাম যে আপনাদের মধ্যে বিবাদ ঘটেছে, তখন আমার আশা ভগ্ন হয়ে গেল। রাজার কথাগুলি এখনো আমার কর্ণে বাজিতেছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, দুই-একবৎসর পরে আবার ইন্দোরে গিয়া শুনি যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি রাজার মন বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার রাজ্য মধ্যে কোনো সভাসমিতি হইতে দিবেন না বলিয়াছেন। শুনিলাম, রাজার ক্রোধ দেখিয়া আর্যসমাজ প্রভৃতি অনেক সভার মীটিং বন্ধ হইয়াছে; কেবল ব্রাহ্মেরা তাঁহার বিরক্তি গ্রাহ্য না করিয়া উপাসনার্থে তাঁহাদের মন্দিরে নিয়ম মতো মিলিত হইতেছেন। ইহাতে নাকি হোলকার ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণকে তাঁহার ভবনে ডাকিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাদের মন্দির ভাঙিয়া দিবেন! এক সময়ে তিনি ঐ মন্দির নির্মাণার্থ কয়েক সহস্র টাকা দিয়াছিলেন, এখন ঐ মন্দির ভাঙিতে প্রস্তুত! আমি শুনিয়া ভাবিলাম, দেশীয় রাজার রাজ্যে বাস করাও বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থা।

সেবারে আর এক ঘটনা ঘটিল, যাহাতে রাজার ব্রাহ্মদিগের প্রতি ঐ বিদ্বেষবুদ্ধি আরও প্রকাশিত হইল। সেটা দশহরার সময়। এই দশহরার সময় ইন্দোরাধিপতি পাত্রমিত্র সহ হস্তী আরোহণে সসৈন্যে বাহির হইয়া থাকেন। বহুকাল হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এই দশহরা যাত্রার দিন আমি আমার বন্ধু সদাশিব পাণ্ডুরঙ্গ কেলকারের সহিত যাত্রা দেখিতে গেলাম। রাজপথের উপর বিপুল জনতা হওয়াতে আমরা রাজপথ হইতে নামিয়া মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম, সেখানে ভিড় ছিল না। তৎপর দিন হোলকার মহারাজার পুত্রের শিক্ষক আমাদিগকে বলিলেন যে, মহারাজা হোলকার তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছেন, "আমি অমুক মাঠে কেলকারের পার্শ্বে যেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে দেখিলাম, তিনি কি এখানে আসিয়াছেন?"

উত্তর। আজ্ঞে হাঁ, এখানকার ব্রাহ্মসমাজের উৎসব চলিতেছে, সেই জন্য তিনি আসিয়াছেন।

হোলকার। আমি পছন্দ করি না যে এই সব মানুষ আমার রাজ্যে আসে।

উত্তর। আজ্ঞে, তিনি দুই-একদিনের মধ্যেই চলিয়া যাইবেন।

পরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই মহারাজাকে পদচ্যুত করিয়া বন্দিশালায় রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্রকে তাঁহার পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় স্থাপন। ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি যে কয়েকটি কার্যের সূত্রপাত করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে একটি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় স্থাপন। অগ্রেই বলিয়াছি যে, আমি ইংলণ্ডে বাস কালে কিণ্ডারগার্টেন স্কুল দেখিয়াছিলাম, এবং শিক্ষা বিষয়ক কতকগুলি গ্রন্থও কিনিয়া আনিয়াছিলাম। সেই-গুলি পাঠ করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন চিন্তা আমার মনে উদয় হয়। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় স্থাপন তাহারই ফল।

শিশুদের যেভাবে পড়াইতাম। এ জাতীয় চিন্তা বহুদিন হইতেই আমার মনে ছিল। আমি যখন বি. এ. ক্লাসে পড়ি, তখন একটি বিশেষ ঘটনাতে শিক্ষা সম্বন্ধীয় নূতন চিন্তা আমার মনে প্রবেশ করে। সে ঘটনাটি এই। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে গেলে বাবা আমাকে প্রতিনিধি দিয়া তাঁহার শিক্ষকতা কার্য হইতে কিছুদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। একদিন আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াইতেছি, এমন সময় সর্ব-নিম্ন শ্রেণীর পণ্ডিত মহাশয় একটি চারি কি পাঁচ বৎসরের বালককে লইয়া ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আসিয়া বলিলেন, "মহাশয়, এই ছেলেটিকে 'পড়' বলিলেই কাঁদে, কি করি?" আর বাস্তবিক দেখিলাম, ছেলেটির দুই চক্ষের দুইটি অশ্রুধারা পড়িয়া পেটের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। আমার বড় আশ্চর্য বোধ হইল; বলিলাম, "পড় বললেই কাঁদে? আচ্ছা, ওকে আমার নিকট দিয়ে যান, আমি দেখি।" তিনি ছেলেটিকে আমার নিকট দিয়া গেলেন।

আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি আমার হাত ধরে আমার সঙ্গে বেড়াও তো।" সে আমার হাত ধরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমার যখন মনে হইল যে বেড়াইতে বেড়াইতে সে ভয়-ভাঙা হইয়াছে, তখন তাহাকে তুলিয়া বেঞ্চের উপর বসাইলাম। বসাইয়া নিজের অঙ্গুলি দিয়া তাহার পেট টিপিতে লাগিলাম, সে হাসিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বল তো, কি দিয়ে ভাত খেয়েছ?" তখন সে ভাত ডাল চড়চড়ি প্রভৃতি তরকারির উল্লেখ করিতে লাগিল, কিন্তু মাছের নাম করিল না। আমি মনে করিলাম, খুব সম্ভবত মাছ খাইয়াছে, কেবল নাম করিতে ভুলিয়া যাইতেছে। বলিলাম, "তুমি আর একটা জিনিস খেয়েছ, আমাকে বলছ না কেন? তুমি মাছ খেয়েছ।" তখন তাহার বড় আশ্চর্য বোধ হইল। সে মনে করিল, আমি পেটের বাহিরে অঙ্গুলি দিয়া মাছ খাওয়া ধরিলাম কিরূপে? সে হাসিয়া বলিল, "তুমি জানলে কি করে?" আমি বলিলাম, "আঁ খোকা, আমি পেটে আঙুল দিয়ে মাছ খাওয়া ধরতে পারি, তা বুঝি জানতে না?"

এইরূপে যখন দেখিলাম সে একেবারে ভয়-ভাঙ্গা হইয়াছে, তখন তাহার বইখানা খুলিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম, "দেখ, তুমি খারাপ ছেলে, আর আমি ভালো ছেলে।" সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" আমি উত্তর করিলাম, "আমি পড়তে পারি,

তুমি পড়তে পার না। এই দেখ আমি পড়ি।" এই বলিয়া ক খ গ ঘ করিয়া পড়িয়া চলিলাম। সে আমাকে পড়িতে দেয় না, বলিল, "আমিও পড়িতে পারি।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা পড়।" তখন সে জোরে জোরে ক খ গ ঘ করিয়া পড়িয়া চলিল।

অবশেষে আমি তাহাকে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে (তাহার ক্লাসে) লইয়া গেলাম। গিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম, "দেখুন, আপনি বলছিলেন ও 'পড়' বললেই কাঁদে, কিন্তু আমার কাছে তো বেশ পড়িল।" চাহিয়া দেখি, পণ্ডিত মহাশয়ের পার্শ্বে একগাছি চেটাল বাঁকারি রহিয়াছে; কোনো ছেলে না পড়িলে বা অবাধ্য হইলে তাহার পৃষ্ঠে, বা তাহাকে চিত করিয়া শোয়াইয়া তাহার পেটে, ঐ বাঁকারি পড়ে। আমি বলিলাম, "ও বাঁকারি দেখলে ওর বাবা হয়তো কাঁদে, ও তো কাঁদবেই। ও বাঁকারি আপনাকে ফেলে দিতে হবে।" তিনি বলিলেন, "তা হলে আর পড়াশোনা হবে না।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা দেখুন, আপনার সম্মুখেই আমি পড়াই।" এই বলিয়া স্কুলের চাকরকে বলিলাম, "একটা বড় মাদুর পেতে দে, আমাদের একটা খেলা হবে।" অমনি ক্লাসশুদ্ধ ছেলে আমাকে ঘেরিয়া ফেলিল, "দেখুন, কি খেলা হবে?"

আমি। রোসো না, দেখবে এখন, খুব মজার খেলা হবে।

তাহার পর মাদুর পাতা হইলে সেই মাদুরে ছেলেদিগকে লইয়া বসিলাম। প্রথমে তাহাদেরই সর্বসম্মতিক্রমে একটা নিয়ম করিয়া লইলাম যে, খেলার মধ্যে যে দুষ্টামি বা গোল করিবে, তাহাকে খেলা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। শেষে খেলা আরম্ভ হইল। আমি শেলটে লুকাইয়া লুকাইয়া একটি ঘোড়া আঁকিলাম। তাহার জিভ বাহির হইয়া আছে। শেষে তাহার জিভে 'ক,' লেজের আগায় 'খ,' পায়ের খুরে 'গ,' এইরূপে বর্ণমালার অক্ষরগুলি লিখিলাম। শেষে সেই ঘোড়া যখন সকলের সম্মুখে বাহির করিলাম, তখন মহা হাস্যের রোল উঠিল। যাহাদের কিছু-কিছু অক্ষর পরিচয় হইয়াছিল, তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল, "ঘোড়ার জিভে ক, ল্যাজে খ," ইত্যাদি। আর যাহাদের বর্ণপরিচয় হয় নাই, তাহারা ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কই ভাই, দেখি কেমন জিভে ক," ইত্যাদি। দেখিতে দেখিতে তাহাদের বর্ণপরিচয় হইতে লাগিল। তৎপর দিন যেই স্কুলে প্রবেশ করিয়াছি, অমনি সর্বনিম্ন শ্রেণীর ছেলেরা আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া বলিতে লাগিল, "পণ্ডিত মশাই, তুমি আমাদের ক্লাসে এস, আমাদের সঙ্গে খেলা করবে।"

এই ঘটনাটা আমার চিরদিন মনে রহিয়াছে। পরে হরিনাভিতে ও ভবানীপুরে যখন হেডমাস্টারি করিয়াছি, তখন নিম্ন শ্রেণীর মাস্টারদিগকে ছেলেদিগকে ভুলাইয়া পড়াইবার উপদেশ দিয়াছি। ইংলণ্ডে গিয়া কিণ্ডারগার্টেন স্কুল দেখিয়া ঐ সকল ভাব আমার মনে আরও প্রবল হয়।

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের প্রথম কল্পনা। ব্রাহ্ম পাড়ায় ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদিগকে সর্বদা সমাজের মাঠে খেলিতে দেখিয়া মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, ইহাদিগকে বেথুন স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া এদের জন্য একটি ছোট স্কুল করা যাক। স্কুলটি তিন ঘণ্টা বসিবে, এবং কিণ্ডারগার্টেনের অনুরূপ প্রণালীতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই ভাবিয়া প্রথমে কতকগুলি শিশু সংগ্রহ করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করা গেল। স্কুলটিতে বালিকাই অধিক জুটিল, সঙ্গে শিশু বালকও থাকিত। নাম রাখা গেল ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়। আমি নিজে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে বোর্ডের সাহায্যে ছবি আঁকিয়া পড়াইয়া দেখাইতাম, কেমন করিয়া পড়াইতে হয়। সে সময়কার

কোনো কোনো শিক্ষক সেই সময় হইতে শিশু-শিক্ষার একটা নূতন ভাব পাইলেন, এবং উত্তর কালে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষক হইয়া উঠিলেন।

ক্রমে এই শিক্ষালয়টি বড় হইয়া উঠিল। ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি ইহাতে নূতন প্রণালীতে শিক্ষা দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, এবং তদনুরূপ আয়োজন করিতেছিলাম। কিন্তু সমাজের সভ্যগণ ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত করিয়া ফেলিলেন, এবং শ্রদ্ধেয় গুরুচরণ মহলানবিশের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বোর্ডিংকে ইহার সহিত যুক্ত করিয়া ইহাকে এক প্রসিদ্ধ বালিকা বোর্ডিং স্কুল করিয়া তুলিলেন। পরে আমি ইহার সহিত সাক্ষাৎ সংশ্রব ত্যাগ করিলাম।

সাধু নবীনচন্দ্র রায়ের মৃত্যু। ১৮৯০ সালের আগস্ট মাসে একটি শোচনীয় ঘটনা ঘটে। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু নবীনচন্দ্র রায় কলিকাতাতে একটি বাস ভবন নির্মাণ কার্য শেষ করিবার জন্য আমার ভবনে আসিয়া বাস করেন। ঐ কার্যের তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁহাকে গুরুতর শ্রম করিতে হয়। তদ্ভিন্ন তাঁহার চিরদিন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাসের অভ্যাস ছিল, তাঁহার আহারাদির নিয়ম স্বতন্ত্র ছিল, তাহা আমাদের ভবনের নারীগণ জানিতেন না; নবীনবাবুও স্বাভাবিক হ্রীশীলতাবশত জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু বলিতেন না। এতদ্ভিন্ন বোধ হয় তাঁহার অপর কোনো উদ্বেগের কারণও ছিল। যাহা হউক, তিনি আমার ভবনে গুরুতর রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। তখন খাণ্ডোয়া হইতে তাঁহার পরিজনদিগকে আনা হয় এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত করিয়া চিকিৎসা করা যায়। এই রোগ শয্যাতে সেই সাধুপুরুষের যে ভাব দেখিয়াছিলাম, তাহা চিরদিন মনে মুদ্রিত রহিয়াছে। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এ যাত্রা আর বাঁচিবেন না, তখন প্রথম প্রথম দেখা গেল যে, তাঁহার পত্নী নিকটে গিয়া বসিলেই তাঁহার মন আবেগে পূর্ণ হইয়া উঠে ও চক্ষে জলধারা পড়ে। বোধ হয় ভাবেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নীকে কে দেখিবে। দুই-তিনদিন পরে সে ভাব চলিয়া গেল, চিত্ত ও মুখ প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। তখন পত্নী নিকটে গিয়া কাঁদিলে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমার দিকে দেখাইয়া দিতেন, এবং আর সংসারের কথা শুনাইতে বারণ করিতেন। এই অবস্থায় একদিন একজন ব্রাহ্ম যুবক আসিয়া বলিলেন, "আপনাকে একটি গান শুনাইতে চাই, কোন গানটি করিব?" নবীনচন্দ্র বলিলেন, "ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম" এই গানটি করুন।" সে গানটি এই—

ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম অপূর্ব শোভন,
ভবজলধির পারে, জ্যোতির্ময়!
শোকতাপিত জন সবে চল, সকল দুখ হবে মোচন,
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে, প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীন্দ্র ঋষিমুনিগণ না জানি কি ধ্যানে মগন,
স্তিমিত লোচনে কি অমৃতরস পানে ভুলিল চরাচর!
কি সুধাময় গান গাইছে সুরগণ, বিমল বিভুগুণ বন্দনা;
কোটি চন্দ্র তারা উলসিত, নৃত্য করিছে অবিরাম!

এই সঙ্গীত যখন হইতে লাগিল, তখন দরদর ধারে নবীনবাবুর চক্ষে প্রেমাশ্রু

বিগলিত হইতে লাগিল; মুখমণ্ডল এক অপূর্ব জ্যোতিতে পূর্ণ হইল। আমরা কি দেখিলাম!

নবীনচন্দ্রে এমন কিছু ছিল, যাহা দেখিয়া স্বদেশী বিদেশী সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইত। শুনিয়াছি, এই বিবরণ যখন কাগজে বাহির হইল, তখন তাহা দেখিয়া খাণ্ডোয়ার ডেপুটি কমিশনার সাহেব নাকি বলিয়াছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি, নবীনচন্দ্র স্বচক্ষে স্বর্গধাম দেখিয়াছিলেন।"

যাহা হউক, ইহার পর যে দুইদিন তিনি বাঁচিয়া ছিলেন, সে দুইদিন কেবল স্বীয় পত্নীকে সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে পত্নীকে বলিলেন, "মহব্বৎসে মিল্‌কর হমেশা য়হাঁ রহ্‌না," অর্থাৎ প্রেমে মিলিত হইয়া চিরদিন ইঁহাদের কাছে থাকিও। এই তাঁহার স্ত্রীর প্রতি শেষ উপদেশ। ইঁহার শেষ শ্বাস যখন যায়, তখন আমরা ভগবানের নাম কীর্তন করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনি হাত দুইখানি জুড়িয়া বক্ষের উপরে লইলেন, এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে করিতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরিবার-পরিজনকে দেখিবার ভার আমার উপর দিয়া গেলেন।

পুনরায় মান্দ্রাজে। নবীনচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর আমি একবার ধর্ম প্রচারার্থ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে গমন করি। ৪ঠা অক্টোবর ১৮৯০ মান্দ্রাজ পঁহুছিয়া, তথা হইতে ১৪ই অক্টোবর কোইম্বাটুর, ও ২১শে অক্টোবর পশ্চিম মালাবার উপকূলস্থিত কালিকট নগরে যাই। কালিকটে গিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলাম। সেখানে প্রবাদ যে মালাবার উপকূলে স্বয়ং পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগের রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে নাম্বুরী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণগণের অসীম প্রভুত্ব। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদের নাম নায়র। নায়রগণ বোধ হয় আদিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত এদেশ জয় করিতে আসিয়াছিলেন। নায়রগণের বীরত্বের অনেক কথা শুনিলাম।

কালিকটে নাম্বুরী ব্রাহ্মণ ও নায়রদিগের অদ্ভুত সামাজিক প্রথা। সেখানে কতকগুলি প্রথা দেখিলাম, যাহা অতীব বিস্ময়জনক। প্রথম দেখিলাম, ব্রাহ্মণ বা গুরুজনদিগকে দেখিলে নায়র বা শূদ্র স্ত্রীলোকদিগকে বক্ষঃস্থল অনাবৃত করিতে হয়। শুনিলাম, তাহা ব্রাহ্মণ ও গুরুজনদিগের প্রতি সম্ভ্রম প্রকাশের চিহ্ন! এ সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিলাম! একবার টিপু সুলতান নাকি উপহাসচ্ছলে একজন নায়র পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "নায়র যুবতীদের বক্ষঃস্থল অনাবৃত কেন? লোকে তো অপমান করিতে পারে।" তদুত্তরে নায়র পুরুষ বলিলেন, "নায়রদিগের স্ত্রীগণের বক্ষঃ অনাবৃত, পুরুষদের তরবারিও অনাবৃত।" নায়রদিগের বীরত্ব-খ্যাতি আছে।

দ্বিতীয় সামাজিক নিয়ম যাহা দেখিলাম, তাহা একটি ঘটনা দ্বারা প্রকাশ করিতেছি। একদিন অপরাহ্নে একজন ব্রাহ্মণ বন্ধুর সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছি; পথিমধ্যে দেখিলাম, একজন নিম্ন শ্রেণীর লোক আসিতে আসিতে দশ-বারো হাত দূরে দাঁড়াইয়া গেল এবং কি বলিল। আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "ও আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানে, এই জন্য দাঁড়াইয়া আমাকে সতর্ক করিতেছে, যেন উহার বাতাস বা ছায়া আমার গায়ে না লাগে; ইহাই আমাদের

সামাজিক প্রথা। নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে পথে ব্রাহ্মণ দেখিলে ঐরূপ করিতে হয়।” আমি এরূপ সামাজিক শাসন আর্যাবর্তে কখনো দেখি নাই; দেখিয়া দাক্ষিণাত্যে জাতিভেদ প্রথা যে কত দূরে গিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

তাহার পর যাহা শুনিলাম, তাহা অতীব বিস্ময়জনক। তাহা এই। শুনিলাম, নায়র ও শূদ্র বালিকাদের বিবাহ নাই। বিবাহের বয়স হইলে স্বজাতীয় একটি বালকের সঙ্গে একদিন নামমাত্র বিবাহ হয়, একটা খাওয়াদাওয়া হয়; কিন্তু তাহা বিবাহ বলিলে যাহা মনে হয় তাহা নহে, বিবাহের পরদিন হইতে তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ রহিত হয়। তৎপর কন্যা মাতৃভবনেই থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আত্মীয়-স্বজন একজন ব্রাহ্মণ যুবককে আনিয়া তাহার সহিত পরিচিত করিয়া দেন, এবং সেই ব্যক্তিই প্রকৃত পতি হইয়া দাঁড়ায়। রমণী মনে করিলে তাহাকে পরিবর্তন করিতে পারে। কিন্তু সে ব্যক্তি কার্যত পতি হইলেও সন্তানদিগের সম্বন্ধে তাহার কোনো দায়িত্ব থাকে না। সে দায়িত্ব তাহাদের মাতুলের উপর থাকে, তাহারা মাতুলেরই ধনের অধিকারী হয়।

একদিকে যেমন এই নিয়ম, অপর দিকে নাম্বুরী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আর এক অদ্ভুত নিয়ম প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে প্রথম পুত্র বংশ রক্ষার জন্য বিবাহ করে, অপর পুত্রেরা বিবাহ না করিয়া নায়র ও শূদ্র জাতীয় স্ত্রীদিগের সহিত এবং আবশ্যক হইলে একাধিক শূদ্র রমণীর সহিত সংগত হইবার জন্য থাকে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, অনেক ব্রাহ্মণ কন্যাকে পতি অভাবে চিরকৌমার্য ধারণ করিতে হয়। নায়র নারীদিগের সহিত নাম্বুরী ব্রাহ্মণদিগের মিলিত হওয়া সেদেশে এরূপ স্বাভাবিক প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, একদিন একজন নায়র ভদ্রলোক আমার সহিত কথা কহিতে কহিতে নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, “আমার এই দেহে ব্রাহ্মণের রক্ত আছে!”

কোকনদায় গুরুতর পীড়া। কালিকট হইতে পুনরায় কোইম্বাটুর গমন করি, ও তৎপর ত্রিচিনপল্লী ও বাঙ্গালোর হইয়া ৩০শে অক্টোবর মান্দ্রাজে ফিরিয়া আসি। তথায় কিছুকাল থাকিয়া বেজওয়াদা, মসুলিপটম ও রাজমহেন্দ্রী হইয়া ১৮ই নভেম্বর কোকনদাতে যাই। এই আমার কোকনদায় দ্বিতীয়বার গমন। সেখানে গিয়া ২০শে নভেম্বর গুরুতর পীড়াতে আক্রান্ত হই। পরে শুনিয়াছি, তাহা টাইফয়েড জ্বর। জ্বরের সহিত রক্ত দাস্ত ও মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। কোকনদার বন্ধুগণ প্রথমে আমার জন্য একটি বাড়ি স্থির করিয়া সেই বাড়িতে আমাকে রাখিয়াছিলেন। অপর এক স্থান হইতে দুইবেলা আমার খাবার পাঠাইয়া দিতেন। পীড়া যখন গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল তখন তাঁহারা বড়ই চিন্তিত হইলেন। এই সময়ে একজন বাঙালী খৃষ্টান কোকনদা স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন এবং সপরিবারে স্কুল ভবনে বাস করিতেন। অবশেষে তিনি দয়া করিয়া আমাকে স্কুল ভবনে লইয়া গেলেন এবং চিকিৎসা করাইতে আরম্ভ করিলেন।

আমার শুশ্রূষার ভার ব্রাহ্মসমাজানুরাগী কতিপয় যুবকের প্রতি ছিল। কিন্তু তাঁহারা তখনো হিন্দুসমাজ সংশ্লিষ্ট আছেন। তাঁহারা সমাজ ভয়ে আমাকে খাওয়ানো ধোয়ানো প্রভৃতি কার্য সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিতেন না। সেজন্য একজন মেথর জাতীয় স্ত্রীলোক রাখা হইয়াছিল। সে খোঁড়া ও দুর্বল, সে আমাকে তুলিয়া পায়খানায় লইবার সময় প্রায় ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিত। একদিন তাহার কঠিন

হস্তে বন্দী হইয়া টলিতে টলিতে আমি বলিয়া উঠিলাম, আই সী মাই কেরিয়ার ইজ গোইং টু এণ্ড ইন দি আর্মস অভ এ সুইপার ওয়াম্যান, অর্থাৎ একজন মেথরানীর বাহুপাশেই বা আমার জীবন শেষ হয়। যেই এই কথা বলা, অমনি দেখি একজন ব্রাহ্মণ যুবক আপনার গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া, পৈতা কোমরে গুঁজিয়া বলিল, "লোকে যা করে করবে, আপনাকে এরূপ লাঞ্ছিত হতে কখনোই দেব না।" এই বলিয়া সে দৌড়িয়া আসিয়া মেথরানীকে সরাইয়া আমাকে বুকে করিয়া ধরিল, এবং তদবধি পুত্রাধিক যত্নে শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তাহার প্রেম আমি কখনোই ভুলিব না।

আশ্চর্য স্বপ্ন। এই পীড়ার সময়ের তিনটি বিষয় আমার স্মৃতিতে রহিয়াছে। প্রথম, আমার শারীরিক ধাতুর দুর্বলতা এত অধিক হইয়াছিল যে, পাড়িয়া পড়িয়া আমার মনে হইত যেন কে আমার সমগ্র শরীরের উপর দিয়া একখানা সীসা বা ইস্পাতের পাত বুলাইতেছে! দ্বিতীয় বিষয়টি অতি আশ্চর্য। আমি দারুণ মাথার যন্ত্রণায় অর্ধনিদ্রিত অর্ধজাগ্রত অবস্থায় অচেতনপ্রায় আছি, হঠাৎ ঘণ্টার শব্দের ন্যায় কি শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমার বোধ হইল যেন ঘণ্টার শব্দটি ক্রমশ আমার নিকটস্থ হইতেছে। সেদিকে মনোনিবেশ করিবামাত্র যেন বহু-বহু লোকের সম্মিলিত সঙ্গীত-ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে সর্বদা ইংরাজীতে কথা কহিতাম, সুতরাং ইংরাজীতে বলিলাম, হোয়ার ইজ দ্যাট নয়জ ফ্রম? অমনি এক নারীর স্বর শুনিলাম (আমি মনে করিলাম তিনি ঘণ্টা বাজাইতেছিলেন); তিনি বলিলেন, দ্যাটস দি এ্যানথেম অভ দি ইম্‌মর্টালস, অর্থাৎ উহা অমরদিগের বন্দনাধ্বনি।

আমি। ইন হোয়াট ল্যাংগোয়েজ ইজ ইট? অর্থাৎ, কোন ভাষাতে ঐ সঙ্গীত হইতেছে?

নারী। হ্যাভ দি ইম্‌মর্টালস এনি ল্যাংগোয়েজ? দোজ আর থটস, অর্থাৎ অমরদিগের কি ভাষা আছে? ও সকল চিন্তা।

আমি। বাট আই নোটিস এ টিউন অর্থাৎ কিন্তু আমি যেন কি একটা সুর লক্ষ্য করিতেছি।

নারী। দ্যাটস দি টিউন অভ দি ইউনিভার্স—হার্মনি অর্থাৎ উহা এই ব্রহ্মাণ্ডের সুর, উহার নাম মহাযোগ।

ইহা শুনিয়া আমি মনে-মনে ভাবিতে লাগিলাম, অমরগণের চিন্তা মহাযোগে এক হইয়া বাজিয়া উঠিতেছে। তৎপরে প্রশ্ন করি, আর সে নারী কণ্ঠের উত্তর নাই। তখন আমি ব্যাকুল হইয়া ভাবিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, আচার্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় হাসিতে হাসিতে আসিতেছেন। এরূপে মৃত ব্যক্তির স্বপ্ন আমি প্রায় দেখি না; কেন জানি না আমার পরমাত্মীয়দিগকেও স্বপ্নে দেখি না। কিন্তু এবারে আচার্য কেশবচন্দ্রকে দেখিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দেখ, পৃথিবীতে থাকতে কত ভুল করা যায়, পরস্পরকে চিনতে পারা যায় না। যা হোক, তুমি এস, তোমাকে রামমোহন রায়ের কাছে নিয়ে যাই।" আমি যেমন উঠিব, অমনি ঘুম ভাঙিয়া গেল, চেতনা হইল। আশ্চর্যের বিষয়, তৎপরে দুই-তিনদিন জাগ্রত অবস্থাতেও সেই মহারোল ও অমরদিগের গাথা শুনিতে লাগিলাম।

একটি অলৌকিক ঘটনা। তৃতীয় ঘটনাটিও আশ্চর্য, ইহা পরে শুনিয়াছি। আমি

যখন কোকনদাতে শয্যায় পড়িয়া মা-মা করিয়া এপাশ ওপাশ করিতেছিলাম, তখন নাকি আমার মাতাঠাকুরাণী গ্রামের বাড়িতে পিতাঠাকুর মহাশয়কে অস্থির করিয়া তুলিলেন, "তুমি কলকাতাতে যাও, ও তার খবর আনো। আমার মন কেন অস্থির হচ্ছে?" বাবা রাগ করিয়া শহরে আসিলেন; আসিয়া গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের নিকট গিয়া শুনিলেন, আমার গুরুতর পীড়া।

যাহা হউক, আমার গুরুতর পীড়ার কথা শুনিয়া কলিকাতার বন্ধুগণ ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার (আমার বর্তমান জামাতা), সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন সহকারী সম্পাদক শশিভূষণ বসু, আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনী, ও আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা, এই চারিজনকে কোকনদাতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা দ্বারা আমাকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। ২০শে ডিসেম্বর আমার জ্বর ত্যাগ হইল, ও ২৬শে ডিসেম্বর আমি তাঁহাদের সঙ্গে কলিকাতা অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

শেষ জীবন

সাধনাশ্রম। ১৮৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করি। ১৮৯১ সালে আমি শহরের ভিতর হইতে উঠিয়া গিয়া বালিগঞ্জে বাসা করিয়াছিলাম। উঠিয়া যাইবার কারণ এই। কিছুদিন হইতে আমার মনে কি এক প্রকার অবসাদের ভাব আসিয়াছিল, আমার নিজের কাজকর্মের প্রতি ও সমাজের কাজকর্মের প্রতি কেমন এক প্রকার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। কিছুই ভালো লাগিত না, মেজাজ খারাপ হইয়া যাইতেছিল। সামান্য কথাতে বন্ধু-বান্ধবের প্রতি, পরিবার-পরিজনের প্রতি বিরক্ত হইতাম। অবশেষে মনে হইল, শহর হইতে একটু দূরে থাকাই ভালো। তাই বালিগঞ্জে একটি বন্ধুর একটি বাড়ি ভাড়া লইয়া গিয়া বাস করিলাম। এখানে প্রায় প্রতিদিন প্রাতে এক নির্জন বাগানে গিয়া বসিয়া চিন্তা করিতাম। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মনে হইতে লাগিল যে, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, ব্রাহ্মসমাজ ও জনসমাজের সেবার জন্য আত্মসমর্পণ করিবেন, এবং বিশ্বাস বৈরাগ্য ও সেবার ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য করিবেন, এরূপ একটি ঘননিবিষ্ট সাধক-মণ্ডলী গঠন করার বড় প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের শক্তি জাগিবে না। বিশ্বাসী ও বৈরাগ্য ভাবাপন্ন মানুষই ধর্মসমাজের বল। এরূপ মানুষ প্রস্তুত না হইলে ধর্ম-সমাজের শক্তি জাগে না। এই ধারণা মনকে এমন করিয়া ধরিয়া বসিল যে, দিন-রাত্রি চিন্তাকে অধিকার করিতে লাগিল। অবশেষে ১৮৯২ সালের মাঘোৎসবের সময় মনে সঙ্কল্প জাগিল যে, এরূপ একটি সাধকমণ্ডলী প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই বিষয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। অবশেষে হৃদয়ে সেইরূপ প্রেরণা আসিল। ঐ বৎসর আমার জন্মদিনের পূর্বে (অর্থাৎ ৩১শে জানুয়ারির পূর্বে) সেই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। প্রস্তাবিত আশ্রমের উদ্দেশ্য ও ভাব একখানি কাগজে লিখিয়া বন্ধুবর আনন্দমোহন বসুকে দেখাইলাম। তিনি হৃদয়ের সহিত উৎসাহ দিলেন।

তৎপরে ৩১শে জানুয়ারি আমার জন্মদিন হইয়া গেল। ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৯২, ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেনের সিটি স্কুল বাড়ির একটি ঘর চাহিয়া লইয়া কতিপয় বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপাসনা পূর্বক আশ্রম স্থাপন করিলাম।

সেই দিন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্তী একজন। তিনি ঐ কাগজ পড়িয়া অতিশয় আন্দোলিত হইলেন, এবং আপনাকে ঐ কার্যের জন্য দিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন ময়মন-সিংহ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে তখন বিদায় দেওয়া গেল। কিন্তু তিনি গিয়া বার-বার পত্র লিখিতে লাগিলেন।

তাঁহার কিছু ঋণ ছিল। অবশেষে সেই ঋণ শোধ করিবার জন্য তাঁহাকে টাকা দিয়া, তাঁহাকে আসিতে বলিলাম।

জগদীশ্বর আশ্চর্য উপায়ে আশ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে লাগিলেন। আমি একটি ছেলের হাতে ভিক্ষার ঝুলি পাঠাইতাম। তাহাতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লোকে যাহা দিত, তাহা দ্বারাই সমুদয় ব্যয় চলিয়া যাইত। গুরুদাস সর্বত্যাগী হইয়া আসিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল নামে বিক্রমপুরের একজন ব্রাহ্ম তাঁহার জুতার দোকান তুলিয়া দিয়া আসিলেন। ক্রমে-ক্রমে আরও অনেকে আসিলেন। ইহার মধ্যে অনেকে আবার চলিয়া গিয়াছেন। আশ্রম ভিন্ন-ভিন্ন বাড়িতে থাকিয়া অবশেষে সমাজ পাড়াতে সমাজের নির্মিত প্রচারক ভবনে প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং অদ্যাবধি সেইখানেই আছে।

'আশ্রমের ইতিবৃত্ত' নামে একখানি হস্তলিখিত পুস্তক আছে, তাহাতে ইহার অনেক আশ্চর্য ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাইবে বলিয়া এখানে আর অধিক লিখিলাম না। কেবল কয়েকটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আশ্রম যখন স্থাপিত হইল, তখন আমার হাতে একটি পয়সা ছিল না। এমন কি, বসিয়া লিখিবার জন্য যে একখানি চেয়ার ও ডেস্ক কিনি, সে পয়সারও অভাব ছিল। অথচ আশ্রম স্থাপনের উপাসনাতে যে সকল বন্ধু আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও কাছেও কিছু চাহিলাম না। মনে এই ভাব ছিল, এ কার্য যদি জগদীশ্বরের অভিপ্রেত হয়, সাহায্য আপনি আসিবে, স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা চলিবে। আশ্চর্যের বিষয় এই, দুইদিন যাইতে না যাইতে ইংলণ্ড হইতে প্রফেসার ফ্রান্সিস নিউম্যানের প্রেরিত পনোরো টাকা আসিয়া উপস্থিত। তিনি লিখিয়াছেন, "তুমি ব্রাহ্মসমাজের যে কাজে ব্যয় করিতে চাও, করিও।" তাহা দিয়া একটি ডেস্ক, একখানি চেয়ার ও অত্যাবশ্যক যাহা কিছু প্রয়োজন ছিল, তাহা কেনা হইল। এই ভাবাপন্ন হইয়াই, যে বালকটির হাতে বাড়িতে-বাড়িতে বাক্স পাঠাইয়াছিলাম, তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলাম, "কাহারও নিকট বিশেষ-ভাবে কিছু চাহিবে না। কেবল বাক্সটি লইয়া বাড়িতে-বাড়িতে গিয়া দাঁড়াইবে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যিনি যাহা দিবেন লইবে।" এইরূপ করিয়াই চারিদিক হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল।

আশ্রম সংক্রান্ত আর একটি ঘটনা চিরস্মরণীয়। ১৮৯২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৩ সালের মাঘোৎসবে ১২ই মাঘ প্রাতঃকালে সাধনাশ্রমের উৎসব হইবে এবং আমাকে লইয়া সাতজন পরিচারক বিধি পূর্বক নিযুক্ত হইবেন, এই স্থির ছিল। এই নিয়োগ কার্য নির্বাহের জন্য আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করি। তিনি দয়া করিয়া সম্মত হন। আমি সংক্ষেপে উপাসনা কার্য সম্পন্ন করিয়া বেদী হইতে অবতরণ করিলে, কিয়ৎক্ষণ সঙ্গীত চলিতে থাকে। ইহার পর মহর্ষি আসিয়া তাঁহার জন্য রচিত নূতন বেদীতে আসন গ্রহণ করেন। একটি সঙ্গীতের পর আমি সাধনাশ্রম ও সাধকমণ্ডলীর অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করি। তৎপরে আমরা সাতজন একে-একে আমাদের ব্রতপত্র পাঠ করি এবং মহর্ষিদেব একে-একে আমাদের সাতজনের মাথায় হাত দিয়া তাঁহার আশীর্বাদ বাণী পাঠ করেন। তৎপরে তিনি চলিয়া গেলে উপাসনার শেষাংশ সম্পন্ন হয়। সেদিন আমার উপদেশের বিষয় ছিল, "জীবন বিনা সত্যের শক্তি হয় না।" সেদিন এইরূপ একটি ভাবের আবির্ভাব হইল যে, সমাগত বন্ধুগণের নিকট দানের উপযুক্ত যে কিছু ছিল, সকলে আশ্রমের জন্য দান করিতে লাগিলেন। এমন কি, অবশেষে চারিদিক হইতে আমার মস্তকের

উপর পুরুষদিগের গায়ের শাল, দামী পট্টবস্ত্র, মহিলাদের বালা, চুড়ি, গলার হার প্রভৃতি পড়িতে লাগিল। তাহা বিক্রয় করিয়া পরে অনেক শতটাকা হইয়াছিল।

এইরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা সাধনাশ্রম চিরদিনই চলিয়া আসিয়াছে। সাধনাশ্রমের ইতিবৃত্ত দেখিয়া বন্ধুগণ জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিবার যথেষ্ট কারণ পাইবেন। তিনি যে ইহার অর্থাভাব পূরণ করিয়া আসিয়াছেন কেবল তাহা নহে, ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অনেকে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে হইতে চারিজনকে এ পর্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আপনাদের প্রচারকপদে বরণ করিয়াছেন।

আর একটি স্মরণীয় ঘটনা, একবার আমি সাধনাশ্রমের কার্যভার আশ্রমের একজন পরিচারকের প্রতি দিয়া ধর্ম প্রচারার্থ লাহোরে গিয়াছিলাম। সেখানে সংবাদ পাইলাম, আশ্রমে মহা অর্থকষ্ট উপস্থিত, দিনে দুই-তিন আনা মাত্র বাজার হইতেছে। যে রবিবার প্রাতে এই সংবাদ পাইলাম, সেইদিন তথাকার এক ব্রাহ্ম-বন্ধুর ভবনে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। আহার করিতে যাইবার সময় সঙ্গের একটি ব্রাহ্ম-বন্ধুকে বলিলাম, “আজ আমার নিমন্ত্রণ খেতে উৎসাহ হচ্ছে না। কলিকাতার আশ্রমে যাঁরা আছেন, তাঁদের বাজারের পয়সা নাই, আর আমি এখানে নিমন্ত্রণ খেয়ে বেড়াচ্ছি, এ ভালো লাগছে না। কিন্তু কি করি, কথা দিয়েছি, না গেলে নয়।” এই বলিয়া কোনো প্রকারে গিয়া আহার করিয়া আসিলাম। সায়ংকালে লাহোর মন্দিরে উপাসনার কার্য আমাকে করিতে হইল। উপাসনান্তে আমি বেদী হইতে নামিয়াছি, এমন সময় একজন আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, একটি পাঞ্জাবী বড়ঘরের মেয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য মন্দিরের পশ্চাতের ঘরে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি গিয়া দেখি, তিনি একজন বড়লোকের পুত্রবধূ; তাঁহার পতি কিছুদিন পূর্ব হইতে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া গলবস্ত্রে আমার চরণে প্রণত হইলেন, এবং আমার পায়ে একশত টাকার নোট রাখিয়া বলিলেন, “আপনার স্থাপিত আশ্রমের সাহায্যার্থে দান।” তৎপর দিনই সেই টাকা কার্যাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিলাম।

ব্রাহ্ম বালক বোর্ডিং। এই কালের মধ্যে আর একটা কাজে হাত দেওয়া গিয়াছিল, তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারা যায় নাই। যে সময়ে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকার্যে ব্যস্ত ছিলাম, সেই সমকালেই সীতানাথ নন্দী নামে এক ব্রাহ্মযুবক আমার নিকট ব্রাহ্ম-বালকদিগের জন্য একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপনের আবশ্যকতার উল্লেখ করেন। আমি বলি, “তোমরা কার্যে প্রবৃত্ত হও, আমি পশ্চাতে আছি।” তিনি বলেন, “আপনি যদি সম্পাদক বলিয়া নাম দেন, তাহা হইলে আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি।” আমি সম্পাদকরূপে নাম দিতে স্বীকৃত হই, এবং ঐ কার্যের দায়িত্ব নিজের শিরে গ্রহণ করি। সীতানাথের তত্ত্বাবধানে বোর্ডিং স্থাপিত হয়। ক্রমে অনেকগুলি বালক জোটে। দুঃখের বিষয়, ইহার অল্পদিন পরেই সীতানাথ নন্দীর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু হইলে আমি বোর্ডিঙের ভার সাধনাশ্রমের পরিচারক গুরুদাস চক্রবর্তীর প্রতি অর্পণ করি। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী নামক একজন পূর্ববঙ্গীয় যুবক আসিয়া আশ্রমে যোগ দেন, এবং ব্রাহ্মবালক বোর্ডিঙে গুরুদাসবাবুর সহকারী হন। তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে বোর্ডিং কিছুদিন চলে। তৎপরে গুরুদাসবাবু প্রভৃতি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া আরাতে, ও সেখান হইতে বাঁকিপুরে গমন করেন, এবং সেখানে শাখা সাধনাশ্রম

স্থাপন করেন। তখন ব্রাহ্মবালক, বোর্ডিঙের ভার শ্রদ্ধেয় গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হয়। অনেক বালকের দেয় অনাদায় থাকাতে গুরুদাসবাবুরা বাজারে প্রায় পাঁচশত টাকা দেনা রাখিয়া যান, তাহা আমাকে দিতে হয়। মহলানবিশ মহাশয়ের হাতে সে বোর্ডিংটি উঠিয়া যায়। কিন্তু তিনি আবার একটি ব্রাহ্ম বালক বোর্ডিং ও স্কুল স্থাপন করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি চালাইতেছেন।

উপাসকমণ্ডলীর দায়ী স্থায়ী আচার্য। আমার এই সময়ের আর একটি বিশেষ কাজ, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসকমণ্ডলীর উন্নতি সাধন। বরাবর উপাসক-মণ্ডলীর কাজ এই ভাবে চলিয়া আসিতেছিল যে, সম্পাদক এক-এক সপ্তাহে এক-একজনকে উপাসনা করিতে অনুরোধ করিতেন; তিনি উপাসনা করিতেন। আমরা এই ভাবেই উপাসনা করিয়া আসিতেছিলাম, তাহাতে কিছুই জমিতেছিল না। পরে ১৮৯৪ সালে ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় উপাসকমণ্ডলীর সম্পাদক হন। তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন যে, খৃষ্টীয় সমাজের অনুরূপ পাসটোরাল সিস্টেম প্রবর্তিত করিতে না পারিলে প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে না। আমার নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করাতে আমি হৃদয়ের সহিত সে কার্যে সহায় হইলাম এবং উপাসকমণ্ডলীর প্রথম দায়ী স্থায়ী আচার্যের ভার গ্রহণ করিলাম। আচার্যের ও উপাসকগণের ব্যবহারার্থ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি নামে একটি লাইব্রেরি স্থাপিত হইল। আমি আমার আপিস তাহাতে স্থাপন করিয়া আচার্যের কার্য করিতে লাগিলাম। প্রতি সপ্তাহে লিখিয়া উপদেশ দিতাম এবং সেই উপদেশ পরে ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত হইত। সেই উপদেশগুলি পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়া 'ধর্মজীবন' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিকে আমার আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধর্মজীবনের পরিণত ফল বলিলে হয়।

কিছুদিন পরে শারীরিক অস্বাস্থ্যের জন্য আমাকে দায়ী আচার্যের কাজ ত্যাগ করিয়া নানাস্থানে যাইতে হয়। উপাসকমণ্ডলীর কাজ আবার পূর্ববৎ দাঁড়াইয়াছে। সেটা একটা দুঃখের বিষয়।

ইহার পরে এই সময়ের মধ্যে আর নূতন কাজে হাত দিই নাই। কয়েক বৎসর ধরিয়া সাধনাশ্রমের কাজ ও উপাসকমণ্ডলীর আচার্যের কাজ, এই দুই কাজই প্রধান কাজ থাকিয়াছে। ১৮৯৮ সালে স্বাস্থ্যের জন্য চন্দননগরে গঙ্গাতীরবর্তী একটি বাড়িতে গিয়া থাকি। সেখান হইতে রবিবার কলিকাতায় আসিয়া মন্দিরে আচার্যের কার্য করিতাম, এবং সমাজের অন্যান্য কাজে সাহায্য করিতাম। ১৮৯৯ সালের শেষে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি।

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' রচনা। এই কালের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে আর একটি এই। এই সময়ের মধ্যে আমার মন্দিরের উপদেশ 'ধর্মজীবন' ব্যতীত, 'যুগান্তর' ও 'নয়নতারা' নামে দুইখানি উপন্যাস, ও 'মাঘোৎসবের উপদেশ ও বক্তৃতা' প্রভৃতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তদ্ভিন্ন 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামে একখানি গ্রন্থ, এবং আমার রচিত প্রবন্ধ সকল সংগ্রহ করিয়া 'প্রবন্ধাবলী' নামে এক গ্রন্থ, মুদ্রিত করি।

পুত্র কন্যার বিবাহ। এই কালের মধ্যে ১৮৯৩ সালে আমার জ্যেষ্ঠাকন্যা হেমলতার

বিবাহ হয়। ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার, যিনি কোকনদাতে পীড়ার সময় আমার চিকিৎসার জন্য সমাজের বন্ধুগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন, তিনি আমার পীড়ার সময় হেমের সহিত পরিচিত হন। সেই পরিচয় ক্রমে দাম্পত্যপ্রেমে পরিণত হয়, এবং অবশেষে তিনি হেমকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, এবং আমার অনুমতি পাইয়া তাঁহারা বিবাহিত হন।

এই কালের মধ্যে আমার সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সুহাসিনীও বিবাহিতা হয়। সাধনাশ্রম সংসৃষ্ট কুঞ্জলাল ঘোষ নামক একজন যুবকের সহিত তাহার বিবাহ হয়। দুঃখের বিষয়, ইহার পর সুহাসিনী বহুদিন বাঁচিয়া থাকে নাই। ১৮৯৯ সালে বিবাহিতা হইয়া ১৯০৬ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিল, ঐ সালের ১৫ই নভেম্বর দিবসে গতাসু হয়।

১৯০১ সালের গ্রীষ্মকালে আমার পুত্র প্রিয়নাথের বিবাহ হয়। ঐ বিবাহ কটকের সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম-বন্ধু মধুসূদন রাওর দ্বিতীয়া কন্যা অবন্তী দেবীর সহিত হয়। এই বিবাহের ফলস্বরূপ অদ্য পর্যন্ত একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে।

১৯০১ সালের ৩রা জুন প্রসন্নময়ী স্বর্গারোহণ করেন। তৎপূর্বে বহু বৎসর তিনি গুরুতর বহুমূত্র রোগে ক্লেশ পাইতেছিলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি পরলোকগত রামকুমার বিদ্যারত্ন ভায়ার মাতৃহীন সর্বকনিষ্ঠা কন্যা রমাকে কন্যা রূপে গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স এক বৎসর। তাহাকে লওয়ার কিছুদিন পরেই তাহার গুরুতর রক্তামাশয় রোগ জন্মে। সেই সময় রাত্রি জাগরণ ও দুর্ভাবনাতে প্রসন্নময়ীর বহুমূত্র রোগের সঞ্চার হয়। তদবধি তাঁহাকে স্বাস্থ্যের জন্য নানাস্থানে প্রেরণ করা হয়। কিছুতেই উপশম হয় নাই। অবশেষে ১৯০১ সালের জুন মাসে অঙ্গুলিতে ক্ষত হইয়া প্রসন্নময়ীর প্রাণ বিয়োগ হয়।

বহুমূত্র রোগের আক্রমণ। প্রসন্নময়ী চলিয়া গেলেন। এদিকে সেই বৎসরেই আমাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি নির্বাচন করাতে আমাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সেই পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তাতে, প্রসন্নময়ী চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরেই, আমার বহুমূত্র রোগ প্রকাশ পাইল। তদবধি আর বসিয়া নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে কাজ করিতে পারিতেছি না। বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস স্বাস্থ্যের জন্য সিমলা, দার্জিলিং, কটক, পুরী, প্রভৃতি স্থানে থাকিতে হইতেছে।

সমগ্র ভারত ভ্রমণ। এই অস্বাস্থ্যের অবস্থাতেও যথাসাধ্য সমাজের কাজ করা আবশ্যক হইতেছে। কিন্তু অনেক সময় শহরে না থাকাতে সাধনাশ্রমের কাজের ক্ষতি হইয়াছে। এই পীড়িত অবস্থাতেও একবার ইচ্ছা হইল যে সমুদয় ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া আসি। তদনুসারে ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পত্নী বিরাজমোহিনী ও আশ্রম সংশ্লিষ্ট শ্রীমান হেমেন্দ্রনাথ দত্তকে লইয়া ভারত ভ্রমণে বহির্গত হই। বহির্গত হইবার সময় সঙ্কল্প করি যে, যাত্রার সাহায্যের জন্য বিশেষ ভাবে কাহারও নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিব না। যাত্রার পূর্বে মন্দিরে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিব। সেই বক্তৃতা স্থলে একটি ভিক্ষার ঝুলি থাকিবে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে যিনি যাহা ফেলিয়া দিতে চান দিবেন, তাহাই আমাদের যাত্রার পাথেয় স্বরূপ হইবে। তদনুসারে বক্তৃতার দিন একটি ঝুলি ঝুলাইয়া দেওয়া হইল, তাহাতে বন্ধুরা যিনি যাহা ফেলিয়া দিলেন, তাহা লইয়াই আমরা বহির্গত হইলাম। পথে একবার মাত্র

ভিক্ষা না করার নিয়মের ব্যাঘাত করিয়াছিলাম। এলাহাবাদে একজন ব্রাহ্মবন্ধুকে আমাদের জন্য ভিক্ষা করিবার অনুমতি দিয়াছিলাম। সেখানে কিছুই হইল না। তৎপরে আমরা ভিক্ষা করা একেবারে বন্ধ করিলাম। কাহাকেও আমাদের অভাব জানাইতাম না; যিনি যাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দিতেন, তাহাই গ্রহণ করিতাম। এইরূপে আমাদের ব্যয় নির্বাহ হইত। আমরা এলাহাবাদ হইতে লক্ষ্ণৌ, লক্ষ্ণৌ হইতে কানপুরে গেলাম। তৎপরে আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, রাওলপিণ্ডী, ইন্দোর, বোম্বাই, মাঙ্গালোর, কালিকট, কোইম্বাটুর, বাঙ্গালোর, ত্রিচিনপল্লী, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, নাগপুর হইয়া কলিকাতায় ফিরিলাম। কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা না করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা আমাদের এই বিস্তীর্ণ ভ্রমণের সমুদয় ব্যয় সুচারু রূপে নির্বাহ হইয়া গেল।

তাহার পর আর এত দূরে ভ্রমণ করি নাই। বিগত বৎসর, অর্থাৎ ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে, অন্ধ্র কনফারেন্সে সভাপতির কার্য করিবার জন্য একবার কোকনদাতে যাই। সেখান হইতে কলিকাতাতে ফিরিয়া আসিয়া শরীরটা বড় খারাপ হয়। সেই অবস্থাতে বায়ু পরিবর্তনের জন্য দার্জিলিঙে যাই।

১৯০৭ সালে গুরুতর পীড়া। দার্জিলিং হইতে পিতাঠাকুরমহাশয়ের গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া সত্বর গ্রামে যাইতে হয়। তিনি আরোগ্য লাভ করিলে গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসি। কলিকাতায় আসিয়া ১৭ই জুন দিবসে আমি গুরুতর পীড়াতে পতিত হই। এই পীড়াতে কয়েকবার জীবন সংশয় হইয়াছিল। যাহা হউক, ঈশ্বর কৃপাতে ৪।৫ মাস রোগ শয্যায় যাপন করিয়া উঠিয়াছি। সেই পীড়ার শেষ ফল এখনো রহিয়াছে, আজিও (৫ই জুন ১৯০৮) সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতে পারি নাই। আগামী ১৭ই জুন হইতে আবার কার্যারম্ভ করিব ভাবিতেছি।

রোগশয্যাতে পড়িয়া অনেক আধ্যাত্মিক চিন্তা করিবার সময় পাইয়াছি। নবশক্তির সঙ্গে-সঙ্গে অনেক নূতন ভাব মনে আসিয়াছে। অবশিষ্ট যে কয়েক বৎসর জগতে থাকি, নূতনভাবে কাটাইব মনে করিতেছি। ঈশ্বর এই শুভ সঙ্কল্পের সহায় হউন।

পরিশিষ্ট

যে সকল সাধু-সাধ্বীর সংশ্রবে আসিয়া এ-জীবনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি, তাঁহাদের কি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, তাহার কথঞ্চিৎ বিবরণ

পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য। আমার পূজনীয় পিতৃদেব হরানন্দ ভট্টাচার্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কেবল প্রিয়পাত্র নহে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতির অনেক গুণ তাঁহাতে ছিল। শুধু গুণ কেন, তাঁহার প্রকৃতির অনেক দোষও আমার পিতার প্রকৃতিতে ছিল। সেই তেজস্বিতা, সেই উৎকট ব্যক্তিত্ব, সেই অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ, সেই আত্মমর্যাদা জ্ঞান, সেই পরদুঃখ কাতরতা, সকলি আমার পিতাতে ছিল; আবার সেই স্বমতপ্রিয়তা, সেই ফলাফলের প্রতি দৃষ্টির অভাব, সেই আত্ম-পরীক্ষা ও আত্মসংশোধনের প্রয়াসাভাব, তাহাও ছিল। কিন্তু মানব কুলের মধ্যে কে আছে, যে দোষে গুণে জড়িত নয়? আমার পিতার দোষ যাহা থাকে থাকুক; ইহা নিশ্চিত কথা যে, শৈশব হইতে ঐ তেজস্বী অধর্মবিদ্বেষী ও সত্যানুরাগী মানুষের শাসনাধীন না থাকিলে, আমার চরিত্র গঠিত হইত না।

আমি আমার দীর্ঘ জীবনের পরীক্ষাতে এই দেখিলাম যে, কোনো গৃহস্থের গৃহের প্রাঙ্গণের চারিদিকে যদি প্রাচীর থাকে, এবং ঐ প্রাচীর যদি উচ্চ হয়, তবে গৃহের বালক-বালিকা প্রাচীরের অপর পার্শ্বের প্রতিবেশীর প্রাঙ্গণের আবর্জনা যেমন দেখিতে পায় না, সুখেই থাকে; তেমনি, পিতামাতার চরিত্র যদি উচ্চ হয়, তাহাতে যদি সন্তানগণ পাপের প্রতি অকৃত্রিম ঘৃণা ও সাধুতার প্রতি অকৃত্রিম আদর দেখিতে পায়, তাহা হইলে সেই পিতৃচরিত্র এবং মাতৃচরিত্র উন্নত প্রাচীরের ন্যায় তাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকে। তাহারা সংসারের খারাপটা সহজে দেখিতে পায় না; সৎপথে থাকিয়াই বর্ধিত হয়।

'অকৃত্রিম' কথাটি এই জন্য ব্যবহার করিতেছি যে, অনেক গৃহে এমন অনেক পিতামাতা দেখিয়াছি, যাঁহারা ইংরাজ লেখক ডিকেন্সের বর্ণিত গুরুমহাশয়ের ন্যায় নিজেরা মাংসখণ্ড মুখে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে শিশুদিগকে উপদেশ বলেন, "দেখ শিশুগণ, লোভ দমন চরিত্রের উন্নতির প্রথম সোপান।" অর্থাৎ তাঁহারা জানিয়া রাখিয়াছেন, শিশুদিগকে মুখে উপদেশ দেওয়া পিতামাতার কর্তব্য; মুখে বড় কথা বলিতে হইবে, মুখে অধর্মের প্রতি ঘৃণা ও সাধুতার প্রতি আদর দেখাইতে হইবে; মুখে সত্যবচনে সত্যব্যবহারে প্রবৃত্ত করিতে হইবে, কার্যত হউক আর না হউক। আমি এরূপ একজন লোকের কথা জানি, যিনি সন্তানদিগকে এইরূপ মৌখিক উপদেশ দিবার নিয়ম রাখিয়াছিলেন; মুখে বড়-বড় উপদেশ দিতেন এবং তাহাদিগকে লইয়া ঈশ্বরের নাম করিতেন। কিন্তু একদিন কোনো ভদ্রলোকের বাগানের মালী নিজ প্রভুর কতকগুলি গাছ চুরি করিয়া বেচিতে আনিল, স্বল্পমূল্যে সেগুলি পাইয়াই তিনি কিনিতে বসিলেন। তখন উপস্থিত সমাগত একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে

স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন, "মহাশয়, বুঝিতে পারিতেছেন না, চুরি করা গাছ; নতুবা কি এত সস্তা দেয়?" তিনি বলিলেন, "তাহা আমি দেখিতে গেলাম কেন? আমার দ্বারে গাছ আনিয়াছে, আমি সস্তাতে পাইতেছি, লইতেছি। আমি তো উহাকে প্রলোভন দিয়া আনি নাই।" এই বলিয়া গাছগুলি লইলেন। আমি শুনিয়াছি, তাঁহার পুত্রেরা সেখানে উপস্থিত ছিল। তৎপরে কতবার ভাবিয়াছি, ইহা কিছুই আশ্চর্য নয় যে তাঁহার পুত্রদের অনেকে উত্তরকালে বদমায়েস হইয়াছে। তাঁহার মৌখিক উপদেশের কোনো কাজ হয় নাই।

আমার পিতা এ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন না। তিনি মুখে আমাদিগকে কখনো নীতির উপদেশ দেন নাই; কখনো বলেন নাই, "দেখ, এইরূপ স্থলে এইরূপ কর্তব্য," কিন্তু তাঁহাতে জীবন নীতি দেখিয়াছি। তিনি যে আমাকে বাল্যকালে গুরুতর প্রহার করিতেন, এমন কি, এক একবার অচেতন করিয়া ফেলিতেন, তাহা তাঁহার আদেশের অবাধ্যতা জনিত ক্রোধবশত নহে, আমার আচরণে মিথ্যা বা অন্যায়ের প্রমাণ পাওয়াতে। তাঁহার অধর্ম বিদ্বেষের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

একবার গ্রীষ্মকালে আমাদের গ্রামের একজন প্রতিবেশী ভদ্রলোকের পুষ্করিণীর মাছ মরিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে আমাদের চাকরানী বাসন মাজিতে গিয়া একটা বড় মাছ আনিল। আনিয়া মাকে বলিল, "মা, অমুকদের পুকুরে রাত্রে অনেক মাছ ম'রে ভেসে উঠেছে। পাড়ার লোকে নিয়ে যাচ্ছে, তাই আমিও একটা এনেছি।" মা মনে করিলেন, পাড়ার সকল লোক যখন লইয়া যাইতেছে, তখন বুঝি বাড়িওয়ালারা সকলকে বিলাইতেছে। তাই তিনি আর কিছু বলিলেন না।

তারপর বাজারের সময় বাবা মা'র কাছে পয়সা চাহিলেন; মা আনাজ তরকারি প্রভৃতি কিনিবার পয়সা দিলেন, মাছের পয়সা দিলেন না।

বাবা। কই, মাছের পয়সা দিলে না? মাছ কি আজ আসবে না?

মা। আজ মাছ আনতে হবে না, মাছ আছে। অমুকদের পুকুরে রাত্রে অনেক মাছ মরে ভেসে উঠেছে; লোকে নিয়ে যাচ্ছে, ঝিও একটা এনেছে।

বাবা শুনিয়া একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া গেলেন, তাঁহার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইল। চুপড়ি শুদ্ধ কোটা-মাছ দেখিবার জন্য আনাইলেন, ঝিকে গালাগালি করিতে লাগিলেন, কেবল মারিতে বাকি রাখিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই কোটা-মাছ শুদ্ধ চুপড়ি সেই গৃহস্থের বাড়ি পাঠাইলেন, তৎপর মাছ কিনিবার জন্য বাজারে গেলেন। আমরা ইহা দেখিলাম। ইহার পরে কি আর নাকী সুরে "দেখ, শিশুগণ চুরি করা বড় পাপ," এরূপ উপদেশ আবশ্যক হয়?

আর একটি ঘটনা আমার মনে দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়াছিল, এজন্য মনে আছে। বাবা তখন কলিকাতায় বাংলা পাঠশালাতে পণ্ডিতী করেন। তিনি আমাকে লইয়া গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে গিয়াছেন। সে সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া চারিদিকের গরীব লোক বড় কষ্ট পাইতেছে। তাহাদের সাহায্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট একটা রিলীফ কমিটি করিয়াছেন। বাবার প্রতি ঐ কমিটির সভ্যগণের এমনি শ্রদ্ধা যে, তিনি যাহাকে সাহায্যের উপযুক্ত বলেন, তাহাকেই তাঁহারা সাহায্য দেন। ইহার কারণও ছিল। কাহাকেও সার্টিফিকেট দিতে হইলে, বাবা তাহার গ্রামে গিয়া তাহার উনান পর্যন্ত না দেখিয়া আসিয়া তাহাকে সাহায্যের উপযুক্ত বলিতেন না। আমাদের কলিকাতা যাত্রা করিবার সময়-সময় বাবা একদিন শুনিলেন যে, আমাদের গ্রাম হইতে তিন-চারি মাইল দূরে কোনো চাষা লোক সপরিবারে অনাহারে আছে। শুনিয়া নিজের গোলা

হইতে দুই পালি চাউল কাপড়ে বাঁধিয়া হাঁটিয়া তাহাদিগকে দিতে গেলেন। গিয়া তাহাদিগকে বলিয়া আসিলেন, "পরশু হাটবারে তোমরা আমার কাছে যেও, আমি সঙ্গে করে তোমাদিগকে রিলীফ কমিটির বাবুদের কাছে নিয়ে সাহায্য পাবার বন্দোবস্ত করে দেব।" তখন তাঁহার মনে ছিল না যে তৎপরদিনেই আমাদিগকে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে, এবং সেই হাটবারের দিনই তাঁহাকে স্কুলের শিক্ষকতা করিবার জন্য কলিকাতা উপস্থিত হইতে হইবে এবং অনুপস্থিত থাকিলে ছুটির দুইমাসের বেতন কাটা যাইবে। তখন এইরূপই নিয়ম ছিল।

তৎপরদিন যথাসময়ে শালতি ভাড়া করিয়া দুইজনে কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছি। আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় তিন-চারি মাইল পথ আসিয়াছি, আমি শালতির মধ্যে বসিয়া চারিদিকের মাঠ ঘাট গাছপালা দেখিতেছি, বাবা বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। হঠাৎ বাবা শালতির ডালিতে আঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওই যাঃ, বড় ভুল হয়েছে। ওরে থাম থাম, ফিরে যেতে হবে।" শালতির চালকগণ জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি মশাই? এত দূর এসে ফিরে যাবেন?"

বাবা। হাঁ, ফিরে যেতে হবে, একটা বড় ভুল হয়েছে। তোমরা ভেব না, তোমাদের যা দেব বলেছি, তা দেব। তোমাদের অপরাধ কি? আমি ভাড়া না করলে তোমরা অন্য ভাড়াটে পেতে।

আমি। বাবা, আপনাকে কাল স্কুলে তো উপস্থিত হতেই হবে, তা না হলে দুমাসের মাইনে কাটা যাবে।

বাবা। তা কি হবে? মহেশ কাওরা-রা অনাহারে সপরিবারে মারা যায়। আমি হাটবারে তাদের আসতে বলেছি। সঙ্গে করে নিয়ে রিলীফ কমিটির কাছ থেকে তাদের সাহায্য পাবার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। আমি গরীবদের কাছে কথা দিয়েছি, ভুলে গিয়েছিলাম। এখন মনে হয়েছে, তা ভেঙে যেতে পারি না।

আমরা আবার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। বাবাকে পুরা শালতির ভাড়া দিতে হইল, স্কুলের বেতন কাটা তো পরে রহিল।

সৌভাগ্যক্রমে সে যাত্রা বাবার দুমাসের বেতন কাটার শাস্তিটা আর ভোগ করিতে হইল না। বাবা কলিকাতায় আসিয়া, কেন একদিন কামাই হইয়াছিল তাহার সবিশেষ বিবরণ কর্তৃপক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের চিহ্ন স্বরূপ আর বেতন কাটিলেন না।

তৃতীয় ঘটনা যাহা উজ্জ্বল রূপে মনে আছে, তাহা এই। বাবা তখন আমাদের গ্রামের হার্ডিঞ্জ মডেল বাংলা স্কুলে হেড পণ্ডিতের কাজ করেন। একবার গবর্ণমেণ্ট স্কুলঘর মেরামতের জন্য বাবার নিকট কিছু টাকা পাঠাইলেন। স্কুলঘর মেরামত হইয়া গেলে কতকগুলি শালের খুঁটি প্রভৃতি বাঁচিল। সেগুলি কি করিতে হইবে, অন্য কোনো গ্রামের স্কুল গৃহের মেরামতে যাইবে, কি নিলাম করিয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে টাকা জমা দিতে হইবে, ইহা জানিবার জন্য বাবা গবর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিলেন। চিঠির উত্তর আর আসে না। দুই-একমাস অপেক্ষা করিয়া অবশেষে বাবা স্কুল গৃহের নিকটস্থ পুষ্করিণীতে খুঁটিগুলি ডুবাইয়া রাখিতে বলিলেন। সেইরূপ রাখা হইল।

কিছুদিন পরে আমি যখন গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি গিয়াছি, তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা বাবা ঘরের দাবাতে বসিয়া তামাক খাইতেছেন, এমন সময় একজন গ্রামস্থ ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিলেন।

সমাগত ব্যক্তি। পণ্ডিত মশাই, প্রণাম হই।

বাবা। এস বাপু! কল্যাণ হোক! ওঠ, দাবাতে ওঠ। বসো, তামাক খাও।

সমাগত ব্যক্তি। থাক, আর দাবাতে উঠব না। অল্প কথা, এই নিচে থেকেই বলে যাচ্ছি। জিজ্ঞাসা করি, ঐ স্কুলের পুকুরে যে খুঁটিগুলো ডুবিয়ে রেখেছেন, ওগুলো কি হবে?

বাবা। কি হবে তা জানি না। ও গবর্ণমেণ্টের জিনিস। তাঁদের পত্র লিখেছি। হয়, অন্য কোনো স্কুলের মেরামতের জন্য যাবে; না হয়, নিলাম করে বিক্রি করতে হবে।

সমাগত ব্যক্তি। ও খুঁটিগুলো আমাকে দিয়ে দিন না? আপনাকে আমি কিছু ধরে দিচ্ছি।

বাবা প্রথমে ঐ লোকটির প্রস্তাবের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, খুঁটিগুলি কিনিতে চায়। তাই বলিলেন, "তুমি কি আমার কথা শুনতে পেলে না? ওগুলো গবর্ণমেণ্টের জিনিস। তাঁরা যেরূপ করতে বলবেন, তাই হবে। তাঁদের হুকুম ভিন্ন কি বেচতে পারি?"

সমাগত ব্যক্তি। আমি আপনার কথা শুনতে পেয়েছি। আমি একখানা ঘর তুলছি, খুঁটির প্রয়োজন। আমি আপনাকে দশ-বারো টাকা ধরে দিচ্ছি, আমাকে খুঁটিগুলো দিন না?

এতক্ষণে সমাগত ব্যক্তির হৃদ্গত কথা বাবার হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি অনুভব করিলেন যে ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে ঘুষ দিতে চাহিতেছে। তখন একেবারে লম্ফ দিয়া দাবা হইতে নিচে পড়িয়া তাহার হাত ধরিলেন, এবং বলিলেন, "তুমি এমন ছোটলোক যে তুমি আমাকে দশ-বারো টাকা ঘুষ দিয়ে খুঁটিগুলো অমনি নিতে চাও! আর আমাকেও এত ছোটলোক মনে করেছ যে, পরের ধন ঘুষ নিয়ে তোমাকে দেব! চল তোমাকে থানায় নিয়ে যাব, তুমি নিশ্চয় ঐ খুঁটির কিছু চুরি করেছ।"

এই বলিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। আমি মাঝখানে পড়িয়া ছাড়াইয়া দিলাম। আমি বলিলাম, "বাবা, খুঁটি তো গোণা আছে। কাল স্কুলে গিয়ে খুঁটি তুলিয়ে গুণে দেখবেন, যদি কম হয় তখন না হয় এই ব্যক্তির নামে থানায় খবর দেবেন। এখন একে ছেড়ে দিন।" অনেক বলাতে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

আর কয়েকটি ঘটনা লিখিয়া রাখিবার ও মনে রাখিবার মতো বিষয়। বহু বৎসর পূর্বে বাবা একবার নিজের বেতনের বিল ইনস্পেক্টরের স্বাক্ষর করাইয়া ভাঙাইবার জন্য কলিকাতায় আসিতেছেন, এমন সময়ে গ্রামস্থ একজন সার্কেল পাঠশালার পণ্ডিত বাবার হাতে একখানি ১৫৲ টাকার বিল দিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত মশাই, অনুগ্রহ করিয়া আমার এই বিলখানাও ইনস্পেক্টরের স্বাক্ষর করাইয়া ভাঙাইয়া আনিবেন।" বাবা তাঁহার বিলখানাও লইয়া আসিলেন।

এদিকে শহরে আসিয়া ইনস্পেক্টর-আপিসে যাইতে বাবার কিছুদিন বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে গ্রাম হইতে সংবাদ আসিল যে, সেই সার্কেল পণ্ডিতটি ওলাউঠা হইয়া মারা পড়িয়াছেন। বাবা যখন উড্রোসাহেবের আপিসে গেলেন, তখন উড্রোসাহেব বাবাকে বলিলেন যে, তিনিও ঐ পণ্ডিতটির স্ত্রীর দরখাস্ত পাইয়াছেন, যেন তাঁর স্বামীর টাকা অপর লোকের হাতে না পড়ে। বাবা বুঝিলেন, দেবরদের সঙ্গে ঐ বিধবার বিবাদ ঘটিয়াছে, তাই তিনি আর এই টাকা লইতে চাহিলেন না। কিন্তু উড্রোসাহেব বাবাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বলিলেন, "পণ্ডিত, তোমাকে চিনি; টাকাগুলি লইয়া যাও নিজের হাতে ঐ বিধবাকে দিবে।" বাবা অগত্যা

টাকাগুলি লইয়া গেলেন। কিন্তু বাড়িতে গিয়াই শুনিলেন, সে বিধবাটি তার পিতৃগৃহে চলিয়া গিয়াছে। তখন টাকাগুলি নিজের বাক্সের এক কোণে রাখিয়া দিলেন, মনে করিলেন, সে স্ত্রীলোকটি ফিরিয়া আসিলে নিজে তাহার হাতে দিবেন।

তাহার পর দুইমাস যায়, ছয়মাস যায়, সে আর আসে না। বাবা সে কথা ভুলিয়াই গেলেন, এবং টাকাগুলিও নিজের টাকার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া খরচ হইয়া গেল।

১৫।১৬ বৎসর পরে বাবার সে কথা স্মরণ হইল; কিছুদিন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে অপর কাহাকেও না পাইয়া, নিজে দশ-বারো মাইল হাঁটিয়া গিয়া সেই বিধবাকে ১৫৲ টাকা দিয়া আসিলেন।

দরিদ্র মানুষকে জীবনে বহুসময়ে বন্ধুদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। বাবার শেষ জীবনে বহুবার তিনি নিজের পূর্বকৃত কোনো ঋণের কথা স্মরণ হইবামাত্র অত্যন্ত অস্থির হইয়া আমার নিকট কলিকাতায় আসিতেন। একবার কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরিতে আমার আপিস ঘরে কয়েকদিন ছিলেন। তন্মধ্যে একদিন বৈকালে আমি বেড়াইয়া আসিয়া দেখি, বাবা ম্লান মুখে আমার খাটে শয়ন করিয়া আছেন।

আমি। বাবা, আপনাকে বড় ম্লান দেখছি কেন?

বাবা। ওরে, একটা বড় ক্লেশের কারণ ঘটেছে। আমার মনের এই বড় ইচ্ছা যে এক পয়সা দেনা রেখে মরব না। মনে করছিলাম যে আর এক পয়সাও দেনা নাই। কিন্তু সেদিন ভাবতে ভাবতে মনে হল যে, আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন শ্রীশ বিদ্যারত্ন আমার সঙ্গে পড়ত। কয়েকবার আমার অর্থাভাব হওয়াতে শ্রীশ আমাকে দুই-তিন বারে চল্লিশ টাকা কর্জ দিয়েছিল। কথা ছিল যে কলেজ হতে বাহির হয়ে দুজনে যখন কর্মে বসব, তখন আমি ঐ ৪০৲ টাকা শোধ দেব। তাহার পর আমি কোথায় গেলাম, সে কোথায় গেল। সে বিধবা-বিবাহের হাঙ্গামার ভিতর পড়ল। সে টাকার কথা দুজনেই ভুলে গেলাম। এতদিনের পর মনে হয়েছে, এখন কি করি?

এ কথাবার্তা বোধ হয় ১৮৯৭ কি ১৮৯৮ সালের। বিদ্যারত্নমহাশয় (যিনি প্রথম বিধবাবিবাহ করেন) তাহার অনেক বৎসর পূর্বে গতাসু হইয়াছেন। আমি বলিলাম, "এ জন্য আপনি মন খারাপ করিবেন না। আমি খুঁজি, শ্রীশ বিদ্যারত্নের কে আছেন।" আমি খুঁজিতে আরম্ভ করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রকে জীবিত পাইলাম। তাঁহার নিকট গিয়া বলিলাম, "আমার পিতা পঠদ্দশায় আপনার পিতার নিকট চল্লিশ টাকা কর্জ করিয়াছিলেন। এতদিনের পর তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার মন চঞ্চল হইয়াছে। আপনি এই চল্লিশ টাকা গ্রহণ করুন, করিয়া আমাকে একখানি রসিদ দিন। আমি বাড়িতে তাঁহার কাছে রসিদ পাঠাইয়া দিই, তাঁহার মন সুস্থির হউক।" তিনি বলিলেন, "এ তো কখনো শুনি নাই যে ৬৫ বৎসরের দেনা বাড়িতে আসিয়া শোধ করিয়া যায়!" আমি টাকা দিয়া রসিদখানি বাবাকে পাঠাইলাম, তিনি সুস্থির হইলেন।

আর একবার শহরে আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়িয়াছে। প্রায় ২৫ কি ৩০ বৎসর পূর্বে আমাদের গ্রামের ছেলেরা একটি পাবলিক লাইব্রেরি করে। বাবা একবার শহরে আসিতেছিলেন, তখন ছেলেরা তাঁহার হাতে একটি বইয়ের তালিকা দিয়া বলে, "পণ্ডিত মশাই, কোনো জানা-শোনা দোকান হতে এই বইগুলি এনে দিবেন, পরে দাম দেওয়া যাবে।" তিনি তাঁহার একজন সমাধ্যায়ী বন্ধুর পুস্তকালয় হইতে দশটাকার পুস্তক লইয়া ঐ গ্রামস্থ যুবকদিগকে দেন।

তাহার পর মাসের পর মাস গেল, বৎসরের পর বৎসর গেল, তাহাদের দাম দেওয়া আর হইয়া উঠিল না। বাবারও আর সে কথা মনে রহিল না। এতদিনের পর সে কথা মনে পড়িয়াছে। আবার আমি তাঁহার সেই সমাধ্যায়ী বন্ধুর পরিবারস্থ কেহ জীবিত আছেন কি না, অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে কলিকাতার বটতলায় তাঁহার পুত্রকে জীবিত পাইলাম, তখনো তিনি পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবসা করিতেছেন। এ দশটাকা বাবা নিজে দেশ হইতে আমার নিকট পাঠাইলেন। আমি বটতলাতে গিয়া সেই ঋণ শোধ করিয়া বাবার কাছে রসিদ পাঠাইলাম, তবে তিনি সুস্থির হইলেন।

আবার আর একটি দেনার কথা স্মরণ হইল। বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্বে বাবা ভবানীপুরের এক কাপড়ের দোকান হইতে পাঁচ টাকার কাপড় ধারে লইয়াছিলেন। তাহার পরেই সে দোকান উঠিয়া যায়। সে ঋণ শোধের কি হইবে? আমরা অনুসন্ধান করিয়া সে দোকানদারের কোনো উদ্দেশ পাইলাম না। কি করা যায়? বাবার মন সুস্থির হয় না। অবশেষে পাঁচ টাকার কাপড় কিনিয়া তাঁহার নিকট পাঠানো গেল, তিনি গ্রামের দরিদ্রদিগকে দান করিলেন।

আমার পিতার কিরূপ তেজস্বিতা ও মনুষ্যত্ব ছিল, তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত স্মরণ আছে। এরূপ শুনিয়াছি যে, আমার মাতাঠাকুরাণীর বিবাহের দিনে, আমাদের গ্রাম হইতে সমাগত বরপক্ষীয় লোকদিগের সহিত চাঙ্গড়িপোতা ও তৎসন্নিকটবর্তী গ্রামের কন্যাপক্ষীয় লোকদিগের বিবাদ হয়। এ বিবাদ কি জন্য ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। অনুমান করি যে, বরপক্ষের বাৎস গোত্রীয় ভট্টাচার্য বংশীয় পদগর্বিত ব্রাহ্মণগণ অনুভব করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের সমুচিত অভ্যর্থনা করা হয় নাই। যাহা হউক, তাঁহাদের বিরক্তির ভাব বিবাহের পর হইতেই প্রকাশিত হইল। বিবাহের পরে যখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে আমার মাতামহের গৃহের ছাদের উপরে আহারে বসানো হইল, তখন বরপক্ষের লোকগুলি একত্র বসিলেন, এবং এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে গৃহস্থের জিনিসপত্রের অপচয় করিয়া বিভ্রাট ঘটাইবার চেষ্টা করিবেন। এই সঙ্কল্প অনুসারে তাঁহারা মুঠা-মুঠা লুচি-কচুরি-সন্দেশ প্রভৃতি ছাদ হইতে বাড়ির পশ্চাতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহার ফল এই হইল যে, অপর জাতীয় যে সকল ব্যক্তিকে লুচি সন্দেশ দিবার আয়োজন করিয়া রাখা হইয়াছিল, বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে চিড়া-দৈ-খৈ দিয়া পরিচর্যা করিতে হইল। এইজন্য আমার মাতামহ আমাদের জ্ঞাতিগণের প্রতি মহা বিরক্ত হইয়া গেলেন, এবং অগ্রে যেরূপ সন্তোষজনক রূপে বিদায় করিবেন ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা আর করিলেন না। আমাদের জ্ঞাতিগণও বিরক্ত হইয়া দেশে ফিরিলেন।

ইহার ফল এই হইল যে, আমার বালিকা মাতা যখন প্রথম শ্বশুরঘর করিতে গেলেন, তখন তিনি সেখানে আবদ্ধ হইলেন, আর তাঁহাকে পিতৃগৃহে পাঠানো হইল না। দুই বৎসর যায়, তিন বৎসর যায়, পিতৃগৃহের লোক গিয়া বারবার ফিরিয়া আসিতেছে; মাকে আর ছাড়ে না। আমার বড়পিসী ও পিসামহাশয়, যাঁহাদের উপর গৃহের কর্তৃত্বভার ছিল, তাঁহারাও জ্ঞাতিদের আপত্তি ও অসন্তোষ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তখন পিতামহাশয় কলিকাতায় শ্বশুরের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছেন। জ্ঞাতিদের এই ব্যবহারের বিষয় তিনি শ্বশুরালয়ের লোকের নিকটে শ্রবণ করিলেন। একটি নিরপরাধা বালিকার প্রতি এরূপ ব্যবহার করা অন্যায়াচরণ বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, অথচ নিজেই বালক, জ্যেষ্ঠ সহোদরাকে ও ভগিনীপতিকে কিছু বলিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু সময়

গেল। অবশেষে বাবার পক্ষে অসহনীয় বোধ হইল। তিনি রাগিয়া গেলেন, এবং যেরূপে হউক বালিকা-পত্নীকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার পিতৃগৃহে আনিবেন স্থির করিলেন। এই স্থির করিয়া একবার কলেজের ছুটির সময় বাড়িতে গেলেন। গিয়া মাকে ডুলি করিয়া নিজে সঙ্গে করিয়া মা'র পিত্রালয়ে আনিতে প্রস্তুত হইলেন। গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। জ্ঞাতিগণ ভাঙিয়া পড়িলেন, বড় পিসী ও পিসামহাশয় লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন, কারণ একজন ১৫।১৬ বৎসরের বালকের পক্ষে এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া বড় লজ্জার কথা মনে হইতে লাগিল। কিন্তু বাবা কাহারও আপত্তির প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। মা'র ডুলির সঙ্গে গ্রামে বাহির হইলেন, এবং জ্ঞাতিবর্গের বাড়ির সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় চীৎকার করিতে লাগিলেন, "কে আছ, বাহির হও। এই দেখ, আমার স্ত্রীকে আমি শ্বশুরবাড়ি লইয়া যাইতেছি।"

আর একটি বিষয়ও এই তেজস্বিতা ও মনুষ্যত্বের দ্যোতক। অগ্রেই বলিয়াছি, বাবা কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিয়পাত্র ছিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিতও তাঁহার আত্মীয়তা ছিল। উক্ত উভয় সদাশয় পুরুষের সঙ্গে মিশিয়া মিশিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল। তদনুসারে তিনি ছুটির সময় ঘরে আসিলেই আমার মাতাঠাকুরাণীর শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হইতেন। মা ঘরের কাজ সারিয়া দশটা রাত্রে শয়ন করিতে আসিলে তাঁহাকে পড়াইতে বসিতেন। মাও উৎসাহ সহকারে পড়িতেন। কলেজ খুলিলে বাবা মাকে পড়িবার জন্য বই দিয়া যাইতেন, মা সেইগুলি মনোযোগ পূর্বক বিনা সাহায্যে যত দূর হয় পাঠ করিতেন; কখনো কখনো পাড়ার ছেলেদিগকে ডাকিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতেন। মা'র পাঠ্যগ্রন্থের মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ এক প্রধান গ্রন্থ ছিল। আমার জ্ঞানে, আমি তাঁহাকে প্রায় প্রতিদিন রামায়ণ পড়িতে দেখিতাম। নিজে পড়িতেন, এবং ছুটির দিনে আমাকে দিয়া পড়াইয়া শুনিতেন।

কিন্তু যে জন্য মা'র লেখাপড়া শিক্ষার কথা বলিতেছি, তাহা এই যে, এজন্য বাবাকে নির্যাতন সহ্য করিতে হইত। বড় পিসী গালাগালি দিতেন, পাড়ার মেয়েরা মাকে উঠিতে বসিতে ঠাট্টা করিত। জ্ঞাতিগণ বাবার 'সাহেব' নাম তুলিয়া দিলেন। ইহার আর একটা কারণও আছে। তিনি একবার কালো জুতা পায় দিয়া এবং একটা চীনে ছাতা মাথায় দিয়া গ্রামে গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে চটি পায়ে না দিয়া কালো জুতা পায়ে দিয়াছে এবং গোলপাতার ছাতা মাথায় না দিয়া চীনে ছাতা মাথায় দিয়াছে, ইহা গ্রামের লোকের, বিশেষত জ্ঞাতিবর্গের চক্ষে অসহনীয় বোধ হইয়াছিল। সে যাহা হউক, বাবা মাকে শিক্ষা দিবার বিষয়ে আত্মীয়-স্বজনের এবং জ্ঞাতিবর্গের আপত্তি শুনিলেন না। স্বাধীনভাবে ও দৃঢ়চিত্তে আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও এই তেজস্বিতা কিরূপে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংশ্রবে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

এক্ষণে তাঁহার উগ্র উৎকট আত্মমর্যাদা জ্ঞানের বিষয়ে কিছু বলি। আমি তাঁহার বিরাগ সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলে, তিনি কিরূপে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আমার উপার্জিত অর্থের এক পয়সাও গ্রহণ করিবেন না। কিরূপে আমাকে অতি গোপনে তাঁহাকে সাহায্য করিতে হইত এবং কিরূপে আমার মধ্যমা ভগিনীর বিবাহের সময় তাঁহাকে লুকাইয়া মা'র হাত দিয়া কিছু অর্থ সাহায্য করাতে

তাহা জানিতে পারিয়া রাগিয়া ঘরে আগুন দিয়াছিলেন, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। এই ভাব তাঁহার ১৭।১৮ বৎসর ছিল। পরে আমার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইলেন এবং সংসারে সাহায্য করিতে দিলেন। যে সময়ে তিনি আমার সাহায্য গ্রহণ না করা বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছেন, তখন আমি একবার গুরুতর পীড়াতে আক্রান্ত হইলে তিনি কিরূপে মা'র গহনা বন্দক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া মাকে লইয়া আমার চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিলেন, তাহাও অগ্রেই বলিয়াছি। যাহার এক পয়সা লইতেছেন না সেই অবাধ্য পুত্রের জন্য যথাসর্বস্ব দিতে প্রস্তুত, এরূপ মহত্ত্ব কোথায় দেখা যায়!

এই যে আমাকে দেখিতে আসা, ইহা হইতে আর এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে বাবার মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্যাদা জ্ঞান অতি উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইল। তিনি আমার পরিচর্যার জন্য মাকে এক স্বতন্ত্র বাড়ি ভাড়া করিয়া দিয়া সেখানে আমাকে রাখিয়া গেলেন। কিন্তু গ্রামের কোনো কোনো বিদ্বেষ্টা লোক গ্রামের জমিদারবাবুদের নিকট গিয়া বলিল, "শুনেছেন মশাই? হারাণপণ্ডিত সেই জাতিচ্যুত ছেলের বাড়িতে আপনার স্ত্রীকে রেখে এসেছে।" জমিদারবাবুদের বড়বাবু পূর্ব হইতেই বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত ব্যাপারে বাবার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, সুতরাং এই কথা যেই শোনা অমনি ফোঁস করিয়া উঠিলেন, "বটে! এ দিকে মুখে তো খুব তেজ দেখানো হয়' এবার পণ্ডিতকে ছাড়া হবে না।" অমনি বাবাকে একঘরে করিবার জন্য চক্রান্ত চলিল। বাবার প্রতি পূর্ব হইতে যাহাদের ঈর্ষা বা অসন্তোষ বা বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল তাহারা সকলে এই দলে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে গ্রামের মধ্যে বিলক্ষণ দুইটি দল পাকিয়া দাঁড়াইল। বাবা অগ্রে বরং প্রকৃত কথা কাহাকেও-কাহাকেও বলিতেছিলেন, কিন্তু যেই শুনিলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে দল বাঁধিতেছে, অমনি মুখ বন্ধ করিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা! ওদের যা করবার করুক!"

ক্রমে আসল কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িল গ্রামের লোকে কলিকাতা হইতে বাড়িতে গিয়া প্রচার করিয়া দিল যে, আমার বাড়িতে মাকে রাখা হয় নাই, কিন্তু মা'র কাছে আমাকে আনিয়া রাখা হইয়াছে ও আমার পরিবার-পরিজন স্বতন্ত্র বাড়িতে আছে। তখন জমিদারবাবুরা মুশকিলে পড়িয়া গেলেন, একবার মুখ দিয়া বলিয়াছেন যে বাবাকে একঘরে করিবেন আবার কি করিয়া সে কথা তুলিয়া লন? তখন বলিলেন, "পণ্ডিত একবার নিজে আসিয়া বলুক যে তার স্ত্রী স্বতন্ত্র বাড়িতে আছেন, তা হলে আমরা যা বলেছি তা তুলে নি।" বাবা শুনিয়া বলিলেন, "শর্মা সে ছেলেই নয়! যদিও এ সত্যকথা, তবু আমি যারা ভয় দেখিয়েছে তাদের কাছে গিয়ে এ কথা বলতে প্রস্তুত নই। তাঁদের যা করবার হয় করুন।" দুমাস যায়, চারিমাস যায়, বাবা আর যান না। জমিদারবাবুরা নানা লোকের দ্বারা ডাকিয়া পাঠান, বাবা সে পথ দিয়াই চলেন না। অবশেষে জমিদারবাবুরা আপনাদের মান রক্ষার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। বাবা তাঁহার জ্যেষ্ঠ মামাতো ভাই গোবর্ধন শিরোমণি মহাশয়কে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। তিনি জমিদারবাবুদের গুরু ছিলেন। বাবুরা নিরুপায় হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তিনি একদিন বাবুদের কাছারিতে বসিয়া বাবাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। চাকর আসিয়া বলিল, "কাঞ্চায়ন বাড়ির বড়কর্তা বাবুদের কাছারিতে বসে আপনাকে ডাকছেন।" গ্রামে 'বাবু' বলিলেই জমিদারবাবু বুঝায়। বাবা বলিলেন, "বাবুদের কাছারিতে বসে কেন?" চাকর সে বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিল না। বাবার যাইতে বড় ইচ্ছা হইল না; কিন্তু কি করেন, দাদা ডাকিয়াছেন,

না গেলেও নয়। অবশেষে অনিচ্ছাক্রমে গেলেন, তখন বাবুদের কৌশলের কথা মনেই আসিল না। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখেন বড়বাবু ও বড়কর্তা বসিয়া আছেন। বড়কর্তাকে দেখিয়াই বাবা গম্ভীর হইয়া গেলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমাকে ডেকেছেন কেন?" বড়কর্তা দেখিয়াই বুঝিলেন, গতিক ভালো নয়। তখন বড়বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাবু, আমি বলাতেই হারাণের বলা হচ্ছে। আমি বলছি শুনুন আমাদের বৌ কলকাতায় গিয়ে আছেন বটে কিন্তু ছেলের বাড়িতে নাই, তাঁরই বাড়িতে তাঁর কাছে ছেলে আছে।"

যেই এই কথা বলা অমনি বাবা দ্রুতবেগে সে স্থান ত্যাগ করিয়া আসিলেন, এবং বড়কর্তা তাঁহাকে অপমানিত করিলেন বলিয়া তদবধি তিন বৎসর তাঁহার মুখ দর্শন করিলেন না।

বাবাকে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় একগুঁয়ে বলিয়াছি তাহারও অনেক দৃষ্টান্ত আছে, তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম একগুঁয়েমোর দৃষ্টান্ত, আমার দ্বিতীয় বিবাহ। অগ্রেই বলিয়াছি যে, বাবা কোনো কারণে আমার প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ীর প্রতি ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বিরক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে প্রসন্নময়ীকে ত্যাগ করিয়া আমাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিবেন। তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত করিবার জন্য অনেকে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমার মাতা ইহার বিরোধী ছিলেন। আমি তখন ১৭।১৮ বৎসরের ছেলে, আমি অমত প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমার মাতামহী প্রসন্নময়ীকে ভালোবাসিতেন, তিনি ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রামের জ্ঞাতি-কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে অনেকে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। বাবা কাহারও কথাতেই কর্ণপাত করিলেন না, বিবাহ দিয়া তবে ছাড়িলেন।

আর একটি বিষয়ও এইরূপ স্মরণীয়। আমি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলে তিনি বলিলেন, "আমার পৈতৃক বিষয়ের এক কানা কড়িও ওকে দেব না।" মধ্যে একটা উইল করিয়া আমার কনিষ্ঠা ও সর্বজ্যেষ্ঠা ভগিনীদ্বয়কে বাস্তুভিটাতে স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে উইল গোপনে বাহির করিয়া লইয়া আমার মা ছিঁড়িয়া ফেলেন।

তৎপরে বহু বৎসর চলিয়া গেল। আমি নিজ ব্যয়ে বাবা ও মা'র মস্তক রাখিবার জন্য আগেকার খড়ো ঘরের পরিবর্তে কোটা বাড়ি করিয়া দিলাম, মা তাহাতে কয়েক বৎসর বাস করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর বাবা নিজের সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য আবার এক উইল করিয়া আমার কনিষ্ঠা ভগিনীকে পৈতৃক ভিটাতে স্থাপন করিলেন এবং আমাকে সমুদয় পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিলেন। সামান্য চারিখণ্ড ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল, তাহার তিনখণ্ড আমার তিন ভগিনীকে দিয়া, তাহাদের অনুরোধে সামান্য একখণ্ড জমি আমার পুত্র প্রিয়নাথকে দিলেন। তাঁহার দুইখানি গ্রন্থের একখানি প্রিয়নাথকে ও অপরখানি আমার পত্নী বিরাজমোহিনীকে দিলেন। আমার নির্মিত কোটা বাড়িটি তিনি যে আমার কনিষ্ঠা ভগিনীকে দিয়াছেন, তাঁহার এই ব্যবস্থাতে আমি সম্মতি দিয়াছি, কারণ আমার কনিষ্ঠা ভগিনী প্রাণ দিয়া বহু বৎসর তাঁহার সেবা করিয়াছে। আমি প্রথমে বলিয়াছিলাম, "উইল লেখা, উইল রেজিস্টারি করা প্রভৃতির প্রয়োজন কি? আপনার কি ইচ্ছা বলিয়া যান আমি তদনুরূপ ব্যবস্থা করিব।" শেষে ভাবিলাম, একগুঁয়ে মানুষের মনের ইচ্ছাটা সম্পন্ন না হইলে মনটা স্থির হইবে না, তাই

উইল লিখিতে ও রেজিস্টারি করিতে উৎসাহ দিলাম। ইহাতে তাঁহার মন শান্ত হইয়াছিল বলিয়া সন্তুষ্ট আছি।

অধিক কি, প্রতিদিন পদে-পদে তাঁহার একগুঁয়েমোর প্রমাণ পাওয়া যাইত। একবার তিনি ও আমার কনিষ্ঠা ভগিনী কুসুম আসিয়া আমার বালিগঞ্জের বাসাতে কিছু-দিন ছিলেন। কোনো কারণে বাবার বাড়িতে যাওয়া আবশ্যক হইল। সেইদিন প্রাতে আমাদিগকে বলিলেন যে, তিনি অপরাহ্নে তিনটার ট্রেনে বাড়ি যাইবেন। আমি বলিলাম, "কেন বাবা তিনটার গাড়িতে যাবেন? বাড়িতে পেঁছিতে রাত হয়ে যাবে। অন্ধকারে পথে পড়ে যান, কিছু হোক, কাজ কি তিনটার গাড়িতে গিয়ে? কুসুম সকাল-সকাল রেঁধে দিক, আপনি খেয়ে প্রাতে ১১টার গাড়িতে যান, সন্ধ্যার পূর্বে ঘরে পেঁছিতে পারবেন।" তিনি মাথা ঘুরাইয়া বলিলেন, "যা নয়, সেই কথা। আমি অত তাড়াতাড়ি তৈয়ের হতে পারব না।" তখন তাঁহার সঙ্গে আর তর্ক করা বৃথা বোধে কুসুমে আমায় পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে, যেরূপে হউক প্রাতে ১১টার গাড়িতে বাবাকে পাঠাইতেই হইবে। এই পরামর্শ করিয়া কুসুম তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া রন্ধনে প্রবৃত্ত হইল, আমি বাবার যাইবার জন্য যা কিছু আয়োজন করা আবশ্যক ছিল তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বেলা ৮টার সময় ছাদে বাবার স্নানের জল দেওয়া গেল। কুসুম আসিয়া বলিল, "বাবা, ছাদ হতে নেয়ে এস।" বাবা কিছু বলিলেন না, স্নান করিতে গেলেন। স্নানান্তে পূজা আহ্নিক প্রভৃতি সারিয়া উঠিতে ৯টা বাজিল। ইতিমধ্যে তাঁহার অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত, কুসুম আসিয়া আহারার্থে ডাকিল। তখনও বাবা কিছু বলিলেন না, আহার করিতে গেলেন। ৯৷৷টার সময় আহার শেষ করিয়া আসিলেন। তখন আমি ঘড়ি দেখাইয়া বলিলাম, "আপনি আর একঘণ্টা শুইয়া থাকুন, আমি তৎপরে আপনাকে গাড়িতে করিয়া রেলে তুলিয়া দিয়া আসিব।" তিনি বলিলেন, "না, আমি সেই তিনটার গাড়িতেই যাব।" এই বলিয়া শয়ন করিয়া অকাতরে নিদ্রা গেলেন। কুসুম ও আমি কত যে হাসিলাম, তাহা আর কি বলিব। একবার মুখ দিয়া বলিয়াছেন, "তিনটার গাড়িতে," সেটা ছেলে-মেয়েদের কথাতে লঙ্ঘন হইবে, তাহা সহ্য হইল না!

এইস্থানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এই একগুঁয়ে মানুষকে লইয়া ঘরকন্না করিতে আমার মাকে যে কি কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা হয় না। বাবা কথা না শুনিলে মা যখন ঝগড়া করিতেন, তখন বাবা বলিতেন, "আমি তো আর 'ঘণ্টার গরুড়' নই যে, 'যে-আজ্ঞে' বলে হাঁত যোড় করে থাকব!" বাস্তবিক, পাছে কেহ তাঁহাকে 'ঘণ্টার গরুড়' মনে করে, এই ভয়ে তিনি চিরদিন দৃঢ়রূপে স্বমতপ্রিয়তা অবলম্বন করিয়া থাকিয়াছেন।

তৎপরে পিতৃদেবের আর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ সহৃদয়তা। এরূপ দয়ালু মানুষ কম দেখা যায়। অগ্রেই তাঁহার দয়ার কিছু-কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছি। আরও কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। একবার আমার জননী একজন গ্রাম-পার্শ্ববর্তী চাষা লোককে ষোলোটি টাকা এই বলিয়া কর্জ দিয়াছিলেন যে, সে সুদের পরিবর্তে প্রতি হাটবারে কিছু-কিছু তরকারি দিয়া যাইবে, তাহার পর হাতে টাকা হইলে টাকা শোধ করিবে। দুইবৎসর যায়, চারিবৎসর যায়, সে হাটবারে হাটবারে তরকারি দিয়া যাইতেছে, ইতিমধ্যে মা'র টাকার বড় প্রয়োজন হইল। তিনি ঐ ব্যক্তিকে টাকা শোধ করিবার জন্য ধরিলেন। তখন তাহার হাতে টাকা নাই, সে মাকে বিলম্ব করিতে কহিল। মা বিলম্ব করিয়া রহিলেন। কিন্তু শেষে সে হাটবারে আর সে পথ দিয়া

আসে না, মা তাহাকে আর দেখিতে পান না। এদিকে দুর্বৎসর উপস্থিত হইয়া প্রজাকুলের বড় অন্নকষ্ট ঘটিল। এই সময়ে মা তাহাকে একদিন পথে দেখিতে পাইয়া তিরস্কার করেন। এই কথা শুনিয়া বাবা বাড়িতে আসিয়া বলিলেন, "তুমি না হরচন্দ্র ন্যায়রত্নের মেয়ে? তোমার গায়ে না হিঁদুর চামড়া আছে? তুমি কি বলে এই দুর্ভিক্ষের সময় তাকে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি কর?" এই বলিয়া বৈকালে আপনাদের গোলা হইতে দুইসের আন্দাজ চাউল কাপড়ে বাঁধিয়া তিন-চারি মাইল হাঁটিয়া তাহাদের দিতে গেলেন। ঋণের টাকা আদায় দূরে রহিল, তাহাদের দারিদ্র্যের চিন্তায় বিব্রত হইলেন।

আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একবার আমাদের পাড়ার একটি গরীব লোকের ঘরবাড়ি আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গেল। বাবার এমন সামর্থ্য ছিল না যে তাহার ঘর তুলিবার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া গ্রামের ভদ্রলোকদের বাড়িতে-বাড়িতে বেড়াইতে লাগিলেন এবং কাহারও নিকটে বাঁশ, কাহারও নিকটে দড়ি, কাহারও নিকটে পয়সা, কাহারও নিকটে টাকা আদায় করিয়া তাহার ঘর তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। অবশেষে তাহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত—"ইহাকে কিছু টাকা তুলিয়া দাও।" আমি কিছু টাকা তুলিয়া দিলাম।

আবার এই সহৃদয়তা কেবল মানুষের উপরে নয়, ইতর প্রাণীদের উপরে তাঁহার ভালোবাসা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি একটি কুকুর শাবককে শিয়ালের মুখ হইতে বাঁচাইয়া আনিয়া, তাহার পৃষ্ঠের ক্ষতে দৈ ঢালিয়া-ঢালিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়া কিরূপে তাহাকে বড় করিয়াছিলেন এবং কিরূপে তাহার নাম 'শেয়ালখাকী' হইয়াছিল, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। একটি না একটি কুকুর বাড়িতে সর্বদাই থাকিত, তাহাকে অন্নমুষ্টি না দিয়া তিনি আহার শেষ করিতেন না। অনেক দিন কুকুরকে ভাতের সঙ্গে মাছ কেন দেওয়া হয় নাই বলিয়া আমার ভগিনী ও ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ীদের সঙ্গে তাঁহার ঝগড়া হইত।

আমাদের একটি বিড়াল আছে, মা তাহার নাম রাখিয়া গিয়াছেন 'দুলচী', অর্থাৎ তাহার গায়ে দুলিচার ন্যায় সুন্দর-সুন্দর দাগ আছে। সেই দুলচী বাবার বড় আদুরে ছিলেন। তিনি মাছ ভিন্ন আহার করিতেন না, এবং বিছানা ভিন্ন শুইতেন না। মাতাঠাকুরাণীর যখন কাল হইল তখন কয়েকদিনের জন্য আমাদের বাড়িতে মাছ আনা বন্ধ হইল। বাবা বাড়ির ছেলেদের জন্য তত ব্যস্ত হইলেন না, দুলচীর জন্য যত ব্যস্ত হইলেন। আমার ভগিনী কুসুমকে বলিতে লাগিলেন, "ওরে কুসী, দুলচীর জন্যে মাছ আনতে দে।" কুসুম বলিল, "নাও নাও, রেখে দাও, বেড়ালের জন্যে আবার মাছ কিনতে দেব! যা নয়, তাই!" বাবা বলিলেন, "ও কি শ্রাদ্ধ করতে বসেছে? ও মাছ খাবে না কেন?"

কুসুম। না, এ ক'দিন বাড়িতে মাছ আসতে দেব না।

বাবা। আচ্ছা, তবে ওকে তোর বড়পিসীর বাড়ি থেকে মাছ খাইয়ে আন।

এই লইয়া দুইজনে খুব ঝগড়া চলিল।

ইতিমধ্যে আর এক ঘটনা উপস্থিত। কিছুদিন পরে দুলচীর তিনচারিটি ছানা হইল। বাবা মহা ব্যস্ত, "ওরে কুসী, দুলচী রোগা হয়ে গেছে, ছানাগুলো দুধ পাবে না। আর আধসের দুধ রোজ কর, ওরা খাবে, আর গিন্নী পাখিটা রেখে গেছেন, সেটাও খাবে!"

কুসুম। এমন কথা কখনো শুনিনি যে, বেড়ালছানার জন্যে দুধ রোজ করে!

বাবা। আহা, ওরা শিশু।

এই 'শিশু'দের মধ্যে একটি একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় কাতর ধ্বনি করিতেছে। বাবার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, হঠাৎ সেই কাতর ধ্বনি শুনিয়া অস্থির হইলেন, "ওরে কুসী, বেড়ালছানা কাঁদে কেন রে? বুঝি শীত করছে।"

কুসুম। তুমি ঘুমোও, ঘুমোও। ওর মাকে পাচ্ছে না বলে ডাকছে। এখনি ওর মা আসবে, তখন চুপ করবে।

একথা বাবার মনঃপূত হইল না। তিনি উঠিলেন এবং বিড়াল শাবকটিকে আপনার লেপের মধ্যে আনিয়া কোলে করিয়া শুইলেন। তবুও সে থামে না! বাবা বলিলেন, "আহা, শিশু কি না, বোধ হয় উদরের পীড়া হয়েছে।"

কুসুম (রাগিয়া)। হাঁঃ! ওর উদরের পীড়া হয়েছে! যাও, তুমি উঠে গিয়ে কবিরাজ ডেকে আন!

এই 'উদরের পীড়া'র বিষয়ে একটু কথা আছে। আমার বাবা সামান্য কথোপ-কথনেও অনেক সময় শুদ্ধভাষা ব্যবহার করিতেন। ইহা লইয়া আমাদের বাড়িতে সময়ে-সময়ে বড় হাসাহাসি হইত। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। একদিন তিনি দ্বিপ্রহরের সময় আহারান্তে শয়ন করিয়াছেন। সবে নিদ্রা আসিতেছে, এমন সময় পাড়ার কতকগুলি বালক-বালিকা আমার ভাগিনেয়ীর সঙ্গে খেলিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত। তাহারা গোল করিতেছে। বাবা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আঃ, নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে, এখন কে গোল করে?" মা আসিয়া ছেলেগুলিকে তাড়াইয়া দিলেন, বলিলেন, "যাঃ, যাঃ, অন্য জায়গায় খেলগে যা! এখন 'কর্ষণ' হচ্ছে, দেখছিস না?" এই লইয়া আমার ভগিনীদের মধ্যে মহা হাসি উঠিয়া গেল।

ইতর প্রাণীদের উপরে বাবার ভালোবাসার আর একটি দৃষ্টান্ত এই। কতকগুলি শকুনি কালীনাথবাবুর নারিকেল বাগানের নারিকেল গাছে বসিয়া সর্বদাই নিজেদের বাসা বাঁধিবার জন্য পাতা ছিঁড়িত। বাবা কাহার নিকট এই ভুল সংবাদ শুনিলেন যে কালীনাথবাবু শকুনিগুলিকে ভয় দেখাইবার জন্য বা মারিবার জন্য বন্দুক আনিয়াছেন। ইহা শুনিয়া বাবা চটিয়া গেলেন, এবং বলিলেন, "এরা আবার ব্রাহ্ম! শকুনি তোমার গাছের পাতা নেবে না, আমার গাছের পাতা নেবে না, তবে কি ওদের নিজের গাছ আছে যে বাসা বাঁধবে?" ইহার কিছুদিন পরে আমি বাড়িতে গেলে, বাবা আমাকে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

এই পিতার গৃহে জন্মিয়া ইঁহারই দৃষ্টান্তের প্রভাবের ভিতরে আমি বর্ধিত হইয়াছি। আমি আত্মজীবন পরীক্ষা করিয়া পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাই যে, এই তেজস্বিতা, এই সত্যানুরাগ, এই দঢ়চিত্ততা, এই সহৃদয়তা শৈশব হইতে না দেখিলে আমি নীতির মূল্য এরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম না। কিন্তু অপরদিকে ইহাও অনুভব করি যে, পিতার তেজস্বিতা, মনুষ্যত্ব, আত্মমর্যাদা জ্ঞান, ও দঢ়চিত্ততা আমি পূর্ণ মাত্রাতে পাই নাই। এগুলি আরও অধিক মাত্রাতে আমাতে থাকিলে ভালো হইত।

জননী গোলোকমণি দেবী। আমি শৈশব হইতে যেমন পিতাতে মনুষ্যত্ব ও দঢ়চিত্ততার আদর্শ দেখিয়া আসিয়াছি, তেমনি জননীতে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মনিষ্ঠার আদর্শ দেখিয়াছি। আমার মাতামহ ধার্মিক গৃহস্থের আদর্শ ছিলেন; আমার মাতুল দেশে

কর্তব্যপরায়ণ, দৃঢ়চেতা ও স্বদেশপ্রেমিক মানুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমার পিতা সত্যবাদী, দৃঢ়চেতা ও পরোপকারী পুরুষ ছিলেন। সুতরাং আমার জননী ধর্ম-পরায়ণতা ও সুনীতির প্রভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই প্রভাবের মধ্যেই বর্ধিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে তেজস্বিনী ও মনস্বিনী নারী ছিলেন। তাঁহাতে দারিদ্য ছিল, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না; কোমলতা ছিল, কিন্তু ভীরুতা ছিল না; সাধুভক্তি পূর্ণ মাত্রায় ছিল, কিন্তু অন্ধতা ছিল না; স্বধর্মানুরাগ প্রবল ছিল, কিন্তু পরধর্মে বিদ্বেষ ছিল না।

তাঁহার আত্মমর্যাদা জ্ঞান প্রবল ছিল। আমার পিতার আয় কখনোই মাসে ৩০।৩৫ টাকার অধিক ছিল না। মাতা এমনি সুগৃহিণী ছিলেন যে, ইহাতেই পুত্রের শিক্ষা, তিনকন্যার বিবাহ ও ধার্মিক হিন্দু গৃহস্থের ক্রিয়াকর্ম সমুদয় নির্বাহ করিয়াছেন। অথচ আমার জ্ঞানে আমি কখনো তাঁহাকে নিজ অভাব অপরকে, এমন কি তাঁহার পিত্রালয়ের মানুষকেও জানাইতে, বা কাহারও নিকট দু'টাকা ঋণ করিতে দেখি নাই। তিনি আমার পিতাকে সম্পূর্ণরূপে ঋণহীন রাখিয়া গিয়াছেন।

ধর্মপরায়ণতা যেন তাঁহার অস্থি মজ্জার মধ্যে নিহিত হইয়াছিল। তৎপরে, বাল্য-কালে বিবাহিত হইয়া তিনি যখন আমাদের ভবনে আসিলেন, তখন আসিয়াই অশীতিপর বৃদ্ধ আমার প্রপিতামহ স্বর্গীয় রামজয় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সেবাতে নিযুক্ত হইতে হইল, ঐ সাধু পুরুষের সংসর্গে ও উপদেশে মাতার ধর্মভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। তিনি তাঁহার নিকটে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং দেবতার ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। আমার প্রপিতামহ এ লোক হইতে অন্তর্হিত হইবার পর পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল মাতাঠাকুরাণী জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহার স্মৃতি একদিনের জন্যও আমার মাতার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত আমার প্রপিতামহের জপের মালা লইয়া প্রতিদিন জপ করিয়াছেন।

শৈশবে আমি একবার কঠিন রোগ হইতে মুক্ত হইলে তিনি যে হাতে ও মাথাতে ধুনা পোড়াইয়াছিলেন এবং বুক চিরিয়া সেই রক্ত দিয়া ইষ্ট দেবতার স্তব লিখিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

যৌবনে যখন আমি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলাম, তখন মা'র প্রতীতি জন্মিল যে, তাঁহার পূর্বজন্মের কোনো পাপের জন্যই সন্তানের দুর্মতি ঘটিয়াছে। তিনি আমার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিলেন না, কিন্তু এই বিশ্বাসের বশবর্তিনী হইয়া তিনি তাঁহার জপতপ ব্রত-নিয়মের মাত্রা অসম্ভব রূপে বাড়াইয়া দিলেন। দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাইলেই আমরা ঠিকুজী কোষ্ঠী তাঁহাকে দেখাইতেন এবং যে ব্রাহ্মণ যে কিছু ব্রত বা ধর্মানুষ্ঠান করিতে বলিতেন, তাহাই করিতেন। এইরূপে অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া গেল এবং তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িল, বহুবার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতাতে আনিতে হইল। অবশেষে একজন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমার কোষ্ঠী দেখিয়া বলিলেন যে, আমার কোষ্ঠীতে আছে, কখনোই আমার দেবতা-ব্রাহ্মণে মতি হইবে না। তখন হইতে জননী নিস্তার পাইলেন।

পিতা ও মাতাতে কি প্রভেদ! পিতা আমাকে মারিবার জন্য গুন্ডা ভাড়াতে কয়েক বৎসরে ২০।২২ টাকা ব্যয় করিলেন, আর জননী আমার জন্য ব্রত-নিয়মে প্রায় ঐ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিলেন।

গত বৎসর (১৯০৭ সালের জুন মাসে) গুরুতর পীড়াতে আমি যখন মৃত্যু-

শয্যাতে শয়ান ছিলাম, তখন জননী আসিয়া কিছুদিন আমার নিকট ছিলেন। তখন প্রতিদিন প্রাতে নিজের পূজা সারিয়া, আমাকে মন্ত্রপূত জল একটু পান করাইতেন, প্রপিতামহের জপের মালা আমার বক্ষে এবং নিজের পদধূলি আমার মস্তকে দিতেন। আমার বন্ধুগণ দমিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আমার জননী দমেন নাই। তখন তাঁহার দৃঢ়চিত্ততা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার প্রার্থনা ও আশীর্বাদে আমি সারিয়া উঠিব।

এই স্বাভাবিক ধর্মভাব তাঁহার প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ ছিল। তিনি গয়া কাশী বৃন্দাবন জগন্নাথক্ষেত্র প্রভৃতি সমুদয় প্রধান-প্রধান তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তথাপি পুণ্যস্থান দেখিবার আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। তাঁহার ধর্মাকাঙ্ক্ষা যেন অসীম ছিল।

আমার শৈশবকাল হইতেই জননী তাঁহার হৃদয়ের সর্বোচ্চ ভাবগুলি আমার হৃদয়ে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথমত, আমার বর্ণপরিচয় হইলেই এবং পড়িতে শিখিলেই তিনি এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, যেদিন আমার পাঠশালা বা স্কুল থাকিত না, সেইদিন দুপুরবেলা তিনি আহারান্তে বিশ্রামার্থ শয়ন করিলে আমাকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে হইত। যে স্থানটি অধিক মিষ্ট লাগিত, দিনের পর দিন বহুবার তাহা পাঠ করাইতেন, এবং মাতা-পুত্রে সে স্থানটি মুখস্থ আবৃত্তি করিতাম। তদবধি বহুকাল আমি রামায়ণের অনেক স্থল মুখস্থ বলিতে পারিতাম। এই দীর্ঘকাল পরেও রামায়ণের কোনো কোনো দৃশ্যের ছবি যেন আমার চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে। এইরূপে, ব্রাহ্মধর্মের ভাব পাইবার পূর্বে, রামায়ণের ধর্ম আমার ধর্ম ও রামায়ণের নীতি আমার নীতি ছিল। তখন রামায়ণের আদর্শ অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আছে, ইহা কেহ বলিলে আমি সহ্য করিতে পারিতাম না।

দ্বিতীয়ত, মা যদি কখনো শুনিতে পাইতেন যে, কেহ আমার সহিত এইরূপ তর্ক উপস্থিত করিয়াছে যাহাতে ঈশ্বরে ও পরকালে অবিশ্বাস প্রকাশ পায়, তখন তিনি বাঘিনীর ন্যায় তাহার মধ্যে পড়িতেন, অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন ও সে তর্ক থামাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। এমন কি, আমার পিতাও যদি তর্কস্থলে এমন কিছু বলিতেন, তাহাও মা সহ্য করিতেন না। বলিতেন, "আমার ছেলের মাথা খেও না।" এই কারণেই বোধহয় এই দীর্ঘকালের মধ্যে একদিনের জন্যও আমার মনে ঈশ্বর ও পরকালের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে নাই। এমন দিন কি এমন ক্ষণ মনে হয় না, যখন আমি ঈশ্বরের সত্তাতে অবিশ্বাস করিয়াছি।

আর একটি ভাব মাতার মধ্যে দেখিতে পাইতাম। কপটাচারী ব্যক্তিদের প্রতি আমার মা'র আন্তরিক ঘৃণা ছিল। যাহারা মুখে বড়কথা বলে কিন্তু কাজে ছোট কাজ করে, যাহা মনের বিশ্বাস নহে তাহা কাজে দেখায়, ভিতরে অসাধু থাকিয়া বাহিরে সাধুতার পরিচ্ছদ পরিধান করে, মা তাহাদের নাম পর্যন্ত সহ্য করিতে পারিতেন না। কেহ তাহাদের প্রশংসা করিলে তাঁহার গায়ে যেন তপ্ত জলের ছড়া দিত। হয় উঠিয়া যাইতেন, নতুবা সে প্রশংসা থামাইয়া দিতেন, এবং বলিতেন, "বল না, বল না! ওর ধর্মের মুখে ছাই! ওর গেরুয়া কাপড়ের, ওর ভস্ম মাথার মুখে ছাই!"

আর একটা এই দেখিতাম যে, যে কার্য তিনি একবার কর্তব্য বলিয়া অনুভব করিতেন তাহা অতি দৃঢ়তার সহিত করিতেন, লোকের অনুরাগ-বিরাগের প্রতি

দৃষ্টিপাত করিতেন না। তাহার একটি নিদর্শন দিতেছি। একবার দুর্ভিক্ষ হইয়া অনেকগুলি নিরন্ন লোক আমাদের গ্রামে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে একটি নিম্নশ্রেণীর লোক চরম অবস্থায় মৃতপ্রায় হইয়া আমাদের পাড়াতে আসিয়া পড়িল। পাড়ার ব্রাহ্মণ কন্যাগণ তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। আমার জননীও তাহার মধ্যে ছিলেন।

মা তাহার কাছে বসিয়া, "তুমি কত দিন খাওনি?" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে তখন কথা বলিতে পারে না, কেবল হাঁ করিয়া নিজের ক্ষুধা জানাইতে লাগিল।

মা বলিলেন, "আমি ওর মুখে ভাত দিব," এই বলিয়া ভাত আনিতে গেলেন। পাড়ার মেয়েরা বলিতে লাগিলেন, "ও মা, তা কেমন করে হবে! ও কি জাত, তার ঠিক নাই। কোনও নীচ জাতীয় লোককে ডাক, সে খাওয়াক," ইত্যাদি, ইত্যাদি। মা সে কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। ভাত আনিয়া ভালো করিয়া মাখিয়া তাহার মুখে দিতে লাগিলেন, সে আহার করিল। জল দিলেন, জল পান করিল। কিন্তু হায়, পরক্ষণেই প্রাণবায়ু তাহার দেহকে পরিত্যাগ করিল। আমার মা কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার পর মা আমাকে বলিয়াছিলেন, "ও বোধহয় পূর্বজন্মে আমার কোনো আত্মীয় ছিল।"

কোথাও পুরাণ পাঠ হইতেছে বা ধর্মের ব্যাখ্যা হইতেছে শুনিলে, মাকে নিতান্ত অসুস্থ অবস্থাতেও এবং নিতান্ত বার্ধক্যেও ধরিয়া রাখা যাইত না। আমাদের বাড়ি হইতে দূরে হইলেও লাঠির উপর ভর করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতেন।

একবার মা আসিয়া আমার বালিগঞ্জের বাসাতে কিছুদিন ছিলেন। তাহার মধ্যে তাঁহার কি একটা ব্রত উপস্থিত হইল। ঐ ব্রতের সময় ব্রতকারিণীকে একটা 'কথা' শুনিতে হয়। আমি পূজা করিবার ব্রাহ্মণ আনিলাম, কিন্তু সে বেচারা সে 'কথা'টা জানিত না।

আমি আবার ব্রাহ্মণ খুঁজিতে বাহির হইলাম। ব্রাহ্মণ পাইলাম না। আসিয়া দেখি, মা আসন দিয়া আমার ভবনের একপার্শ্বে বসিয়াছেন, এবং বিড়-বিড় করিয়া সমগ্র 'কথা'টি বলিয়া যাইতেছেন। আমার কন্যারা তাঁহাকে ঘিরিয়া হাসিতেছে, বলিতেছে, "ও মা, এ কেমন 'কথা' শোনা!" তিনি হস্ত সঞ্চালন দ্বারা তাহাদিগকে চুপ করিতে বলিতেছেন। শেষে উঠিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কেন? 'কথা' শোনা চাই, এই মাত্র ধর্মে বলে। পরের মুখে শুনবে কি নিজের মুখে শুনবে, তার তো নিয়ম নাই? কথাগুলো আমার কানে গেলেই হল। আমারই কথা আমার কানে গেল, এই তো হল।" এক নাতনী বলিয়া উঠিল, "ধন্যি ঠাকুরমা তোমার বুদ্ধি!" মা বলিলেন, "বুঝলি না? কথাটা না শুনলে ব্রতটা পণ্ড হয়, তাই নিয়মটা রক্ষা করা গেল।"

বাবা বোধহয় লোকের মুখে "বাহবা পণ্ডিত মশাই!" এই কথাটা শুনিতে ভালোবাসিতেন; অন্তত আমার মাতাঠাকুরাণী এইরূপ মনে করিতেন। কারণ, কোনো ক্রিয়াকর্ম করিবার সময়ে ধর্মে যত দূর চায়, শাস্ত্রে যাহা বলে, তাহা করিয়া বাবা সন্তুষ্ট হইতেন না; এমন করিয়া করিতে চাহিতেন যাহাতে সকলে ধন্য-ধন্য করে। ইহা যে সকল স্থলে প্রশংসাপ্রিয়তা হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা নহে; বাবার সহৃদয়তাই অনেক স্থলে ইহার মূলে থাকিত। লোককে দিতে খাওয়াইতে তিনি ভালোবাসিতেন। কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁহার প্রকৃতিতে একটু প্রশংসাপ্রিয়তাও বোধহয় ছিল। যাহা হউক, মা এইটুকুও সহ্য করিতে পারিতেন না। এই প্রশংসাপ্রিয়তার গন্ধটুকু থাকাতে

আমার বাবার ক্রিয়াকর্মে মা বড় আস্থা রাখিতেন না। বলিতেন, "তুমি তো ধর্মার্থে তত কর না, যত 'ভ্যালা রে পণ্ডিত' শোনবার জন্যে কর।" এই লইয়া দুইজনে অনেকবার বিবাদ হইতে দেখিয়াছি। মা ধর্মকর্মের মধ্যে কোনো প্রকার অভিসন্ধির গন্ধ সহ্য করিতে পারিতেন না।

যাহা কিছু অসৎ, যাহা কিছু অপবিত্র, তাহার প্রতি মাতার এত ঘৃণা ছিল যে, শৈশবে আমি এবং আমার ভগিনীগণ পাড়ার বালক-বালিকাদের সঙ্গে মিশিয়া কত যে খারাপ বিষয় দেখিতাম, কত খারাপ কথা শুনিতাম, তাহার একটিও বাড়িতে আনিতে সাহস করিতাম না। আমি একবার একটি খারাপ কথা বাড়িতে উচ্চারণ করিয়া যে সাজা পাইয়াছিলাম, তাহা যথাস্থানে লিখিয়াছি। মা ভালোবাসিবার সময় ফুলের ন্যায় কোমল, অথচ শাসন করিবার সময় লৌহের ন্যায় কঠিন হইতেন।

অতএব ইহা আমি অকুণ্ঠিতভাবে বলিতে পারি যে, আমি যে ঈশ্বরে ও পরকালে, এবং সত্যে ও নিজ কর্তব্যে আস্থা রাখিতে শিখিয়াছি, তাহা অনেক পরিমাণে আমার জননীকে দেখিয়া। তিনি যে কেবল তাঁহার স্তনদুগ্ধের দ্বারা আমাকে পালন করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার চরিত্রের দ্বারাও আমার চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। ১৮৫৬ সালে আমি যখন আমার পিতার সহিত কলিকাতাতে পড়িতে আসিলাম ও চাঁপাতলায় আমার মাতামহের বাসাতে উঠিলাম, তখন মাতামহ মহাশয় সেখানে ছিলেন না। তিনি পীড়িত হইয়া দেশে ছিলেন। আমি সেই সময় হইতে বাসার অপরাপর লোকের ব্যবহার ও আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ব্যবহারে কিছু পৃথক দেখিতাম। তিনি তামাকটি পর্যন্ত খাইতেন না; সর্বদা গম্ভীর, বাসার আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতেন না এবং সর্বদা পাঠে মগ্ন থাকিতেন। তিনি বোধহয় তখন তাঁহার 'গ্রীস ও রোমের ইতিহাস' লিখিতেছেন।

গৃহে যেমন তাঁহাকে পাঠে নিযুক্ত দেখিতাম, সংস্কৃত কলেজে পড়িতে গিয়াও দেখিতাম, তিনি লাইব্রেরি গৃহের এক কোণে পাঠে নিমগ্ন আছেন। এমনি গম্ভীর যে লোকে তাঁহার কাছে যাইতে ভয় পায়। বাস্তবিক, তিনি এমনি গম্ভীর মানুষ ছিলেন যে, আমার মা'র মুখে শুনিয়াছি, দাদা ঘরে আছেন দেখিলে ভগিনীরা পায়ের মল টানিয়া হাঁটুর কাছে তুলিয়া আস্তে-আস্তে সিঁড়ীতে নামিতেন। বড়-মামার এত কম কথা কহা অভ্যাস ছিল যে, আমাকে যে এত ভালোবাসিতেন আমাকেও কখনো একটি আদর বা ভালোবাসার কথা বলেন নাই। তিনি বসিয়া আছেন বা বেড়াইতেছেন দেখিলে আমরা সে ধার দিয়া যাইতাম না।

আমার বয়স যখন ১২ কি ১৩ বৎসর, আমার বড়মামীর বয়স ১৭ কি ১৮ (ইনি বড়মামার তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী) তখন মাসীরা একটা কথা লইয়া বড় হাসাহাসি করিতেন, তাই মনে আছে। সে কথাটা এই :

মামার পড়ার নেশা এমনি প্রবল ছিল যে, রাত্রি ১১টার সময় বড়মামী যখন গৃহকার্য সমাধা করিয়া শয়ন করিতে গেলেন, তখন দেখিলেন যে বড়মামা এমনি পাঠে নিমগ্ন যে একবার মামীর দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না। মামী গায়ে পড়িয়া কথা কহিতে গেলেন, বড়মামা বাম হস্তের ইশারা করিয়া তাঁহাকে থামিতে আদেশ করিলেন। মামী মানিনী হইয়া দুম করিয়া আছড়িয়া বিছানাতে পড়িলেন, সে রাত্রে আর মামার সহিত কথা কহিলেন না। বাস্তবিক, আমি অনেকদিন রাত্রি ১১টার

সময় শয়ন করিতে যাইবার সময় দেখিয়াছি, বড়মামা পাঠে নিমগ্ন; আবার রাত্রি-শেষে ৪টার সময় উঠিয়া দেখিয়াছি, বড়মামা পাঠে নিমগ্ন। বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছি, তবে তিনি ঘুমান কখন!

১৮৫৮ সাল হইতে সোমপ্রকাশ কাগজ বাহির হইলে এই নির্জন বাস ও পাঠাভ্যাস অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল। যখন তিনি তাঁহার ছাপাখানা ও সোম-প্রকাশ কাগজ তাঁহার বাসগ্রাম চাঙ্গড়িপোতাতে তুলিয়া লইয়া মাতলা রেলওয়ের ডেলি-প্যাসেঞ্জার হইলেন, তখনও দেখিতাম, গাড়ি আসিতে বিলম্ব আছে, নানাজনে নানা কথা কহিতেছে, তিনি একপাশে তন্মনস্ক হইয়া কলেজে যাহা পড়াইবেন, সেই পুস্তক পড়িতেছেন। গাড়ির মধ্যে তাঁহার সঙ্গে উঠিয়া অনেকবার দেখিয়াছি, নানা-জনে নানা প্রসঙ্গ করিতেছেন, তিনি কিছুতেই বড় একটা যোগ দিতেছেন না, হুঁ-হাঁ করিতেছেন মাত্র; অধিকাংশ সময় হয় নয়ন মুদ্রিত করিয়া ঢুলিতেছেন, না হয় কলেজের পুস্তক দেখিতেছেন। কেবল, যাহাতে কোনো অন্যায় বা অধর্মের প্রতিবাদ আছে এরূপ কোনো আলোচনা উঠিলে, ও তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার মুখশ্রী বদলিয়া যাইত; অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। বলিতে কি, তিনি ট্রেনে যে-কামরাতে থাকিতেন, সেই সময়ের জন্য সে-কামরার হাওয়া যেন উন্নত ভাব ধারণ করিত।

কর্তব্যকার্যে তাঁহার এমনি গাঢ় অভিনিবেশ ও চিত্তের এরূপ অদ্ভুত একাগ্রতা দেখিতাম যে, তিনি যখন বাড়িতে থাকিতেন, তখন দেখিলে মনে হইত যে সোম-প্রকাশ লেখা ভিন্ন তাঁহার পৃথিবীতে অন্য কার্য নাই; আবার কলেজে গিয়া যখন বসিতেন, তখন দেখিলে মনে হইত যে কলেজে পড়ানো ছাড়া তাঁহার পৃথিবীতে অন্য কার্য নাই। বাস্তবিক, তিনি যে কাজটা একবার কর্তব্য বলিয়া ধরিতেন, তাহা সমগ্র হৃদয়ের সহিত ধরিতেন; ক্ষতিকে ক্ষতি বলিয়া জ্ঞান করিতেন না এবং সে কার্য উদ্ধার না করিয়া ছাড়িতেন না। ইহার দুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

একবার তিনি একদিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আসিতেছেন, এমন সময় গোপজাতীয়া একটি বিধবা যুবতী কাঁদিতে-কাঁদিতে সেই পথ দিয়া চলিয়াছে। বড়মামা তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে, গ্রামের একজন ধনী-লোক তাহাকে দাসী করিয়া বাড়িতে রাখে; সেই অবস্থাতে তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়া বিপথে লইয়া যায় এবং তৎপরে তাহাকে সসত্ত্বা দেখিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। সে তখন নিরুপায়। শুনিয়া বড়মামার ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি প্রথমে সেই ধনীর নিকটে লোক পাঠাইয়া ঐ হতভাগিনীর ভরণপোষণের উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলেন। তাহাতে অকৃতকার্য হইয়া রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন, নিজে ব্যয় দিয়া মোকদ্দমা চালাইবার যোগাড় করিলেন। এই অবস্থাতে বোধহয় ঐ ধনীব্যক্তি সেই স্ত্রীলোককে যাবজ্জীবন মাসে চারিটাকা করিয়া দিতে রাজি হইল। তৎপরে বিধবার গর্ভের সন্তানটি যাহাতে নষ্ট না হয় মামা তাহার উপায় করিলেন, এবং মাতা-পুত্রের রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

আর একটি দৃষ্টান্ত এই। গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাতুল মহাশয় অনুভব করিতে লাগিলেন যে, গ্রামে একটি ভালো ইংরাজী স্কুল থাকা আবশ্যক। তৎপূর্বে গ্রামের জমিদারবাবুদের স্থাপিত একটি স্কুল ছিল। প্রথমে বড়মামা তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া সেটিকে ভালো করিবার প্রয়াস পাইলেন। দুই-তিনবৎসরের মধ্যেই অনুভব করিলেন যে সে প্রয়াস বৃথা। তখন নিজের উপরেই স্কুলটির উন্নতি সাধনের সম্পূর্ণ

দায়িত্ব লইয়া সেই কার্যে দেহ মন অর্পণ করিলেন। তাঁহার ন্যায় একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষে ইহা যে অতিশয় দুঃসাহসিকতার কার্য, এ কথা একবারও তাঁহার মনে আসিল না। স্কুলটির সমগ্র ব্যয়ভার তাঁহার উপরেই পড়িয়া গেল। এই ভার তিনি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বহন করিয়াছেন। মাসের প্রথমে সংস্কৃত কলেজের বেতন পাইলেই সেইদিন বাড়ি ফিরিবার সময় তিনি প্রথমে স্কুলে গিয়া স্কুলের আয়-ব্যয় দেখিয়া, আবশ্যক মতো নিজ বেতন হইতে অর্থ সাহায্য করিয়া শিক্ষক-দিগের বেতন দিবার বন্দোবস্ত করিয়া তবে বাড়ি যাইতেন।

আমার মাতুলের উদারতা ও মহত্ত্বের কোনো কোনো বিবরণ অগ্রে দিয়াছি, তাহার পুনরুক্তি আর করিলাম না। সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমার পিতা-মাতার চরিত্রের পর আমার মাতুলের চরিত্র আমার চরিত্র গঠনের পক্ষে প্রধানরূপে কার্য করিয়াছে। তাঁহার জ্ঞাননিষ্ঠা, তাঁহার কর্তব্যপরায়ণতা, তাঁহার স্বদেশানুরাগ, তাঁহার অকপটচিত্ততা চিরদিন আমার মনে মুদ্রিত রহিয়াছে। আমার 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক গ্রন্থে তাঁহার জীবনচরিত দিয়াছি।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আমার মাতুলের পরেই যাঁহার সংশ্রবে আসিয়া আমি বিশেষ রূপে উপকৃত হই, তিনি পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আমি ১৮৫৬ সালে নয় বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসি। আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হই। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। কেবল তাহা নহে, বন্ধুতা-সূত্রে আমার মাতুলের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আমাদের বাসাতে আসিতেন। অগ্রেই বলিয়াছি, তিনি আমাকে দেখিলেই হাতের দুই অঙ্গুলি চিমটার মতো করিয়া আমার ভুঁড়ির মাংস টানিয়া ধরিতেন। এই ভয়ে, তিনি আসিতেছেন জানিতে পারিলেই, আমি সেখান হইতে নিরুদ্দেশ হইতাম। কিন্তু তিনি আমাকে বড় ভালোবাসিতেন। আসিয়াই আমাকে খুঁজিতেন, আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। আমার বাবাকেও অত্যন্ত ভালোবাসিতেন এবং মাতুলের সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণ লইয়া বিচার উপস্থিত হইলে, বাবাকে ডাকিয়া মীমাংসা করিয়া লইতেন। বাবার ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল।

কলেজে আমরা তাঁহাকে ভয়ের চক্ষে দেখিতাম এবং দূরে-দূরে থাকিতাম। ছেলেরা দুষ্টামি করিলে তিনি ধরিয়া নিজের ঘরে লইয়া যাইতেন, কোণে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন এবং বইয়ের পাতাকাটা স্লাইসের দ্বারা তাহাদের পেটে মারিতেন। আমার যেন মনে হয়, আমার কোনো দুষ্টামির জন্য আমাকে ধরিয়া লইয়া আমার ভুঁড়িতে মারিয়াছিলেন ও আমাকে কোণে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলেন।

আমরা কলেজের ছোট-বড় সকল ছেলে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিয়া মনে করিতাম। আমার বেশ মনে আছে, তিনি যখন ডিরেক্টরের সহিত ঝগড়া করিয়া কলেজ ছাড়িলেন, তখন আমরা গবর্ণমেণ্টের উপর মহা চটিয়া গিয়াছিলাম। তিনি যেন আমাদের প্রাণ সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

তাহার পর যত বয়স বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার সঙ্গে আরও গাঢ় যোগ হইতে লাগিল। আমি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলে বাবার যে ক্লেশ হইয়াছিল তাহাতে তাঁহারও মনে বড় ক্লেশ হইয়াছিল। বাবা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "মানুষ যেমন ছেলে যমকে দেয়, তেমনি আমি ছেলে কেশবকে দিয়াছি।" তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাঁদিয়া-ছিলেন। কিন্তু পথে ঘাটে আমার সঙ্গে দেখা হইলেই প্রথম প্রশ্ন এই করিতেন, "হাঁ

রে তোর কেমন করে চলে?" আমি গৃহতাড়িত হইয়া কষ্ট পাইতেছি, এই মনে করিয়া তাঁহার ক্লেশ হইত।

আমি গবর্ণমেন্টের চাকুরী যখন ছাড়িলাম, তখন একজন গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মশাই, পাজিটা এমন সুখের চাকরীটা ছেড়ে দিয়েছে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কোন পাজির কাছে বলছ? সে তো আমার মনের মতো কাজ করেছে।"

কেহ তাঁহার নিকট গিয়া আমাকে গালাগালি করিলে, তিনি আমার ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের জন্য দুঃখ করিতেন; কিন্তু বলিতেন, "যাই বল, ওকে বুকে রাখলে আমার বুক ব্যথা করে না।"

আমি নানা স্থলে নানা অবস্থাতে তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার প্রকৃতির গুণ সকল দেখিবার যথেষ্ট অবসর পাইতাম। এরূপ দয়াবান, সদাশয়, তেজীয়ান, উগ্র উৎকট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ এ জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি। আমার প্রণীত 'প্রবন্ধাবলী' নামক গ্রন্থে 'বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে তাঁহার অনেক গুণের উল্লেখ করিয়াছি।

প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ী দেবী। অনুমান ১৮৫০ সালে কলিকাতার ৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত রাজপুর নামক গ্রামে, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে প্রসন্নময়ীর জন্ম হয়। আমার বয়ঃক্রম যখন তিন বৎসর ও তাঁহার বয়ঃক্রম যখন একমাস মাত্র, তখন দাক্ষিণাত্য কুলীন বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের কুলপ্রথা অনুসারে তাঁহার সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং তাঁহার ৮ কি ৯ বৎসর ও আমার ১১ কি ১২ বৎসর বয়সে ঐ সম্বন্ধ বিবাহে পরিণত হয়। আমার প্রপিতামহ পূজ্যপাদ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় এই বাগদান ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

বালিকা প্রসন্নময়ী বধূরূপে আমাদের গৃহে আসিয়া বড় অধিক সমাদরে গৃহীত হন নাই। জ্ঞানালোচনাতে ও সামাজিক অবস্থাতে হীন বলিয়া আমার শ্বশুরকুলের ব্যক্তিগণের প্রতি আমার পিতামাতার, বিশেষত আমার পিতার, অবজ্ঞা ছিল। প্রসন্নময়ী সে গৃহের কন্যা সুতরাং তিনিও কিয়ৎ পরিমাণে সেই অবজ্ঞার অংশী হইয়াছিলেন।

তাঁহার সকল কাজকর্মের মধ্যে আমার জনক-জননী অজ্ঞ ও অশিক্ষিত বংশের পরিচয় পাইতেন। তাঁহার বালিকাসুলভ সামান্য-সামান্য ত্রুটি সকলও গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত। হিন্দু গৃহস্থের ঘরে বালিকা বধূকে শ্বশ্রূ ও গুরুজনের সমক্ষে কিরূপ ভয়ে-ভয়ে বাস করিতে হয় তাহা অনেকে জানেন, অতি অল্প বালিকাই সে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। এরূপ সকল দিক দেখিয়া চলা, সরল প্রকৃতির বালিকা প্রসন্নময়ীর বুদ্ধিতে কুলাইত না সুতরাং তিনি ত্বরায় পতিগৃহে বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

আমি এখন এই সকল কথা বলিতেছি, তখন বলি নাই। তখন আমিও বালক ছিলাম, সম্পূর্ণরূপে গুরুজনের ও পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের প্রভাবের অধীন ছিলাম। আমি তখন অধিকাংশ সময় কলিকাতায় থাকিতাম। গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটিতে গৃহে যাইতাম, তখন বালিকা-পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইত। কিন্তু তখন আমি অপরের চক্ষেই তাঁহাকে দেখিতাম এবং অনেক সময় গুরুজনের শাসনের উপরে শাসনের মাত্রা বর্ধিত করিয়া প্রসন্নময়ীর জীবনকে বিষময় করিতাম। তাহা স্মরণ করিয়া পরে অনেক ক্ষোভ করিয়াছি।

যাহা হউক, আমার বাল্যাবস্থা না ঘুচিতেই পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল, উভয় কুলের মধ্যে বিবাদ পাকিয়া উঠিল। প্রসন্নময়ীকে আমাদের গৃহ হইতে নির্বাসিত করা হইল এবং আমি পিতামাতার একমাত্র পুত্র বলিয়া আমাকে দারান্তর গ্রহণে বাধ্য করা হইল।

এই কার্যের পরেই আমার মনে অনুশোচনার উদয় হয়, তাহার ফলে আমি অল্পে-অল্পে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকি। ব্রাহ্মধর্ম হৃদয়ে প্রবেশ করিলে আমি অনুভব করিলাম যে প্রসন্নময়ীকে অকারণে সাজা দেওয়া হইয়াছে। তখন আমি তাঁহাকে নির্বাসন হইতে গৃহে আনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। তিনি পুনরায় আমাদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

এদিকে আমি এক-এক পা করিয়া ব্রাহ্মসমাজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তৎপরে অনেক প্রকার পরীক্ষার ভিতর দিয়া আসিতে হইল। সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে সমুদয় পরীক্ষার মধ্যে প্রসন্নময়ী আমার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন। গোপনে উৎসাহ দান করিয়া আমাকে সবল করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সেইদিন আসিল, যখন আমাকে আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইল। ১৮৬৯ সালে আমি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইলাম। সে সময়ে প্রসন্নময়ীকে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলেই আমার নিকট আসিতে নিষেধ করিলেন। তিনি কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। আমার শিশু কন্যা হেমলতাকে লইয়া আমার নিকট আসিলেন।

আমি তখনো ছাত্র। যে সামান্য ছাত্রবৃত্তি পাইতাম, তদ্দ্বারাই নিজের ভরণপোষণ নির্বাহ করিতাম। সকলেই বুঝিতে পারেন, গৃহতাড়িত হইয়া আমাদিগকে কি ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। প্রসন্নময়ী অতি হৃষ্টচিত্তে সেই দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

তৎপরে যখন আমি কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রসন্নময়ীকে গোপনে বলিলাম যে, ধর্ম-প্রচারে জীবন দিতে আমার ইচ্ছা, তিনি তাহাতে দ্বিরুক্তি করিলেন না। বলিলেন, "তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই কর।" আমি বিধাতার দ্বারা চালিত হইয়া অল্পে-অল্পে ধর্ম প্রচারের পথে আসিয়া পড়িলাম। প্রসন্নময়ী বিরোধী হইলে, কখনই এ পথে সুখে ও সহজে আসিতে পারিতাম না। তিনি কেবল যে বাধা দিলেন না, তাহা নহে; বরং সকল প্রকার দারিদ্র্য ও পরীক্ষা বহন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

এদিকে দুই-একটি করিয়া গৃহহীন বালিকার জন্য আমাদের গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিতে হইল। ক্রমেই তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। আমি আনিতাম, তাহাতে যেন আশ মিটিত না; প্রসন্নময়ী নিজেও জুটাইতেন। এইরূপে বিভিন্ন সময়ে আমাদের গৃহে বিশ বাইশটি বালক-বালিকা আশ্রয় লইয়াছে। প্রসন্নময়ী ইহাদিগকে নিজের সন্তান নির্বিশেষে পালন করিতেন। সে বিষয়ে কোনো প্রভেদ করিতেন না। তাহাদের আবদার ও উপদ্রব সহিতেন, তাহাদিগকে রাঁধিয়া খাওয়াইতেন, রোগে সেবা করিতেন, কোনো প্রকারে মায়ের অভাব জানিতে দিতেন না। অধিক কি, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, সকল গৃহস্থের গৃহের চারিদিকেই প্রাচীর থাকে, বিনা অনুমতিতে কেহ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না, এবং তাহারা আপনাদেরটি আগে দেখিয়া পরেরটি পরে দেখে; কিন্তু প্রসন্নময়ীর হৃদয়ের গুণে আমার গৃহের চারি-

দিকে যেন প্রাচীর ছিল না; যে আসিয়া আপনার হইয়া থাকিতে চাহিত, সেই বসিতে পাইত; আশ্রয়ার্থী হইয়া কেহই বিমুখ হইত না।

এখন তাঁহার কতকগুলি গুণের কথা বলি। তাঁহার প্রধান গুণ, পরকে আপনার করা। এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ পুরুষ বা স্ত্রীলোক দেখি নাই। যে সকল বালিকা এক সময়ে আমাদের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছে, তাহারা পরে যেখানেই যাউক, যেখানেই থাকুক, আমার বাড়ি তাহাদের বাপের বাড়ির মতো হইয়াছে। প্রসন্নময়ী সহস্র কাজের মধ্যে তাহাদের সংবাদ লইয়াছেন, অর্থের দ্বারা সহায়তা করিয়াছেন ও তাহাদের ভদ্রাভদ্রের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিয়াছেন। মৃত্যুশয্যাতে পড়িয়াও তাহাদের অনেকের নাম করিয়াছেন ও দেখিতে চাহিয়াছেন। সত্য-সত্যই পরকে আপন করা এরূপ দেখা যায় না।

দ্বিতীয় গুণ, গৃহকার্যে দক্ষতা। যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, সকলেই জানেন, তিনি আলস্য কাহাকে বলে জানিতেন না। যতদিন শরীরে শক্তি ছিল, রাঁধুনী রাখিতে দিতেন না; নিজ হস্তে পাক করিয়া সন্তানদিগকে খাওয়াইতে ভালো-বাসিতেন। এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না যে, আমার সন্তানেরা কখনো তাহাদের মাতাকে ঘুমাইয়া থাকিতে দেখিয়াছে কি না সন্দেহ; অর্থাৎ তাহারা নিদ্রিত হইলে তিনি শয্যাতে যাইতেন, এবং তাহারা উঠিবার পূর্বেই গাত্রোত্থান করিয়া গৃহকার্য অর্ধেক সারিয়া ফেলিতেন। সাধনাশ্রমে আসার পর প্রাতে ৮টার পূর্বে রাঁধিয়া অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত রাখিয়া যথাসময়ে উপাসনায় যোগ দিতেন।

তৃতীয় গুণ, কাজের শৃঙ্খলা। তিনি অনিয়ম সহ্য করিতে পারিতেন না। রন্ধন-শালায় বা ভাঁড়ার ঘরে সর্বদা একটি ঘড়ি রাখিতেন। ঘড়ির নিয়মানুসারে সকল কাজ করিতেন। আমাদের বন্ধু-বান্ধব সকলে বলিতে পারিতেন, তিনি কোন ঘণ্টায় কি কাজ করিতেছেন।

চতুর্থ গুণ, হৃষ্টচিত্ততা। তিনি যে এত পরিশ্রম করিতেন, এত দারিদ্র্যে বাস করিতেন, সংসারের এত ভার বহিতেন, তাঁহার মুখ দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যাইত না। সর্বদা প্রফুল্ল থাকিতেন, আর গান করিতেন, বা মুখে-মুখে কোনো ছড়া আবৃত্তি করিতেন। গাহিয়া হাসিয়া অভিনয় করিয়া পরিবারস্থ সকলকে চির-আনন্দে রাখিতেন। বন্ধুগণ সর্বদা বলিতেন, এই আমুদে পরিবারের লোকে দুঃখ কাহাকে বলে জানে না।

তাঁহার স্বাভাবিক হৃষ্টচিত্ততার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার আমাদের বড় দারিদ্র্যের অবস্থা উপস্থিত হয়। সেই সময়ে প্রসন্নময়ীর আরসীখানি ভাঙিয়া যায়। তখন তাঁহার একখানি নূতন আরসী কিনিবার পয়সা ছিল না। তিনি জলের জালাতে মুখ দেখিয়া চুল বাঁধিতে আরম্ভ করেন। এ সকল কথা আমি জানিতাম না। এক-দিন আমার বন্ধু দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের পত্নী ব্রহ্মময়ী অপরাহ্নে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে প্রসন্নময়ী জলের জালার নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি হেমের মা, জলের জালার কাছে দাঁড়িয়ে কেন?"

প্রসন্নময়ী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আরসীখানা ভেঙে গেছে, তাই জলের জালাতে মুখ দেখে চুল বাঁধছি।"

ব্রহ্মময়ী। ও মা, এমন তো কখনো শুনিনি!

প্রসন্নময়ী অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, "দেখলেন, আমি কেমন একটা নূতন

বিষয় দেখালাম।" দুইজনেই হাসিতেছেন, এমন সময় আমি উপস্থিত; তখন আমি সমুদয় কথা জানিতে পারিলাম।

এ কথাটাও আমার এই সঙ্গে বলা আবশ্যক যে আমার বন্ধুপত্নী হাসিলেন বটে, কিন্তু ব্যাপারটায় তাঁহার প্রাণে একটা আঘাত লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকাণ্ড একখানি সুন্দর আরসী কিনিয়া আনিয়া উপহার দিলেন।

আর একটি ঘটনা এই। এইরূপ দারিদ্র্যের অবস্থাতে একবার আমাদের ঝি ছিল না। একদিন প্রসন্নময়ী একখানি মলিন বসন পরিয়া প্রাঙ্গণে ঝাড়ু দিতেছেন, এমন সময়ে কাহাদের বাড়ির একজন স্ত্রীলোক পাড়াতে বেড়াইতে আসিল। সে প্রসন্নময়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তুমি এদের বাড়ি মাসে কত মাইনে পাও?" প্রসন্নময়ী বলিলেন, "ও গো, আমাকে এরা মাইনে দেয় না, পেটভাতে এদের বাড়িতে আছি।" সে স্ত্রীলোক আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছে, এমন সময়ে আমার সন্তানদের মধ্যে কেহ মা বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া প্রসন্নময়ীকে ধরিল। তখন সে স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল, "ও মা, তুমি এ বাড়ির গিন্নি!" তখন প্রসন্নময়ী খ্যাংরা ফেলিয়া অট্টহাস্য করিয়া গৃহের মধ্যে গেলেন।

পঞ্চম গুণ, পবিত্রচিত্ততা। পবিত্রচিত্ততাতে তিনি নারীকুলের অগ্রগণ্য শ্রেণীতে ছিলেন। অপবিত্র কার্যের প্রতি এমন গভীর ঘৃণা প্রায় দেখা যায় না। অভদ্র আলাপ, অভদ্র পরিহাস সহ্য করিতে পারিতেন না; এমন কি, মলিন চিন্তাও কখনো মনে উদয় হইত না। অধিক কি, যদি কখনো মলিন স্বপ্ন দেখিতেন, তাহাতেও চরিত্রের হীনতা জ্ঞানে ক্ষোভ করিতেন। আমি বুঝাইয়া সে ক্ষোভ নিবারণ করিতে পারিতাম না।

ষষ্ঠ গুণ, সরলতা। তিনি কাহারও অনিষ্ট চিন্তা কখনো করেন নাই। সংসারের কুটিল পথ একেবারেই জানিতেন না। তাঁহার চিত্তের সরলতা এতই অধিক ছিল যে, তিনি পঞ্চাশৎ বৎসরেরও অধিক কাল সংসারের মধ্যে বাস করিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয় মনে কলঙ্কের রেখাও পড়ে নাই।

সপ্তম গুণ, তাঁহার শিক্ষা কিছুই ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া তিনি আমার কয়েকজন বন্ধুর প্রতি অন্তরের এরূপ শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তাহা হইতে কেহই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মন এমন কুসংস্কারবিহীন ও সামাজিক বিষয়ে এত অগ্রসর ছিল যে, দেখিয়া অনেকের আশ্চর্য বোধ হইত; অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিতেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারি। আমরা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পরেও আমার জনক-জননী সর্বদাই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন যেন আমার সন্তানগণ ব্রাহ্মণকেই বিবাহ করে। প্রসন্নময়ী বলিতেন, "তা কি বলিতে পারি? ছেলেমেয়েরা যাকে ভালোবাসিবে তাকেই বিবাহ করিবে। ব্রাহ্ম যখন হইয়াছি, তখন আবার জাত কি?" কাজেও সেইরূপই করিয়াছেন।

উপাসনাতে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। রোগে নিতান্ত অশক্ত হইলেও প্রতি-দিন ঈশ্বরোপাসনা করিতে ভুলিতেন না। এমন কি, যে রোগে তাঁহার প্রাণ গেল, তাহার মধ্যেও যতক্ষণ শক্তি ছিল, অতি কষ্টে শয্যাতে উঠিয়া বসিয়া গান ও ঈশ্বরোপাসনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে সময়ে প্রায় প্রতিদিন সাধনাশ্রমের উপাসনা কালে বলিতেন, "আমাকে লইয়া আশ্রমের বারান্দাতে শোয়াও।" আমি শিলচর হইতে "প্রসন্নময়ীর অবস্থা খারাপ" এই টেলিগ্রাম পাইয়া কলিকাতায় আসিলাম। আসিয়াই ডাকিয়া বলিলাম, "দেখ, আমি আসিয়াছি।" তখন তিনি

বলিলেন, "আমার মাথার কাছে বসিয়া উপাসনা কর।" মৃত্যুর পূর্বে কন্যাদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমার মৃতদেহ ঘাটে লইয়া যাইবার পূর্বে একবার আশ্রমের উপাসনা কুটিরের বারান্দাতে শোয়াস।" তদনুসারে তাঁহার শবদেহ আশ্রমের বারান্দাতে রাখিয়া প্রার্থনা করা হইয়াছিল।

তাঁহার সরল পবিত্র হৃদয়ে পরস্পর বিরোধী ভাবের আশ্চর্য সমাবেশ দেখিয়াছি। দুর্নীতির প্রতি তাঁহার এমনি বিরাগ ছিল যে, ওরূপ জ্বলন্ত ঘৃণা প্রায় দেখা যায় না। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নিজের একজন নিকটস্থ আত্মীয়ের কোনো গর্হিত অনুষ্ঠানের কথা শুনিয়া এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, সে ব্যক্তি দেখা করিতে আসিলে দেখা করিলেন না, এবং আর তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মদের মধ্যে কেহ ঋণ করিয়া টাকা দেয় না, মিথ্যা প্রবঞ্চনা করে, বা আরও কিছু গুরুতর পাপে লিপ্ত হইয়াছে, শুনিলে ঘৃণাতে অধীর হইয়া উঠিতেন। বলিতেন, "ব্রাহ্মসমাজে কি মানুষ নাই? এই হতভাগাদিগকে কান ধরিয়া দূর করিয়া দেয় না কেন?" অথচ যদি আবার বিশ্বাস হইত যে, কোনো স্ত্রীলোক দুর্বলতা বশত পাপে পড়িয়াছে বা তাহাকে প্রবঞ্চনা পূর্বক কেহ বিপথে লইয়াছে এবং সেজন্য সে অনুতপ্ত, তাহা হইলে ভগিনীর ন্যায় তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিতেন; সময়ে অসময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন, শ্রদ্ধা ও প্রীতি দিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। বলিতে কি, অনুতপ্ত ব্যক্তির প্রতি তাঁহার সদ্ভাব দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া যাইতাম।

সমাজের কাজ লইয়া ব্রাহ্ম-বন্ধুদিগের সহিত সময়-সময় আমার মতবিরোধ হইত। সাধারণত আমি বাহিরের কথা ঘরে লইয়া যাইতাম না। কিন্তু প্রসন্নময়ী যদি কাহারও মুখে শুনিতেন যে, আমাকে কেহ কর্কশ কথা বলিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কিছুই বিরক্ত হইতেন না। বলিতেন, "সমাজ তোমারও যেমন, তাঁদেরও তেমনি; দশকথা বলিলেই দশকথা শুনিতে হয়।" অধিক কি, নববিধানের বন্ধুগণের সহিত কত বিরোধ করিয়াছি ও তাঁহাদিগের কত কটূক্তি ভাজন হইয়াছি, তাহা সকলেই জানেন। প্রসন্নময়ীকে যদি কেহ ঐ সকল কটূক্তির কথা শুনাইত, তিনি হাসিতেন; ঐ সকল কটূক্তি সত্ত্বেও নববিধানের যে সকল বন্ধুর সহিত তিনি একবার একগৃহে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আপনার লোক ও অগ্রজ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেন; তাঁহাদের নাম হইলেই গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন, দেখা হইলেই আনন্দিত হইতেন। শুনিয়াছি, শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা গৌরগোবিন্দ রায় ও কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়দ্বয় তাঁহাকে রোগশয্যাতে দেখিয়া বাহিরে যাইবার সময় লোকের নিকট বলিয়া গিয়াছিলেন, "ইনি তো আমাদের লোক।" বাস্তবিক, প্রসন্নময়ী যেখানেই থাকুক, প্রীতি ও শ্রদ্ধাতে মনে মনে তাঁহাদের লোক রহিয়াছিলেন। তবে নববিধানের নূতন মত ও কাজকর্ম ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেন না।

এই তো একদিকে আমার বিরোধীদিগের প্রতি উদারতা। কিন্তু অপর দিকে, যদি কখনো শুনিতে পাইতেন যে, কোনো লোক গোপনে আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে নিন্দা করিতেছে বা লোক চক্ষে আমাকে হীন করিতে চেষ্টা করিতেছে, তখন আর তাহার নাম সহ্য করিতে পারিতেন না। বলিতেন, "ও কাপুরুষের নাম আমার কাছে করিও না," বলিয়া ক্রোধভরে সে স্থান ত্যাগ করিতেন।

এই সকল গুণে প্রসন্নময়ী সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুতে কেবল আমার সন্তানেরাই যে মা-হারা হইয়াছিল তাহা নহে, তাঁহার জন্য অনেকের চক্ষে জল পড়িয়াছিল।

আমি বহু বৎসর পূর্বে ঈশ্বর চরণে নিবেদন করিয়াছিলাম—

"আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই,
পরে সুখী করে সুখী হতে চাই।
নিজে তো কাঁদিব,
কিন্তু মুছাইব
অপরের আঁখি,—এই ভিক্ষা চাই।
সত্য! ধন মান
চাহে না এ প্রাণ,
যদি কাজে আসি তবে বেঁচে যাই।
বহু কষ্টে পূর্ণ আমার অন্তর,
এই আশীর্বাদ কর, হে ঈশ্বর—
খাটিতে বাঁচিব,
খাটিয়া মরিব,
এই বড় আশা; পূর্ণ কর তাই।"

তখন আমি যে ছবি আদর্শে রাখিয়াছিলাম, প্রসন্নময়ী তাহা জীবনে পরিণত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি সংসারের শত কষ্ট ও অশান্তির মধ্যে পরকে সুখী করিয়া সুখী হইয়াছেন, নিজে কাঁদিয়া অপরের অশ্রু মুছাইয়াছেন এবং অনলস শ্রমশীল ও কর্তব্যপরায়ণ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। যথার্থই তিনি খাটিতে বাঁচিয়াছেন ও খাটিয়া মরিয়াছেন॥

উল্লিখিত বিদেশী ব্যক্তিদের পরিচয়

আর্থার হেল্পস (স্যর) : জন্ম ১৮১৩। বিখ্যাত প্রবন্ধকার এবং ঐতিহাসিক। গ্রন্থাবলী : 'থটস্ ইন দি ক্লয়স্টার এ্যান্ড দি ক্রাউড' (১৮৩৫), 'ফ্রেন্ডস্ ইন কাউনসিল' (১৮৪৭-৫৯), 'টকস্ এ্যাবাউট এ্যানিম্যালস্ এ্যান্ড দেয়ার মাস্টার্স্' (১৮৭৩), 'কঙ্কারারস্ অভ দি নিউ ওয়ার্ল্ড এ্যান্ড দেয়ার বন্ডস্‌মেন' (১৮৪৮-৫২) ইত্যাদি। বিবিধ সামাজিক সমস্যা এবং দাসত্বপ্রথা বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধাবলী বিখ্যাত।

আর্নল্ড টয়েন্‌বি : জন্ম ১৮৫২। বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক। ব্যালিয়ল কলেজের ছাত্রাবস্থাতেই শ্রমিকদের আর্থিক এবং নৈতিক উন্নতির জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। মৃত্যুর দুই বছর পরে ১৮৮৫ সালে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য হোয়াইটচ্যাপেল-এ 'টয়েন্‌বি হল' স্থাপিত হয়।

ই. বি. কাউয়েল : জন্ম ১৮২৬। ১৮৫৬ সালে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক এবং অল্পদিন পরেই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৬৭ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

উইলিয়াম জোনস্ (স্যর) : বিখ্যাত প্রাচ্যভাষাবিদ পণ্ডিত। জন্ম ১৭৪৬। ১৭৮৩ সালে বাঙলা দেশের সুপ্রীমকোর্টে জজ নিযুক্ত হন। ১৭৮৭ সালে তিনিই প্রথম সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ল্যাটিন এবং গ্রীক ভাষার সাদৃশ্যের প্রতি পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কলকাতায় রয়েল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সভাপতি। রচনাবলী : শকুন্তলা এবং হিতোপদেশের সম্পূর্ণ এবং বেদ, মনু-র আংশিক অনুবাদ। ১৭৯৪ সালের ২৭শে এপ্রিল কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

উইলিয়াম স্টেড : জন্ম ৫ই জুলাই, ১৮৪৯। ১৮৮৩ সাল থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত 'পেলমেল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'মেইডেন ট্রিবিউট' নামে প্রবন্ধ রচনার জন্য তাঁকে তিনমাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। 'রিভিউ অভ রিভিউস্' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। শান্তি, আধ্যাত্মবাদ, এবং রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্কে প্রচুর কাজ করেছেন। বোয়ার-যুদ্ধের সময় বোয়ারদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। ১৯১২ সালে, ১৫ই এপ্রিল বিখ্যাত 'টাইটানিক' জাহাজডুবিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

এডউন আর্নল্ড (স্যর) : জন্ম ১০ই জুন, ১৮৩৯। কবি এবং শিক্ষাবিদ। ১৮৫২

সালে 'বেলশাজারস্ ফীস্ট' নামে কবিতা লিখে নিউডিগেট পুরস্কার লাভ করেন। পুণার 'গভর্ণমেণ্ট স্যানস্ক্রিট কলেজ'-এর অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৬১ সালে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' কাগজের সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দেন। কাব্যগ্রন্থ : 'পোয়েমস্' (১৮৫৩), 'দি ইণ্ডিয়ান সং অভ সংস্' (১৮৭৫), 'দি লাইট অভ এশিয়া' (১৮৭৯), 'ইণ্ডিয়ান পোয়েট্রি' (১৮৮৩), 'দি সং সেলেস্টিয়াল' (১৮৮৫) ইত্যাদি।

কার্পেণ্টার (জোসেফ এস্টেলিন কার্পেণ্টার) : জন্ম ১৮৪৪। বিখ্যাত সমাজসেবী মেরি কার্পেণ্টার-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। ধর্মতত্ত্ববিদ। ১৯০৬-১৫ খৃষ্টাব্দে ম্যানচেস্টার কলেজের অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষ ছিলেন।

চার্লস ভয়সী (রেভারেণ্ড) : জন্ম ১৮২৮। হোয়াইটচ্যাপেল-এর কিউরেট ছিলেন। ধর্মবিষয়ক বক্তৃতার জন্য ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর কারাদণ্ড হয়। পরে তিনি লণ্ডনে খৃষ্টীয় অদ্বৈতবাদী থীইস্টিক চার্চের প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যু ১৯১২।

জর্জ মুলার : জন্ম ১৮০৫। বিখ্যাত 'ননকনফর্মিস্ট' ধর্মযাজক। ১৮৩৬ সালে ব্রিস্টলের এশলিডাউনে তিনি একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যু ১৮৯৮।

জন হেনরী নিউম্যান (কার্ডিন্যাল) : জন্ম ২১শে ফেবরুয়ারী, ১৮০১। ইতালি ভ্রমণের সময় 'লীড কাইণ্ডলি লাইট' নামে তাঁর বিখ্যাত কবিতা রচনা করেন। ট্রাকটারিয়ান আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। এই আন্দোলন উপলক্ষ্যে রচিত ধর্ম-পুস্তিকাগুলির জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। কিছুদিন পরে ট্রাকটারিয়ান আন্দোলন শেষ হয়ে যায় এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজেও পোপের আনুগত্য স্বীকার করে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কার্ডিন্যাল নিযুক্ত হন। মৃত্যু ১৮৯০।

জেমস মার্টিনো : লেখিকা হ্যারিয়েট মার্টিনো-র ভ্রাতা। জন্ম ১৮০৫, নরউইচ। ডাবলিন এবং লিভারপুলে ইউনিটারিয়ান সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক ছিলেন। ম্যাঞ্চেস্টার নিউ কলেজের অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষ। বিখ্যাত তত্ত্বজিজ্ঞাস্য লেখক। রচনাবলী : 'দি র‍্যাশোনেল অভ রিলিজাস হিস্ট্রি' (১৮৩৬), 'হিমস ফর দি ক্রিশ্চিয়ান চার্চ অ্যাণ্ড হোম' (১৮৪০), 'টাইপস অভ এথিকাল থিওরি' (১৮৮৫), 'এ স্টাডি অভ স্পিনোজা' (১৮৮২), ইত্যাদি।

ডক্টর বার্নার্ডো : জন্ম ১৮৪৫, আয়র্ল্যাণ্ড। অনাথ শিশুদের জন্য ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে 'বার্নার্ডো হোমস্'-এর প্রতিষ্ঠা করেন।

ডক্টর লেগি : জন্ম ১৮১৫। মালাক্কায় এ্যাংলো-চাইনীজ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড-এ চীনাভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মূল, অনুবাদ এবং টিকা সহ 'চাইনীজ ক্ল্যাসিকস' (১৮৬১-৮৬) নামে বিখ্যাত গ্রন্থ সম্পাদনা করেন।

ডেভিড হেয়ার : (১৭৭৫) জন্ম স্কটল্যাণ্ড। ঘড়ি-ব্যবসায়ী হিসাবে ভারতবর্ষে

এসেছিলেন। কিন্তু বাঙলাদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের কাজে সহায়তা করার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। রামমোহন রায় এবং কয়েকটি ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে একত্রে তিনি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং পাঠ্যপুস্তক প্রচারের জন্য 'স্কুলবুক সোসাইটি' স্থাপন করেন। তাঁর উৎসাহে কলকাতার নানাস্থানে আরও কয়েকটি ইংরেজী ও বাংলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিখ্যাত 'হেয়ার স্কুল' এই হিতৈষী ব্রিটিশ ভদ্রলোকের নামের স্মৃতি বহন করছে। মৃত্যু ১৮৪২।

থিওডোর পার্কার : জন্ম ১৮১০। আমেরিকার বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক। ইউনিটারিয়ান মতাবলম্বী হয়েও তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী। আমেরিকায় দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদকল্পে যে যে আন্দোলন হয় তাঁর অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। রচনাবলী : 'এ ডিসকোর্স অভ ম্যাটারস প্যারটেনিং টু রিলিজান' (১৮৪১), 'স্যরমনস অভ দি টাইমস' ইত্যাদি। কঠোর পরিশ্রমের ফলে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে ১৮৮৮ সালে এই মনীষীর মৃত্যু হয়।

ফ্রান্সিস নিউম্যান : কার্ডিন্যাল নিউম্যান-এর ভ্রাতা। জন্ম ১৮০৫। ম্যাঞ্চেস্টার নিউ কলেজ এবং পরে লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপক। কার্ডিন্যাল নিউম্যান-এর বিপরীত ধর্মমত পোষণ করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইতিহাসে যেসব বিভিন্ন ধর্মমতের উল্লেখ আছে তার সমস্ত প্রধান বৈশিষ্ট্য সমন্বিত একটি ধর্মমতের প্রবর্তন প্রয়োজন। ১৮৫৩ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফেজেজ অভ ফেইথ' প্রকাশিত হয়।

বুথ : জন্ম ১৮২৯। স্যালভেশন আর্মির প্রতিষ্ঠাতা এবং এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম 'জেনারেল'। তাঁর পুত্র উইলিয়াম ব্রামওয়েল বুথ—১৯১২-২৮ পর্যন্ত স্যালভেশন আর্মির 'জেনারেল' ছিলেন।

ব্রাডল : জন্ম ১৮৩৩, ২৮শে সেপ্টেম্বর। সমাজতন্ত্রবিরোধী সমাজসংস্কারক। পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েও শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় দু'বার তাঁর নির্বাচন বাতিল হয়ে যায়। অবশেষে তৃতীয়বার নির্বাচিত হয়ে তিনি শপথ গ্রহণ করতে স্বীকার করেন। এ্যানি বেসান্ত-এর সঙ্গে একত্রে 'দি ফ্রুটস অভ ফিলজফি' নামে পুস্তিকা প্রকাশের জন্য তাঁর ছ'মাস কারাদন্ড এবং ২০০ পাউন্ড অর্থদন্ড হয়। পৃথিবীতে অতিমাত্রায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিরসন প্রসঙ্গ এই পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়। মৃত্যু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে, ৩০শে জানুয়ারি।

মনিয়ার উইলিয়ামস্ (স্যর) : জন্ম ১২ই নভেম্বর, ১৮১৯, বম্বাইতে। হেইলিবেরী এবং পরে অক্সফোর্ডে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে। সংস্কৃতের ব্যাকরণ এবং অভিধান রচনা করেছেন। রচিত গ্রন্থাবলী : 'রুডিমেন্টস অভ হিন্দুস্থানী' (১৮৫৮), 'ইন্ডিয়ান এপিক পোয়েট্রি' (১৮৬৩), 'ইন্ডিয়ান উইজডম' (১৮৭৫), 'হিন্দুইজম' (১৮৭৭), 'মডার্ন ইন্ডিয়া' (১৮৭৮), 'রিলিজাস থটস অ্যান্ড লাইফ ইন ইন্ডিয়া' (১৮৮৩), 'বুদ্ধিজম্' (১৮৯০)। 'শকুন্তলা' এবং আরো কয়েকটি সংস্কৃত কাব্যের সম্পাদনা করেছেন।

মাদাম ব্লাভাটস্কি : জন্ম ১৮৩১, রাশিয়া। আধুনিক থিওসোফি অর্থাৎ ব্রাহ্মবিদ্যা মতবাদের প্রবর্তক।

মিসেস কসিট : স্যর থিওডোর মার্টিন-এর পত্নী। জন্ম ১৮২০, ১১ই অক্টোবর। শেক্সপীয়ার-এর নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৫১ সালে বিবাহের পরে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ১৮৮৫ সালে 'অন সাম্ অভ শেক্সপীয়ারস' ফিমেল ক্যারেকটারস্' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। মৃত্যু ১৮৯৮, ৩১শে অক্টোবর।

মিস কব (ফ্রান্সেস পাওয়ার কব) : ১৮২২ সালে ডাবলিনের নিকটবর্তী নিউব্রিজে জন্ম। মা এবং পরে বাবার মৃত্যুতে তাঁর মনে গভীর ধর্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়। নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেত্রী ছিলেন। গ্রন্থাবলী : 'ফ্রেন্ডলেস গার্লস' (১৮৬১), 'ক্রিমিন্যালস', 'ইডিয়টস', 'উইমেন অ্যান্ড মাইনারস' (১৮৬৯), 'ডারউইনিজম ইন মর্যালস্' (১৮৭২), 'দি হোপস্ অভ দি হিউম্যান রেস্ হিয়ার-আফটার অ্যান্ড হিয়ার' (১৮৭৪), ইত্যাদি।

মিসেস বাটলার : হ্যারো বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক জর্জ বাটলার-এর পত্নী। জন্ম ১৮২৮। নারী আন্দোলনের নেত্রী এবং সমাজ সংস্কারক হিসাবে বিখ্যাত।

স্টপফোর্ড ব্রুক (রেভারেন্ড) : জন্ম ১৮৩২। ডাবলিন ট্রিনিটি কলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। ধর্মযাজক হিসাবে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাগুলি চিন্তা এবং ভাষার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত। গ্রন্থাবলী : 'থিওলজি ইন দি ইংলিশ পোয়েটস্' (১৮৭৪), 'প্রাইমার অভ ইংলিশ লিটারেচার' (১৮৭৬), 'মিলটন' (১৮৭৯), 'টেনিসান' (১৮৯৪), 'স্যরমনস' (১৮৬৮-৯৪), 'পোয়েট্রি অভ ব্রাউনিং' (১৯০২), ইত্যাদি। মৃত্যু ১৯১৬।

বর্ণানুক্রমিক নামসূচী